সারদা-রামকৃষ্ণ

শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম
২৬, মহারাণী হেমন্তকুমারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীশ্রীমায়ের শতবার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে

শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের

পাদপদ্মে ভক্তি-অর্ঘ্য
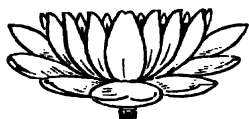
নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণং হৃদি সন্নিধায় শ্রিয়ং বিধত্তে কৃপয়া চ মোক্ষম্ ।
ভক্তে প্রসন্না পতিতেঽপি সন্না যা সারদা তাং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী মাতাঠাকুরাণী যেদিন কৃপাপরবশ হইয়া এই দীনা কন্যাকে সন্ন্যাস দান করেন, সেদিন আশীর্ব্বাদান্তে বলিয়াছিলেন, "প্রচার করো মা, প্রচার করো।" সেদিন হইতে এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে আমার মনে ইহাই প্রতিভাত হইয়াছে যে, জীবের কল্যাণে তাঁহারই অনুপম জীবনাদর্শ এবং অমৃতবাণী প্রচারের ইঙ্গিতই মা করিয়াছিলেন। তদবধি মায়ের নামপ্রচারই আমার জীবনে মুখ্য ব্রত।

শৈশবাবধি কতভাবে মায়ের কৃপালাভে কৃতার্থ হইয়াছি, কত শরণাগত নরনারীকে মায়ের কৃপায় ধন্য হইতে দেখিয়াছি, মায়ের শ্রীমুখ হইতে তাঁহার পূতজীবনের কত কথা শুনিয়াছি; সেই সমস্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে মায়ের মহিমাই প্রচার করা হইবে এবং তাহাতে জগতের কল্যাণই হইবে,—ইহাই আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু কার্য্যে ব্রতী হইয়াই মনে হইল, এবারের লীলা তো একার নহে,—এ যে যুগ্মলীলা। ঠাকুর যুগপ্রবর্ত্তক, আর ঠাকুরাণী যুগাধিষ্ঠাত্রী দেবী; উভয়ের জীবন ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত। এই ভাগবতী লীলা অবিচ্ছিন্নভাবে অনুধ্যান করিলে তবেই তাঁহাদের লীলামাহাত্ম্য সম্যক উপলব্ধি হইবে। এই কারণে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিতকথাও এই গ্রন্থে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল মায়ের পূতসঙ্গলাভ এবং কলিকাতায় ও বিভিন্ন স্থানে তাঁহার সহিত বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। সেই সুযোগে তাঁহাদের জীবনের অনেক কথা তাঁহার শ্রীমুখ হইতে জানিতে পারিয়াছি। পূজনীয়া জননী শ্যামাসুন্দরী ও মায়ের সহোদরগণ, পূজনীয় রামলালদাদা ও লক্ষ্মীদিদি, শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, গৌরীমা, গোলাপমা, কৃষ্ণভাবিনী দেবী, নিকুঞ্জ দেবী-প্রমুখ অন্তরঙ্গগণের নিকট হইতেও ঠাকুর-ঠাকুরাণীর জীবনকথা শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের অনেক ভক্তের নিকট হইতেও বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদের নিকট হইতেই এই গ্রন্থের উপাদান আহৃত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থেরও সহায়তা লইয়াছি, তাহাদের নাম পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

মাতাঠাকুরাণীর সহিত দেবী জগদ্ধাত্রীর অলৌকিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা গ্রন্থমধ্যে আলোচিত হইয়াছে। মাতার আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেবী জগদ্ধাত্রী যে পিতা রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দর্শন দিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গটি মাতার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। অনেক অপ্রকাশিত ঘটনা গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। প্রচারিত কয়েকটি ঘটনা সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ নহি বলিয়া তাহা গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ করা হয় নাই। ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সকল ঘটনা এইরূপ ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে, তাঁহাদের কৃপা হইলে ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত করিয়া লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর লোকোত্তর জীবনচরিত ত্রুটিহীনভাবে অঙ্কিত করা জীবের দুঃসাধ্য। তবে ভরসা এই যে, ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটিলেও মূর্ত্তিমতী করুণা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এবং করুণার অবতার শ্রীশ্রীঠাকুর কন্যার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়ের লিখিত অনেক তথ্য দিয়া সাহায্য করিয়াছেন তদীয় পৌত্র শ্রীঅনিলকুমার গুপ্ত। শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, ভক্তিমতী শৈলবালা দেবী, কানুমোহিনী দেবী-প্রমুখ অন্তরঙ্গগণের পত্রাবলীতে নানাভাবে উপকৃত হইয়াছি। মাতাঠাকুরাণীর স্নেহধন্যা কয়েকজন আশ্রমবাসিনী সন্ন্যাসিনীও নানাভাবে সহায়তা করিয়াছেন। ত্রিশখানি ছবি এবং একখানি

মানচিত্রও গ্রন্থে সংযুক্ত হইয়াছে। ছবির ব্লক দিয়া যাঁহারা সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের নাম যথাস্থানে স্বীকৃত হইয়াছে। *এই গ্রন্থপ্রকাশে মানসী* প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারিগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং অন্যান্য যাঁহারা নানাভাবে সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদেরও সদাশয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত সকলের নিকট ঋণ এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীগুরুমাতার শতবার্ষিক-জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণকে আমার অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে পারিয়া আমি নিজেকে অতীব কৃতার্থ মনে করিতেছি। যদি 'সারদা-রামকৃষ্ণ' গ্রন্থের বিষয়বস্তু আলোচনা এবং অনুশীলন করিয়া কাহারও প্রাণে শুভ প্রেরণা জাগে ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধি হয়, তাহা শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের মহিমারই গুণে।

তাঁহাদের কৃপায় সকলের কল্যাণ হউক, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক।

অক্ষয়তৃতীয়া
২২শে বৈশাখ, ১৩৬১
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর
শ্রীচরণাশ্রিতা কন্যা
শ্রীদুর্গাপুরী দেবী

সূচীপত্র

শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ স্তব	...	...	১
সম্ভবামি যুগে যুগে	...	...	২
পুণ্যতীর্থ	...	...	৪
আগমনী	...	...	৭
শৈশবে	...	...	১৩
প্রভু গদাধর	...	...	১৭
মিলন	...	...	২৫
সাধনা	...	...	৩০
সহধর্ম্মিণী	...	...	৪৪
দৈবযোগ	...	...	৬২
দক্ষিণেশ্বর	...	...	৭০
দক্ষিণেশ্বরে মাতাঠাকুরাণী	...	...	৯৬
ঠাকুরের মহাসমাধি	...	...	১৩১
শ্রীধাম বৃন্দাবনে	...	...	১৫০
নূতন জীবনধারা	...	...	১৬৪
সংঘ ও প্রচার	...	...	১৮২
সন্তানবৎসলা	...	...	১৯৩
শ্রীক্ষেত্রে	...	...	২২২
মাতৃপূজা	...	...	২৩৮
মাতৃভবনে	...	...	২৬৬
মৃন্ময়ী দেবী ও রামেশ্বর মহাদেব	...	...	২৮৩
বিবিধ প্রসঙ্গে	...	...	৩০২
শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতা ও আশ্রম	...	...	৩৪৩
পথের নির্দ্দেশ	...	...	৩৫৫
জগজ্জননী	...	...	৩৮৩
নিত্যমিলন	...	...	৪১৬

শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণৌ জয়তাম্

আদ্যাং শক্তিং প্রকৃতিমসমামীশ্বরীং বিশ্বধাত্রীং
সন্তানানাং কুশলনিরতাং হ্লাদিনীং সিদ্ধিদাত্রীম্।
সর্ব্বারাধ্যামভয়বরদাং সারদাং মর্ত্ত্যরূপাং
স্মারং স্মারং প্রণতিকুসুমৈরঞ্জলিং কল্পয়ামি॥

অদ্বৈতনিত্যবিগুণং পরমাত্মতত্ত্বং
শ্রীভক্তচিত্তসগুণং ভজনানুরূপম্।
কারুণ্যপুণ্যনিলয়ং যুগধর্ম্মনিষ্ঠং
দীনার্ত্তদুঃখিশরণং ভজ রামকৃষ্ণম্॥

দেবস্য কৃষ্ণস্য পুরা প্রতিজ্ঞা
দেব্যাশ্চ ধর্ম্মপ্রতিরক্ষণার্থা।
এতৎফলং যত্র সমৃদ্ধরূপং
শ্রীসারদাং নৌমি চ রামকৃষ্ণম্।

'সম্ভবামি যুগে যুগে'

বসুন্ধরা আর বহিতে পারে না যুগযুগসঞ্চিত গ্লানির দুর্ব্বহ ভার। পুঞ্জীভূত পাপতাপ অনাচার অত্যাচারে, কালনাগিনীর সহস্রদংশনে জর্জ্জরিত হইয়া উর্দ্ধমুখে পড়িয়া আছে—নিস্তেজ, নিস্পন্দ।

মহাশ্মশানের বুকে অমানিশার অন্ধকারে চলে প্রলয়ংকর মহাকালের তাণ্ডব।

অন্তরীক্ষ হইতে গ্রহতারকা রুদ্ধশ্বাসে নিরীক্ষণ করে যুগান্তের এই বিপর্য্যয়।

থর থর কাঁপে ধরা। তাহার বুকফাটা আর্ত্তনাদ সপ্ত বায়ুস্তর ভেদ করিয়া উঠে উর্দ্ধে…বহু উর্দ্ধে… স্বর্গে রত্নদেউলের মণিকোঠায় যেখানে বসিয়া দেবতা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন প্রলয়ের বিধান করেন।

বিচলিত হয় দেবতার আসন, করুণায় বিগলিত হয় তাঁহার অন্তর—মর্ত্ত্যের দুর্ব্বিষহ মর্ম্মবেদনায়।

স্বর্গ নামিয়া আসে, ধরা দেয় ধরাকে। বলে,—দেখ, ওঠ, আমি আসিয়াছি।

ধরা নির্ব্বাক, নিশ্চল; কহে না কথা, উঠে না সে। দুঃখে অভিমানে তাহার বুকের মধ্যে যেন প্রলয়ঝঞ্ঝা বহিতে থাকে, দুই চক্ষু দিয়া ঝরিয়া পড়ে গঙ্গাযমুনার বারিধারা। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলে অসহায় করুণ কণ্ঠে,—ওগো, যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত দুর্ব্বহ ভার হিমাচলের মত চাপিয়া বসিয়া আছে আমার বুকের উপর। আমার তো উঠিবার সামর্থ্য নাই, যদি-না তুমি আমায় ধরিয়া তোল।

স্বর্গের অন্তর কাঁদিয়া উঠে অসহায় ধরণীর ব্যথায়। স্নেহকোমল করে মুছাইয়া দেয় তাহার অশ্রুধারা, মুছাইয়া দেয় তাহার সর্ব্বাঙ্গের মালিন্য, অমৃতবর্ষণে স্নিগ্ধ করিয়া দেয় তাহার তাপিত অন্তর, ললাটে পরাইয়া দেয় আশিস্-তিলক। আর বলে,—তোমার সকল গ্লানি, সকল ব্যথা দূর হইয়াছে। নূতন সৃষ্টির আনন্দস্পর্শে ঐ দেখ, বিশ্বজগৎ পুলকিত। তুমি ওঠ, এইবার চাহিয়া দেখ।

বসুন্ধরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে এই নব-জাগরণের স্পন্দন; পুলকশিহরণ জাগে তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে—শিরায় উপশিরায়, বিদ্যুদ্‌বেগে ছুটিয়া চলে নবচৈতন্যের প্রাণশক্তি।

উপলব্ধি করে সে,—বসন্ত আসিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে তাহার নবজীবনের পরিপূর্ণ শোভা, অন্তরে তাহার নূতন দিনের নব-উন্মাদনা। শুষ্ক তরুশাখা নব-কিশলয়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে, চূতমুকুলে মধুকরের গুঞ্জরণ, পুষ্পিত তরুর শীর্ষে বিহঙ্গের আনন্দকাকলী।

প্রকৃতি আজ বসন্ত-উৎসবে মাতিয়াছে। দিকে দিকে শ্যামসমারোহ, রূপে রসে গন্ধে আজ জীবনেরও যেন মহামহোৎসব। মোহনিদ্রার অবসানে নবীন প্রভাতে জগৎ শুনিতে পায়—

বোধনের শুভ শঙ্খধ্বনি।

পুণ্যতীর্থ

"বন্দে মাতরম্" মন্ত্রের ঋষি যাঁহাকে "ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী, কমলা কমলদল-বিহারিণী" বলিয়া অন্তরে আবাহন করিয়াছিলেন, সেই চিন্ময়ীকেই তিনি আবার বাহিরে পূজা করিয়াছিলেন মৃন্ময়ী দেশ-মাতৃকারূপে। দেশমাতৃকার সেই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা রূপশ্রী কোলাহলমুখর নগরীতে অথবা বর্ত্তমান সভ্যতার কৃত্রিম আড়ম্বরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না, মায়ের এই রূপটি পল্লীভূমিতেই দেখা যায়।

ভারতের ঋদ্ধি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে কৃষীর পল্লীপ্রান্তরে এবং ঋষির তপোবনে। পল্লীই দেশমাতৃকার প্রতিমূর্ত্তি, করুণাময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজ করিয়া দেশমাতা পল্লীপ্রান্তরেই প্রবাহিত করেন স্তন্যপীযূষধারা। সেই ধারা উদ্বেল হইয়া উঠে শত শত নদনদীতে, উচ্ছলিত হইয়া উঠে দুই কূলে, পরিবেশন করে শস্যফলপুষ্প। কঙ্করময় উষর ভূমি শ্যামলিমায় ভরিয়া উঠে, দীঘিতে দীঘিতে হাসিতে থাকে কমল-কুমুদ-কহ্লার, বিচিত্র বর্ণে গন্ধে রসে পূর্ণ হয় বনশ্রী। সোনার শস্য শীর্ষ দোলাইয়া ডাকে কৃষীকে, মনের আনন্দে সে রামপ্রসাদী-সুরে গান ধরে,—

"মন রে, কৃষিকাজ জান না।
এমন (মানব-)জমি রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥"

পল্লীভূমিই দেশমাতৃকার দেহ; আর, তপোবন তাহার আত্মা। ভারতের শান্তরসাস্পদ তপোবন—সারদার পীঠস্থান—জ্ঞান ও তপস্যার প্রাণকেন্দ্র। এইস্থানেই তপস্যাভাস্বর "অমৃতস্য পুত্রাঃ" অভীঃ মন্ত্র এবং আত্মার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। মহাভাগ্যবান এই ভারতবর্ষ,—আর্য্য ঋষিদিগের সাধনার মহাতীর্থ। এই তীর্থে সাধকদের তপঃশক্তিতে অসাধ্য সুসাধ্য হইয়াছে, দুর্লভ সুলভ হইয়াছে, দুর্জ্জয় সুজেয় হইয়াছে। "সম্ভবামি যুগে যুগে" বাণী সার্থক করিতে শ্রীভগবান যুগে যুগে এই পুণ্যতীর্থে অবতীর্ণ হইয়া মাটির মানুষের সহিত লীলা করেন।

পল্লী আর তপোবন—দেহ আর আত্মা—উভয়ে মিলিয়া অনন্তকালের পথে চলে, যেন প্রকৃতি আর পুরুষ। কিন্তু এই জগৎ তো শাশ্বত নয়, পরিবর্ত্তমান। কালের রথচক্র ঘুরিয়া যায়। করাল কাল উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, তাহাদের মিলনের ছন্দ হারাইয়া যায়। দেহ আত্মাকে হারায়, আত্মা হারায় দেহকে। কিন্তু এই ব্যবধান চিরন্তন হইয়া থাকে না।

একে অন্যকে আবার ফিরিয়া পাইতে চায়। একদিন যাহা ছিল, আজ যাহা হারাইয়া গিয়াছে, আবার তাহা ফিরিয়া পাইবে কি-না জানে না; তবু তাহার জন্য আকুতি, আকুলতা ও প্রয়াসের অন্ত থাকে না। প্রেম অবিনশ্বর, তাই বিরহ দুঃসহ। আশা অবিনশ্বর, তাই প্রতীক্ষা দুর্ব্বহ। এই বিরহ ও প্রতীক্ষা প্রেমেরই মাধুরী এবং শক্তি বৃদ্ধি করে। তাই মৃত্যুজয়ী সাধনা করিয়াছিলেন দক্ষযজ্ঞের পর বিরহী শিব স্বীয় শক্তিকে ফিরিয়া পাইবার জন্য। সর্ব্বস্ব দিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন বিরহিণী রাধা পরমানন্দ মাধবের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইবার জন্য।

যুগে যুগে শক্তিসাধনার তপস্যা করিয়াছে এই বাংলাদেশ, যেখানে তপস্যাবলে ভারতীয় আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির দেহ ও আত্মার পুনর্মিলন হইয়াছে। ইহারই সাগরতীর্থে রাজা ভগীরথের তপস্যাশক্তিতে শঙ্করের শিরোবন্দিনী সুরধুনী অবতরণ করিয়া কত সহস্র অভিশপ্ত আত্মার উদ্ধার করিয়াছিলেন। আর, এই সুরধুনীকে অবলম্বন করিয়াই শত শত জনপদ "সুজলা সুফলা" হইয়াছে, কূলে কূলে অগণিত তীর্থ রচিত হইয়াছে, কত শত মঠমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাধনা যখন সফল হয়, তখন তাহার গতি এইরূপই সুদূরপ্রসারী হয়। তাহার সুফল সাধকের একার সম্পদ হইয়া থাকে না, তাহা সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াও থাকে না; সমগ্র বিশ্বের কল্যাণে সম্প্রসারিত হয়—বিচিত্র রূপে, অনন্ত বিভূতিতে।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এইরূপ দেহ-আত্মার মিলন-সাধনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল কোলাহলমুখর নগর হইতে অতি দূরে, সভ্যজগতের অপরিজ্ঞাত

জয়রামবাটী

শিকরের মারে

জয়রামবাটী

দামোদর নদ

পুণ্যপুকুরের ধারে

দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির

মাতাঠাকুরাণীর বাটী
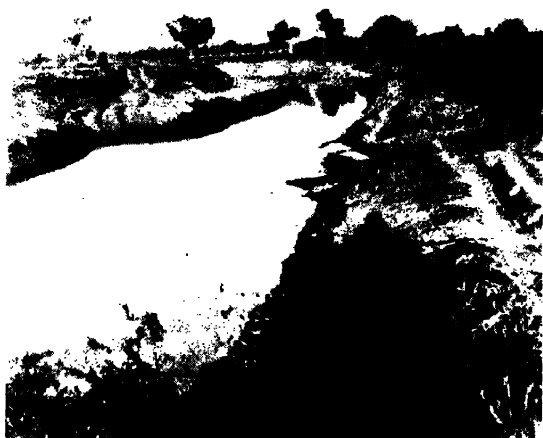
আগমনী

শ্যামল তরুলতায় সমাকীর্ণ ক্ষুদ্র পল্লী—জয়রামবাটী। মাটি ও খড়ে নির্ম্মিত কুটীর, অনতিব্যবধানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলাশয়। দক্ষিণ প্রান্তে জমিদারের পুষ্করিণীতে অসংখ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম শারদলক্ষ্মীর আসন রচনা করিয়া রাখে। উত্তর সীমায় সর্পিল গতিতে ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদ কলকল রবে প্রবাহিত। বর্ষায় কূল ছাপাইয়া উঠে জল, আবার গ্রীষ্মকালে অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন পল্লীবাসিগণ অনায়াসে পার হইয়া যায়। আমোদরের জল কখনও একেবারে শুকাইয়া যায় না।

জয়রামবাটী এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি উর্ব্বরা ; এখানে ধান ও নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। পল্লীবাসীদের অনেকেরই আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নহে। তাহারা ভোগবিলাসী বা শ্রমবিমুখ নহে, যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া ফলমূলশস্য উৎপাদন করে ; কৃষিকার্য্যে একে অন্যের সাহায্য করে। পল্লীনারীগণ ঢেঁকিতে ধান ভানে, পুষ্করিণী হইতে কলসী ভরিয়া জল আনে দৈনন্দিন গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করে। প্রভাতে উঠিয়া নিষ্ঠার সহিত তাহারা তুলসীতলা গোময়ের দ্বারা মার্জ্জনা করে, সায়াহ্নে সেখানে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করে দেবতার উদ্দেশে। অন্ধকার ঘনাইয়া আসিলে বালকবালিকা ও বধূগণ মিলিয়া বৃদ্ধা পিতামহী অথবা মাতামহীর নিকট সীতাঠাকুরাণীর আত্মত্যাগ, বালক অভিমন্যুর বীরত্ব ইত্যাদি কাহিনী শুনিতে শুনিতে হৃদয়াবেগে নীরবে অশ্রুমোচন করে। পল্লীবাসীর সহজ ও অনাড়ম্বর জীবনধারা এইভাবে অভাব-অনটনের মধ্যেও শান্তিতে অতিবাহিত হয়।

জয়রামবাটীতে কয়েকটি দেবমন্দির আছে। তথায় বারোয়ারি পূজা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। কীর্ত্তন ও পাঁচালির গান, কথকতা ও যাত্রাভিনয় প্রভৃতিতেও সকলে যোগদান করিয়া আনন্দ লাভ করে। ধর্ম্মস্থানে পুরুষের ন্যায় নারীদিগেরও যাতায়াত এবং উৎসবাদিতে

যোগদানের প্রথা প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, এইসবই ছিল সেকালের শিক্ষার বাহন। এই পল্লীর প্রধান দেবতা সিংহবাহিনী জাগ্রত-দেবী; দূরদূরান্তর হইতেও সরল বিশ্বাসী নরনারী দেবীর পূজা দিতে আসে। সর্পদংশন এবং বিবিধ রোগের প্রতিকার ও প্রতিষেধকরূপে অনেকে এই দেবীস্থানের মাটি ব্যবহার করে, নিরাময় হইয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে পুনরায় পূজা দিতে আসে।

নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহের মধ্যে কামারপুকুর, কোয়ালপাড়া, কোতলপুর, আনুড়, শিহড় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আনুড়ের বিশালাক্ষী দেবীও প্রসিদ্ধ। শিবের গাজন উপলক্ষে শিহড়ের প্রসিদ্ধ শান্তিনাথ শিবের পূজা দিতে এবং মেলা দেখিতে দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও নরনারীগণ দলে দলে সমবেত হয়।

কলিকাতা হইতে প্রায় ষাট মাইল পশ্চিমে বাঁকুড়া জিলায় জয়রামবাটী অবস্থিত। পূর্ব্বে তারকেশ্বর ও চাঁপাডাঙ্গা হইয়া পায়ে হাঁটিয়া অথবা পালকীতে করিয়া এই পথে যাত্রীরা যাতায়াত করিত, তিন-চারি দিন সময় লাগিত। বর্দ্ধমান হইয়াও যাইত। কিন্তু এইসকল পথ তৎকালে বিপৎসঙ্কুল ছিল, দলবদ্ধ হইয়া না গেলে অনেকসময় দস্যুদের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত ও নির্য্যাতিত হইতে হইত, এমন-কি পথিকদিগকে প্রাণ হারাইতেও হইত।

বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে বিষ্ণুপুর হইয়া রেলপথে জয়রামবাটী যাইতে প্রায় দেড় শত মাইল পথ। মহকুমা শহর বিষ্ণুপুর হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ছাব্বিশ মাইল। এই পথে যাতায়াত সম্প্রতি অধিকতর সুগম হইয়াছে।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে জয়রামবাটীতে রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক ভক্তিমান ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পিতার নাম কাত্তিকরাম। রামচন্দ্রের তিন কনিষ্ঠ সহোদর—ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র এবং নীলমাধব। ত্রৈলোক্যনাথ সংস্কৃতে পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু

স্কেল:- ইংরাজি মাইল
৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৮ ১২ মাইল
জিলা সীমানা
রাস্তা
উত্তর
নবদ্বীপ
শান্তিপুর
রানাঘাট
বর্দ্ধমান
দামোদর নদ
ব র্দ্ধ মা ন
জি.টি.রোড
ই.আর (মেন)
বি.পি.আর
বি.ডি.আর
বাঁ কু ড়া
রায়না
জামালপুর
নৈহাটি
চন্দননগর
দশঘরা
কোতলপুর
বিষ্ণুপুর
আমোদর নদ
কোয়ালপাড়া
দেশড়া
শিহড়
তারকেশ্বর
হরিপাল
বৈদ্যবাটী
বারাকপুর
আরামবাগ
জয়রামবাটী
আনুড়
তেলোভেলো
চাঁপাডাঙ্গা
ই.আর
কামারপুকুর
শ্রীরামপুর
খড়দহ
পানিহাটি
দক্ষিণেশ্বর
হু গ লী
কাশীপুর
গড়বেতা
মার্টিন লাইন
বাগবাজার
মে দি নী পু র
রূপনারায়ণ নদ
হাওড়া
কলিকাতা
চাঁদবালী ও পুরী
ঘাটাল
গঙ্গাসাগর

অকালে পরলোকগমন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সামান্য উপার্জ্জন করিতেন। নীলমাধব কলিকাতায় অল্পবেতনে চাকুরী করিতেন; তিনি ছিলেন অকৃতদার।

রামচন্দ্র ও অন্য তিন সহোদর একান্নভুক্ত ছিলেন। যাজকত্ব করিয়া তাঁহাদের কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইত, কিন্তু সংসারনির্ব্বাহের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হইত কৃষির উপর। তাঁহাদের যে-কয়েক বিঘা ভূমি ছিল, নিজেরাই তাহাতে কৃষাণমুনিষের সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিতেন। ধান রাখিবার জন্য তাঁহাদের দুই-তিনটি মরাই অর্থাৎ গোলাঘর ছিল। ক্ষেতে ধান, আলু, ফুটি, তুলা, ইক্ষু ইত্যাদি উৎপন্ন হইত। এতদ্দ্বারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান হইয়া যাইত। তাঁহাদের কয়েকটি গৃহপালিত পশুও ছিল।

পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম শিহড়ের হরিপ্রসাদ মজুমদারের কন্যা শ্যামাসুন্দরী দেবীর সহিত রামচন্দ্রের বিবাহ হয়।* শ্যামাসুন্দরী শ্যামবর্ণা হইলেও সুন্দরী ছিলেন, কাজেই তিনি ছিলেন অন্বর্থনাম্নী। তিনি অত্যন্ত শ্রমশীলা এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। ধর্ম্মভীরু, নির্ব্বিরোধ এবং পরোপকারী বলিয়া এই ব্রাহ্মণদম্পতিকে সকলে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত।

যথাকালে সন্তানের মুখদর্শনে বঞ্চিত থাকায় ব্রাহ্মণদম্পতির অন্তরে ছিল গভীর ক্ষোভ। একটি সন্তানলাভের আশায় শ্যামাসুন্দরী দেবতার নিকট প্রার্থনা জানাইতেন, সিংহবাহিনী এবং অন্যান্য দেবতার মন্দিরে মানত করিতেন। পত্নীর অন্তরের বেদনা রামচন্দ্র বুঝিতে পারিতেন, সময় সময় স্তোভবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনাও দিতেন। কিন্তু নিজের দীর্ঘশ্বাস তাহাতে রুদ্ধ হইত না, শীতের প্রভাতের কুহেলিকার ন্যায় একটা বিষাদের ছায়া তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। তিনিও নিজের ইষ্টদেবতার নিকট গোপনে প্রাণের আকিঞ্চন নিবেদন করিতেন, —তোমার করুণা হইলে সকলই পূর্ণ হয়। আর কিছু চাই না, প্রভু,— একটি সন্তান।

---

* হরিপ্রসাদের বংশপদবী বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্দ্ধমানের মহারাজ ইঁহাদের বংশের একজনের উপর সন্তুষ্ট হইয়া 'মজুমদার' উপাধি দিয়াছিলেন।

অন্ধকার রজনীর পরও উজ্জ্বল দিনমণি হাসিয়া উঠে। গভীর দুঃখের অবসানেও একদিন সুখের উদয় হয়, ধরণীকে আনন্দে পূর্ণ করে, অতীতের যত অভাব আর বেদনা ভুলাইয়া দেয়। প্রকৃতির ইহাই নিয়ম।

বসন্তের এক গোধূলিকালে রামচন্দ্র নিজের দেহমনকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না। নিরুদ্দেশ পদক্ষেপে তিনি আমোদরের তীরে উপস্থিত হইলেন।—বসুন্ধরা আজ অনুপম সাজে সজ্জিতা। আমোদরের স্বচ্ছধারায় প্রতিবিম্বিত পশ্চিমাকাশের রক্তিম আভা, অদূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, পক্ষীর কাকলী ;—আশৈশব বহুবার তিনি এইস্থানে আসিয়াছেন, কিন্তু আজিকার দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার অভিনব। সমস্ত মিলিয়া যেন এক স্বপ্নরাজ্য রচনা করিয়াছে। চারিদিকের শান্ত পরিবেশ তাঁহার ভারাক্রান্ত দেহমনের সকল শ্রান্তি দূর করিয়া দিল।

ব্রাহ্মণ মুগ্ধচিত্তে বহুক্ষণ বসিয়া রহিলেন আমোদরের তীরে। তারপর, সেইস্থানেই সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিলেন; ইষ্টপ্রণামান্তে গমনোদ্যত হইলে সম্মুখে চাহিয়া দেখেন,—দিকচক্রবালের কিঞ্চিদূর্দ্ধে বিরাটকায় এক সিংহ। মুখে হিংসার চিহ্নমাত্র নাই, প্রশান্ত প্রসন্ন তাহার দৃষ্টি। পশুরাজের পৃষ্ঠোপরি উপবিষ্টা বালার্কসদৃশতনু জ্যোতির্ম্ময়ী চতুর্ভুর্জা এক দেবীমূর্ত্তি। নানালঙ্কারভূষিতা সেই দেবীর এক হস্তে শঙ্খ, এক হস্তে চক্র, অন্য দুই হস্তে ধনুর্ব্বাণ। ধরণীর দিকে তিনি একখানি কমলচরণ প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন।

ইনি যজ্ঞোপবীতধারিণী কৌমারী শক্তি—দেবী জগদ্ধাত্রী।

ব্রাহ্মণ অপলকনয়নে ভুবনমোহন মাতৃরূপ-সুধা প্রাণ ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন।—মরি মরি! একি রূপ! কত মধুর মায়ের মুখের হাসি! ব্রাহ্মণের দেহ রোমাঞ্চিত হয়।

ধীরে ধীরে সেই দেবীমূর্ত্তি অনন্তে মিলিয়া গেল।

ভক্তিবিগলিত-চিত্তে ব্রাহ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়া দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। হৃদয় তাঁহার দিব্যানন্দে ভরিয়া উঠিল।

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াও তিনি হৃদয়াকাশে সেই মূর্ত্তিই দেখিতে লাগিলেন, ভুলিতে আর পারেন না। যতই ভাবেন সেই মূর্ত্তির কথা, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাঁহার অন্তর পূর্ণ হয়।

এইভাবে যায় কিছুদিন।

ব্রাহ্মণ এক রাত্রে স্বপ্নে তৃতীয়মহাবিদ্যা—রাজরাজেশ্বরী ষোড়শী মূর্ত্তির দর্শন পাইলেন। বিস্ময়বিহ্বল-চিত্তে তিনি ভাবেন,—মহামায়া কেন আমায় এভাবে দর্শন দিতেছেন ? মহামায়ার উপাসনা তো আমার নয়! আমার ইষ্টদেব নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রঘুপতি রাম। তবে ?—

এই জিজ্ঞাসা ব্রাহ্মণের মনে তীব্র হইয়া উঠে। আবার একদিন তিনি স্বপ্নে দেখেন—মায়ের দিব্য শান্ত জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি ; কিন্তু এইবার তাঁহার দ্বিভুজা মানবীর রূপ।

প্রসন্নবদনা মা মধুর হাস্যে বলেন,—

"বাবা, এবার হেমন্তশেষে তোর বাড়ী যাবো।"

শৈশবে

দৈব কৃপায় অদূর ভবিষ্যতে তাঁহাদের কুটীরে কোন অসামান্য সন্ততির আগমন হইবে, এইরূপ আশা ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর মনে দৃঢ় হইল। দেবতার প্রসন্নতালাভে তাঁহারা বিশেষভাবে ব্রতা হইলেন। ক্রমে শ্যামাসুন্দরীর দৈহিক পরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়, দিন দিন তিনি আনন্দবিহ্বলা হইতে লাগিলেন। পতিপত্নী উভয়েই একান্তচিত্তে দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে হেমন্তের শেষ আসন্ন হয়। দিগ্‌বধূ মা-লক্ষ্মীর বেশে সুশোভিতা। মায়ের প্রসন্নহাস্য যেন সোনার ধানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির অন্তরে বাহিরে উচ্ছল আনন্দ। কৃষিপ্রধান জয়রামবাটীর ঘরে ঘরে আজ উৎসব চলিতেছে।

হেমন্তের শেষে, ১২৬০ সালের ৮ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ), বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে সন্ধ্যার পর ভাগ্যবতী শ্যামাসুন্দরীকে মাতৃত্বে স্বীকার করিয়া এক দিব্যদর্শনা কন্যার আবির্ভাব হইল। দেবশিশুর আগমনী দিকে দিকে প্রচারিত হয়। সার্থক হয় ব্রাহ্মণব্রাহ্মণীর বহুবাঞ্ছিত আকিঞ্চন এবং স্বপ্ন।

সন্তানবঞ্চিত মুখোপাধ্যায়ের কেবল সন্তানলাভই হইল না, সেই বৎসর তাঁহাদিগের আশাতীত শস্যলাভ এবং সংসারে নানাভাবে সৌভাগ্যের সূচনা হইল। তাঁহাদের নিরানন্দ গৃহ আনন্দে ভরিয়া উঠিল। এই আনন্দ কেবল মাতাপিতার নহে, পল্লীর সকলের। সকলেই আসিয়া শিশুকে দর্শন করে। জননীর বক্ষ গর্ব্বে স্ফীত হয়, তৃষিতনয়নে সন্তানের রূপমাধুরী পান করেন। শিশুর নবনীকোমল দেহখানি বক্ষে তুলিয়া পুলকিত হন; আর ভাবেন,—এমন সাগর-সেঁচা মাণিক কবে কোন্ মায়ের বুক আলো করেছে?

পিতার মনের অভিলাষ ছিল,—প্রথম সন্তানটি কন্যা হইলেই ভাল;

অন্নপূর্ণা-মা ঘরে আসিলে সকল অভাব দূর হইবে। সেই অভিলাষ এতদিনে পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না।

শিশুকে অনুক্ষণ কোলে লইয়াই শ্যামাসুন্দরী গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করেন, ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু প্রতিবেশিনীগণ আনন্দময়ী শিশুকে কোলে পাইবার জন্য কত-যে আকুলতা প্রকাশ করে, পাইলে আবার কোন্ মুহূর্ত্তে যে অদৃশ্য হইয়া যায়, জানিতেও পারেন না জননী। কী করিবেন তিনি? লোকেরা বোঝে না। ঘুমাইয়া থাকিলেও যাহার চাঁদমুখখানি বারবার না দেখিলে মন মানে না, এমন প্রাণপুত্তলীকে কি ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা হয় মায়ের? তবুও অনিচ্ছায় দিতে হয়। সকলেরই তো আদরের ধন তাঁহার শিশু! কাহারও প্রাণে ব্যথা দিলে যদি শিশুর অকল্যাণ হয়, কেবল এই আশঙ্কায় ছাড়িয়া দেন। আহা, সকলের প্রীতিতে, সকলের আশীর্ব্বাদে বাঁচিয়া থাকুক তাঁহার শিশুটি।

ছাড়িয়া দেন বটে, কিন্তু উদ্বেগ বাড়িয়া যায়। সংসারের কর্ম্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে বৎসহারা গাভীর ন্যায় উদ্বেগে বারবার ঘরবাহির করেন শ্যামাসুন্দরী—কন্যার প্রতীক্ষায়। যতদূর দৃষ্টি যায়, কাহাকেও দেখিতে পান না। স্বামী বা দেবরকে অনুসন্ধান লইতে বলেন, তারপর নিজেই বাহির হইয়া পড়েন।

ঘুরিতে ঘুরিতে কোন প্রতিবেশিনীর গৃহে গিয়া শিশুকে দেখিতে পান। অনেকক্ষণ পরে জননীকে দেখিবামাত্র 'আম্-মা, আম্-মা' রবে শিশু তাঁহাকে আহ্বান জানায়। সকলের আদরযত্ন, সকল আকর্ষণ তুচ্ছ হইয়া যায় মাতৃদর্শনের পর, দুই হাত মেলিয়া তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। স্নেহময়ী জননীর বুকের মধ্যে ডুবিয়া যায় শিশু, সুধাপানে মগ্ন হয়। এই পৃথিবীতে ইহার অধিক আনন্দ শিশুর নিকট আর তো কিছুই নাই। শিশুকে বুকে জড়াইয়া শ্যামাসুন্দরী নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

কন্যার দেহে তাঁহারা কয়েকখানি অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন,—পায়ে মল, হাতে বালা, কোমরে নিমফল। মাথার সম্মুখভাগে কেশগুচ্ছে

বাঁধিয়া দেন ছোট্ট একটি ঘুন্টি শ্যাম অঙ্গে মানাইয়াছে সুন্দর। সালঙ্কার চরণযুগল ধরণীর বুকে স্পর্শমাত্র তালে তালে রুনুঝুনু ধ্বনি হইতে থাকে।

গৃহের অঙ্গনমধ্যেই তাহার পদচালনা এবং খেলাধূলা আর অধিক দিন সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, সমবয়স্কা সঙ্গিনীদিগের সহিত বাহিরেও যাইতে দিতে হয়। পুষ্করিণীর তীরে বন্য ফলপত্রসহযোগে তাহারা নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধনের খেলা করে। দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া পুঁতির মালায় এবং রঙ্গীন বস্ত্রখণ্ডে নব নব বেশে সজ্জিত করে, ভোগ নিবেদন করে, মুখে তুলিয়া খাওয়াইয়া দেয়। মাঠে কর্ম্মনিরত চাষীরাও স্নেহবশতঃ কোনদিন তাহাদিগকে ফলমূল উপহার দেয়।

শিশুদিগের দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী এইভাবে চলে, কিন্তু কর্ম্মস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে। সাহস ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। কোন কোন দিন সায়াহ্নে তাহাদিগের সন্ধান পাওয়া যায় না। শ্যামাসুন্দরী ব্যাকুল হইয়া ডাকেন, "সারু···ও সারু,··কোথা গেলি রে?" কোন দিক হইতেই উত্তর আসে না। পিতা বা অন্য কেহ ব্যস্তসমস্ত হইয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। আমোদরের তীরে দলের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি বেলগাছের তলায় মাটির দেবমন্দির গড়িয়া পুষ্পপত্রে সজ্জিত করিয়া তখনও তাহারা পূজায় ব্যাপৃত।

বালিকার দুই নাম—শ্রীমতী সারদাসুন্দরী এবং ঠাকুরমণি দেবী। মাতাপিতা ও আত্মীয়পরিজন আদর করিয়া তাহাকে সারু বলিয়া ডাকিতেন, ব্রাহ্মণেতর পল্লীবাসিগণ ডাকিত ঠাকরুণদিদি বলিয়া।

তাহার আচরণে আশৈশব অসাধারণ গুণাবলী পরিলক্ষিত হয়। তাহার অঙ্গের সৌষ্ঠব এবং স্বভাবের মাধুর্য্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই আকর্ষণ করিত। শান্তপ্রকৃতি বালিকা কাহারও সহিত কলহ করিতে পারিত না, বরং অন্যের বিরোধের মীমাংসা করিয়া দিত, সমবয়সীদিগকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। তাহাকে কোনদিন না পাইলে সঙ্গীদিগেরও আনন্দ পূর্ণাঙ্গ হইত না। তাহারা সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত।

এইভাবে আরও কয়েকটি বৎসর চলিয়া যায়। এখন বালিকা পঞ্চবর্ষীয়া। আধুনিক কালে অদ্ভুত এবং কুসংস্কার মনে হইলেও, তৎকালীন সমাজে অল্পবয়সে বিবাহ—কমলাদান, গৌরীদান,— প্রশংসনীয় এবং পুণ্যকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। সুতরাং শ্যামাসুন্দরীও কন্যার বিবাহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কোথায় একটি মনোমত পাত্র পাওয়া যায়? রূপে গুণে সুন্দর, অন্নবস্ত্রের অভাব নাই,—এমন একটি পাত্রের কথা তিনি ভাবেন। অপরকেও মনের কথা বলেন। বিবাহ হইয়া গেলে প্রাণাধিকা কন্যা যে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, নিজের ইচ্ছামত আর তাহাকে সর্ব্বদা দেখিতে পাইবেন না, ইহাও তিনি ভাবেন; এবং ভাবিয়া বিচ্ছেদের বেদনাও অনুভব করেন। কিন্তু কন্যাসন্তান তো, বিবাহ দিতেই হইবে, পরের ঘরে যাইবেই একদিন।

কন্যার বিবাহের কথা শ্যামাসুন্দরী পতিকেও স্মরণ করাইয়া দেন। শুনিয়া রামচন্দ্র চমকিয়া উঠেন, বলেন,—কী বলছো তুমি? একরত্তি মেয়ে, ওর আবার বিয়ে কি গো? পত্নীর প্রস্তাব তিনি গ্রাহ্য করেন না।

মনে জাগে স্বপ্নদর্শনের কথা,—মাতা জগদ্ধাত্রীই তাঁহার গৃহে কন্যা-রূপে আসিয়াছেন। এখনই তাহাকে বিদায় দিবার কি দায় পড়িয়াছে? এমন কথা ভাবিতেও পিতার মনে ব্যথা বাজে। তিনি ভাবেন,—মা আমার ঘরখানি দিব্যি আলো ক'রে আছে, থাকুক-না যদ্দিন খুশী।

—আমার মায়ের জন্যে তুমি অনর্থক ভেবো না, পত্নীকে বুঝাইয়া বলেন রামচন্দ্র।

কিন্তু, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ভবিতব্যই বিধাতাপুরুষ পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন। রামচন্দ্রের ব্যস্ততা না থাকিলেও পাত্রপক্ষ নিজেরাই এক ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়া অকস্মাৎ একদিন জয়রাম-বাটীতে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাত্রীকে তাঁহারা দেখিলেন। বিবাহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে।

———

প্রভু গদাধর

পাত্র—শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়।

গদাধরের জন্মভূমি হুগলী জিলার কামারপুকুর গ্রামে, জয়রামবাটী হইতে অনধিক দুই ক্রোশ দূরে। এই দুই ক্রোশের মধ্যেই দুই জিলার সীমারেখা। নৈসর্গিক শোভায় কামারপুকুর যেন একটি তপোবন,—ঘনলতাগুল্ম-সমাচ্ছন্ন, স্নিগ্ধচ্ছায়াশীতল, সুন্দর পরিবেশ। পশ্চিম দিকে সুদূরপ্রসারী গোচারণ ভূমি এবং 'মাণিক-রাজার আম্রকানন' স্মরণ করাইয়া দেয় সীমার মধ্যে অসীমের কথা। উত্তর-পশ্চিম দিকে ক্ষীণকায় 'ভূতির খাল' আঁকিয়া বাঁকিয়া যাইয়া আমোদর নদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

গ্রামটি জয়রামবাটীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত বর্দ্ধিষ্ণু, পূর্ব্বে ইহার সমৃদ্ধি আরও অধিক ছিল। বিগত গৌরবের স্মৃতি কামারপুকুরের জীর্ণ বক্ষে অতীতের সুখস্বপ্নের মত আজিও জাগিয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য্য হইলেও কুটীরশিল্পের জন্য ইহাদের খ্যাতি আছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তন্তুবায়, কর্ম্মকার, কুম্ভকার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই কামারপুকুরে দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রামবাসীরা ধর্ম্মনিষ্ঠ। গদাধরের বাটীর সংলগ্ন একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মনসাপূজা, শিবের গাজন, হরিবাসর ইত্যাদি গ্রামের বিশেষ উৎসব। বর্দ্ধমান হইতে একটি রাস্তা কামারপুকুরের মধ্য দিয়া শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত গিয়াছে। তীর্থযাত্রী সাধুসন্ন্যাসিগণ যাতায়াতের পথে গ্রামের সদাশয় জমিদার লাহা-বাবুদের পান্থনিবাসে বিশ্রাম গ্রহণ ও ধর্ম্মালোচনা করেন। গ্রামবাসীরা সাধুদর্শনে এবং ধর্ম্মকথাশ্রবণে আনন্দ পায়।

গদাধরের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তিনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। অভীষ্টদেব রামচন্দ্র, গৃহদেবতা রঘুবীর শালগ্রাম-শিলা এবং রামেশ্বর শিবলিঙ্গের সেবা ও আরাধনায় তাঁহার দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। কথিত আছে যে, এই ঋষিতুল্য ব্রাহ্মণ যখন 'হালদার-পুকুরে' স্নান করিতেন, তাঁহার প্রতি

শ্রদ্ধাবশতঃ সেই পুষ্করিণীর জলে তখন কেহ পদক্ষেপ করিত না। তাঁহার পত্নী পুণ্যশীলা চন্দ্রমণি দেবী ছিলেন স্নেহ, সেবা ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি। এই সদাত্মা ব্রাহ্মণদম্পতিকে সকলে ভক্তি করিত, ভালবাসিত।

ক্ষুদিরামের সত্যনিষ্ঠা কত গভীর ছিল, একটিমাত্র ঘটনা হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষুদিরাম এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণের বাসস্থান ছিল পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে। একবার তথাকার জমিদার এক দরিদ্র প্রজার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে মকদ্দমা উপস্থিত করিয়া ক্ষুদিরামকে তাঁহার পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অনুরোধ করেন। জমিদার জানিতেন, ক্ষুদিরামের সত্যনিষ্ঠার প্রতি জনসাধারণের এমনই গভীর শ্রদ্ধা যে, তিনি মুখ দিয়া যাহা বলিবেন তাহাই সকলে বিশ্বাস করিবে। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে ক্ষুদিরাম দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। জমিদার নিরস্ত না হইয়া তাঁহাকে স্বার্থের প্রলোভন দেখাইলেন, অবশেষে ভীতি প্রদর্শনও করিলেন; তেজস্বী ব্রাহ্মণ ইহাতেও ধর্ম্মপথ ত্যাগ করিলেন না। পরিণামে ইহাই হইল যে, দুর্দ্দান্ত জমিদারের কোপে পৈতৃক বাস্তুভিটা, প্রায় দেড়শত বিঘা ভূমি ইত্যাদি বিসর্জ্জন দিয়া ক্ষুদিরামকে সপরিবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল—নিঃস্ব এবং আশ্রয়হীন অবস্থায়। তথাপি সত্যসন্ধ ব্রাহ্মণ অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন না। ভগবান সহায় হইলেন, কামারপুকুর-নিবাসী জনৈক সুহৃৎ ক্ষুদিরামের এইরূপ বিপদে বিচলিত হইয়া তাঁহাকে ভূমি এবং অর্থদানে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ক্ষুদিরামের তিন পুত্র এবং দুই কন্যা। পুত্রগণের নাম—রামকুমার, রামেশ্বর ও গদাধর; কন্যা—কাত্যায়নী ও সর্ব্বমঙ্গলা। রামকুমার এবং কাত্যায়নী কামারপুকুরে আসিবার পূর্ব্বেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মেধাবী রামকুমার যৌবনের প্রারম্ভেই ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং স্মৃতিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেন; তাঁহার উপার্জ্জন সংসারের অভাব অনেকাংশে মোচন করিল। এইসময় ক্ষুদিরাম পদব্রজে রামেশ্বর এবং দক্ষিণভারতের অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া আসেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন, তাঁহার নাম রাখিলেন—রামেশ্বর।

আরও কয়েকবৎসর পরে ক্ষুদিরাম গয়া ও কাশীতীর্থে গমন করেন। গয়াধামে অবস্থানকালে তিনি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করেন,—শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী নারায়ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "আমি পুত্ররূপে তোমার গৃহে যাইব।" ভক্তি ও বিস্ময়ে আবিষ্ট ব্রাহ্মণ দেবতার এইরূপ অহেতুকী করুণা এবং অদ্ভুত অভিলাষের কথা চিন্তা করিয়া আনন্দাশ্রুতে আপ্লুত হইলেন।

স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া চন্দ্রমণির অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে ক্ষুদিরাম নিঃসন্দেহ হইলেন যে, পরিণত বয়সে ব্রাহ্মণী পুনরায় সন্তান-সম্ভবা। চন্দ্রমণিরও নানারূপ অলৌকিক দর্শন এবং অনুভূতি হইতে লাগিল। দরিদ্রের পর্ণকুটীর যেন দেবতার লীলানিকেতনে পরিণত হইল। সুগন্ধে কুটীর আমোদিত। ক্ষুদিরাম পত্নীর নিকট গয়াধামের স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—দেবতা প্রসন্ন হইয়াছেন, একান্তচিত্তে কেবল রঘুবীরের শরণাগত হও। তিনি কল্যাণ করিবেন।

এইভাবে অধীর প্রতীক্ষায় জনকজননীর দশ মাস অতিবাহিত হয়।

শীতের কুজ্মটিকা এবং জড়তার অবসান হইয়াছে। 'মধু বাতা ঋতায়তে'···মধুময় বসন্ত সমাগত। বসুন্ধরা মনোহরবেশে সজ্জিত হইয়া পুলকচঞ্চলা। প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি সৌরভ বিতরণ করিতেছে, তরুশাখায় পিকরাজ মধু বর্ষণ করিতেছে। আজ জড় চেতন, আকাশ বাতাস, অরণ্য সমুদ্র,—সমগ্র বিশ্ব মধুময়।

ফাল্গুন মাস। কৃষ্ণপক্ষ অপগত। দূর হইতে ক্ষীণতনু চন্দ্রমা একবার চকিত ইঙ্গিতে হয়তো স্বর্গলোকের কোন গোপন কথা জানাইয়া যায়। যুগান্তের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া হাস্যময়ী ঊষা যেন সতৃষ্ণনয়নে কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে মঙ্গলশঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ), বুধবার, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, বৃহস্পতিবার সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বক্ষণে, ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির নয়নের মণি—গয়াধামে স্বপ্নদৃষ্ট—প্রভু গদাধরের ধরাতলে আবির্ভাব হইল।

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় গদাধরও শৈশবেই দুরন্ত হইয়া উঠিল। তাহারও এমনই এক আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, পরিচিত অপরিচিত সকলেই তাহাকে অতীব প্রীতির চক্ষে দেখিত। তাহার মুখে কিছু উত্তম ভোজ্য দিতে পারিলে অথবা একবার তাহাকে কোলে তুলিয়া লইতে পারিলে তাহাদের আনন্দের সীমা থাকিত না।

ক্ষুদিরাম পঞ্চম বর্ষে পুত্রকে লাহা-বাবুদের পাঠশালায় প্রেরণ করিলেন। গদাধরের মেধা এবং অনুকরণশক্তি প্রখর ছিল; কীর্ত্তন, কথকতা এবং যাত্রাগান শুনিয়া অনর্গল নিখুঁতভাবে তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে পারিত। তাহার সুমধুর সঙ্গীত সকলকে মুগ্ধ করিত। তাহাকে কখনও দেখা যাইত শিল্পীর ন্যায় দেবদেবীর মূর্ত্তিগঠনে রত, আবার কখনও চিত্রাঙ্কনে নিরত। বহুবিধ গুণাবলীর জন্য অল্পবয়সেই সমবয়সী-দিগের মধ্যে গদাধর নেতৃত্ব লাভ করিল। অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতে অনতিদূরে মাণিক-রাজার আম্রকাননে বালকদিগের যাত্রাগানের যে অভিনয় চলিত, অভিনয়পটু গদাধর ছিল তাহার শিক্ষাগুরু ও সঙ্গীতাচার্য্য। শ্রীকৃষ্ণ, রাজা বা প্রধান নায়কের ভূমিকায় তাহাকেই থাকিতে হইত।

চঞ্চল হইলেও বাল্যকাল হইতেই গদাধরের স্বভাবে নির্জ্জনতাপ্রীতি, একাগ্রতা ও ভাবতন্ময়ত্ব লক্ষিত হইত। একদা আসন্ন সন্ধ্যায় নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়া সঙ্গিগণের সহিত যাইতে যাইতে অনন্ত আকাশের তলে কৃষ্ণ মেঘের কোলে বালক সহসা নিরীক্ষণ করে—শুভ্র বলাকার মালা উড়িয়া চলিয়াছে অসীমের পথে। বলাকাশ্রেণীর এই যাত্রা, আকাশের বিশালতা এবং প্রকৃতির নিস্তব্ধতা তাহার অন্তরে সুপ্ত চৈতন্যকে জাগাইয়া তোলে, ভাবাবেশে বালক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

গদাধর যখন মাত্র সপ্তবর্ষীয় বালক, বিজয়াদশমী দিবসে ভক্ত ক্ষুদিরাম ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। পিতৃবিয়োগের পর ব্যথাতুরা জননীর মনস্তুষ্টির জন্য বালক অধিক আগ্রহান্বিত হইল।

ইহার দুই বৎসর পরে গদাধরের উপনয়ন-সংস্কার সম্পন্ন হয়। বাল্যকাল হইতেই তাহার ধর্ম্মে অনুরাগ ছিল. উপনয়নের পর তাহা

আরও বর্দ্ধিত হয়। যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ভক্তির সহিত রঘুবীর এবং অন্যান্য গৃহদেবতার পূজা করিতেন। লাহা-বাবুদের পান্থনিবাসে গিয়া তিনি সাধুসন্তদের ধর্ম্মালোচনা শুনিতেন, ভজন শিক্ষা করিতেন। ইহাতে স্নেহময়ী চন্দ্রমণি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

পিতৃবিয়োগের কয়েকবৎসর পরে অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে জ্যেষ্ঠ রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ঝামাপুকুরে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলেন। কামারপুকুরের সংসারের ভার রামেশ্বরের উপর রহিল। গদাধরের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইল, সঙ্গে সঙ্গে পাঠাভ্যাসে অমনোযোগ বৃদ্ধি পাইল, ক্রমে পাঠশালা-গমনও বন্ধ হইল। এই অবস্থা অবগত হইয়া রামকুমার কনিষ্ঠকে ১২৫৯ সালে কলিকাতায় চতুষ্পাঠীতে আনয়ন করিলেন। ইহাতে সকলেই আশান্বিত হইলেন যে, গ্রামের সঙ্গীদের প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জ্যেষ্ঠ সহোদরের পরিচালনা ও অধ্যাপনায় গদাধরের বিদ্যালাভ হইবে।

কলিকাতায় আসিয়া গদাধর জ্যেষ্ঠ সহোদরের গৃহকর্ম্ম এবং যাজনকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন। পূজাপার্ব্বণের জন্য যে-সকল যজমানের বাড়ীতে যাইতেন, তাঁহারা গদাধরের সরলতা, ভক্তি ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইতেন। সুতরাং এখানেও তাঁহার অনুরাগীদের অভাব হইল না। কথকতা ও ধর্ম্মসঙ্গীত শুনাইবার জন্য অনেক স্থান হইতে তাঁহার আমন্ত্রণ আসিত। অনেকের গৃহে গিয়া তিনি রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর কথকতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন। কলিকাতায় আসিয়াও গদাধরের জীবন একইভাবে চলিতে লাগিল।

রামকুমারের তত্ত্বাবধানে থাকিয়াও গদাধরের বিদ্যার্জ্জনে কোন উন্নতি হইল না এবং যজমানদিগের নিকট হইতে অর্থোপার্জ্জনেও তাঁহার কোনপ্রকার স্পৃহা দেখা গেল না। অবশেষে একদিন রামকুমারের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, কনিষ্ঠকে তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেন। কনিষ্ঠও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জ্যেষ্ঠকে জানাইয়া দিলেন, "তোমাদের ও

চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাই না।" রামকুমার এইবার নিঃসংশয়ে বুঝিলেন—বৃথা চেষ্টা!

ওদিকে সকলের অগোচরে—জগদম্বার ইঙ্গিতে—ভাগীরথীতীরে পরিত্যক্ত এক শ্মশানভূমির উপর গদাধরের নূতন লীলাক্ষেত্র গড়িয়া উঠে।

গড়িয়া তুলিলেন সাধক রামপ্রসাদের দেশের এক মাহিষ্য কৃষকের কন্যা, পরবর্ত্তী জীবনে—পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি। রাসমণি বহুগুণে ভূষিতা,—একাধারে বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, সহৃদয়া এবং ভক্তিমতী। বিবাহসূত্রে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইলেও ভোগবিলাসের মোহ "কালীপদ-অভিলাষী" রাণীর চিত্তকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই, জগদম্বার আরাধনাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

একবার তিনি মনস্থ করিলেন, কাশীতে গিয়া মাতা অন্নপূর্ণার মন্দিরে পূজা দিয়া আসিবেন। রাণীর তীর্থযাত্রা, সমারোহের অন্ত নাই। বহু নৌকা দেবীপূজার দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইল। বহু আত্মীয়পরিজন, দাসদাসী তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। যে-দিন যাত্রা করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখেন,—জগদম্বা বলিতেছেন, "অত দূরে পূজা দিতে যাবি কেন? এখানেই গঙ্গাতীরে মন্দির গ'ড়ে আমায় পূজা ভোগ দে।"

অদ্ভুত স্বপ্ন! নয়নজলে রাণীর বক্ষ ভাসিয়া যায়।

কাশীযাত্রা স্থগিত থাকিল।

—কিন্তু,...একি সম্ভব? স্বপ্ন কি সত্য হয়?

—আমি তোমার মন্দির গড়বো, আর তুমি নেবে আমার পূজো! এমন ভাগ্য কি দাসীর কখনো হবে মা?

রাণী কাঁদেন, আর পুত্রপ্রতিম জামাতা মথুরানাথকে বলেন,—বাবা, কেন দেখলুম এমন অদ্ভুত স্বপ্ন, এও কি সম্ভব? অবশেষে ইহাকে জগদম্বার প্রত্যাদেশ মনে করিয়াই রাণী মন্দির নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলেন।

বহু আলোচনা ও চেষ্টার পর তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরে বিপুল অর্থব্যয়ে বিরাট এবং সুরম্য এক দেবালয় নির্ম্মাণ করেন।

নবরত্নশোভিত গগনস্পর্শী মন্দিরে কাশীশ্বরের হৃদয়াসনে ভবতারিণীর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হইল। এইসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইল বিষ্ণুমন্দির এবং দ্বাদশ শিবমন্দির। নাটমন্দির, ভোগশালা, অতিথিশালা, নহবৎ-ঘর, বিশাল প্রাঙ্গণ ইত্যাদিও নির্ম্মিত হইল। ১২৬২ সালের স্নান-পূর্ণিমার দিনে নবনির্ম্মিত মন্দিরে মহাসমারোহে দেবতার পূজার্চ্চনার শুভ উদ্বোধন হয়। সফল হয় সাধিকার স্বপ্ন।

রাণীর একান্ত আগ্রহে রামকুমার ভবতারিণীর পূজকের কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অনতিবিলম্বে গদাধরও কালীবাড়ীতে আসিলেন। ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী বন্ধ হইল। কিছুদিনের মধ্যে মথুরানাথের অনুরোধে গদাধর প্রথমতঃ ভবতারিণীর বেশকারীর কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এইসময়েই শক্তিসাধক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট তিনি শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। দীক্ষান্তে মধ্যে মধ্যে তিনি মাতৃমন্দিরে এবং বিষ্ণুমন্দিরে পূজাও করিতেন। কিছুকাল পরে তিনিই ভবতারিণীর পূজকের পদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ইহার বৎসরকালমধ্যেই রামকুমারের অকালে দেহত্যাগ হয়।

গদাধর পূজারী হইলেন বটে, কিন্তু পুরোহিতের গতানুগতিক ক্রিয়াপদ্ধতি তিনি অনুসরণ করিলেন না। পূজার ক্রিয়ানুষ্ঠানের বাহ্যাড়ম্বর তাঁহার নিরর্থক বলিয়া মনে হইত, তিনি অন্তরের অন্তস্তল হইতে উদ্গত ভক্তিদ্বারা ভবতারিণীর পূজা করিতেন। মায়ের রাতুল চরণে প্রাণমন নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া শিশুর ন্যায় সরলপ্রাণে ডাকিতেন,—মাগো, সন্তানের পূজা গ্রহণ কর মা! ইহাই হইল নবীন পূজারী গদাধরের মাতৃপূজার বিধি এবং মন্ত্র।

কিন্তু, প্রতিমা সাড়া দেয় না। গদাধর ভাবেন,—তবে কি পাষাণ-প্রতিমার পূজা করিতেছি? মা কি আমার চিন্ময়ী নন? তিনি ভাবেন, আর অভিমানে কাঁদেন। মন্দিরে বসিয়া কাঁদেন, নিজের ঘরে কাঁদেন, গঙ্গার তীরে তীরে পাগলের মত কাঁদিয়া বেড়ান। ভূমিতে লুটাইয়া মাতৃহারা বালকের ন্যায় গদাধর কেবল কাঁদেন, আর ডাকেন—মা, মা, মা!

মাতৃকৃপালাভের ব্যাকুলতায় গদাধর নিজের দৈনন্দিন প্রয়োজন ভুলিয়া গেলেন, ভুলিয়া গেলেন ক্ষুধাতৃষ্ণা। রাত্রির নিদ্রাও গেল। গভীর নিশীথে জীবজগৎ যখন নিদ্রাভিভূত, তিনি নির্জ্জন স্থানে গিয়া সাধনভজন করেন। জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিতেই হইবে, এই ব্যাকুলতা তীব্র হইতে তীব্রতমে গিয়া উঠিল। দিবানিশি কেবল একই কথা, একই ধ্যান—মা, মা, মা।

অবশেষে একদিন তিনি স্থির করিলেন, আর নয়, জীবন দুর্ব্বহ, এ জড়দেহপিণ্ড করালবদনা কালীর পায়ে বলি দিয়া সকল যন্ত্রণার অবসান করিবেন। এইরূপ কৃতসংকল্প হইয়া অভিমানী সন্তান বলিদানের খড়্গ বজ্রমুষ্টিতে ধরিলেন। জীবনের চরম মুহূর্ত্তে অভীষ্টনাম শেষবার প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লইলেন,—মা, মা, মা।

তারপর—

তিনিই শ্রীমুখে বলিয়াছেন, "এমন সময়ে সহসা মা-র অদ্ভুত দর্শন পাইলাম"……"ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই!—আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যে দিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল ঊর্ম্মিমালা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম।"

"তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই। অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মা-র সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।" (৩)

মিলন

গদাধরের অবস্থার কথা অতিরঞ্জিত এবং বিকৃতভাবে কামারপুকুরে প্রচারিত হইতে থাকে। কেহ বলে,—গদাধর উদাসী হইয়াছে, কেহ বলে,—তাঁহার উপর দুষ্টগ্রহ ভর করিয়াছে, কেহ বলে,—মৃগীরোগ হইয়াছে, আবার কাহারও কাহারও মতে গদাধর একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে। মায়ের প্রাণ, স্নেহময়ী চন্দ্রমণি স্থির থাকিতে পারেন না। স্বামী স্বর্গে গিয়াছেন, জ্যেষ্ঠ পুত্রও গিয়াছে, কনিষ্ঠের এই অবস্থা; চন্দ্রমণি কাঁদিয়া আকুল। গৃহদেবতা রঘুবীরের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানান, পুত্রের কল্যাণার্থে কত মানত করেন।

অবশেষে মধ্যম পুত্রকে দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইলেন কনিষ্ঠকে ফিরাইয়া আনিতে। গদাধর এখন এই সংসারের মানুষ নহেন, সর্ব্বদা ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন। কিন্তু তিনি মাতৃভক্ত, ব্যথাতুরা জননীর অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার আদেশানুযায়ী কামারপুকুরে ফিরিয়া গেলেন।

দীর্ঘকাল পরে পুত্রকে ফিরিয়া পাইয়া চন্দ্রমণির আনন্দের সীমা রহিল না। কিন্তু তাঁহার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বড়ই চিন্তিত হইলেন। পুত্রকে প্রকৃতিস্থ করিতে যে যাহা বলে তিনি নির্ব্বিচারে তাহাই করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণির মনের অবস্থা ঠিক শচীমাতার মতই হইল। গয়াধাম হইতে নিমাই অপ্রকৃতিস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলে শচীমাতা যাহা করিয়াছিলেন, তিনিও তাহাই করিতে লাগিলেন। পুত্রকে ঔষধ খাওয়াইলেন, শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন, এমন-কি ভৌতিক আবেশ মনে করিয়া ওঝা আনাইয়া ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থাও করিলেন। জননীর মনস্তুষ্টির জন্য পুত্র কিছুতেই আপত্তি করিলেন না।

যে-কারণেই হউক, বাল্যের স্মৃতিবিজড়িত প্রকৃতির লীলানিকেতনে কিছুকাল বাস করিয়া এবং জননীর স্নেহযত্ন ও সুব্যবস্থায় গদাধরের উদ্দাম আধ্যাত্মিক আবেগ অনেকাংশে প্রশমিত হইল। তাঁহার এই পরিবর্ত্তনে

মাতা ও ভ্রাতার মনে আশার সঞ্চার হইল। তাঁহারা মনে করিলেন যে, ইহাই সুবর্ণ সুযোগ, এই অবসরে একটি সুলক্ষণা পাত্রী মিলাইতে পারিলে গদাধরের ঊর্দ্ধমুখী মনকে সংসারমুখী করা যাইবে। সরলমতি চন্দ্রমণি কল্পনানেত্রে সোনার সংসারের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন,—নববধূকে কত আদরযত্ন করিবেন, আর বধূ ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে, গৃহদেবতার সেবা করিবে, গুরুজনদের সেবা এবং সংসারের ভার লইবে। জননীর অন্তরে সুখকল্পনার অন্ত নাই।

প্রথমে গদাধরের অগোচরেই বিবাহের আলোচনা এবং চেষ্টা চলিতে থাকে। জননীর অভিলাষ তিনি বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু বিবাহ-সংস্কারে আপত্তি করিলেন না। রামেশ্বর মহা-উৎসাহে নানাস্থানে পাত্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পাত্রীর বংশমর্য্যাদা, বয়স ইত্যাদির সহিত নিজেদের অবস্থার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া একটা মনোমত সম্বন্ধ কিছুতেই আর স্থির হয় না। ইহাতে তাঁহারা উদ্বিগ্ন হইলেন। এমন সময়ে গদাধর নিজেই সন্ধান দিলেন,—হেথাহোথা ঘুরছো কেনে? জয়রামবাটীতে রাম মুখুজ্যের বাড়ীতে ছাখোগে, মেয়ে কুটোবাঁধা রয়েছে।*

এইরূপ বলিবার এক ইতিহাস আছে। দক্ষিণেশ্বরে গদাধরের সেবাসঙ্গী ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী শিহড় গ্রামে। সেখানে একবার উৎসব উপলক্ষে গানের আসরে গদাধর উপস্থিত ছিলেন। পাত্রী সারদার মাতুলালয়ও শিহড়ে। এক আত্মীয়া এই শিশুকন্যাকে কোলে লইয়া সেইস্থানে গান শুনিতে গিয়াছিলেন এবং রঙ্গচ্ছলে শিশুকে বলেন,—ও সারু, এতগুলি লোকের মধ্যে তুই কা'কে বিয়ে করবি? শিশু কি বুঝিল, সে-ই জানে, ছোট্ট একখানি হাত তুলিয়া নিকটে উপবিষ্ট একজনকে দেখাইয়া দিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি অন্য কেহই নহেন, তিনি আমাদের গদাধর চট্টোপাধ্যায়।

---

* কোন কোন স্থানে এমন রীতি আছে যে, গাছের প্রথম উৎকৃষ্ট ফলটিকে দেবতার উদ্দেশে বা অন্য উদ্দেশ্যে খড়কুটা বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখা হয়।

গদাধরের ইঙ্গিতের উপর নির্ভর করিয়াই রামেশ্বর জয়রামবাটীতে পাত্রীর সন্ধান পাইলেন এবং দেখিয়া বুঝিলেন, পাত্রী সুলক্ষণা ; সুতরাং সেই স্থানেই ভ্রাতার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পাত্রের বয়স চব্বিশ, কন্যা মাত্র ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যার বয়সের সহিত পাত্রের বয়সের অনেক ব্যবধান, ইহা বিবেচনা করিয়া শ্যামাসুন্দরী ও রামচন্দ্র প্রথমে এই সম্বন্ধে সম্মত হইলেন না, ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। আবার ইহাও তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন, পাত্রপক্ষই উপযাচক হইয়া তাঁহাদের কন্যা প্রার্থনা করিতেছেন। পাত্র প্রিয়দর্শন, সচ্চরিত্র ও উচ্চকুলোদ্ভব ; এবং কন্যার শ্বশুরবাড়ীও নিকটেই হইবে। অবশেষে তাঁহারা সম্মত হইলেন। ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসে শুভবিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইল।

শ্যামাসুন্দরী ও রামচন্দ্র যে সৌভাগ্যশালী ছিলেন, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাঁহাদের সংসারে আর্থিক প্রতুলতা ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহোৎসবে ইচ্ছানুরূপ অর্থব্যয় এবং সমারোহ করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি জগদ্ধাত্রীরূপা এই কন্যার জন্য তাঁহাদের অদেয় কিছুই ছিল না ; সাধ্যমত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থাই তাঁহারা করিলেন, কোনপ্রকার ত্রুটির অবকাশ রাখিলেন না।

বিবাহের দিন সমাগত হইলে আত্মীয়পরিজন এবং অনাত্মীয় প্রতিবেশী নরনারী আয়োজন এবং উৎসবের কার্য্যে সহায়তা করিতে আসিলেন। কন্যার বিবাহ আনন্দের বিষয় এবং শুভ কার্য্য সন্দেহ নাই, তথাপি মাতাপিতা অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন না। শ্যামাসুন্দরী অতি ব্যস্ততার মধ্যেও কন্যার দিকে চাহিয়া বারংবার অশ্রুমোচন করেন ; রামচন্দ্র প্রাণাধিক কন্যাকে ছাড়িয়া কিভাবে থাকিবেন, ভাবিয়া বিমর্ষ হইয়া পড়েন। মনকে তাঁহারা স্থির করিতে প্রয়াস পান, কিন্তু পারেন না, মন ভাঙ্গিয়া পড়ে।

পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়ে শোভিত হইয়া বর গদাধরচন্দ্র আসিলেন। আজানুলম্বিত তাঁহার বাহু, সুবিশাল বক্ষ, প্রশস্ত ললাট, ভাবঘন আয়ত নয়ন, উজ্জ্বল গৌর কান্তি। এই রূপ একবার দেখিলে মানুষ আর নয়ন

ফিরাইতে পারে না। সারদার বরের রূপ দেখিয়া কিশোরীগণ মন্তব্য করেন,—ওরে, ঠাকুরমণির ভাগ্য ভাল, খাসা ঠাকুর এসেছে।

পিতা রামচন্দ্র কন্যা সম্প্রদান করিলেন। গদাধরের হস্তে কন্যার একখানি সুকোমল হস্ত মিলিত করিয়া দিলেন। তাঁহার গৃহের এবং হৃদয়ের আনন্দ-প্রতিমাকে সমর্পণ করিয়া রামচন্দ্র যুক্তকরে জামাতার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন,—আপনি আমার এই সুলক্ষণা এবং সালঙ্কারা কন্যাকে গ্রহণ করুন। আপনাদের জীবন কল্যাণযুক্ত হউক।

অগ্নি এবং নারায়ণকে যথাবিধি সাক্ষী রাখিয়া গদাধর সারদা দেবীকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিলেন।

ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু।
মম বাচমেকমনা জুষস্ব বৃহস্পতিস্ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্॥

—আমার ব্রতে তোমার হৃদয় সমাহিত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুকূল হউক, তুমি একান্তমনে আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হও, দেবগুরু বৃহস্পতি তোমাকে আমার সহিত যুক্ত করুন।

বিবাহ উপলক্ষে বরের হস্তে যে মাঙ্গলিক সূত্র বন্ধন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা কয়েকদিবস ধারণ করিবার প্রথা প্রচলিত। কিন্তু এই অদ্ভুত-প্রকৃতির নববিবাহিত তরুণ ভাবিলেন,—জগদম্বার সন্তান আমি, আমার আবার বন্ধন কেন? সূত্রবন্ধন তাঁহার নিকট অসহ্য বোধ হইল, এবং যে-ভাবেই হউক বরণডালার প্রদীপশিখায় বিবাহরাত্রিতেই সেই মাঙ্গলিক সূত্র দগ্ধ হইয়া গেল। ইহাতে নিশ্চিন্ত হইয়া তিনি বলিলেন,—বেশ হলো, এতক্ষণে বন্ধন গেল।

কিন্তু এইপ্রকার কার্য্যদর্শনে পুরনারীরা 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন,—বিয়ের রাত্তিরে এমন অলক্ষুণে কাণ্ড; কী জামাই এলো গো!

গদাধর ছিলেন রসিক পুরুষ, অপ্রসন্ন সকলকে প্রসন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিলেন। সুর আর ভাব মিলিয়া সকলকে অভিভূত করিল। এমন মধুর সঙ্গীত তাঁহারা কখনও শোনেন নাই। ভুলিয়া গেলেন তাঁহারা সকল অমঙ্গলের দুশ্চিন্তা।

কন্যাপক্ষের আদর-আপ্যায়নের সঙ্গে আত্মীয়-অভ্যাগতদিগের 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' ধ্বনির মধ্যে উৎসব সুসম্পন্ন হইল ; সকলে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। যে-কয়জন কৌতুকপ্রিয় বধূ আসিয়াছিলেন নবদম্পতির বাসর জাগিতে, বরের আচরণে তাঁহাদের উৎসাহ নিভিয়া যায়, হতাশ হইয়া তাঁহারাও চলিয়া গেলেন।

উৎসব-বাটীর কর্ম্মকোলাহল থামিয়া যায়। সকলে শ্রান্ত, নিদ্রাভিভূত। বালিকাবধূ এবং তরুণ বর জাগিয়া আছেন। উভয়ে উভয়কে দেখেন, কাহারও মনে দ্বিধাসঙ্কোচ আসে না। গদাধর প্রদীপের আলোকে নববধূকে নিরীক্ষণ করেন ; গভীর সেই দৃষ্টি, প্রবেশ করে অন্তস্তল পর্য্যন্ত।

বলেন,—বেশ তো তুমি,···দিব্যি।

উপবাসে ও অনিদ্রায় বালিকাবধূ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এইবার বিশ্রামের প্রয়োজন, এইরূপ ভাবিয়া কুণ্ঠাজড়িতকণ্ঠে গদাধর বলেন,—দ্যাখগো, নারকেল তেলের গন্ধ আমার সয় না। তা, তুমি এই বিছানায় শোও, আমি মেঝেতে শোব'খন। কিছু অসুবিধে হবে'না।

—তা কি কখনো হয় ? স্বামী যে গুরুজন।

বয়সে নিতান্ত বালিকা হইলেও সারদা বুদ্ধিমতী। ঘরের কোণে একখানি খেজুর পাতার চাটাই ছিল, মাটিতে বিছাইয়া তাহাকেই সানন্দ-চিত্তে নিজের শয্যা করিলেন। উত্তম শয্যা স্বামীর জন্য ছাড়িয়া দিলেন।

ইহাই সদ্যঃপরিণীত সারদা-গদাধরের বাসররাত্রির অভিনব চিত্র।

"দেবী-কবচে" ভগবতীর স্বরূপ বর্ণনায় আছে,—

"প্রথমং শৈলপুত্রীতি, দ্বিতীয়ং ব্রহ্মচারিণী।"

সারদারও বাসরকক্ষ হইতেই ব্রহ্মচর্য্যব্রতের সূত্রপাত হইল।

এমন পুণ্যদিবসে, দেব-দেবীর শুভমিলনের উদ্দেশে আমরা সভক্তি অন্তরে প্রণাম নিবেদন করিতেছি,—

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥"

সাধনা

মা-সারদা পতিগৃহে চলিলেন।

চিরপরিচিত গৃহ এবং আত্মীয়স্বজনকে ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে হইলে মানুষ সাধারণতঃ অন্তরে বেদনা অনুভব করে, কিন্তু নিতান্ত বালিকা হইলেও মা-সারদা জয়রামবাটী হইতে পতির সহিত শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় একবিন্দু অশ্রুও বিসর্জ্জন করেন নাই।

নববিবাহিত পুত্র ও বধূ কামারপুকুরের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে চন্দ্রমণি বালিকাবধূর মুখারবিন্দ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহার সকল অভাব এবং দুঃখের যেন অবসান হইল। পুত্রবধূকে বক্ষে চাপিয়া চন্দ্রমণি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন,—আমার মা এসেছ, আমার লক্ষ্মী এসেছ, গদাই-এর ঘর আজ আলো হলো। আত্মীয়পরিজন এবং পল্লীবাসী নরনারী সকলেই নববধূকে দেখিয়া প্রীতি লাভ করিলেন।

উন্মাদপ্রায় পুত্রকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ দেখিয়া জননী এতদিনে নিরুদ্বেগ হইলেন। ভাবিলেন, এইবার রঘুবীর সকল দুঃখমোচন করিলেন, তাঁহার গদাই সংসারী হইল। পুত্রকে তিনি শীঘ্র কলিকাতা যাইতে দিলেন না।

ওদিকে শ্যামাসুন্দরীর দিন আর কাটে না। নয়নের মণি সারদা জয়রামবাটী হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহার অদর্শনে গৃহসংসার সকল অন্ধকার। কন্যার অনুপস্থিতিতে রামচন্দ্রও সকল কার্য্যে নিরুৎসাহ বোধ করেন। কন্যা ছিল তাঁহার মনের বল, সকল উৎসাহের উৎস। কয়েকদিন পরে কন্যা শ্বশুরালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মাতাপিতার প্রাণমন পুনরায় ভরিয়া উঠিল। সহচরীগণও তাঁহাকে ফিরিয়া পাইয়া যেন হারানিধি লাভ করিল।

ইতোমধ্যে জামাতা গদাধর পুনরায় শ্বশুরবাড়ী আসিলেন। বধূ

স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই পতির চরণ ধৌত করিয়া দিলেন, স্বহস্তে পাখার বাতাস দিয়া তাঁহার শ্রান্তি দূর করিলেন। গদাধর বালিকাবধূর বুদ্ধিমত্তা এবং প্রীতির নিদর্শনে প্রসন্ন হইলেন। এইযাত্রায় তিনি জয়রামবাটীতে কয়েকদিন বাস করিয়া বধূকে সঙ্গে লইয়া কামারপুকুরে ফিরিয়া গেলেন।

জননীর ইচ্ছানুসারে দেড় বৎসরাধিককাল কামারপুকুরে থাকিয়া গদাধর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। মা-সারদাও পিত্রালয়ে চলিয়া আসিলেন। পরবর্ত্তী কয়েকবৎসর তিনি মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে যাইয়া বৃদ্ধা শ্বশ্রূ-মাতাঠাকুরাণীর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন, পতি তখন দক্ষিণেশ্বরে। চন্দ্রমণির মনে বড়ই আক্ষেপ হইত,—বধূমাতা আসিয়াছে, আর গদাই এমন সময়ে অনুপস্থিত। গদাই থাকিলে কত সুন্দর মানাইত, কত-না সুখের হইত! বধূমাতার চিবুক ধরিয়া বৃদ্ধা বলিতেন,—মাগো, রঘুবীরকে জানাও, গদাই আমার ঘরে ফিরে আসুক।

বালিকাবধূর মনঃকষ্ট হইতে পারে ভাবিয়া সহৃদয়া চন্দ্রমণি তাঁহাকে একসঙ্গে অধিককাল কামারপুকুরে রাখিতেন না, জয়রামবাটীতে পাঠাইয়া দিতেন। মধ্যমপুত্রবধূ শাকম্ভরীর সহায়তায় চন্দ্রমণির ক্ষুদ্র সংসারের কাজকর্ম্ম চলিয়া যাইত, এইজন্য বালিকাবধূর সর্ব্বদা কামারপুকুরে থাকিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু কনিষ্ঠপুত্রবধূ নিকটে থাকিলে বৃদ্ধার চিত্ত প্রফুল্ল থাকিত।

পতিগৃহে বালিকার প্রয়োজন না থাকিলেও, পিতৃগৃহে তাঁহার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। মা-সারদা বাল্যকাল হইতেই সংসারকার্য্যে নিপুণা, জননীকে তিনি নানাভাবে সহায়তা করিতেন, কোনপ্রকার কার্য্যেই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। জননী কখনও রন্ধনে অপারক হইলে, মা-সারদা রন্ধনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু ভাতের হাঁড়ি নামাইবার সামর্থ্য তখনও তাঁহার হয় নাই, এইজন্য পিতাকে ডাকিতে হইত। গৃহস্থঘরের কন্যাদের যে-সকল কার্য্য সাধারণতঃ করিতে হয় না, তিনি তাহাও করিতেন। নিজেদের ক্ষেতে চাষে নিযুক্ত জনমজুরদিগের আহার্য্যও তিনি দিয়া আসিতেন। তাঁহাদের তূলার চাষও ছিল, তিনি ক্ষেত হইতে তূলা

সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং পৈতা তৈয়ারী করিতেন। সমবয়সী বালকবালিকাদিগের মত তাঁহার আর খেলাধূলা করিবার অবসর ছিল না, সেদিকে তাঁহার চিত্তও আকৃষ্ট হইত না।

মা-সারদার পরে শ্যামাসুন্দরীর আরও ছয়টি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—দ্বিতীয়া কন্যা কাদম্বিনী, এবং পঞ্চ পুত্র—প্রসন্নকুমার, উমেশচন্দ্র, কালীকুমার, বরদাপ্রসাদ ও অভয়চরণ। কাদম্বিনী এবং উমেশচন্দ্র উভয়েরই অকালে মৃত্যু হয়। সংসারের বহুবিধ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায় শ্যামাসুন্দরীর পক্ষে এতগুলি সন্তানের প্রতিটি প্রয়োজনে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইত না। জ্যেষ্ঠা সহোদরা কনিষ্ঠ ভ্রাতাভগিনীদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন।

স্নেহ ও দয়া ছিল মা-সারদার সহজাত গুণ। বাল্যকাল হইতেই বিপন্নের দুঃখে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। এমন-কি গৃহপালিত পশুগণও তাঁহার স্নেহলাভে বঞ্চিত হইত না। তাঁহার মাতাপিতাও সহৃদয় ছিলেন। নিজেদের অপ্রাচুর্য্যের মধ্যেও সংসারের সামান্য সঞ্চয় হইতেই বিপন্নকে দান করিয়া তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করিতেন।

"মায়ের এগারো বৎসর বয়সের সময়, ১২৭১ সালে, ওদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়। মায়ের পিতার কিছু ধান্য সঞ্চিত ছিল। গরীব ব্রাহ্মণ, নিজের পোষ্যরাই কি খাইবে সেদিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, অন্নসত্র খুলিয়া দিলেন। কড়াইয়ের ডালের খিচুড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি রন্ধন করাইয়া কয়েকটি ডাবায় ঢালিয়া রাখিতেন। গরম খিচুড়ি খাইতে লোকের কষ্ট হইত বলিয়া মা দুইহাতে পাখার বাতাস করিয়া তাহা ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন।

"ক্ষুধার্ত্ত লোকদের দুর্দ্দশা মা এইরূপে বর্ণনা করিতেন, 'আহা, এই ক্ষিদের জ্বালায় সকলে খাবার জন্যে বসে আছে। একদিন একটি বাগ্‌দী না ডোমের মেয়ে এসেছে, মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া হয়ে গেছে তেলের অভাবে, চোখ উন্মাদের মত। ছুটে এসে গোরুর ডাবায় যে কুঁড়ো ভেজানো ছিল তাই খেতে আরম্ভ করেছে। এত যে সকলে ডাকছে, 'বাড়ীর ভিতরে এসে খিচুড়ি খা'—তা আর ধৈর্য্য মানছে

না। খানিকটা কুঁড়ো খেয়ে তবে কথা তার কানে গেল। এমন ভীষণ দুর্ভিক্ষ! সেই বছর দুঃখ পেয়ে তবে লোকে ধান মরাইয়ে রাখতে আরম্ভ করলে।" (৪)

কেবল সংসারকার্য্যেই মা-সারদার সকল সময় অতিবাহিত হইত না, পাঠেও তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। কিন্তু সেকালে পল্লী-অঞ্চলে বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থার অভাবে এবং বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক কার্য্যে নানাভাবে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার বিদ্যাচর্চ্চার যথেষ্ট সুযোগ হয় নাই; কনিষ্ঠ সহোদরগণের সহিত কয়েকদিবস মাত্র পাঠশালায় যাতায়াত করিয়াছেন। শ্বশুরালয়ে গিয়াও অবসর সময়ে তিনি পাঠাভ্যাস করিতেন; কিন্তু তৎকালে বিবাহের পর নারীর বিদ্যাচর্চ্চার রীতি তেমন প্রচলিত না থাকায়, কামারপুকুরে এইজন্য তাঁহাকে গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছে। অবশ্য, ইহাতেও তাঁহার উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালে আমরাও তাঁহাকে ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতে দেখিয়াছি এবং অনেক সঙ্গীত ও ছড়া আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

এদিকে কামারপুকুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গদাধর পুনরায় মাতৃ-পূজায় ব্রতী হইলেন, সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বৃদ্ধা জননী, নববিবাহিতা পত্নী, বাহ্যজগতের সকল বিষয় তিনি ভুলিয়া গেলেন।

ক্রমে মাতৃভাবে বিভোর পূজারীর পূজার নিয়মপদ্ধতিতেও ভুল হয়। কখনও দেবীর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পুষ্পমাল্য নিজকণ্ঠেই অর্পণ করেন, পাষাণপ্রতিমার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন,—খাও মা, খাও। কখনও পূজার মন্ত্রোচ্চারণের পরিবর্ত্তে কেবল শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে থাকেন।

মন্দিরের কর্ম্মচারীদিগের আলোচনা এবং অভিযোগ রাণীর কর্ণগোচর হয়। তাহারা বলে, সব পণ্ড হইল, দেবীর কোপে রাণীর সর্ব্বনাশ হইবে! শুনিয়া রাণীরও ভয় হয়। জামাতা মথুর তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলেন, তিনি থাকিতে মন্দিরে কিছুতেই অনাচার হইতে দিবেন না।

মন্দিরের ব্যবস্থা এবং পূজারীর অবস্থা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে মথুরানাথ আসেন দক্ষিণেশ্বরে। কর্ম্মচারিগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া যে-যাহার কার্য্যে মনোযোগ দেয়। মথুরানাথ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া নিঃশব্দে সিঁড়ি বাহিয়া উঠেন মন্দিরে, স্বেচ্ছাচারী পূজারীর পশ্চাতে দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকেন।

দেবীপ্রতিমার সম্মুখে অঞ্জলির পত্রপুষ্প হাতে লইয়া ভাববিভোর পূজারী বসিয়া আছেন তো বসিয়াই আছেন,—নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিঃশ্বাস ফেলিতে ভয় হয় মথুরের। এ কি-রকম পূজা!

ধীরে ধীরে পূজারীর বাহ্যচেতন ফিরিয়া আসে, ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলেন,—মাগো, পূজা গ্রহণ কর্, দয়া কর্ মা।

এ-কি সাধারণ মানুষের কথা? যেন দেবকণ্ঠের বাণী, গমগম্ করে মন্দির! পাষাণপ্রতিমার মধ্য হইতে চিন্ময়ী জগন্মাতা ভুবনমোহন হাসিতে কি উত্তর দেন, কে জানে? এ-কি দৃষ্টিবিভ্রম, না স্বপ্ন? ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবেন মথুরানাথ।

ভক্ত-ভগবানের ভাষা তিনি বোঝেন না, উপলব্ধি করিতে পারেন না সেই দিব্যভাব। মন আর মস্তিষ্ককে তিনি প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারেন না। মনে হয়, দেহ, মন্দির, পৃথিবী সকলই যেন ভূমিকম্পে দুলিতেছে। বিষয়বাসনায় সঙ্কুচিত মন, তাঁহার সর্ব্বদেহ ছম্‌ছম্ করে, নিজের দেহের ভার বহিতে পারেন না। আর এক মুহূর্ত্ত এমন স্থানে থাকিলে হয়তো তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইবে। ত্বরিতগতিতে নামিয়া যান মথুরানাথ মন্দির হইতে কলিকাতার পথে।

জামাতার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা শুনিলেন রাণী রাসমণি। ভাষা আর চলে না। দুইজনেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। ভক্তিমতী রাসমণির গণ্ডে অশ্রুগঙ্গা বহিয়া যায়। পূজারীর সাধনায় পাষাণপ্রতিমা সত্যই জাগ্রত হইয়াছে এতদিনে, স্বপ্ন সার্থক হইয়াছে।

যথাকালে কলিকাতা হইতে কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ আসে,—'বাবা'র কোন কাজে কেহ বাধা দিবে না, দিলে তাহার চাকুরী থাকিবে না।

একদিন রাসমণি গঙ্গাস্নানান্তে মন্দিরে আসিয়াছেন। জগন্মাতাকে দণ্ডবৎ করিয়া নিকটেই উপবিষ্ট হইলেন, এবং পূজারী বাবাকে একখানি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে অনুরোধ করিলে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

কিন্তু অকস্মাৎ পূজারীর ভাবস্রোত স্তব্ধ হইল। রাণীর দিকে তিনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাঁহার হৃদয়কন্দরে যাহা দেখিলেন, তাহাতে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। কেবল তাহাই নহে, পাগল পূজারী রাণীর অঙ্গে চপেটাঘাত করিয়া বসিলেন, এবং বলিলেন,—কী, এখানে মায়ের পায়ের তলায় ব'সেও ঐ বিষয়চিন্তা!

রাণীর পরিচারিকা ও প্রতিহারিগণ এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনায় দারুণ উত্তেজিত হইয়া কলরব করিয়া উঠিল। কর্ম্মচারিগণ যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল, উন্মাদ পূজারীকে অন্যায় কার্য্যের জন্য সমুচিত দণ্ড দিতে হইবে।

সত্য সত্যই ভবতারিণীর সম্মুখে বসিয়া সাধকের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ-কালেও রাণীর মন মাতৃচিন্তায় রত ছিল না। তিনি ঐ সময় বিচারাধীন একটা মকদ্দমার ফলাফলের বিষয়ই মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন।

সন্তান কোন অন্যায় কর্ম্ম করিলে পিতা যেমন তাহাকে শাসন করেন, গদাধরও তদ্রূপ রাণীকে শাসন করিলেন। দেবতার নিকট তুচ্ছ বিষয়চিন্তা করিতে নাই, কেবল দেবতার চিন্তাই করিতে হয়। রাণী মন্দিরের কর্ত্রী, এবং এমনই তেজস্বিনী যাঁহাকে ইংরাজ সরকারও যথেষ্ট মানিয়া চলেন, এহেন রাণীর অঙ্গে চপেটাঘাত করিয়াও গদাধর নির্ব্বিকার! তিনি-যে রাণীর বেতনভুক একজন পূজারীমাত্র, তাহা মনেও আসিল না। শাসন করিয়া একটু হাসিলেন মাত্র, তারপর আবার সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন।

রাণীও নিজের অপরাধ বুঝিয়া অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু অসন্তুষ্ট হইলেন না; বরং বিস্মিত হইলেন, বাবা মনের গোপন কথা জানিলেন কিরূপে? তবে কি ইনি অন্তর্য্যামী?

এতক্ষণে বাহিরে কর্ম্মচারিবৃন্দের কোলাহলে রাণীর চমক ভাঙ্গে। আত্মভোলা পূজারীর উপর হয়তো উৎপীড়ন হইবে, এইরূপ আশঙ্কা

করিয়া তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন,—ভট্‌চায্‌ মশাইর কোন দোষ নেই, তোমরা গোল করো না এখানে, স'রে যাও।

সকলে অবাক! একে অন্যের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া যায়।

রাণী রাসমণির ভক্তি এবং মহত্ত্বের কথা চিন্তা করিলে মনে হয়, এমন ভক্তিমতীর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরেই তো জগন্মাতার আবির্ভাব সম্ভব।

সাধনার কঠোরতা এবং দেহের প্রতি উদাসীনতার ফলে পুনরায় গদাধরের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিল। রাসমণি এবং মথুরানাথ তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু চিকিৎসকের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও সুফল দেখা গেল না। অবশেষে একজন বহুদর্শী চিকিৎসক তাঁহার দৈহিক লক্ষণসমূহ লক্ষ্য করিয়া বলেন,—ইহা রোগ নহে, ইহা যোগীর দিব্যোন্মাদ-ভাব। ঔষধে ইঁহার উপকার হইবে না।

এই অবস্থায় তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রাম অতিশয় আন্তরিকতার সহিত তাঁহার সেবাযত্ন করিতেন। মা-সারদার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হৃদয়রাম আত্মভোলা মাতুলের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অবহিত থাকিতেন, ভাবসমাধির সময় এবং কোথাও যাতায়াতের সময় তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। এই অলোকসামান্য সাধকের অপূর্ব্ব সাধনার এবং জীবনের ইতিহাস রচনাতেও পরবর্ত্তী কালে হৃদয়রাম যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার এই অবদানের জন্য দেশবাসী তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করিবে।

গদাধরের এই দিব্যাবস্থার সময় দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে অপরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী এক সন্ন্যাসিনী উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম যোগেশ্বরী, ভৈরবী ব্রাহ্মণী নামে সুপরিচিতা। গদাধরের সহিত সাক্ষাতের প্রথম দিন হইতেই উভয়ে উভয়ের ভাবে এবং কথায় মুগ্ধ হইলেন। সন্ন্যাসিনীর মাতৃ-ভাব, গদাধর হইলেন তাঁহার সন্তান। গদাধর বলিতেন, ইনি যোগমায়ার

অংশসম্ভূতা মূর্ত্তিমতী সরস্বতী। ইনিই শাস্ত্রোক্ত ভাবলক্ষণাদি মিলাইয়া গদাধরকে ভগবানের অবতার বলিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ছিলেন। গদাধরকে তান্ত্রিক সাধনার উৎকৃষ্ট আধার বুঝিয়া তাঁহাকে এই সাধনায় উৎসাহিত করেন। ব্রাহ্মণীর নির্দ্দেশে এবং সহায়তায় একে একে চৌষট্টিপ্রকার তন্ত্রোক্ত সাধনা গদাধর আয়ত্ত করিলেন। যেরূপ অল্পকালমধ্যে তিনি এইসকল কঠিন সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন, বহুশাস্ত্রজ্ঞা সন্ন্যাসিনীর তাহাতে বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

গদাধর স্বয়ং তন্ত্রোক্ত সাধনার অনুষ্ঠান করিয়াও তত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগকে বলিতেন,—তন্ত্রসাধনার কতকগুলি ক্রিয়ায় পতনের আশঙ্কা অধিক। ধর্ম্মের নামে অনধিকারীরা এই কঠিন সাধনার পথে আসিয়া ভোগের পঙ্কে ডুবিয়া মরে। সংযম পালন করিয়া এবং একান্তভাবে শরণাগত হইয়া ঈশ্বরকে ডাক, এই যুগে ইহাই শ্রেষ্ঠ পথ।

এই প্রসঙ্গে নিজের ভাবের কথায় একদিন বলিয়াছেন, "কি জান, আমার ভাব মাতৃভাব—সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোন বিপদ নাই। স্ত্রীভাব, বীরভাব—বড় কঠিন, ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়। তোমরা আপনার লোক, তোমাদের বলছি,—শেষ এই বুঝেছি—তিনি পূর্ণ, আমি তাঁর অংশ। তিনি প্রভু, আমি তাঁর দাস। আবার এক একবার ভাবি, তিনিই আমি, আমিই তিনি। আর ভক্তিই সার।" (১)

তন্ত্রসাধন-কালে গদাধরের বায়ুরোগ, পঞ্চমুণ্ডির আসনে উগ্রতম সাধনা, কুকুরের উচ্ছিষ্ট ভোজন ইত্যাদি কথা অতিরঞ্জিত আকারে আবার জননী চন্দ্রমণির কর্ণগোচর হইল। জননীর স্নেহ চিরকাল এই উদাসী পুত্রের উপরই ছিল অধিক। বিবাহবন্ধনের দ্বারাও পুত্রের মন সংসারে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না, ইহাই ছিল তাঁহার ক্ষোভ। পুত্রসান্নিধ্যের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্রের সেবাযত্ন এবং গঙ্গাতীরে বাস, এই দুই উদ্দেশ্য লইয়া এইবার তিনি নিজেই দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে পুত্রের নিকট বাস করিতে পারিয়া বৃদ্ধা পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

গদাধর উদাসী হইলেও "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জননীকে আজীবন ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার প্রসন্নতাসাধনে সচেষ্ট থাকিতেন। জননীর মনস্তুটির জন্য তাঁহার নিকট বসিয়া গদাধর আহার করিতেন এবং তাঁহাকে নানারূপ গল্প শুনাইতেন।

গদাধর এবং চন্দ্রমণি প্রথম কয়েকবৎসর নহবৎ-ঘরের পূর্ব্বদিকে বড়কুঠীতে বাস করিতেন। এইস্থানে রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু ঘটিলে বড়কুঠী ত্যাগ করিয়া চন্দ্রমণি নহবতে আসিয়া বাস করেন। গদাধরও ইহার সন্নিকটে দক্ষিণ দিকের কক্ষে, যাহাকে এখন দর্শনার্থিগণ 'ঠাকুরের ঘর' বলিয়া জানেন, সেইস্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

সন্তানের চরিত্রগঠনে জননীর চরিত্র প্রভূত সহায়তা করে। বহুবিধ মহৎ-গুণের অধিকারিণী হইলে তবেই কোন কোন ভাগ্যবতী জননীর গর্ভে মহামানব এবং অবতার-পুরুষগণের আবির্ভাব হইতে পারে। দেবী চন্দ্রমণি বহু মহৎ-গুণের অধিকারিণী ছিলেন। শিশুসুলভ সারল্য এবং অসামান্য নির্লোভতা ছিল তাঁহার চরিত্রের তুইটি বিশেষ গুণ। নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে তাঁহার চরিত্রের এই দিক সুন্দররূপে পরিস্ফুট হয়।

বাবার সেবায় মথুরানাথ আত্মপ্রসাদ বোধ করিতেন। তাঁহার প্রাণের একান্ত অভিলাষ ছিল যে, বাবার জন্য কিঞ্চিৎ ধনসম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যাইবেন। বেনারসী পট্টবস্ত্র, কাশ্মীরী শাল, সোনার অলঙ্কার ইত্যাদি বহুমূল্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ দিয়া দেখিয়াছেন, বাবা সেদিকে দৃকপাতও করেন না। যোগীশ্বর বাবার মন চিরকালই উদাসীন, নির্ব্বিকার। কোনপ্রকার ভোগ বা প্রলোভনে তাঁহার মনকে আকর্ষণ করা যায় না। একবার তো এইপ্রকার দানের কথায় বাবা তাঁহাকে মারিতেই উদ্যত হইয়াছিলেন।

এইবার সরলস্বভাবা ঠাকুরমাতাকে পাইয়া, তাঁহার সহায়তায় কৌশলী মথুরানাথ এতকালের অভিলাষ পূর্ণ করিতে চেষ্টিত হইলেন। ঠাকুরমাতাকে সম্মত করাইতে পারিলে মাতৃভক্ত বাবা তাহাতে আপত্তি করিবেন না, এই ভরসায় তিনি নবোদ্যমে বৃদ্ধাকে ভজাইতে লাগিলেন।

বৃদ্ধার অভাববোধ কম, অল্পেতেই সন্তুষ্ট ; তিনি বলিলেন,—দাদা, তোমার সেবার ত্রুটি কোথায় ? আমাদের কোন অভাব-অভিযোগ তো তুমি রাখনি।

মথুরের এইবার শেষ চেষ্টা, সহজে ছাড়িবেন না ; বলিলেন,—তোমার যা' মন চায় ঠাকু'মা, নাতির কাছ থেকে তা-ই চেয়ে নাও।

বৃদ্ধা অনেক ভাবিলেন, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, —কৈ, না, কোন অভাব তো মনে পড়ে না। ঘরের থালা, বালতি, মাদুর, পাখা হইতে আরম্ভ করিয়া তিন-চারিখানি থানকাপড় পর্য্যন্ত মথুরকে দেখাইয়া চাক্ষুষ প্রমাণ করিয়া দিলেন,—এত জিনিষপত্র ঘরে রয়েছে। কেন ভাবছো দাদা ? কোন অভাব নেই। তোমার যত্নে দিব্যি সুখে আছি আমরা এখানে।

নৈরাশ্যে মথুরের মন মুষড়াইয়া পড়ে। তবু আর একবার চেষ্টা করিয়া বলেন,—ঠাকু'মাগো, কে জানে ভবিষ্যতে তোমাদের সেবা কিভাবে চলবে। এখুনি কিছু দিতে পারলে, আমি প্রাণে শান্তি পেতুম, কৃতার্থ হতুম।

মথুরের ব্যাকুলতায় বৃদ্ধার কোমল প্রাণ বিচলিত হয়। আবার তিনি চিন্তা করিয়া দেখেন, কিছু একটা অভাব বাহির করিতে পারেন কি-না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল একটা অভাবের কথা। মথুরকে সন্তুষ্ট করিতে বৃদ্ধা উৎসাহের সঙ্গে বলেন,—হ্যাঁ দাদা, মনে পড়েছে এতক্ষণে। আমার দাঁতের গুল ফুরিয়ে গেছে, এক পয়সার দোক্তা পাতা কিনে দিও। প্রাণ-ভ'রে আশীর্ব্বাদ করবো তোমায়।

হায় রে ! কোথায় একটা তালুক সাধুব্রাহ্মণের সেবায় দানপত্র লিখিয়া দিবেন, মথুরের অবর্ত্তমানেও যাহাতে বাবার সেবায় ত্রুটি না হয়, আর ঠাকু'মা চাইলেন কি-না এক পয়সার দোক্তা পাতা ! ভাবিয়া দানশীল ভক্ত মথুরের চক্ষে জল আসে। তাইতো, এমন মা না হ'লে কি অমন ছেলে হয় !

তন্ত্রসাধনার পর সখ্যবাৎসল্যাদি বিভিন্ন ভাবসাধনায় গদাধরের আরও কয়েকবৎসর অতিবাহিত হইল। অতঃপর প্রসিদ্ধ নাগা সন্ন্যাসী তোতাপুরী পরমহংস দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর ন্যায় তোতাপুরীও সাধক গদাধরকে দর্শনমাত্র বুঝিলেন, ইনি নিশ্চয়ই অসামান্য পুরুষ। এরূপ ব্যক্তিকে বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া আনন্দের বিষয়, জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি বেদান্ত শিক্ষা করবে?

গদাধর বলেন,—আমি ওসব জানি না, আমার মা জানেন।

—মা! তোমার মা বেদান্তশিক্ষার কি বোঝেন?

—বটে! তিনি সর্ব্বজ্ঞানময়ী, তাঁর কথাতেই আমি চলি।

নাগা সন্ন্যাসীর মনে সংশয় জাগে, প্রশ্ন করেন,—কে তোমার মা?

—ঐ মন্দির যিনি আলো ক'রে আছেন, গদাধর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন।

সবিস্ময়ে হাসিয়া বলেন সন্ন্যাসী,—ঐ পাথরের প্রতিমা তোমাকে চলার নির্দ্দেশ দেন?

—পাথরই বটে! তুমি তাঁর কি বুঝবে? তাঁর কথা ছাড়া এক পা আমি চলি না।

গদাধরের পৌত্তলিকতার কুসংস্কার দেখিয়া ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী মনে মনে দুঃখিত হইলেন, কিন্তু এমন উত্তম সাধককে ত্যাগ করাও যায় না। অগত্যা, পাথর-প্রতিমার নির্দ্দেশ চাহিতেই তাঁহাকে বলেন।

মাতৃসাধক মন্দিরে চলিলেন, তাঁহার মায়ের মতামত জানিতে।

মন্দির হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি সন্ন্যাসীকে জানাইলেন,—মা বেদান্তসাধনায় অনুমতি দিয়েছেন। আর, জান? তিনিই তোমাকে এজন্য এখানে এনেছেন।

নাগা সন্ন্যাসীর বিস্ময় বাড়িয়া যায় গদাধরের কথা শুনিয়া।

শুভক্ষণ নির্ব্বাচন করিয়া পঞ্চবটীতলে দীক্ষানুষ্ঠান আরম্ভ হইল। তোতাপুরীর নির্দ্দেশানুযায়ী গদাধর পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্দেশ্যে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিয়া নিজেরও পিণ্ডদান করিলেন। বিরজা-হোম

করিলেন, সকল কামনাবাসনা এবং ব্রাহ্মণ্য-প্রতীক যজ্ঞসূত্র হোমাগ্নিতে আহুতি দিলেন। তৎপরে গুরুদত্ত গৈরিক বসন পরিধানপূর্ব্বক মুণ্ডিত-মস্তক নবীন সন্ন্যাসী ধ্যানে উপবিষ্ট হইলেন। নাম এবং রূপের সীমা অতিক্রম করিয়া অরূপ পরব্রহ্মে লীন হইতে হইবে।

তিনি ধ্যান করিতে'চেষ্টা করিলেন,

"সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তম্ অবাঙ্ মনসগোচরম্।"

মাতৃভাবের সাধক গদাধর অরূপের ধারণা করিতে গিয়াও দেখেন—অপরূপ রূপময়ী শ্যামা-মা সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন। বারংবার চেষ্টা করেন মাতৃমূর্ত্তি ভুলিয়া অরূপ ব্রহ্মের ধ্যান করিতে, কিন্তু অগ্রসর হইতে পারেন না। মাতৃরূপ এবং মাতৃনামের বাহিরে আর কিছুই তাঁহার মনে আসে না।

নিরাশ হইয়া বলেন গুরুকে,—তোমার অদ্বৈতজ্ঞান, অরূপ ব্রহ্ম, নির্ব্বিকল্প সমাধি, এসব আমার হলো না। বৃথা চেষ্টা! কি করি বল? আমার অন্তরে বাহিরে মাতৃমূর্ত্তি, আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত বিশ্বভুবনে মা-ছাড়া আর কিছুই আমি দেখতে পাই না।

শিষ্যের 'না' শুনিয়া তোতাপুরী তাতিয়া উঠেন,—কেন হবে না? সকল সাধনার সিদ্ধি তোমার করতলগত, আর এটা হবে না? দেখি, কেমন না হয়, এ হ'তেই হবে। এই বলিয়া উত্তেজিত নাগা সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণধার একখণ্ড কাচ সংগ্রহ করিয়া শিষ্যের ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে তাহা নির্ম্মমভাবে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। দরদরধারে রক্ত বহিতে লাগিল। বজ্রনির্ঘোষে শিষ্যকে নির্দ্দেশ দিলেন,—ঠিক এখানে। সমস্ত ভুলে গিয়ে এখানে চিত্ত নিবিষ্ট কর। তোমার অবশ্য হবে।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া শিষ্য পুনরায় কেন্দ্রীভূত করেন চিত্তকে। স্থির হইয়া আসে তাঁহার দেহ, স্থির হইয়া আসে চিত্ত,···ভ্রূদ্বয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়,···নাম এবং রূপের সীমা পার হইয়া 'আমির মন, আর মনের আমি' সকলই অরূপসাগরের অতলে হারাইয়া যায়।

এত অল্পায়াসে শিষ্যকে সমাধিনিমগ্ন দেখিয়া তোতাপুরীর মন প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠে। তিনি নিজেই রহিলেন প্রহরী, কেহ আসিয়া এমন প্রশান্ত ব্রহ্মানন্দে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। প্রহরের পর প্রহর চলিয়া যায়, সাধনকুটীরের অভ্যন্তরে যে কোন মানুষ রহিয়াছে, তাহার কোন সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না। শিষ্য বাহ্যচেতনাহীন, সমাধি আর ভাঙ্গে না। ব্রহ্মজ্ঞ গুরু তাঁহার নবীন শিষ্যের অচিন্তিতপূর্ব্ব অবস্থাদর্শনে স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু দুই-তিন দিবস যখন চলিয়া যায়, ভৈরবী ব্রাহ্মণী ব্যাকুল হইয়া উঠেন, সকলেরই মনে তখন আশঙ্কা জাগে। তোতাপুরীর বিস্ময়ও আশঙ্কায় পরিণত হইতে চলিল,—কি ব্যাপার! দেহে প্রাণ আছে তো?

এই সমাধি-অবস্থার বর্ণনা "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে,—

"দিন যাইল, রাত আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল'। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন বিস্ময়কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গল মোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন ঠাকুর সেইভাবেই বসিয়া আছেন, দেহে প্রাণের প্রকাশ মাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর জ্যোতিঃপূর্ণ! বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ। তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে!

"সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসর ব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই এক দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণ-সকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি না,

নাসিকাদ্বারে বিন্দুমাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি না বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারংবার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার, বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না! তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'য়হ 'ক্যা দৈবী মায়া'—সত্য সত্যই সমাধি! বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল—নির্বিকল্প-সমাধি! একদিনে হইয়াছে! দেবতার এ কি অদ্ভুত মায়া!

"অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্' মন্ত্রের সুগভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল-জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।"
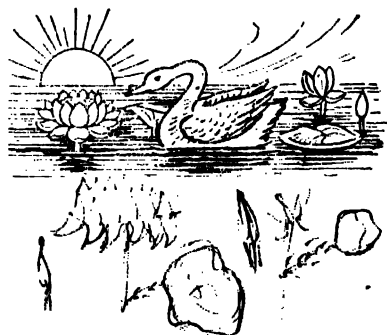
সহধর্ম্মিণী

গদাধর অতঃপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইবেন।

নির্ব্বিকল্প সমাধির দিব্যানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণের দিবারাত্র সমভাবে চলিতে লাগিল। সর্ব্বদা তদ্গত হইয়া থাকেন, বলপ্রয়োগে কোনপ্রকারে তাঁহাকে আহার্য্য এবং পানীয় গ্রহণ করাইতে হয়, এই অবস্থায় কয়েক-মাস থাকিবার পর ধীরে ধীরে মন পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কিন্তু ইতোমধ্যে স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অবনতি ঘটে, চিকিৎসায় তাহার সামান্যই উন্নতি হইল। স্থানপরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে মনে করিয়া মথুরানাথের পরামর্শে সেবক হৃদয়রাম তাঁহাকে কামারপুকুরে লইয়া গেলেন। রাণী রাসমণির ভক্তিমতী কন্যা জগদম্বা বাবার নিত্য-প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্যসামগ্রী সঙ্গে দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভূমি এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর দর্শনমানসে ভৈরবী ব্রাহ্মণীও সঙ্গে গেলেন, কিন্তু জননী চন্দ্রমণি বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতীর ত্যাগ করিলেন না।

দীর্ঘকাল পরে তাহাদের গদাধর স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন, পল্লীর নরনারী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইতে লাগিল। তাহারা দেখিয়া বুঝিল—গদাধর সত্যই উন্মাদগ্রস্ত নহেন, তেমন আনন্দময়ই আছেন। তাঁহার মুখে ভাগবতী কথা শুনিবার জন্য, তাঁহার আকর্ষণে নরনারী দলে দলে আসিয়া তাঁহার কুটীর পূর্ণ করিতে লাগিল।

কনিষ্ঠা বধূমাতাকে আনিতে রামেশ্বর জয়রামবাটীতে লোক পাঠাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা জানিয়া আপত্তি করিলেন না, উল্লসিতও হইলেন না; তাঁহার ভাব এবং আদর্শের পরিপন্থী কোন কার্য্য পত্নী করিবেন, এমন আশঙ্কা তাঁহার মনে কখনও উদয় হয় নাই।

ব্রহ্মজ্ঞ সন্ন্যাসী তোতাপুরী হয়তো অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের উচ্চাবস্থা উপলব্ধি করিয়াই বলিয়াছিলেন,—বিবাহ হইয়াছে তো কি হইয়াছে? যাঁহার আত্মসংযম এবং আত্মজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত, কে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে? মনের গেরুয়াই আসল সন্ন্যাস।

মা-সারদা কামারপুকুরে আসিলেন এবং পরম আন্তরিকতার সহিত পতির সেবাযত্নে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার তখন কিশোর কাল, বয়স তের-চৌদ্দ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে অনাদর বা অবহেলা করিলেন না, নিজেকে সংসারত্যাগী সাধুসন্ন্যাসী মনে করিয়া দূরে সরিয়া আত্মগোপনও করিলেন না। আত্মশক্তির উপর তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ছিল। পত্নীর প্রকৃতিও বুঝিয়াছিলেন, তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোক বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। প্রথমাবধি পত্নীকে সহধৰ্ম্মচারিণীরূপেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মা-সারদার উপস্থিতিতে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মনে কিঞ্চিৎ দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিল, কারণ "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।" শ্রীরাম-কৃষ্ণকে অবতার বুঝিয়াও তাঁহার মনে এইরূপ আশঙ্কার উদয় হইয়াছিল। ইহাতে আমরা তাঁহার গুরুতর দোষ দেখি না। বিদুষী এবং ধৰ্ম্মপরায়ণা হইলেও তিনি মা, এইরূপ আশঙ্কা তাঁহার মাতৃহৃদয়ের দুর্ব্বলতামাত্র। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিঃস্বার্থভাবে স্নেহ করিতেন এবং তাঁহার যথার্থ কল্যাণকামী ছিলেন, তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণচিন্তাই ব্রাহ্মণীর মাতৃহৃদয়ে ঐরূপ আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিল।

দীর্ঘকাল শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিয়া ব্রাহ্মণী তাঁহাকে যেভাবে এবং যতদূর বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মা-সারদাকে এইপর্য্যন্ত সেইপ্রকার, এমন-কি কিছুমাত্রও জানিবার সুযোগ তাঁহার হয় নাই। বধূমাতা হয়তো অন্য দশজনের অনুরূপই সাধারণ একজন স্ত্রীলোক হইবেন, ব্রাহ্মণীর মনে প্রথমে এইরূপ ভাবনারই উদয় হইয়াছিল। বধূমাতা যে কত উচ্চস্তরের নারী এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়াই শিষ্য সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়ের সম্পর্কে তাঁহার আশঙ্কা যে ভ্রান্ত তাহা অল্পদিনের মধ্যেই ব্রাহ্মণী বুঝিতে পারিলেন।

ব্রাহ্মণীর মানসিক উদ্বেগের বিষয় মা-সারদা অনুমান করিতে পারিয়া-ছিলেন, তথাপি ইহার কোন আলোচনা বা প্রতিবাদ তিনি কখনও করেন নাই,—না ভাষায়, না আচরণে।

ব্রাহ্মণীর এবম্বিধ আচরণসম্পর্কে পরবর্ত্তী কালে জিজ্ঞাসিত হইয়া মা-সারদা বলিয়াছেন,—বামনী-ঠাকরুণের আচরণ প্রথম প্রথম কেমন খাপছাড়া মনে হতো, কিন্তু তা'তে আমার মনে কোন ক্ষোভ হয়নি। তিনি-যে ঠাকুরের গুরু-মা গো। আমি তাঁকে নিজের মা আর শাশুড়ী ঠাকরুণের মতই ভক্তি করতুম। আর জেনো মা, সন্তানের মঙ্গলের জন্যই গুরুজনেরা সময় সময় কঠোর আচরণ করেন, গুরুজনের কোন কাজেই দোষ দেখতে নেই।

ব্রাহ্মণীকে মা-সারদা সমীহ করিয়া চলিতেন। একদিন ব্রাহ্মণীর প্রস্তুত ব্যঞ্জন খাইয়া রামেশ্বরের পত্নী বলিয়াছিলেন, ব্যঞ্জনে ঝাল অধিক হইয়াছে। এহেন মন্তব্যে ক্ষুণ্ণ হইয়া ব্রাহ্মণী বধূমাতার মতামত জানিতে চাহিলেন। ঝালের তীব্রতায় অশ্রুপাত করিতে করিতেও বধূমাতা অধো-বদনে বলিলেন, খাইতে ভালই হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণী বধূমাতার প্রশংসা করিলেন।

কোমলপ্রাণা মা-সারদা কাহারও প্রাণে ব্যথা দিতে পারিতেন না এবং কাহারও দুঃখ দেখিলে সমবেদনায় নিজেও ব্যথিত হইতেন। কামারপুকুরে অবস্থানকালে ব্রাহ্মণীর সহিত জনৈক ব্যক্তির কোন বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় উক্ত ব্যক্তি তাঁহার প্রতি রূঢ় আচরণ করেন, মা-সারদা ইহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

তাঁহার সেবাযত্নে ঠাকুরের ভগ্নস্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হইল। ঠাকুরের জন্য তিনি স্বহস্তে লঘুপাচ্য আহার্য্য রন্ধন করিতেন। নিজের স্বাস্থ্য এবং রুচি-অনুযায়ী খাদ্যাদি রন্ধনবিষয়ে ঠাকুরও কখন কখন পত্নী এবং ভ্রাতৃজায়াকে নির্দ্দেশ দিতেন। এমন-কি কিভাবে কোন্ দ্রব্য রন্ধন করিতে হয়, কিভাবে সম্বরা দিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়েও উপদেশ দিতেন। গৃহিণীদিগের গুণপনার কথায় ঠাকুর বলিতেন,—তরকারীতে নুন, আর পানেতে চূণ; অর্থাৎ যার মন ভাল হয়, তার রান্নায় নুন আর পানেতে চূণের পরিমাণও ঠিক হয়। আবার, কি করিয়া পানের খিলি সাজিতে হয়, তাহাও শিখাইয়া দিয়া বলিয়াছেন,—পানের খিলি এমন হবে যে, দূরে

ছুঁড়ে মারলেও খুলে যাবে না। এইভাবে কেবল সংসারযাত্রার দৈনন্দিন ক্ষুদ্র বিষয়েই নহে, পারমার্থিক বিষয়েও উপদেশ দিতেন।

মা-সারদা বলিয়াছেন, ঠাকুরের সঙ্গে কামারপুকুরে এই কয়মাস নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে কাটিয়াছে। কত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ, কত রঙ্গরসের কথা; দিবারাত্র যে কোন্ পথে চলিয়া যাইত, তাহা বুঝিবারও অবসর পাওয়া যাইত না। পার্শ্ববর্ত্তী কত গ্রাম হইতে কত লোক তাঁহাকে দেখিতে, তাঁহার কথা শুনিতে আসিত। তাঁহার কথা শুনিয়া, কীর্ত্তন শুনিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিত। তিনি যেখানেই যাইতেন, যেখানেই থাকিতেন, সাড়া পড়িয়া যাইত, সকলেই আনন্দে বিভোর হইত।

এইসময়ের প্রসঙ্গে "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে" লিখিত হইয়াছে, "পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধি-বিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদর-যত্নলাভে ঐকালে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উল্লসিত হইয়াছিলেন, ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদিগের নিকট তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময়ে এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্ব্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম'—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

কামারপুকুরে ছয়-সাত মাস এইভাবে সকলকে আনন্দ বিতরণ করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মা-সারদাও জয়রামবাটীতে ফিরিয়া গেলেন। পিত্রালয়ে নানাকাজের মধ্যেও তাঁহার চিত্ত ছুটিয়া যাইত পতির চরণপ্রান্তে। পতির কথা, তাঁহার অনাবিল স্নেহযত্ন ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়া তাঁহার অন্তর বিমল আনন্দে পূর্ণ হইত। তিনি অনুভব করিতেন, 'হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট' যেন পূর্ব্বেরই মত স্থাপিত রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কামারপুকুরে আসিয়াও তিনি বাস করিতেন। এইভাবে আরও তিন-চারি বৎসর অতিবাহিত হইল।

•

ইতোমধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আত্মভোলা পতির দিব্যাবস্থার সূত্র ধরিয়া জয়রামবাটীতে কেহ কেহ অনেকরকম কাহিনী রচনা ও রটনা করিতে

লাগিল। কেহ বলিত গদাধরের উন্মাদরোগ হইয়াছে, কেহ-বা সারদাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া অযাচিতভাবে সহানুভূতি জানাইতে আসিত। ইহাতে জননী শ্যামাসুন্দরীর চিত্তের বিক্ষেপ হইত, তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইতেন। গিরিরাণী যেমন পাগল ভোলানাথের সম্বন্ধে নানাবিধ উদ্ভট কাহিনী শ্রবণ করিয়া প্রাণাধিকা উমার ভাগ্যের জন্য দুঃখ করিয়া বলিতেন,

"কত লোকে কত বলে, শুনে প্রাণে ম'রে যাই ;"

জননী শ্যামাসুন্দরীর প্রাণও তেমনই আকুল হইয়া উঠিত। মা-সারদা এইসকল অলীক কাহিনী গ্রাহ্য করিতেন না। পতি উন্মাদ হইয়াছেন, এমন কথা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। তিনি মনে প্রাণে জানিতেন যে, তাঁহার পতি সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে,—তিনি দেবতা। কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্যের জন্য মা-সারদার আশঙ্কা হইত, তবে কি আবার তাঁহার শারীরিক অবস্থার অবনতি হইয়াছে? তিনি কি আহারনিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ ঈশ্বরচিন্তায় বিভোর থাকেন? যদি এইরূপই হইয়া থাকে, এইসময়ে পত্নীর কর্ত্তব্য নিকটে থাকিয়া পতির সেবাযত্ন করা, তাঁহার সন্তোষ বিধান করা, তাঁহার জীবন রক্ষা করা। এইসকল চিন্তা করিয়া অবিলম্বে দক্ষিণেশ্বর যাইবার জন্য মা-সারদার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। কিন্তু দক্ষিণেশ্বর তো নিকটে নহে, অনেক দূরের পথ, যাইবেন কি করিয়া? কিভাবে সেখানে যাইবার ব্যবস্থা হইবে? পতির নিকট যাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ যে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এমন কথা তিনি কি করিয়া মাতাপিতার নিকট বলিবেন? প্রাণের গোপন কথাটি কাহাকেও প্রকাশ করিয়া বলিতে না পারায়, পতির জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল।

অবশেষে অন্তর্য্যামী সুযোগ মিলাইয়া দিলেন।

১২৭৮ সালের দোলপূর্ণিমা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। সেই উপলক্ষে স্বগ্রামবাসী কয়েকজন নরনারী মিলিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবে স্থির করে। তাহাদের দলের এক আত্মীয়ার নিকট তিনিও সঙ্গিনী হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। নিজে এই বিষয়ে মাতাপিতার নিকট প্রস্তাব করিতে

সঙ্কোচ বোধ করায়, সেই মহিলা কন্যার কথা পিতাকে জানাইলেন। ইহাতে অভিপ্রেত ফলও ফলিল। পিতা রামচন্দ্র কন্যার গঙ্গাস্নান-যাত্রার উদ্দেশ্য বুঝিয়া নিজেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

তখন ঐ অঞ্চল হইতে রেলগাড়ী অথবা ষ্টীমারে করিয়া যাতায়াতের সুবিধা ছিল না সুতরাং সকলে দলবদ্ধ হইয়া পদব্রজে তারকেশ্বরের পথে যাত্রা করিলেন। পথ প্রায় ত্রিশ ক্রোশ, পথশ্রমে অনভ্যস্তা নারীর পক্ষে চারি-পাঁচ দিন সময় লাগে।

মা-সারদা দুই ক্রোশের অধিক পথ এযাবৎ কখনও পদব্রজে অতিক্রম করেন নাই। তাঁহার সুকুমার দেহ অল্পকালমধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। মনে অপরিসীম উৎসাহ—অবিলম্বে পতিদেবতার দর্শন লাভ করিবেন; কিন্তু দুই দিন চলিবার পরই তিনি দারুণ জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। পীড়িত কন্যাকে লইয়া বিপন্ন পিতার পথিমধ্যে একস্থানে আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর রহিল না।

মা-সারদার দেহ জ্বরের প্রকোপে দুর্ব্বল ও অবসন্ন, দুঃখবেদনায় ততোধিক ক্লিষ্ট তাঁহার মন; যদি-বা অনেক করিয়া পতির সহিত মিলিত হইবার একটা সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাহাও বুঝি আর সার্থক হইল না। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গভীর রজনীতে একসময় তিনি নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রার মধ্যে দেখিলেন,—অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী এক নারী আসিয়া স্নেহশীতল অমৃতময় স্পর্শে তাঁহার সকল ব্যথা জুড়াইয়া দিয়া গেলেন।

পরবর্ত্তী কালে মা-সারদা এই দিব্য দর্শনের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল—মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই! বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসচ গা?'

রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি।'

"শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐ সব আর হইল না।'

রমণী বলিল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে, তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।'

আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?'

মেয়েটি বলিল, 'আমি তোমার বোন হই।'

আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ!'

ঐরূপ কথাবার্ত্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।" (৩)

ইহার পর যখন মা-সারদা জাগরিত হইলেন, তখন জ্বরের প্রকোপ খুবই কমিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে হইল, দেহের সমস্ত গ্লানিও দূর হইয়াছে। উৎফুল্ল মন দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই অবস্থায় পড়িয়া থাকাও কষ্টদায়ক। দুর্ব্বল দেহ লইয়াই তিনি নূতন উৎসাহে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শীঘ্রই একটি পালকি পাওয়া গেল, তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন।

চারি দিনের সকল বিঘ্ন এবং কষ্ট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে বহুবাঞ্ছিত তীর্থযাত্রা সার্থক হইল। মা-সারদা প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অকস্মাৎ সহধর্ম্মিণীকে উপস্থিত দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—এই-যে! তুমি এসেছো? বেশ করেছো।

কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের মুখে পত্নীর জ্বরের কথা শুনিয়া তিনি একটু ভাবিত হইলেন। ক্ষুদ্র নহবৎ-ঘরে রোগীর বসবাস এবং চিকিৎসার অসুবিধা হইবে বিবেচনা করিয়া নিজের কক্ষেই তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য একজন সেবিকাও নিযুক্ত হইল।

পরদিবস চিকিৎসক আসিয়া মা-সারদাকে পরীক্ষা করিয়া ঔষধপত্রের নির্দ্দেশ দিয়া গেলেন। পতি এবং শ্বশ্রূমাতার যত্নে তিনি অল্পকয়েক

শ্রীশ্রী ভবতারিণীর মন্দির

পঞ্চবটী

মাতাঠাকরাণীর ঘর ও নহবত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ঘর

দিবসের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পতির প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—হায় রে, এমন সোনার মানুষকে লোকে বলে কি-না পাগল!

কন্যা সুস্থ হইলে পিতা রামচন্দ্র কন্যা-জামাতার মিলনে এবং জামাতার আদর-আপ্যায়নে পরম সন্তুষ্ট হইয়া জয়রামবাটীতে ফিরিয়া গেলেন। মা-সারদাও অতঃপর নহবৎ-ঘরে থাকিয়া পতি এবং শ্বশ্রূমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কেবল আত্মনিয়োগ নহে, ইহাকে চরম কষ্ট-সহিষ্ণুতার সহিত পরম আত্মত্যাগ বলিতে হইবে।

কেন, তাহাই বলিতেছি।

নহবতের কক্ষটি নিতান্ত অপ্রশস্ত। তাহার মধ্যেই বিছানাপত্র, চালডাল, তরিতরকারী, থালাবাটি ইত্যাদি সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য। মেঝেতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায়, আরও কতপ্রকার দ্রব্য দড়ির শিকাতে মাথার উপর ঝুলাইয়া রাখা হইত। একটু অসাবধান হইয়া চলিলেই মাথায় আঘাত লাগে, কখনও মাথায় লাগিয়া কষ্টে সংগৃহীত দ্রব্যাদি পড়িয়া ভূমিতে লুটায়। এই কক্ষেই এবং অবস্থাবিশেষে সিঁড়ির নীচেও রন্ধন হইত। ভোজনান্তে আবার ধুইয়া মুছিয়া সেই কক্ষমধ্যেই শয়নের ব্যবস্থা। তদুপরি, সময় সময় জয়রামবাটী এবং কামারপুকুর হইতে আত্মীয় অনাত্মীয় নরনারী নিজ নিজ কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে তাঁহাদেরই নিকট আশ্রয় লইত। মা-সারদা কখন কাহাকেও বিমুখ করিতেন না।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীলা। কেহ তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, এই আশঙ্কায় দিবাভাগে ঐ কক্ষ হইতে বাহির হইতেন না। অন্ধকার থাকিতেই নিত্যকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সেই-যে কক্ষে প্রবেশ করিতেন, পুনরায় বাহিরে আসিতেন রাত্রিকালে।

এইরূপ অবস্থায় তিনি পূর্ব্বে কখনও বাস করেন নাই। পল্লী-অঞ্চলে প্রচুর আলোবাতাসের মধ্যে থাকিতেন, সুতরাং অল্পপরিসর এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে কত অসুবিধা ও কষ্ট সহ্য করিয়া যে তাঁহাকে দিনের

পর দিন, মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না, ভাবিতেও প্রাণে ব্যথা লাগে।

একে তো স্থানাভাব, তাহার উপর কায়িক পরিশ্রম, আবার অনেকসময় লোকাভাব এবং কদাচিৎ অর্থাভাবেও প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটিত। ইহা সত্ত্বেও মা-সারদা অম্লানবদনে এবং তৎপরতার সহিত সকলপ্রকার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। কোনপ্রকার অভাব বা অস্বাচ্ছন্দ্য তাঁহার সদাপ্রসন্ন চিত্তকে কখনও কাতর করিতে পারে নাই। নিজের সুখসুবিধার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, কায়মনো-বাক্যে ঠাকুরের সন্তোষবিধান করাই ছিল তাঁহার পরম কাম্য।

কত নিষ্ঠাসহকারে তিনি ঠাকুরের ভোগ রন্ধন করিতেন! বলিতেন, —যখন আমি ঠাকুরের জন্য রান্না করতুম, ভগবানের নাম মনে মনে জপ করতুম। উনি তো সামান্য নন, ভগবানেরই ভোগ রাঁধছি।

নিজের দেহবিষয়ে ঠাকুর চিরকাল উদাসীন ছিলেন। কঠোর সাধনার ফলে সময় সময় তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিত; ইদানীং পাকাশয়ের গোলযোগে ভুগিতেছিলেন। কি প্রকার খাদ্য তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর এবং কোন্ দ্রব্যসহযোগে প্রস্তুত করিলে তাহা রুচিকর হইবে, একমাত্র মা-সারদাই তাহা জানিতেন। সেইসকল দ্রব্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। অনেকসময় তাহা সংগ্রহ করা অনায়াসসাধ্য হইত না। আহারের সময় ঠাকুর শিশুর ন্যায় নানাবিধ আবদার-আপত্তি জানাইতেন, পর্য্যাপ্ত আহার করিতেন না। মা-সারদা অতিশয় যত্নসহকারে এবং অনেক অনুরোধ ও কৌশলে তাঁহাকে আহার্য্য গ্রহণ করাইতেন।

পরবর্ত্তী কালে একদিন ভোজনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ জনৈক ভক্তকে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন,—আমার মত লোকের স্ত্রী কেন প্রয়োজন, জান? নিজেই স্মিতবদনে ইহার উত্তর দিলেন,—এই দেখছো না, আমার পেটে যা' সয়, এমনসব খাবার ইনি না থাকলে, এমন যত্ন ক'রে কে আমায় রেঁধে খাওয়াতো? কে এই দেহের যত্ন করতো, বল তো?

নহবতের ক্ষুদ্র কক্ষে পত্নীর যে কত অসুবিধা এবং তিনি যে একান্ত-ভাবে তাঁহারই সেবাযত্নের জন্য ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, ঠাকুর তাহা অনুভব করিতেন। এইজন্যই একদিন তিনি বলিয়াছিলেন,—এভাবে খাঁচার ভেতর দিনরাত ব'সে থাকলে শেষে-যে বাতে ধরবে গো। দুপুর-বেলা পাড়ার গেরস্ত ধোঁদের বাড়ী বেড়িয়ে এসো। অতঃপর ঠাকুরের আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে যখন পথঘাট জনবিরল হইত, মা-সারদা কোন কোন দিন প্রতিবাসিনীদের বাড়ীতে যাইতেন।

রাণী রাসমণি অনেককাল পূর্ব্বেই স্বর্গতা হইয়াছিলেন, মন্দিরের পরবর্ত্তী পরিচালক সেজবাবু অর্থাৎ মথুরানাথও কয়েকমাস পূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিলে অবশ্যই কিছু উত্তম ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহারই প্রশংসাচ্ছলে মা-সারদার অসুস্থতার সময় একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—তুমি যদি এলেই, এত দেরী ক'রে কেন এলে? আমার সেজবাবু কি আর বেঁচে আছে, তেমনভাবে কে তোমায় সেবাযত্ন করবে?

•

মা-সারদা বিবাহের পর যখন কামারপুকুরে গিয়াছিলেন, স্নেহময়ী চন্দ্রমণি তখন অর্থাভাবহেতু পুত্রবধূকে অলঙ্কার দিতে না পারিয়া দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—মাগো! আমি তোমার সোনার অঙ্গে গয়না পরাতে পারলাম না বটে, আমার গদাই তোমাকে গয়না পরাবে।

মা-সারদা দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পর শ্বশ্রূমাতার সেই পুরাতন প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত হয়। ঠাকুর যে-সময়ে সখীভাবের সাধনা করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার অঙ্গসজ্জার জন্য মথুরানাথ কয়েকখানি অলঙ্কার দিয়াছিলেন। তাহা ঠাকুর এইক্ষণে মা-সারদাকে দিলেন। ঠাকুর একদিন পঞ্চবটীতে সীতাদেবীকে দর্শন করেন,—হাতে তাঁহার ডায়মণ্ডকাটা বালা। সেইরূপ সোনার বালা এবং আরও দুই-একখানি নূতন অলঙ্কারও তিনি পত্নীকে দিয়াছিলেন।

ইহার পরও যখন ঠাকুরের সখীভাবে সাজিবার অভিলাষ হইত

মা-সারদা সেইসকল অলঙ্কার এবং সুন্দর বস্ত্রাদিদ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া দিতেন। কঠোর সাধনায় এবং আহারনিদ্রার অনিয়মে ঠাকুরের দেহের উজ্জ্বল গৌর বর্ণ পরবর্ত্তী কালে কতকটা ম্লান হইয়া গিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে সোনার অলঙ্কার পরাইয়া দিলে দেহের বর্ণ এবং সোনার বর্ণে প্রভেদ ধরা যাইত না। ঠাকুরের নির্দ্দেশানুসারে মা কৃত্রিম কবরীবন্ধনও করিয়া দিতেন। এইরূপে নারীবেশে সজ্জিত হইয়া ঠাকুর মন্দিরে যাইয়া ভবতারিণীকে চামরদ্বারা ব্যজন করিতেন। নারীর বেশ ধারণ করিলে তাঁহাকে সুন্দর মানাইত, অনেকে তাঁহাকে পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারিত না। কোনদিন মন্দির জনশূন্য থাকিলে, অবগুণ্ঠনবতী মা-সারদাও মন্দিরে গিয়া সেই দৃশ্যদর্শনে আনন্দ পাইতেন।

দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পর ঠাকুর একদিন মা-সারদাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—তুমি কি আমায় মায়ায় আবদ্ধ করতে এসেছো?

—না, তা' কেন? আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তোমাকে ধর্ম্মপথে সহায়তা করতেই কাছে এসেছি।

ধনী মাড়োয়ারী-ভক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ যখন ঠাকুরের সেবার উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন, তখন ঠাকুর যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠেন,—টাকা···কাঞ্চন···অবিদ্যা? মাগো, তুই একি করলি?···

লক্ষ্মীনারায়ণ ভক্ত হইলেও ব্যবসায়ী, তিনি ধীরে ধীরে ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিলেন,—সাধুমহাত্মাদিগের পক্ষে অর্থগ্রহণ ধর্ম্মহানিকর হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেবার জন্যও তো অর্থের প্রয়োজন হয়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। তিনি নিজে নাই-বা গ্রহণ করিলেন, যাঁহারা তাঁহার সেবাযত্ন করেন তাঁহাদিগের নামে এই সাধুসেবার অর্থ গচ্ছিত থাকিতে পারে।

তাঁহার এই নিবেদন ঠাকুর সময়ান্তরে মা-সারদাকে জানাইলেন,—ওগো, লক্ষ্মীনারান মাড়োয়ারী দশ হাজার টাকা আমায় দিতে এসেছিলো।

তা,' আমি তো আর টাকা লই না। তোমার নামে সে কোম্পানীর কাগজ কিনে দিতে চাইছে, তাই থেকে বছর বছর অনেক টাকা সুদ পাওয়া যাবে, তা'তে তোমার খরচ চ'লে যাবে। বেশ হবে, কি বল তুমি ?

মায়ের শ্রীমুখের উত্তর,—সে কি হয় ? আমি নিলেও তোমারই নেওয়া হবে, সে-টাকা তোমার সেবাতেই খরচ হবে। তুমি যে-টাকা নেবে না, আমি তা' কি ক'রে নেবো ? ও টাকা আমাদের চাই না।

মা-সারদার পক্ষে এইরূপ উত্তরই স্বাভাবিক। যেমন ঠাকুর, তেমনই ঠাকুরাণী। সংসারের প্রয়োজন একপ্রকার চলিয়া যাইত সত্য, কিন্তু সচ্ছলতার মধ্যে অবশ্যই নহে। সেই অবস্থায় দশ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যান তুচ্ছ কথা নহে।

পত্নীর কঠোর আদর্শ এবং বৈরাগ্যের পরিচয় পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চিন্ত এবং প্রসন্ন হইলেন। পত্নীর অন্তরের এই ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যক জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন; এবং এমন শ্রদ্ধা করিতেন, যাহা পতিপত্নীর মধ্যে দেখা যায় না।

এইস্থানে কয়েকটিমাত্র ঘটনার উল্লেখ করিতেছি:

মা-সারদা একদিন কর্ম্মোপলক্ষে ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তিনি মুদ্রিত নয়নে শয্যায় শায়িত আছেন। কর্ম্মান্তে নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহার পদশব্দে মনে করিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মীমণি কোন কাজে ঘরে আসিয়াছে; বলিলেন,—যাবার সময় দোরটা ভেজিয়ে দিস।

মা-সারদা বলিলেন,—হ্যাঁ, দিচ্ছি।

তাঁহার কণ্ঠস্বরে ঠাকুর বুঝিতে পারিলেন,—ইনি পত্নী, ভ্রাতুষ্পুত্রী নহে। পত্নীকে তিনি কখনও 'তুই' সম্বোধন করিতেন না। এখন লক্ষ্মী মনে করিয়া 'তুই' বলিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাতে তিনি মনে মনে বড়ই লজ্জিত হইয়া অনুনয়ের সুরে বলিলেন,—ওঃ তুমি! ভেবেছিলাম লক্ষ্মী বুঝি, ভুলে 'তুই' ব'লে ফেলেছি। তা' তুমি কিছু মনে করোনি কিন্তু,

আমি জেনে শুনে অমন বলিনি। এইধরণের কথা শুনিয়া মা-সারদা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন,—ওমা শোন কথা, আমি কী আবার মনে করবো? কিছু অন্যায় হয়নি এতে। এই বলিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

অন্যায় হয় নাই সত্য, কিন্তু তিনি যে পত্নীর প্রতি অসম্ভ্রমসূচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, এই বিষয় চিন্তা করিয়া রাত্রিতে তাঁহার নিদ্রা হইল না। এইখানেই শেষ নহে, প্রাতঃকালে নহবতে গিয়া পত্নীর নিকট পুনরায় ত্রুটিস্বীকার করিলেন,—তোমাকে অমন অশিষ্ট সম্বোধন ক'রে অশান্তিতে রাত্রে আমার ঘুম হয়নি, তুমি সত্যই অসন্তুষ্ট হওনি তো?

সামান্য একটা তুচ্ছ কথাকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়া পতি সারারাত্রি কষ্ট পাইয়াছেন, ইহাতে মা মনে মনে আহত হইলেন। মুখের হাসিতে কথাটা উড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—এসব কি বলছো তুমি? এতে অন্যায়টা কি হয়েছে? আমিই-বা অকারণে তোমার ওপর অসন্তুষ্ট হ'তে যাবো কেন? অমন ক'রে আমায় আর লজ্জা দিও না।

দৈনন্দিন ব্যাপারে যাহাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় না হয়, এই বিষয়ে আলোচনা-কালে পত্নীকে একদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—বাড়াবাড়ি কিছুরই ভাল নয়, সকল অবস্থাতেই বিচার ক'রে কাজ করতে হয়। মা-সারদা কোনদিন ঠাকুরের কোন কার্য্যের সমালোচনা বা প্রতিবাদ করেন নাই, এইদিনও করিলেন না। তিনি নীরবে নহবৎ-ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। পরে ঠাকুরের মনে হইল, এইভাবের উপদেশে হয়তো পত্নী ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, মনে ব্যথা পাইয়াছেন। এইরূপ মনে হইতেই তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে বলিলেন,—ও রামনাল, শিগ্যির গিয়ে তোর খুড়ীকে শান্ত কর, তিনি অসন্তুষ্ট হ'লে আমার রক্ষে নেই।

একদিন ভাগিনেয় হৃদয়রাম মা-সারদাকে অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মা তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া ক্ষুন্নমনে নিজকক্ষে চলিয়া যান। ঠাকুর তখন ভাগিনেয়কে বুঝাইয়া বলিলেন,

—ও হৃদু, তোর কল্যাণের জন্যেই বলছি বাবা, আমাকে উপেক্ষা কর, অপমান কর, তা'তে তোর ক্ষতি নাও হ'তে পারে। কিন্তু সাবধান, ওর মনে দুঃখু দিসনি ; ও রাগলে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও তোকে রক্ষে করতে পারবে না।

•

সাধারণ বুদ্ধির ব্যক্তিরা দূর হইতে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া পত্নীর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উদাসীনতা সম্বন্ধে যেরূপ বিপরীত ধারণাই পোষণ করুক না কেন, তিনি পত্নীকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন এবং নিবিড়-ভাবে ভালও বাসিতেন। এইপ্রকার কথা মায়ের শ্রীমুখে আমরা শুনিয়াছি, অন্তরঙ্গগণের নিকটও শুনিয়াছি।

মায়ের সঙ্গিনী গৌরীমা বলিয়াছেন, "এই যে দুজনের, মাত্র পনর বিশ হাত দূরে থেকেও, কখনও কখনও ছমাসেও হয়ত একদিন দেখা নেই, তবু দুজনে ভাবই ছিল কত! দেখেছি, একদিন মায়ের মাথা ধরেছে, ঠাকুর তাই শুনে মহা ব্যস্ত হয়ে বারবার রামলাল•দাদাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ওরে রামনাল, মাথা ধরল কেন রে?" (৪)

তাঁহাদিগের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা কত যে গভীর ছিল এবং তাহা যে কত বিশুদ্ধ হইতে পারে, তাহারই অগ্নিপরীক্ষায় এইবার তাঁহারা অগ্রসর হইলেন।

অবিশ্বাসী লোক শ্রীরামকৃষ্ণের সাধুতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে একাধিকবার কৌশল করিয়া তাঁহাকে ছলনাময়ী নারীদের সংসর্গে ফেলিয়া দেখিয়াছে, তাঁহার চিত্তের বিকার হয় নাই, তিনি ইন্দ্রিয়জয়ী পুরুষ। কিন্তু ইহা তো অন্যের পরীক্ষা। এইবার তিনি নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন যে, শাস্ত্রসম্মতভাবে যাঁহাকে তিনি পত্নীত্বে স্বীকার করিয়াছেন, স্বগৃহে যিনি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই আয়ত্তে রহিয়াছেন, সেই পত্নীর আকর্ষণে তাঁহার চিত্তের বিকার হয় কি-না, অথবা পত্নীই তাঁহাকে ভোগের পথে আকর্ষণ করেন কি-না, এবং আকর্ষণ করিলে তাঁহার আত্মরক্ষার প্রবল শক্তি আছে কি-না।

ব্রহ্মচর্য্য এবং পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি মা-সারদাও পতির এইপ্রকার পরীক্ষার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন, শঙ্কিত হইলেন না। পতির আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নহবৎ হইতে মা-সারদা পতির কক্ষে যাইয়া একাদিক্রমে দীর্ঘকাল রাত্রিযাপন করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহিত পতিপত্নী হইয়াও তাঁহাদিগের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ কখনও ঘটে নাই। এই সাফল্যের কৃতিত্ব কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের একার নহে, মা-সারদারও অবশ্যই।

স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে এই সময়ের বর্ণনায় লিখিয়াছেন, "পূর্ণযৌবন ঠাকুর ও নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানবহৃদয় স্বতঃই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানুষের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে একক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।" (৩)

ইন্দ্রিয়সংযমের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায় কি রকম ক'রে? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ করতে হয়।··· তা' না হ'লে পরিবারকে আটমাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন করে? দুজনেই মার সখী।" "যত স্ত্রীলোক শক্তিস্বরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হ'য়ে, স্ত্রীরূপ ধ'রে রয়েছেন।" "সেই আদ্যাশক্তির পূজা ক'রতে হয়, তাঁকে প্রসন্ন ক'রতে হয়, তিনিই মেয়েদের রূপধারণ ক'রে রয়েছেন। তাই আমার মাতৃভাব।" (১)

পতির পদসেবা করিতে করিতে পত্নী একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলেন, "মন্দিরে

যে মায়ের পূজা হয়, সেই মা-ই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন এবং আজকাল নহবতে বাস করিতেছেন। আবার তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। আনন্দময়ী মায়ের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বলিয়াই তোমাকে সর্ব্বদা দেখিয়া থাকি।"

পত্নীও পতিকে নানাভাবে দর্শন করিয়াছেন,—দেবপতিজ্ঞানে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, নিজেকে বিশ্বজননীবোধে তাঁহাকে সন্তানবৎ স্নেহ করিয়াছেন, আবার পতিদেহে মা-কালীর রূপও তিনি দর্শন করিয়াছেন।

একদিবস ঠাকুরের ভোজনকালে তিনি নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার হস্ত নিশ্চল হইয়া আসিল, বিস্মিত হইয়া তিনি পতির বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভূমিনত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। ইহাতে ঠাকুর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন,—কি গো, এমন অসময়ে প্রণাম?

মা-সারদা কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

ঠাকুর পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন,—কি হয়েছে বল-না গো?

এইবারও মা নিরুত্তর রহিলেন।

বালকস্বভাব ঠাকুরের কৌতূহল বৃদ্ধি পায়, ভোজন বন্ধ রাখিয়া তিনি তৃতীয়বার বলিলেন,—সে হবে না, কি হয়েছে তোমায় বলতেই হবে।

অগত্যা মা বলিলেন,—আমি দেখলাম কি, তুমি তো খাচ্ছ, তোমার কাঁধ পর্য্যন্ত তোমার দেহই রয়েছে, কিন্তু তার ওপরে মা-কালীর মাথা, আর তা'তে সোনার মুকুট ঝলমল করছে। তোমার হাত দিয়ে মা-কালীই খাচ্ছেন।

ঈষৎ হাসিয়া ঠাকুর বলিলেন,—ঠিকই দেখেছো তুমি।

অলৌকিক তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলী, অনুপম তাঁহাদিগের চরিত্র, আর অপূর্ব্ব তাঁহাদিগের সাধনা। প্রাকৃত নরনারীর দাম্পত্যজীবনের বহু ঊর্দ্ধে ঠাকুরের সহিত মা-সারদার সম্বন্ধ—দেবদুর্লভ বস্তু।

সুরভিত কুসুম দেবতার পূজায় নিজেকে নিবেদিত করিয়া সার্থক হয়। ব্রজের রাধারাণী নিজের দেহ এবং প্রাণ শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্ত্যর্থে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া—নিজের পৃথক সত্তা ভুলিয়া—প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়াছিলেন। মা-সারদাও তাঁহার অভীষ্টকে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াই পূর্ণ, তাঁহার সহিত অভিন্ন এবং একাত্মা।

নারীতে মাতৃভাব এবং পত্নীতে ব্রহ্মময়ীভাব উপলব্ধি করিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে আর এক সংকল্পের উদয় হইল এবং তিনি চাহিলেন সেই উপলব্ধিকে পূর্ণতা দিতে। স্থির করিলেন, পরবর্ত্তী অমাবস্যা তিথিতে সর্ব্বকর্ম্মফল-বিনাশিনী শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে প্রত্যক্ষ জগজ্জননীজ্ঞানে পত্নীকে ষোড়শী-পূজা করিবেন; সাধনা, সিদ্ধি, সর্ব্বস্ব সেই দেবীর চরণে সমর্পণ করিবেন। কালীমন্দিরে ঐ পুণ্যদিবসে অধিক জনসমাগম হইবে জানিয়া, তাঁহার নিজকক্ষেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে পূজার আয়োজন করা হইল। মা-সারদাকে যথাকালে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ আহ্বান জানাইলেন।

অমাবস্যার তমোময়ী রজনী। সম্মুখে কলনাদিনী পূতসলিলা ভাগীরথী, অদূরে সিদ্ধপীঠ পঞ্চবটী এবং মাতৃমন্দির। পূজাপ্রকোষ্ঠ ধূপ-গুগ্‌গুল এবং পুষ্পচন্দনের দিব্য সৌরভে আমোদিত। পূজক একখানি আসনে উপবিষ্ট, বদনমণ্ডল তাঁহার দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত। তাঁহার সভক্তি আহ্বানে আরাধ্যা দেবী মা-সারদা ধীরপদক্ষেপে পার্শ্বস্থিত আলিম্পন-চিত্রিত পীঠের উপরে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অধিষ্ঠিত হইলেন। কোন জিজ্ঞাসা নাই,—নির্ব্বাক, ভাবাবিষ্ট।

পূজক মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পূত গঙ্গোদকে দেবীর অভিষেক করিলেন। তাঁহাকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া দিলেন। চরণযুগল রঞ্জিত করিলেন অলক্তকরাগে, হস্তদ্বয় শোভিত করিলেন শঙ্খ ও সুবর্ণবলয়ে, সিন্দূরবিন্দু পরাইয়া দিলেন ললাটে। কণ্ঠে দোলাইয়া দিলেন সুবাসিত পুষ্পমাল্য।

অতঃপর তদ্গতচিত্তে পূজক ষোড়শোপচারে পরমা প্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার যথাবিধি পূজা করিলেন। নিবেদিত ভোজদ্রব্যের কিঞ্চিৎ দেবীর শ্রীমুখে প্রদান করিলেন, বিল্বপত্রে নিজের নাম লিখিয়া দেবীর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলেন।

অমিতশক্তিসম্পন্না 'সহধর্ম্মিণী তাহাতে আপত্তি করিলেন না, জগজ্জননীরূপে পতির সেই পূজা গ্রহণ করিলেন। অর্দ্ধবাহ্যজ্ঞানও তিরোহিত হইল,—তিনি সমাধিতে নিমগ্ন।

পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণ সহধর্ম্মিণীর চরণযুগলে রুদ্রাক্ষের মালা ও ইষ্ট-দ্রব্যাদির সহিত আত্মনিবেদন করিলেন, সচন্দন-পুষ্পপত্র অঞ্জলি দিয়া ভক্তিভরে দেবীর চরণসরোজে প্রণাম করিলেন।

অতঃপর 'মা-মা-মা' বলিয়া তিনি গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

"পূজ্য পূজকেতে দুয়ে, ভাবরাজ্য তেয়াগিয়ে,
ভাবাতীতে একত্রে মিলন।" (২)

দৈবযোগ

ষোড়শীপূজার কয়েকমাস পরে মাতাঠাকুরাণী দক্ষিণেশ্বর হইতে দেশে গমন করেন। এই বৎসর ঠাকুরের মধ্যম সহোদর রামেশ্বর এবং মাতাঠাকুরাণীর পিতৃদেব রামচন্দ্রও পরলোকগমন করেন।

মাতাঠাকুরাণী পিতার অত্যন্ত আদরের সন্তান ছিলেন। তিনিও স্নেহময় পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহার পরলোকগমনে খুবই ব্যথিত হইলেন। সংসারেও নানাবিধ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল; কিন্তু উদাসীন স্বামী ও বৃদ্ধা শ্বশ্রূমাতার সেবার অসুবিধা হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া তিনি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন।

ইহার বৎসরাধিককাল পরে ঠাকুর কঠিন আমাশয় রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। মাতাঠাকুরাণী সেবাদক্ষতায় সত্বর তাঁহাকে নিরাময় করিলেন, কিন্তু নিজে শীঘ্রই ঐ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলেন। রোগের উপশম হইলে, জননীর আহ্বানে তিনি জয়রামবাটী গমন করেন। দুঃখের বিষয়, ঐস্থানে যাইবার পর ব্যাধি পুনরায় প্রবলাকার ধারণ করায় জটিল উপসর্গসমূহ প্রকাশ পাইতে লাগিল। দেহে রক্তাল্পতা এবং জলসঞ্চার হইল, চক্ষু হইতে সর্ব্বক্ষণ জলধারা বহিত। দেহ অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় তাঁহার জীবনসম্বন্ধে সকলের শঙ্কা জাগিল।

সহধর্ম্মিণীর সঙ্কটজনক অবস্থার সংবাদ পাইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইলেন,—তাইতো, কত কাজ অসমাপ্ত প'ড়ে রইল, আর এখনি চ'লে যাবে? দায় কি শুধু আমার একার!

আর্থিক অনটন সত্ত্বেও জননী এবং ভ্রাতৃগণ মাতাঠাকুরাণীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার কোন ত্রুটি করেন নাই; কিন্তু চিকিৎসায় কোন উপকার হইল না। মা তাহাতে আস্থা হারাইয়া স্থির করিলেন, মানুষের চেষ্টা তো অনেক হইয়াছে, এইবার জগদম্বার চরণে সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ভালমন্দ যাহা তাঁহার ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

দেবী সিংহবাহিনী

গ্রামের দেবী সিংহবাহিনীর করুণার উপর নির্ভর করিয়া তিনি তথায় পড়িয়া রহিলেন। অবিলম্বে দেবীর প্রত্যাদেশ হইল এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুযায়ী দেবীস্থানের মাটি ও সাধারণ লতাপাতা ব্যবহার করিয়া অত্যল্পকালমধ্যে মা দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিলেন।

তাঁহাকে নিমিত্ত করিয়া জয়রামবাটীর সিংহবাহিনী দেবী যে সত্যই অভীষ্টদাত্রী, তাহা লোকমুখে প্রচারিত হইতে লাগিল। তদবধি দূরদূরান্তর হইতেও লোক আসিয়া দেবীর নিকট মনস্কামনা জানায়, পূজা দেয়।

দেবী চন্দ্রমণি

মাতাঠাকুরাণী যখন অসুস্থ হইয়া জয়রামবাটীতে ছিলেন, সেই সময়ে চন্দ্রমণি দেবী দক্ষিণেশ্বরে অন্তিমশয্যায় শায়িত। শ্রীরামকৃষ্ণ সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীন হইলেও জননীর সন্তোষবিধানে আজীবন যত্নবান ছিলেন, বিশেষ করিয়া এইসময় তিনি স্বহস্তে তাঁহার সেবা করিবার অধিক সুযোগ পাইলেন। অন্তিম মুহূর্ত্তে মাতৃভক্ত পুত্রকর্ত্তৃক সচন্দনপুষ্পে অর্চ্চিত হইয়া সৌভাগ্যবতী চন্দ্রমণি ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

সেদিন ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া, ১২৮২ সাল।

এমনই এক পুণ্যতিথিতে রত্নগর্ভা চন্দ্রমণি গদাধরকে স্বীয় অঙ্কে ধারণ করিয়াছিলেন। আজ অনুরূপ শুভ তিথিতেই তাঁহার হৃদয়ের পরমধনকে বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গ করিয়া তিনি অভীপ্সিত লোকে প্রস্থান করিলেন। প্রীতি, কল্যাণ ও সরলতার প্রতিমূর্ত্তি মাতা চন্দ্রমণি, তুমি ধন্য! আবার আসিও মা। দুঃখদৈন্য-পাপতাপ-ভরা ধরার পথভ্রান্ত মানবকুলকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে, যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত গ্লানি দূর করিয়া 'ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায়' এবং 'জগদ্ধিতায়,' যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা জাগিবে, সেদিন আবার আসিও মা।

স্বর্গের দেবমাতা অদিতি, অযোধ্যার কৌশল্যা এবং নদীয়ার শচীমাতার

ন্যায় তুমি স্নেহকোমল বক্ষে পীযূষধারা লইয়া আমাদের এই তৃষ্ণার্ত্ত ধরায় আসিয়া অপেক্ষায় থাকিও,—কোন্ শুভক্ষণে তোমার পুণ্য ক্রোড় উজ্জ্বল করিতে এই দেবমানবের পুনরাবির্ভাব হইবে। তাহারই পূর্ব্বাভাসরূপে আবার আসিও মা তুমি।

দেবী জগদ্ধাত্রী

মাতাঠাকুরাণীকে এইবার অনেকদিন জয়রামবাটীতে থাকিতে হইল। কর্ম্মকুশল রামচন্দ্রের অবর্ত্তমানে শ্যামাসুন্দরীর সংসারে তখন অসচ্ছল অবস্থা। কিন্তু তিনি ছিলেন শক্তিমতী নারী, বুদ্ধিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিয়া কোনপ্রকারে তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। অবস্থাপন্ন প্রতিবাসীদের গৃহে ধান সিদ্ধ করিয়া এবং ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া তাহার বিনিময়ে তিনি কিছু কিছু ধানচাল পাইতেন। উৎসবাদিতে রন্ধন করিয়াও কিছু অন্নের সংস্থান হইত। ব্রাহ্মণের কন্যা হইলেও, এইসমস্তকে তিনি হীন কার্য্য মনে করিতেন না। মাতাঠাকুরাণীও সাংসারিক কার্য্যে অসহায়া জননীকে নানাভাবে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের গৃহে জগদ্ধাত্রীপূজা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে সাংসারিক অবস্থার সচ্ছলতা আরম্ভ হয়। এই পূজার এক অলৌকিক ইতিহাস আছে।

অনেকস্থানেই এইরূপ প্রথা আছে যে, কোন গৃহস্থ পৃথকভাবে পূজা করিতে না পারিলে তাহারা পল্লীর বারোয়ারি পূজায় অথবা কোন প্রতিবাসীর গৃহে পূজা হইলে সেইস্থানে নৈবেদ্য, দক্ষিণাদি পাঠাইয়া থাকে। মূল পূজা সমাপ্ত হইলে পুরোহিত পৃথক পৃথক পূজাদাতার নামে সংকল্প করিয়া তাহাদের নৈবেদ্যাদি দেবতাকে নিবেদন করেন।

একবার জয়রামবাটীর এক কালীপূজায় শ্যামাসুন্দরী এইভাবে পূজা-স্থলে নৈবেদ্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পূজার কর্ত্তৃস্থানীয় ব্যক্তির সহিত ছিল তাঁহাদের পারিবারিক মনোমালিন্য, সুতরাং নৈবেদ্য প্রত্যাখ্যাত হইল। একে প্রকাশ্যে অপমান, তদুপরি দেবীপূজার বিঘ্ন, ইহাতে

হয়তো তাঁহার সংসারে কোন অমঙ্গল হইতে পারে। প্রত্যাখ্যানের আঘাত শ্যামাসুন্দরীর হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। গরীব মানুষ, কত কষ্টে পূজার দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা মা-কালীর ভোগে লাগিল না। ক্ষোভে ও দুঃখে শ্যামাসুন্দরী আহারনিদ্রা ত্যাগ করিলেন। ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মা-কালীর উদ্দেশে জানাইতে লাগিলেন,—মাগো, দুখিনী বিধবার পূজো তুমি নিলে না!

রজনীশেষে নিদ্রাভিভূত হইয়া স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে ডাকিতেছে। সারা ঘরখানি আলো করিয়া দ্বারদেশে এক রক্তবর্ণা ঠাকুরাণী একখানি চরণ অন্য চরণের উপর রাখিয়া সহাস্যবদনে বসিয়া আছেন।

ঠাকুরাণী স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন,—কি হয়েছে গো তোমার? অমন ক'রে কাঁদছো কেন?

শ্যামাসুন্দরী ব্যথাজড়িতকণ্ঠে বলেন,—কাঁদবোনি? মা-কালীর পূজোর নৈবিদ্যি আমার ফিরিয়ে দিলে ওরা, আমি এখন কি করবো বল তো?

—কি হয়েছে তা'তে? মা-কালীর ভোগ আমি খাবো। তুমি কেঁদো না।

—তুমি কে মা?

—আমি? এই-যে গো, এর পরেই যা'র পূজো আসছে। তুমি এই দিয়েই ভোগ দিও। আমি এসে খাবো।

নিদ্রাভঙ্গে শ্যামাসুন্দরীর প্রাণে নূতন আশা-উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাঁহার দীনভবনে জগদ্ধাত্রীর পূজা এইবার করিতেই হইবে। দীনভাবেই আয়োজন চলিল। জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিতে এক পুত্রকে পাঠাইলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—বেশ তো, মা-জগদ্ধাত্রীর পূজো করবি, ভালই হবে তোদের।

দেবী যেমন অযাচিতভাবে আসিয়া করুণা দেখাইলেন, তেমনই অযাচিতভাবে জয়রামবাটী গ্রামে এক মৃৎশিল্পী আসিয়া শ্যামাসুন্দরীর গৃহে উপস্থিত হইল। প্রতিমানির্ম্মাণের কথা শুনিয়া শ্যামাসুন্দরী অবাক, লোকটা বলে কি! কত চেষ্টা, কত কষ্ট করিয়া পূজার আয়োজন হইতেছে,

তাহার উপর আবার প্রতিমা ! টাকা কোথা হইতে আসিবে ? কে তাহাকে প্রতিমা গড়িতে ডাকিয়াছে ? আমরা তো কাহাকেও কিছু বলি নাই।

সে জানাইল, একজন মেয়েমানুষ গিয়া এই বাড়ীর জগদ্ধাত্রী-প্রতিমা গড়িতে তাহাকে বলিয়া আসিয়াছে। যাঁহার পূজা, তাঁহারই ব্যবস্থা। মৃৎশিল্পী মায়ের প্রতিমা গড়িবেই ; অবশেষে প্রতিমাও নির্ম্মিত হইল। শ্যামাসুন্দরীর গৃহে সমারোহের সহিত জগদ্ধাত্রী-পূজা সম্পন্ন হইল।

পরের বৎসর শ্যামাসুন্দরী আবার পূজার অভিলাষ প্রকাশ করিলে মাতাঠাকুরাণী বলিলেন,—একবার হয়েছে, বেশ। আমাদের পক্ষে বছর বছর পূজো করা তো সম্ভব নয়।

ইহাতে শ্যামাসুন্দরী নিরুৎসাহ হইলেন, দুঃখিতও হইলেন।

নিস্তব্ধ রজনী, পৃথিবী নিদ্রায় অচেতন। দেবী এইবার আসিয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু একাকিনী নহেন, সঙ্গে আরও দুইজন আছেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—আমরা কি তবে চ'লে যাবো ?

সবিস্ময়ে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমরা কা'রা বট গো ?

প্রধানা বলিলেন,—আমি জগদ্ধাত্রী। তুমি যে আমার পূজো করবে না বলেছ !

মাতাঠাকুরাণী কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন,—ওমা, সে কি কথা ! তোমরা কোথায় যাবে ? না, না, তোমরা যাবে কেন মা ? আমি তো তোমাদের যেতে বলিনি। তোমরা এখানেই থাক।

সেই হইতে মায়ের বাটীতে প্রতিবৎসর দুই পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া দুই সখীসহ দেবী জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা চলিতে লাগিল।

ডাকাত-বাবা

একবার জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে আরামবাগ ও তারকেশ্বরের মধ্যপথে 'ডাকাত-বাবা'র সহিত মাতাঠাকুরাণীর সাক্ষাৎ হয়। ডাকাত-বাবার উপাখ্যানটি বলিয়া মা আনন্দ পাইতেন, কিন্তু তাহা শুনিতে শুনিতে ভয়ে আমাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইত।

জয়রামবাটী হইতে দক্ষিণেশ্বরে মাতাঠাকুরাণীকে একাধিকবার পদব্রজে আসিতে হইয়াছে। তাঁহার সুকুমার দেহ, দ্রুতবেগে চলিতে পারিতেন না। সঙ্গীরা অগ্রসর হইয়া যাইতেন, তিনি ধীরগতিতে সকলের পশ্চাতে চলিতেন। এই কারণে অনেকসময় তাঁহাকে একাকিনী চলিতে হইত। অগ্রগামী সঙ্গীরা যখন পথিমধ্যে বিশ্রাম করিতে বসিতেন, সেই অবসরে তিনি গিয়া আবার তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইতেন।

জাহানাবাদ অর্থাৎ বর্ত্তমান আরামবাগের পথে তেলোভেলো এবং কৈকালা নামক অতিবিস্তীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তর সেকালে নানাকারণে বিপৎসঙ্কুল ছিল। এইস্থানে দস্যুতস্করের ভয় ছিল। যাত্রিগণ সংখ্যায় অল্প থাকিলে দিবাভাগেই তাহারা যাত্রীদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত, সময় সময় খুন করিয়াও ফেলিত। অসিমুণ্ডধরা এক করালিনী মূর্ত্তি তথায় বিরাজমান এবং দস্যুগণ এই মূর্ত্তির সম্মুখে নরবলিও দিত। এইপ্রকার সত্যাসত্য অনেক জনশ্রুতি তৎকালে বহুলভাবে প্রচারিত ছিল। সুতরাং দলবদ্ধ না হইয়া ঐ পথে কেহ যাতায়াত করিত না, সন্ধ্যার পর দলবদ্ধ হইয়াও কেহ যাতায়াত করিতে সাহস পাইত না।

এই যাত্রায় মাতাঠাকুরাণী পশ্চাতে পড়িলেও আরামবাগ পর্য্যন্ত কোনপ্রকারে দলের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। সম্মুখে বিপৎসঙ্কুল প্রান্তর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই অতিক্রম করিতে সকলে কৃতসংকল্প হইলেন। একজনের জন্য অন্য সকলের অসুবিধা হইবে, হয়তো-বা দস্যুকবলে প্রাণান্ত হইবে, ইহা সমীচীন নহে। বিপদাশঙ্কা বুঝিয়াও সঙ্গীদিগের এই সংকল্পে মা আপত্তি করিলেন না। তাঁহাদের গতিবেগ বৃদ্ধির সহিত তিনিও কিছুদূর পর্য্যন্ত অস্বাভাবিক দ্রুতপদে চলিলেন, কিন্তু পথশ্রান্ত চরণের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। অগ্রগামী সঙ্গিগণ তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তখন তিনি সেই ভয়াবহ স্থানে নিতান্ত একাকিনী।

সূর্য্যদেব অস্তাচলে অদৃশ্য হইলেন, সম্মুখে তখনও তেলোভেলোর দীর্ঘ পথ। সেই পথে কুলবধূ চলিয়াছেন একাকিনী।

দূরে—দক্ষিণেশ্বরে পতিসন্দর্শনের আশার ক্ষীণ আলোক, আর অদূরে —চতুর্দ্দিকে ভীতিভরা অন্ধকার। আশঙ্কা জাগে তাঁহার মনে, এই নির্জ্জন মাঠে যদি কোন বিপদ ঘটে? ভাবিবার অবসরও আর রহিল না, দেখেন,—দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি হন্‌হন্ করিয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছে!

"পুরুষ প্রকাণ্ডকায় ভীষণ গড়ন।
ডাকাতের সমাকৃতি ভয় দরশন॥
মাথায় বাবরি চুল, গোঁফ জুল্পি কাটা।
বরণ বিকট কাল, হাতে ধরা সটা॥" (২)

সেই ভীষণাকার ব্যক্তি বজ্রনাদে চীৎকার করিয়া উঠিল,—কে···রে? অসহায়া নারীর অন্তরাত্মাও সেই হুঙ্কারে কম্পিত হইল। একেবারে ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন।

সেই ব্যক্তি আরও নিকটে আসিয়া দেখিল—এক নারীমূর্ত্তি। আবার প্রশ্ন করিল,—কে গা তুমি? এত রাত্তিরে একলা এখানে?

মনে যতই ভয় থাকুক, মাতাঠাকুরাণী অতিশয় মধুরকণ্ঠে বলিলেন,—বাবা, আমি সারদা, তোমার মেয়ে। সঙ্গীরা আমায় ফেলে এগিয়ে গেছে।

তাঁহার মধুর কথা শ্রবণে, তাঁহার সরল আচরণে এবং পবিত্র বদনমণ্ডল-দর্শনে সেই ভীষণদর্শন ব্যক্তির চিত্ত বিগলিত হইল। এইবার সংযতকণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায় যাবে মা, তুমি?

—বাবা, তারকেশ্বরে; আমার সঙ্গীরা সেখানে অপেক্ষা করবে।

অচিরে আর একজন আসিয়া মিলিত হইল, সে নারী। মায়ের মনে সাহসের সঞ্চার হইল, সেই নারীর একখানি হাত ধরিয়া স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিলেন,—মাগো, ভাগ্যিস্ তোমরা এলে, কি-যে ভয় করছিল আমার!

যাদুমন্ত্রে যেন তাহারা উভয়েই মুগ্ধ হইল এবং সেই নারী মাতৃস্নেহে কন্যা সারদাকে আশ্বস্ত করিল। তিনি আশ্বস্ত হইয়া এইবার অনুরোধ করিলেন,—মেয়েকে যদি তারকেশ্বরে সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দাও, তা' হ'লে খুবই ভাল হয়। তিনি আরও জানাইলেন,—তোমাদের জামাই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীমন্দিরে থাকেন, আমি সেখানে যাবো।

সঙ্গীদের সঙ্গে তারকেশ্বরে দেখা না হ'লে, যদি মেয়েকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত পৌঁছে দাও, তবে তোমাদের জামাই ভারী খুশী হবেন।

সেই রাত্রিতেই তারকেশ্বর গেলে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ হইবে মনে করিয়া নিকটবর্ত্তী এক কুটীরে গিয়া সকলে আশ্রয় লইল। সেখানে কন্যাকে জলযোগ করাইয়া তাঁহার শয়নের ব্যবস্থাও করিয়া দিল।

"বসনে বিছানা করি ঘরের ভিতরে।
শুয়াইয়া রাখে মায় নিজে একধারে॥
মিন্‌সে মহারথী প্রায় বীরের আকার।
হাতে সোঁটা রাত্রি গোটা রক্ষা করে দ্বার॥
মাঝে মাঝে আশ্বাসিয়া কহে জননীরে।
কি ভয় ঘুমাও মাগো আমি আছি দ্বারে॥" (২)

পরদিবস প্রাতঃকালে তাহারা তারকেশ্বরে উপস্থিত হইয়া পরিচিত এক দোকানে আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিল। ইতোমধ্যে সঙ্গীরাও তথায় আসিয়া মিলিত হইল। মাতাঠাকুরাণীর নিকট তাঁহার পথে-পাওয়া মা-বাবার স্নেহযত্নের কাহিনী শ্রবণ করিয়া সঙ্গীরা অতীব বিস্মিত হইলেন এবং নবাগতদিগের অগোচরে বলিলেন,—যা-ই বল-না কেন, বহুভাগ্যে এযাত্রা রক্ষে পেয়েছ।

বিদায়ের কালে ডাকাত-বাবা, তাহার পত্নী ও কন্যা সারদা তিনজনেই বিচ্ছেদব্যথায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। মমতাময়ী নারী ক্ষেত হইতে কিছু মটরশুঁটি সংগ্রহ করিয়া কন্যা সারদার বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়া বলিল,—মা, ক্ষিদে পাবে যখন রাত্তিরে, মুড়ির সঙ্গে খেও।

এইভাবে ভয়ংকর তেলোভেলোর নির্জ্জন প্রান্তরে মাতাঠাকুরাণীর দিব্য দর্শন 'ডাকাতদম্পতি'র হৃদয়ের সুপ্ত বাৎসল্যকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে কন্যা ও জামাতার আকর্ষণে তাহারা দক্ষিণেশ্বরে ছুটিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদিগের জন্য সঙ্গে করিয়া ফলমিষ্টান্ন আনিয়াছে, আর আনিয়াছে—অন্তরের স্নেহ ও ভক্তি।

দক্ষিণেশ্বর

উনবিংশ শতাব্দী ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রকারে এক স্মরণীয় যুগ। এই শতকে ভারতবর্ষ বহুবিধ কারণে জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপনীত হয়। ধর্ম্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই নিদারুণ পরিবর্ত্তন ঘটে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ এবং বহিরাগত শিক্ষাদীক্ষার সহিত সংঘর্ষে ভারতের জীবনধারা, বিশেষতঃ ধর্ম্মজীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে।

কিন্তু 'পতন এবং অভ্যুদয়ের বন্ধুর পন্থা' অবলম্বন করিয়াই মহাকালের রথ চলে। ভগবানের করুণাবারি-বর্ষণে মৃতের মধ্যেও জীবনের সঞ্চার হয়, উদ্‌ভ্রান্ত আর্ত্ত মানবের জন্য পরিত্রাতার আবির্ভাব হয়। ভারতের এইরূপ যুগসন্ধিক্ষণে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীতীরে লোকোত্তর পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বকল্যাণের নিমিত্ত মৃতসঞ্জীবনী-সাধনায় সমাধিস্থ হইলেন, এবং যুগযুগান্তের গ্লানি ও অন্ধকার দূর করিবার জন্য তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই দক্ষিণেশ্বর তপোভূমিতে নবযুগ-অভ্যুদয়ের 'জাগৃহি' মন্ত্র উষার আলোকে উদীরিত হইয়া উঠিল।

বিশ্ববাসীকে ডাকিয়া তিনি শুনাইলেন তাঁহার সত্যানুভূতির বাণী,—

"ভগবানলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।

পবিত্র দেহমনে ব্যাকুলভাবে ডাকিলে তাঁহাকে লাভ করা যায়, যদি ডাকার মত ডাকা যায়। মানুষ যেমন মানুষকে দেখিতে পায়, তেমনই তাঁহাকেও দেখা যায়।

আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহাকে জানিয়াছি, তাঁহাকে পাইয়াছি। উপযুক্ত লোক পাইলে তাহাকেও দেখাইতে পারি।"

এমন তেজোদৃপ্ত দ্ব্যর্থহীন বাক্যশ্রবণে মানুষ স্তম্ভিত হইল। আত্মবিস্মৃত এবং পরধর্ম্মে অসহিষ্ণু বিশ্ববাসীকে তিনি আরও শুনাইলেন সেই পুরাতন কথা, মানবসভ্যতার প্রভাতে ছায়াচ্ছন্ন তপোবনে ঝঙ্কৃত সেই শাশ্বত মন্ত্র.

"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।"

কাঠ খোদাই অঙ্কিত

কিন্তু, শুনাইলেন তাঁহার অনুপম সরল ভাষায়, যাহা অজ্ঞ নিরক্ষর অতিসাধারণ মানুষেরও হৃদয়তন্ত্রীতে গিয়া বাজিয়া উঠে, নবভাবের উদ্দীপনা জাগাইয়া তোলে সকলের অন্তরে। বলিলেন,—

"ঈশ্বর এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে 'গড্', কেউ বলে 'আল্লা', কেউ বলে 'কৃষ্ণ', কেউ বলে 'শিব', কেউ বলে 'ব্রহ্ম'।

"মত—পথ, সকল ধর্ম্মই সত্য। যেমন কালীঘাটে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায়। ধর্ম্ম কিছু ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম আশ্রয় করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়।" "নদী সব নানাদিক দিয়ে আসে, কিন্তু সব নদী সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেখানে সব এক।" (১)

দক্ষিণেশ্বর তপোভূমি—চিরতীর্থ, বিশ্বমানবের ইহা মিলনমন্দির। "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা," বহু মত এবং বহু পথ সকল দ্বন্দ্ব ভুলিয়া এই তীর্থে আসিয়া মিলিত হইয়াছে; সকলের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে এইস্থানে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমন্বয়ের ভাস্বর প্রতীক।

এই মিলনতীর্থের অধিষ্ঠাতা তাঁহার সাধনা পূর্ণাঙ্গ করিতে তাঁহার সহধর্ম্মিণীকেও আহ্বান জানাইলেন, এবং সেই মহিমময়ী নীরব সাধিকা অসামান্য ত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্যের শক্তিতে এই অভিনব সাধনাকে পূর্ণাঙ্গ করিতে দক্ষিণেশ্বরের মাতৃমন্দিরে আসিয়া মিলিত হইলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং সারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী পৃথিবীর সকল যুগের এবং সকল জাতির নরনারীর সমক্ষে এমন এক আদর্শ স্থাপন করিলেন, যাহা কোন দেশে, কোন যুগে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। হয়তো-বা স্বপ্নেও ইহা কেহ ভাবে নাই। এই মহিমময় সাধক ও মহিমময়ী সাধিকার যুক্তসাধনায় ভারতের শাশ্বত আত্মাই পরিমূর্ত্ত হইয়াছে। সাধনার জীবন্ত বিগ্রহ এই ঠাকুর-ঠাকুরাণীর পুণ্যময় আবির্ভাব এবং তাঁহাদের জীবনবেদ কেবল ভারতের নহে, সমগ্র বিশ্বের পরম সৌভাগ্য ও সম্পদরূপে যুগে যুগে সমাদৃত হইবে।

এই সাধক-সাধিকা লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্গম গিরিকন্দরে কঠোর তপশ্চর্য্যার দ্বারা মোক্ষ লাভ করিতে আসেন নাই, তাঁহারা আসিয়াছিলেন 'জগদ্ধিতায়'—লোকশিক্ষা দিতে, লোককল্যাণ করিতে; এবং তাহা কেবল প্রাণহীন মৌখিক উপদেশের দ্বারা নহে, "আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই পন্থা অনুসরণে। বিবাহসংস্কার স্বীকার করিয়া এবং দক্ষিণেশ্বরে একত্র দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব ব্যবহারিক জীবনে জগৎকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, ভগবানলাভের পথে বিবাহ প্রধান অন্তরায় নহে। সংসার-আশ্রমে থাকিয়াও সংযম, ত্যাগ এবং ভক্তিসহযোগে চরম লক্ষ্য এবং পরম আনন্দ লাভ করা যায়। কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও গৃহীর পক্ষেও তাহা অনধিগম্য নহে।

সাধনাদ্বারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করা যায় এবং মানুষও দেবতা হইতে পারে। এইভাবেই ভগবানের সৃষ্টি এবং লীলা সার্থক হয়; ইহা অবাস্তব অথবা অসম্ভব নহে।

ঠাকুর গৃহস্থ ভক্তদিগকে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, তাহার মধ্যে যুক্তি থাকিত, হিসাব থাকিত। ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার জন্য তিনি মাতা-পিতা এবং সংসারকে পরিত্যাগ করিতে বলেন নাই, বরং বলিয়াছেন, "বাপমাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম্ম করবে, তার ছাই হবে! মানুষের অনেকগুলি ঋণ আছে। পিতৃঋণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ। এ ছাড়া আবার মাতৃঋণ আছে। আবার পরিবারের সম্বন্ধে ঋণ আছে—প্রতিপালন করতে হবে সতী হলে, মরবার পরও তার জন্য কিছু সংস্থান করে যেতে হয়। * * * সংসারও কর, আবার ভগবানেতেও মন রাখ। সংসার ছাড়তে বলি না, এও কর, ওও কর।" (১)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং সারদেশ্বরী ঠাকুরাণীর বিবাহ আদর্শের বিবাহ এবং বিবাহের আদর্শ। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমেরই আদর্শ। তাঁহাদিগের তপস্যাপূত জীবন বর্ত্তমান যুগের উন্মত্ত এবং উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাদের প্রবলতম প্রতিবাদ। বিবাহিত হইলেও তাঁহাদের ভালবাসা সাধারণ মানুষের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন নহে,

ইহা উর্দ্ধমুখী। তাঁহাদের প্রেম সমুদ্রের ন্যায় বিশাল ও গভীর এবং ভাগীরথীর ন্যায় পবিত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ নাম স্মরণ করিলে, প্রথমেই তাঁহার যে সুপ্রসিদ্ধ উপদেশটি মনে পড়ে, তাহা— কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। ভগবানের পথে নারী অন্তরায়, এবং কাঞ্চনের সহিত নারীকেও তিনি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। তাহা না হইলে, তিনি ধর্ম্ম ও সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হইবার পরেও স্বয়ং বিবাহ করিলেন কেন? পত্নীর সান্নিধ্য হইতে দূরে না থাকিয়া তাঁহাকেও নিজের সাধনপথে আহ্বান করিলেন কেন? জগদম্বাজ্ঞানে নিজের পত্নীকে বিধিপূর্ব্বক পূজাই-বা করিলেন কেন?

যে মহীয়সী নারীর গর্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি আজীবন ভক্তির সহিত পূজা করিয়াছেন। উপনয়নকালে ধাত্রীমাতা জনৈকা কর্ম্মকারপত্নীর হস্ত হইতেই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী এই ব্রাহ্মণকুমার প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেন। সুদীর্ঘকাল তিনি যে মন্দিরের পূজারী এবং যেস্থানে তিনি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, সেই দক্ষিণেশ্বর মাতৃমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রীও ছিলেন নারী। তন্ত্রসাধনকালে তিনি বহুশাস্ত্র-পারদর্শিনী এক নারীকেই গুরুরূপে স্বীকার করিয়াছেন; আবার নারীকে তিনি দীক্ষাদানও করিয়াছেন। সকল নারীতেই ছিল তাঁহার মাতৃভাব, এমন-কি অবজ্ঞাতা নারীর মধ্যেও তিনি জগজ্জননীর প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাদিগকে প্রণাম করিয়াছেন। তাঁহার জীবনচরিত অনুশীলন করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, তিনি নারীকে লেশমাত্র অবজ্ঞা বা অগ্রাহ্য করেন নাই, বরং আজীবন মাতৃজ্ঞানে তাঁহাদের পূজাই করিয়াছেন।

একদা অল্পবয়স্কা দুই বধূ তাঁহার নিকট আসেন। তাঁহারা উপবাস করিয়া আছেন জানিয়া তিনি স্নেহকণ্ঠে বলিলেন, "তোমরা উপবাস কোরে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়। মেয়েরা আমার মার এক একটি রূপ

কি না ; তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না ; জগন্মাতার এক একটি রূপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে।”

“এই বলিয়া শ্রীযুক্ত রামলালকে বধূদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে আদেশ করিলেন। ফলহারিণী পূজার প্রসাদ, লুচি, নানাবিধ ফল, গ্লাস ভরিয়া চিনির পানা ও মিষ্টান্নাদি তাঁহারা পাইলেন।

“ঠাকুর বলিলেন, ‘তোমরা কিছু খেলে এখন আমার মনটা শীতল হলো, আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না।” (১)

নারীজাতির প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর মমতা, শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহার প্রসঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রথিতযশা প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তাৎকালিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন,—

“আমাদের এই মহাপুরুষের মতে—নারীশক্তির মধ্যে ভগবানের মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়া সরল শিশুর ন্যায় সর্ব্বান্তঃকরণে এবং শুদ্ধানন্দে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই শক্তিপূজা। আমাদের বন্ধুবর বহু পূর্ব্বেই নারীর সহিত সাংসারিক এবং দৈহিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি কখনও পত্নীর সঙ্গ করেন নাই। তিনি বলেন,—সন্তানভাব ব্যতীত অন্য কোনভাবে পুরুষ নারীকে জয় করিতে পারে না। নারী জগৎকে মুগ্ধ করিয়া ভগবৎপ্রেমে বিমুখ করিয়া রাখে। শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্রতম সাধকগণও নারীর মোহিনী শক্তির প্রভাবে ভোগলালসা ও পাপে পতিত হইয়াছেন। সম্পূর্ণভাবে কামজয়ই এই মহাপুরুষের আজীবন কাম্য। তিনি বলেন,—নারীর প্রভাব হইতে মুক্তিলাভের আশায় তিনি বহু বৎসর কঠোর সাধনা করিয়াছেন। * * *

“যে মায়ের তিনি ধ্যান করেন, সেই মা-কালী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, প্রত্যেক নারী তাঁহারই প্রতিমূর্ত্তি ; তাই তিনি প্রত্যেক নারীকে মাতৃজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন। নারী ও কুমারীর সম্মুখে তিনি ভূমিনত হইয়া প্রণাম করেন। পুত্র যেভাবে মাকে পূজা করে, তিনি সেভাবেই তাঁহাদের অনেককে পূজা করিয়াছেন। নারীজাতির সম্বন্ধে

তাঁহার পবিত্র অনুভূতি এবং সম্পর্ক এক অপূর্ব্ব এবং শিক্ষণীয় বস্তু। ইহা পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার বিপরীত। ইহা মূলতঃ আমাদের গৌরবময় মজ্জাগত জাতীয় ভাব। * * *

"তাঁহার উক্তিসমূহ যদি সংকলন করা যায়, তবে এক অপূর্ব্ব এবং বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডারের সৃষ্টি হইবে। জড় এবং চেতন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উপলব্ধিসমূহ যথাযথভাবে প্রকাশিত হইলে মানুষের মনে হইবে যে, পুরাকালের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞানের যুগ বুঝি-বা ফিরিয়া আসিয়াছে।"*

নরনারীর ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে সমাজের শোচনীয় অধঃপতন হয়, ইহা লক্ষ্য করিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণের এই সতর্কবাণী। ইহা কামনা এবং ভোগ-সর্ব্বস্বতার বিরুদ্ধে, নারীজাতির বিরুদ্ধে অবশ্যই নহে। পুরুষ ধর্ম্মার্থী-দিগকে যেমন তিনি কামিনী হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপদেশ দিতেন, তেমনই আবার ধর্ম্মসাধিকাদিগকেও বলিতেন,—পুরুষমানুষ হ'তে সাবধান থাকবে, "মেয়েভক্তেরা আলাদা থাকবে, পুরুষভক্তেরা আলাদা থাকবে। তবেই উভয়ের মঙ্গল।"

সংসারে প্রতিনিয়ত অসংযম এবং দারিদ্র্যের যে পরিণাম, ঠাকুর তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন, অনুভব করিয়াছেন এবং তাহাতে ব্যথিত হইয়া বলিয়াছেন, "কি দুরবস্থা! কুড়ি টাকা মাইনে—তিনটে ছেলে হয়েছে—তাদের ভাল করে খাওয়াবার শক্তি নেই, বাড়ীর ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, মেরামত করবার পয়সা নেই—ছেলের নতুন বই কিনে দিতে পারে না—ছেলের পৈতে দিতে পারে না—এর কাছে আট আনা, ওর কাছে চার আনা ভিক্ষে করে।" (১)

* The Sunday Mirror এবং The Theistic Quarterly Review পত্রিকায় (১৮৭৬—১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ অন্তরঙ্গগণের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ হইবারও কয়েকবৎসর পূর্ব্বে) "The Hindu Saint" শিরোনামে যে সুদীর্ঘ ইংরাজি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা হইতে উদ্ধৃতাংশের বঙ্গানুবাদ।

আবার এইরূপ দুরবস্থার প্রতিকারকল্পে এবং সদ্গৃহীর আদর্শ সম্পর্কে তিনিই উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন,—

"বিদ্যারূপিণী স্ত্রী যথার্থ সহধর্ম্মিণী। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে বিশেষ সহায়তা করে। দু'একটি ছেলের পর দু'জনে ভাইভগিনীর মত থাকে। দু'জনেই ঈশ্বরের ভক্ত—দাস ও দাসী। তাদের সংসার, বিদ্যার সংসার। ঈশ্বরকে ও ভক্তদের ল'য়ে সর্ব্বদা আনন্দ। তারা জানে ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক—অনন্ত কালের আপনার। সুখে দুঃখে তাঁকে ভুলে না—যেমন পাণ্ডবেরা।" (১)

কামিনী সম্বন্ধে সকল মানুষকে তিনি এই কথাই দিনের পর দিন বুঝাইয়াছেন,—বিবাহিত জীবনেও সংযম পালন করিবে এবং নিজ পত্নী ব্যতীত সকল নারীকেই শুদ্ধদৃষ্টিতে ও মাতৃভাবে দেখিবে। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণের কামিনীত্যাগের মর্ম্মকথা।

কামিনীর পর কাঞ্চন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এক হাতে টাকা এবং অন্য হাতে মাটি লইয়া মনকে বলিয়াছেন,—ইহাদের মধ্যে তফাৎ কি? দুই-ই তো এক, কোনটাতেই ঈশ্বরলাভ হয় না। এই বলিয়া তিনি উভয়ই গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আবার, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার শয্যাতলে টাকা রাখিয়া পরীক্ষা-ব্যপদেশে মানুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, সেই শয্যা স্পর্শমাত্র তিনি দেহে অগ্নিদাহবৎ জ্বালা অনুভব করিয়াছেন; স্বহস্তে কাঞ্চনগ্রহণ তো দূরের কথা।

আমরা জানি, কাঞ্চন না হইলে মানুষের যেমন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না, তেমনই ইহার প্রতি অত্যধিক আসক্তিতে মানুষের অধঃপতন এবং দুর্দ্দশারও সীমা থাকে না। স্বার্থান্ধ মানুষ বিষয়সম্পদের লোভে আত্মীয়কে বঞ্চনা করে, মানুষকে হত্যা করে। এক জাতি অন্য জাতিকে পাশবিক বলে শোষণ করে, ধ্বংস করে। এতদ্ভিন্ন, অধিক অর্থ মানুষের চিত্তে দুশ্চিন্তা, অহঙ্কার, এবং অবস্থাবিশেষে মত্ততাও আনয়ন করে। এই কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ কাঞ্চন বর্জ্জন করিয়াছেন।

কিন্তু গৃহীকে তিনি সম্পূর্ণরূপে কাঞ্চন বর্জ্জন করিতে বলেন নাই, বলিয়াছেন, "যার অর্থ আছে, অর্থের সদ্ব্যবহার করা তার উচিত। ঠাকুর-সেবা, সাধুভক্তের সেবা, সম্মুখে কেউ গরীব পড়্‌ল তার উপকার করা,—এই সব টাকার সদ্ব্যবহার। ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য টাকা নয়, দেহের সুখের জন্য টাকা নয়, লোকমান্যের জন্য টাকা নয়। অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভগবানের সেবা।" (১)

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের কাঞ্চনত্যাগের মর্ম্ম,—কাঞ্চনের প্রতি আসক্তি ত্যাগ; টাকা যেন জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়া না দাঁড়ায়।

কিন্তু সাধুসন্ন্যাসীদিগের প্রতি এই বিষয়ে তাঁহার অনুশাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর,—"সাধুরা ঈশ্বরের উপর ষোল আনা নির্ভর করবে। তাদের সঞ্চয় কর্ত্তে নাই। ত্যাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনীকাঞ্চনের সংশ্রব লেশমাত্রও থাকবে না।"

তাঁহার সহধর্ম্মিণীরও প্রাত্যহিক সংসারযাত্রায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থসঞ্চয়ে আগ্রহ ছিল না। তিনি কাঞ্চনের আসক্তি হইতে কিরূপ মুক্ত ছিলেন, তাহা লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার অর্থে অনাসক্তি এবং নিরাসক্ত চিত্তের প্রমাণ আমরাও পরবর্ত্তী কালে অনেক প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যে শক্তিমান হইয়া, এবং সকল মতের ও সকল পথের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তররাজ্যে যে পরম ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বের কল্যাণে বিতরণ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। প্রাণের কত কথা, কাহার নিকট বলিবেন? ঈশ্বরীয় কথা সর্ব্বক্ষণ বলিতে না পারিলে তাঁহার তৃপ্তি হয় না, প্রাণ আকুলিবিকুলি করে, জীবন অসহ্য হইয়া উঠে। তিনি সত্যই কাঁদিতেন, ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতেন,—কৈ, মনের মানুষ কে আছ? তোমরা এসো। তোমাদের অপেক্ষায় আমি দুয়ার খুলে কত কাল ধ'রে ব'সে আছি। কে কোথায় আছ, এসো।

আশ্চর্য্য হইলেও সত্য, তাঁহার আহ্বানে প্রথম আসিলেন মূর্ত্তিপূজা-বিরোধী ব্রাহ্মসমাজের কুলপতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে তিনিই প্রথম 'পরমহংস মহাশয়'কে শিক্ষিত সমাজের সহিত পরিচিত করাইলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা Mirror, New Dispensation, সুলভ সমাচার, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতিতে এই মহাশক্তিসম্পন্ন পুরুষের অলৌকিক জীবনকথা প্রচারিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মসমাজের নেতারা লিখিলেন,—

"এই শুদ্ধসত্ত্ব মহাপুরুষ হিন্দুধর্ম্মের গভীরতা ও মাধুর্য্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় এবং দেহাত্মবোধ-বিরহিত। তিনি আত্মানন্দে বিভোর, ধর্ম্মের সত্যানুভূতিতে পূর্ণ এবং স্বর্গীয় পবিত্রতায় দীপ্ত। * * * অম্লান পবিত্রতা, অব্যক্ত দিব্যানন্দ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত অসীম জ্ঞান, শিশুসুলভ প্রশান্তি, বিশ্বমানবপ্রীতি এবং সর্ব্বোপরি ঐকান্তিক ভগবৎপ্রেম—তাঁহার জীবনে চরিতার্থ হইয়াছে। * * * আমাদের ধর্ম্মজীবনের আদর্শ স্বতন্ত্র হইলেও যতদিন তিনি দেহে থাকিবেন, আমরা সানন্দে তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার পবিত্রতার উচ্চ আদর্শ, অসাংসারিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং ভগবৎ-প্রেমোন্মাদনা শিক্ষা করিব।"

কেশবচন্দ্রের ন্যায় বাগ্মী, মনীষী এবং প্রতিভাবান ব্রাহ্ম আচার্য্যকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে 'নিরক্ষর পাগলা বামুনের' সমীপে সমাগত এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁহার কথামৃত পান করিতে দেখিয়া, এবং তৎসহ প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতৃবর্গকেও দেখিয়া তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের প্রৌঢ় ও যুবকগণ প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইলেন এবং তৎপরে মহাজনগণের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া তাঁহারাও দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া মিলিত হইলেন।

মহামায়ার বিচিত্র লীলা! ঊনবিংশ শতাব্দীর বিষবৃক্ষে অমৃতফল ফলিতে লাগিল।

একের পর এক, আরও অনেকে আসিতে লাগিলেন। পঞ্চবটীর নির্জ্জন পরিবেশ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। কত পণ্ডিত আসিলেন, কত মূর্খ

আসিলেন, কত গৃহী আসিলেন, ত্যাগী আসিলেন, কত সাধু আসিলেন, পাতকীরাও আসিলেন। ইংরাজ আমেরিকানও আসিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব দৃষ্টি, বুদ্ধি এবং ভাবের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে বুঝিবার প্রয়াস পাইতেন। কেহ তাঁহার পবিত্র বদনমণ্ডলে দিব্য জ্যোতিঃদর্শনে ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন, কেহ তাঁহার মুখে কঠিন তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বিষয়ের সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাশ্রবণে মুগ্ধ হইতেন, কেহ তাঁহার অন্তর্বিগলিত বিশ্বব্যাপী করুণার কণামাত্র আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

অসংখ্য জনসমাগম, অফুরন্ত ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর চলিল। কিন্তু প্রাণের ব্যাকুলতা শান্ত হয় না। সকলের সহিত কথা বলিয়া আনন্দ পাওয়া যায় না। মনের মানুষ আসে কৈ ?

যে পরম ঐশ্বর্য্য তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে কাহাকে দান করিয়া যাইবেন ? উপযুক্ত আধার কৈ ?

কিন্তু মহাপুরুষের শুভ অভিলাষ কখনও অপূর্ণ থাকে না। স্বীয় তপস্যার্জ্জিত সম্পদ যাঁহাদিগকে দান করিয়া যাইবেন বলিয়া তিনি দীর্ঘকাল প্রতীক্ষমাণ ছিলেন, এতদিনে সেইসকল পবিত্র, শ্রদ্ধাশীল এবং হৃদয়বান অন্তরঙ্গগণ একে একে আসিয়া পুণ্যতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলরাম বসু ; রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ) ; গৌরীমা, গোপালের মা, গোলাপমা-প্রমুখ পূজনীয় গৃহী ও ত্যাগী অন্তরঙ্গগণ আসিয়া শ্রীগুরুর চরণতলে মিলিত হইলেন। গুরুর প্রবল আকর্ষণে ও নিঃস্বার্থ প্রেমে তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন এবং ধীরে ধীরে গুরুগতপ্রাণ হইয়া উঠিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ প্রত্যেকেই অসামান্য, প্রত্যেকেরই জীবনচরিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ; তন্মধ্যে নরেন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, লাটু মহারাজ এবং গৌরীমাতার জীবন সমধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

নরেন্দ্রনাথ ছাত্রজীবন হইতেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসু এবং অত্যন্ত যুক্তিবাদী। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান আছেন, কি নাই, থাকিলে তাহার প্রমাণ কি, তাঁহাকে কেহ কখনও প্রত্যক্ষ করিয়াছে কি-না, ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। সত্যের অনুসন্ধানে তিনি ব্রাহ্মসমাজে গেলেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শন অধ্যয়ন করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার চিত্তকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না।

অবশেষে সেই জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিয়া তাঁহাকে শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথ যেদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন,—মশাই, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন? ঠাকুর অতি সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন,—হাঁ, আমি তাঁকে দেখেছি, তোমাকেও দেখাতে পারি। এইরূপ দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট উত্তর নরেন্দ্রনাথ আর কাহারও নিকট শুনেন নাই। উত্তর শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন।

অতঃপর ঠাকুর যেদিন মাত্র স্পর্শের দ্বারা নরেন্দ্রনাথের সম্মুখ হইতে পরিদৃশ্যমান জগতের বিলোপ ঘটাইয়া তাঁহাকে অদ্বৈতজ্ঞানের আভাস দিলেন, সেদিন এই 'পাগলা বামুনের' অলৌকিক শক্তি অনুভব করিয়া তিনি বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া গেলেন। ইতঃপূর্ব্বে স্বীয় মনোবল সম্বন্ধে নরেন্দ্রনাথের দৃঢ় ও উচ্চ ধারণা ছিল; আজ তিনি দেখিলেন, তাঁহার সেই সুদৃঢ় সত্তাটিকে এই ব্রাহ্মণ ইচ্ছামাত্র কাদার তালের মত যদৃচ্ছ আকার দিতে পারেন। নরেন্দ্রনাথ এই ব্রাহ্মণের চরণে মস্তক নত করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র গুরুর শ্রীমুখনিঃসৃত বলিয়াই কোন কথা নির্ব্বিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ছিল তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। পদে পদে তিনি গুরুকে পরীক্ষা করিতে এবং তাঁহার কথার যাথার্থ্য যাচাই করিতে লাগিলেন। কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া ঠাকুরও পরমস্নেহে শিষ্যের সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিতেন।

নরেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে নিরাকারবাদী ছিলেন, ভগবানের মাতৃরূপে বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর সংসারের অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া একদিন তিনি ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা জানাইতে বাধ্য হইলেন, ঠাকুর

যেন তাঁহার মা-কালীকে বলিয়া ইহার একটা প্রতিবিধান করান। ঠাকুর বলিলেন,—তুই নিজে গিয়ে মাকে বল, আজ যা' চাইবি, মা তোকে তা-ই দেবেন। নরেন্দ্রনাথ ঐহিক সম্পদ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মা-কালীর মন্দিরে চলিলেন, কিন্তু মায়ের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি সকল অভাবের কথা ভুলিয়া গিয়া প্রার্থনা জানাইলেন,—মা, আমায় জ্ঞান বিবেক বৈরাগ্য দাও। ফিরিয়া আসিলেন ঠাকুরের ঘরে, ঠাকুর আরও দুইবার তাঁহাকে মায়ের নিকট পাঠাইলেন, তিনিও অর্থকামনার দৃঢ়সংকল্প লইয়াই মন্দিরে গেলেন, কিন্তু প্রতিবারই মায়ের নিকট সেই একই প্রার্থনা জানাইলেন। ঠাকুর ইহাতে নিরতিশয় প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—যা, মোটা ভাতকাপড়ের অভাব তোদের আর হবে না।

ঠাকুর প্রথম দর্শনেই বুঝিয়াছিলেন, নরেন্দ্রনাথ জীবের কল্যাণে দেহ ধারণ করিয়াছে। বাহিরে যুক্তিবাদী এবং সংশয়বাদী হইলেও নরেন্দ্র-নাথের অন্তর প্রেমভক্তিতে পূর্ণ। ঠাকুরের প্রেমের বন্ধনে কখন যে তিনি বাঁধা পড়িলেন, নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। বাল্যাবধি স্বেচ্ছা-চারী, ঈশ্বরচিন্তা করিবার প্রবৃত্তিই তাঁহার ছিল না। এমন-কি কুঠারহস্তে দেববিগ্রহ খণ্ডিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, সুতরাং ধর্ম্ম তাঁহার কাছে ছিল ব্যঙ্গের বস্তু। কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবলে গিরিশ তখন বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের স্রষ্টা ও পালয়িতা ; নট, নাট্যকার এবং মহাকবিরূপে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত।

উত্তর-কলিকাতায় গিরিশের নিজ পল্লীতেই কোন কোন ভক্তগৃহে সেই সময় ঠাকুরের যাতায়াত ছিল। দুই-একবার গিরিশ কৌতূহলবশতঃ তাঁহাকে তথায় দেখিতেও যান, কিন্তু তাহাতে ভক্তি বা শ্রদ্ধার লেশমাত্র ছিল না। ভবরোগের ধন্বন্তরি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও বুঝিয়াছিলেন, এত বড় দুরারোগ্য রোগী তিনি আর পান নাই।

গিরিশের 'ষ্টার-থিয়েটারে' ঠাকুর কয়েকবার চৈতন্যলীলা, প্রহ্লাদ-চরিত্র ইত্যাদির অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম গিরিশ

তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন, সুযোগ পাইলে শ্লেষবিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না ; ঠাকুর কিন্তু তাঁহাকে দেখিলেই নমস্কার করিতেন। একদিন সুরামত্ত অবস্থায় নিজের রঙ্গালয়ে সর্ব্বজনসমক্ষেই গিরিশ এই মহাপুরুষকে অনেক কটুকথা শুনাইয়া দিলেন। ঠাকুর তাহাতে ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং তাঁহার প্রতি অধিকতর বিনয়, সৌজন্য ও স্নেহপূর্ণ আচরণ করিলেন। গিরিশ ইতঃপূর্ব্বে কোনদিন ঠাকুরকে চাহেন নাই, এই ঘটনায় তিনি প্রথম ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত আরম্ভ করেন। কিন্তু পানাদি দোষ ত্যাগ করিবার কথা তখনও তাঁহার মনে জাগে নাই। ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহাকে ইহা ত্যাগ করিতে অথবা ধর্ম্মের কোন বিধিনিয়ম পালন করিতে কখনও বলেন নাই। পরন্তু পরমস্নেহে সন্তানবৎ আচরণ করিতে থাকেন। কেহ কেহ ইহাকে অন্যায় প্রশ্রয়দান মনে করিয়া মন্তব্য করিলে, ঠাকুর বলিতেন,—থাক্‌-না, শালা ক'দিন আর খাবে ?

এইরূপে দিনের পর দিন অহেতুক কৃপালাভে ধন্য হইয়া গিরিশের ভক্তিভাব প্রবুদ্ধ হইল, তিনি ঠাকুরের চরণে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার চরিত্রেরও পরিবর্ত্তন হইল এবং রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে তিনি ঠাকুরের বাণীই প্রচার করিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অবতারত্বে গিরিশের বিশ্বাস এমনই দৃঢ় হইল যে, তিনি একদিন ঠাকুরকে বলিলেন, "তুমি আসবে, একথা যদি আমি আগে জানতুম, তবে প্রাণভ'রে আরও পাপ ক'রে রাখতুম।" তাঁহার সুমেরুবৎ অটল বিশ্বাসসম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং বলিতেন, "গিরিশের বিশ্বাস পাঁচসিকে পাঁচ আনা।"

সন্ন্যাসী অন্তরঙ্গগণের মধ্যে লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) প্রথমে এবং বাল্যবয়সে ঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের নাম রাখতুরাম, ঠাকুর আদর করিয়া লাটু অথবা লেটো বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার জন্মস্থান বিহারে ছাপরা জিলায়। শৈশবে মাতাপিতৃহীন হইয়া জীবিকার অন্বেষণে কলিকাতায় আসেন, এবং এমনই যোগাযোগ—ভক্ত

রামচন্দ্র দত্তের পরিচারক নিযুক্ত হন। সেই সূত্রে ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় এবং দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত, ক্রমে মনের আকর্ষণও বৃদ্ধি পায়। লাটু মহারাজের পরমভাগ্য, অবশেষে ঠাকুর তাঁহাকে রামচন্দ্রের নিকট হইতে চাহিয়া লইলেন। তদবধি তিনি দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া ঠাকুরের সেবায় ও পারমার্থিক চিন্তায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

লাটু মহারাজের বিদ্যানুশীলনের এক ইতিহাস আছে। তিনি লিখন-পঠনে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই নিরক্ষর বালকের বিদ্যাশিক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন ঠাকুর স্বয়ং। বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইল, শিক্ষক আহ্বান করিলেই ছাত্রকে উপস্থিত হইতে হয়। শিক্ষকের সান্নিধ্য ছাত্র খুবই ভালবাসেন, কিন্তু তিনি যে পাঠ বুঝাইয়া দেন, ছাত্র তাহা কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারেন না। পাঠে তাঁহার অনুরাগও আসে না। ছাত্র বসিয়া বসিয়া ভাবেন, এখানে আসিলাম সাধুসঙ্গ করিতে, বইপত্র আবার কেন আসিয়া জুটিল? এইভাবে উভয় পক্ষের বিপরীত প্রয়াস কত দিন চলিতে পারে? পাঠে ছাত্রের বীতস্পৃহতা এবং তাঁহার অদ্ভুত বাংলা-উচ্চারণভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া অনতিবিলম্বে শিক্ষকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন,—দূর শালা, তোর এসব হবার নয়!

গুরুর তিরস্কারে ছাত্র কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু আদৌ দুঃখিত হইলেন না, বরং বিপদ হইতে শীঘ্র পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দিতই হইলেন। যে গুরুর আশ্রয় এবং প্রেরণা তিনি পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আত্মজ্ঞানলাভের কোন অসুবিধাই হইল না। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিষয় তিনি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন। অল্পায়াসেই তাঁহার ধ্যান গভীর হইয়া আসিত, সময় সময় বাহ্যজ্ঞানও লোপ পাইত।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গগণের জীবনে শক্তিসঞ্চার করিতে লাগিলেন। কেবল গুরুরূপে তিনি ধর্ম্মার্থী শিষ্যশিষ্যাদিগকে জ্ঞানদান করিয়াই বিরত থাকেন নাই, কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার ন্যায় তাঁহাদিগকে শাসন করিয়াও

সর্ব্ববিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। মাতা সারদেশ্বরীও তাঁহাদিগকে সন্তানবৎ স্নেহযত্ন এবং ধর্ম্মপথে সহায়তা করিয়াছেন।

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায় তখন পূর্ণ জোয়ার, কূল ছাপাইয়া চলে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস। ঠাকুর ও ঠাকুরাণীকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ণানন্দের মহামেলা, প্রতিদিন আনন্দের মহামহোৎসব, তাহাতে বিরাম নাই, ছেদ নাই। অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে সম্মিলিত দেখিয়া ঠাকুর আনন্দে মাতোয়ারা। কখনও ভক্তগণের কীর্ত্তনশ্রবণে পুলকিত, মধ্যে মধ্যে নিজেও রসমধুর আখর দিয়া কীর্ত্তনের মাধুর্য্য বৃদ্ধি করিতেছেন, কখনও আনন্দে নৃত্য করিতেছেন,—চক্ষে এবং বক্ষে প্রেমের ধারা।

ভাবের আবেগে কখনও নিজেই সুধাকণ্ঠে কীর্ত্তন করেন,—

"স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা,
প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে ?
আমায় দে মা পাগল ক'রে॥"

স্তব্ধ নিঃশ্বাসে ভক্তগণ শোনেন প্রেমপাগলের সেই স্বর্গীয় গীতি। মহাভাবের তরঙ্গ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলের মর্ম্মতটে আঘাত করে, এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাঁহারা অনুভব করেন হৃদয়মধ্যে।

নরেন্দ্রনাথের মধুরকণ্ঠে মাতৃনাম-শ্রবণে ঠাকুরের বড়ই তৃপ্তি। তাঁহার আদেশে নরেন্দ্রনাথ ভাববিভোর হইয়া গাহেন,—

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহা-বাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চিরশান্তি পরিমল অবিরত যায় ভাসি'॥
মহাকাল রূপ ধরি' আঁধার বসন পরি'
সমাধি-মন্দিরে ওমা কে গো তুমি একা বসি'॥
অভয় পদকমলে প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্ট হাসি॥"

সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের দেহমন স্থির হইয়া আসে, আসে মহাভাবের সমাধি। জড়জগৎ ছাড়িয়া মায়ের অভয় পদকমলে মনোভৃঙ্গ মজিয়া রহে, মুখমণ্ডলে শোভা পায় দেবশিশুর দিব্যানন্দময় হাসি।

ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ সেই নিস্পন্দ দেবদেহ ঘিরিয়া কীর্ত্তন করেন, কিন্তু শঙ্কিত থাকেন—বিবশ অঙ্গ ভূমিতে পড়িয়া আঘাত না লাগে। দেবভাবের বৈদ্যুতিক শক্তি গৃহময় পুলকসঞ্চার করে।

এইরূপে নিত্য নবভাবের অভিব্যক্তি চলে দক্ষিণেশ্বরে। বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তের সকল শুভ বাসনাই পূর্ণ করেন, কাহাকেও মুখের ভাষায় প্রার্থনা করিবারও অবকাশ দেন না, ভক্তের জন্য তাঁহার অদেয় কিছুই নাই।

গৌরীমার একবার অভিলাষ হইয়াছিল, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব যেমন ভক্তবৃন্দ লইয়া মহাভাবে মত্ত হইতেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারে একবার সেইরূপ দেখেন। অবশ্য, মনের গোপন কথা প্রকাশ করিয়া তিনি কাহাকেও কিছু বলেন নাই।

"কিছুদিন পরে রবিবারে একদিন।
একত্রিত বহু ভক্ত নবীন প্রবীণ॥
সেইদিন গৌরমাতা মায়ের মন্দিরে।
রন্ধনশালায় রত ভকতির ভরে॥
শ্রীপ্রভুর সেবা-হেতু পরম যতন।
খেচরান্ন ব্যঞ্জনাদি করেন রন্ধন॥" (২)

ঠাকুর বসিয়া আছেন। ঘরে বাহিরে ভক্তগণ তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন, কেহ দাঁড়াইয়া বাতাস করিতেছেন। সকলের মনে আনন্দ—ঠাকুরের ভোজন দর্শন করিবেন।

"হেনকালে গৌরমাতা ভক্তি-অনুরাগে।
থুইল ভোজন থাল শ্রীপ্রভুর আগে॥"

হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিতে করিতে ঠাকুর ভক্তগণসমক্ষে গৌরীমার

ভক্তি এবং বৈরাগ্যের কথা বলিতে লাগিলেন। এইসময় গৌরীমার ভাবাবেশ হইল, ঠাকুরও মহাভাবে আবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সেইস্থান মহাভাবের বন্যায় প্লাবিত হইল। ভক্তগণ একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, কেহ ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, কেহ উচ্চৈঃস্বরে 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, সকলে ভাবাবেগে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে ঠাকুর সকলের দেহ স্পর্শ করিলেন।—

"স্বভাবস্থ হয় সবে শ্রীহস্ত-পরশে।
বলিবার নহে কথা ভাষা যায় ভেসে॥
থালভরা প্রসাদ আছিল শ্রীমন্দিরে।
ভক্তগণ খায় মহা আনন্দের ভরে॥
প্রসাদে প্রসাদজ্ঞান সমান সবার।
একত্রে ভোজন, নাই জাতির বিচার॥" (২)

এইভাবে দক্ষিণেশ্বরের আনন্দনিকেতনে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ারা থাকিতেন। কেবল প্রবীণ ও নবীনগণের ভাববিহ্বলতা নহে, ঠাকুরের ইচ্ছামাত্র বালকগণও ভগবদ্ভাবে বিহ্বল হইত। ভক্ত বলরাম বসুর দৌহিত্র মাণিক ও দৌহিত্রী ইন্দু একদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিয়াছে। সরল ও পবিত্র ভক্তদ্বয়কে দেখিয়া ঠাকুরের ভাগবত ভাবের উদ্দীপন হইল। 'আয় রে, তোরা কাছে আয়' বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া আনিলেন এবং উভয়ের বক্ষে হস্তার্পণ করিলেন। বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তাহারা একে অন্যের গায়ে ঢলিয়া পড়িল, মুখে দিব্য হাসি। বালকবালিকাদ্বয়ের ভাবাবেশ দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত।

তৎকালীন এইরূপ আনন্দোৎসব এবং মহাভাবের বর্ণনা মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদের তন্ময়তা আসিত। মনে হইত, আমরাও বুঝি এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারাই দক্ষিণেশ্বর-লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বলিতাম, —মা, বড়ই ভাল লাগছে, আরও বলুন।

মা বলিতেন,—তখন যদি তোমরা আসতে মা! দক্ষিণেশ্বরের সেই আনন্দের চিত্র শুধু কথার বাঁধুনিতে কি ক'রে বোঝাব? সে-সব ব'লে শেষ করা যায় না। অফুরন্ত সে আনন্দ। সময় নেই, অসময় নেই, দিনের পর দিন এই আনন্দোৎসব চলতো।

কেবল ভাগবতপ্রসঙ্গ, ভাবসমাধি এবং আনন্দোৎসবেই দক্ষিণেশ্বরের লীলা সমাপ্ত হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর এক বিরাট মহীরুহ; ঠাকুর তাহার মূল, আর মাতাঠাকুরাণী তাহার শাখাপল্লব—সকলকে স্নেহ ও ছায়ায় আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন ছিল বিশ্বকল্যাণে নিবেদিত, দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী। লীলাসঙ্গিগণের সহিত বিমল আনন্দ উপভোগের মধ্যেও তাঁহারা কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গে তরঙ্গে শুনিতে পাইতেন—পৃথিবীর পাপতাপাহত জীবের আর্ত্তনাদ, অভাব অভিযোগের হাহাকার। জীবের প্রতি সহানুভূতিতে তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইত, অহেতুকী করুণা বহিয়া যাইত জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল দীন, আর্ত্ত ও তৃষিতের প্রাণের পিপাসা মিটাইতে।

রসিক দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ীর আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে। সেই অবসরে সে দূর হইতেই একবার করিয়া ঠাকুর মহাশয়কে দর্শন করিয়া যাইত; আর লক্ষ্য করিত, তাঁহার কাছে প্রত্যহ কত ভক্ত আসে, কত বড় লোক আসে গাড়ী করিয়া। বাবাকে ঘিরিয়া কত কীর্ত্তন, কত নর্ত্তন, কত আনন্দ! ঈশ্বরের কথায় বাবার ঘন ঘন ভাব হয়। কত লোক তাঁহার কৃপা পায়, কত পাপীতাপী উদ্ধার হইয়া যায়।

বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে,—

"করুণা নিরখনে, প্রেমরস বরিখনে অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে, অতুল প্রেমদানে মুঞি সে হইলুঁ বঞ্চিত॥"

রসিকেরও প্রাণের আকিঞ্চন পদকর্ত্তা চৈতন্যদাসের মতই। তাহার প্রাণে সাধ হয়, সেও এইসব ব্যাপার একটু ভাল করিয়া দেখে, বাবার

একটু কৃপা পায়। কিন্তু সে-যে মেথর হইয়া জন্মিয়াছে। প্রাণের কথা কোন্ সাহসে বাবাকে জানাইবে? অবশেষে তাহার মাথায় এক বুদ্ধি জাগিল। নহবতের নিকট দিয়া বারবার যাতায়াত আরম্ভ করিল; মা-ঠাকরুণের দর্শন যদি একবারটি পায়, তবে একটা উপায় হয়তো হইতে পারে। এই আশা লইয়া সে আসে, আর নৈরাশ্যে ফিরিয়া যায়। সেই অসূর্য্যম্পশ্যা মাতার দর্শন তাহার ভাগ্যে আর মিলে না।

মাতাঠাকুরাণীরও মনে হয়, এই পথে একটি লোকের আনাগোনা যেন বাড়িয়া গিয়াছে। লোকটি কে, কি তাহার উদ্দেশ্য, জানা দরকার। একদিন বাহির হইয়া দেখেন, কালীবাড়ীর ঝাড়ুদার নহবতের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। রসিকও বুঝিল, এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। দণ্ডবৎ করিয়া করজোড়ে সে কুণ্ঠাজড়িতকণ্ঠে বলিল,—আজ্ঞে মা-ঠাকরুণ, সারা মুল্লুকের লোক বাবার কাছে আসে, বাবার দয়া হ'লে না-কি ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যায়। অধমের উপর যদি দেবতার একটুখানি দয়া হয় মা। আপনাদের চরণেই তো প'ড়ে আছি।

কাঙ্গাল সন্তানের কাতরতায় দয়াময়ীর প্রাণ গলিয়া যায়। আহা গো, বেচারা মেথর, তাই বলিতে সাহসে কুলাইতেছে না। তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন,—আচ্ছা বাবা, আমি বলবো।

সুযোগ বুঝিয়া মা ঝাড়ুদারের প্রার্থনা ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন। ঠাকুর উত্তরে আর কিছুই বলিলেন না, মাত্র একটি—হুঁ।

রসিকের ভাগ্য নিশ্চয়ই ভাল। দয়াময়ী তাহার প্রার্থনাপূরণের ভার লইয়াছেন। পরদিবস রসিক নিত্যকর্ম্ম শেষ করিয়া পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতেছে, হাতে ঝাঁটা; ঠাকুরও ভাবে গদগদ হইয়া সেই দিকেই যাইতেছেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ। নিজের আস্পর্দ্ধার কথায় রসিকের নিজেরই আজ ভয় হয়, হাত হইতে অজ্ঞাতে ঝাঁটা পড়িয়া যায়। বাবার যাইবার পথ হইতে সরিয়া দাঁড়ায় সে। কত দূরে আর যাইবে? প্রেমের ঠাকুর 'আয়, আয়' বলিয়া ভাবাবেশে রসিককে জড়াইয়া ধরিলেন।—তুই না-কি ঈশ্বরকে দেখতে চাস! বলিয়াই নিশ্চল, সমাধিস্থ।

রসিকের অবস্থা কল্পনার অতীত। সেই দিব্যস্পর্শে তাহার দেহ থর থর করিয়া কাঁপে। আনন্দের আতিশয্যে সে বাহ্যজ্ঞানহীন, নয়ন ছাপাইয়া ঝরে অশ্রুধারা। জ্ঞান যখন সে ফিরিয়া পাইল সেইস্থানে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

তাহার পর মনে পড়ে দয়াময়ীর কথা। উঠিয়া যায় নহবতের নিকটে, পথের ধূলায় পড়িয়া ভাগ্যবান রসিক সাশ্রুলোচনে মাতা-ঠাকুরাণীর উদ্দেশে জানায় প্রাণের কৃতজ্ঞতা।

একদিন ভবতারিণীর মন্দিরে বসিয়া ঠাকুর মায়ের রূপ চিন্তা করিতে-ছিলেন।—বিশ্বরূপে আলো-করা মা আমার বিশ্বম্ভরা, ত্রিভুবন আলো করিয়া আছেন। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকলই মহামায়ার অনন্ত রূপ। বিদ্যা আর অবিদ্যা, মায়েরই রূপ। মাগো, একমাত্র তুমিই মাতৃরূপে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ,—

"বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ"—

—কে ও?

চিন্ময়ী মূর্ত্তির পশ্চাতে একখানি রমণীর মুখ যেন ভাসিয়া উঠিল।

—কে মা তুমি?

নাঃ, কেউ তো নয়।

মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া চিন্তামগ্নচিত্তে ঠাকুর প্রাঙ্গণ দিয়া যাইতেছেন, দেখেন—সালঙ্কারা এক রমণী 'বাবা, বাবা' বলিয়া তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। আশ্চর্য্য হইয়া বলেন,—ওমা, এইমাত্র যে তোমার কাঁচা মুখখানি দেখে এলুম গো, মায়ের মূর্ত্তির পেছনে! মা কখন-যে কোন রূপে দেখা দেন, কে জানে!

রমণী প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে ঠাকুর বাধা দিয়া বলিলেন,—না, না, প্রণাম তো চলবে না। মাতৃরূপে দেখলুম, তুমি যে আমার মা।

মধুর মাতৃ-সম্বোধন শ্রবণ করিয়া ভাবাবেগে রমণীর তুই চক্ষে বহিতে থাকে অশ্রুধারা।

এই রমণীর নাম—রমণী। তিনি একজন স্খলিতা নারী, অন্তরে অনেক ব্যথা সঞ্চিত। তিনি নিঃসন্তান, ঠাকুর তাঁহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করিয়াছেন, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাবের উদয় হইল।

একদিন নহবৎ-ঘরে মাতৃসকাশে রমণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—কৈ গো আমার বৌমা, কোথায় তুমি? একবার দেখতে এলুম।

মাতাঠাকুরাণী বাহিরে আসিয়া বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর যাঁহাকে 'মা' ডাকিয়াছেন, ইনি সেই রমণী। রমণী তাঁহার পদধূলি লইতে উদ্যত হইতেই মা তাঁহার হাতখানি ধরিয়া বলিলেন,—সে হয় না, ঠাকুর তোমায় 'মা' ডেকেছেন, তুমি-যে আমার শাশুড়ী গো।

এইবার মাতাঠাকুরাণী প্রণাম করিতে অর্দ্ধাবনত হইতেই রমণী তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন,—আমার এ সর্ব্বনাশ আর করো না মা। তুমি আমার বৌমা, তুমি আমার মা, আমার ইষ্টদেবী। ছেলে আমায় মা ব'লে গ্রহণ করেছেন, তুমিও আমায় ধুয়ে মুছে নাও মা। এই বলিয়া রমণী কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যথায় মা-ও কাঁদেন।

সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য।

শান্ত হইয়া রমণী বস্ত্রাঞ্চল হইতে কিছু ভোজ্য দ্রব্য বাহির করিয়া বধূমাতার হস্তে দিলেন, ঠাকুরের সেবার জন্য। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর যাঁহাকে মা বলিয়াছেন, তাঁহার স্বভাব, চরিত্র, জাতি, কুল কিছুরই বিচার করিবার প্রয়োজন নাই।

অনেকের আনীত দ্রব্যাদি খাইলে ঠাকুরের অতৃপ্তি হইত, পাকাশয়ে গোলযোগ হইত। তিনি সকলের দ্রব্য আহার করিতেন না, অনেকের দ্রব্য তাঁহার গলাধঃকরণ হইত না। মা তাহা বিশেষরূপেই অবগত ছিলেন। ইহা জানিয়াও তিনি এই রমণীর দ্রব্য গ্রহণ করিতেন এবং ঠাকুরও তাহা ভোজন করিতেন।

ঠাকুর একবার কাশীবৃন্দাবন-দর্শনে গিয়াছিলেন। সঙ্গে মথুরানাথ, হৃদয়রাম প্রভৃতি। পথিমধ্যে বৈদ্যনাথধামে অবস্থানকালে একদিন তিনি শহরের বাহিরে চলিয়া গেলেন, তথায় দরিদ্র পল্লীবাসীদিগের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তৃণপত্রে নির্ম্মিত তাহাদের কুটীর, তাহাও এমনই জীর্ণ যে রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত হইতে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষা হয় না। জীর্ণ কুটীরও সকলের ভাগ্যে জোটে না, কেহ আবার বৃক্ষতলেই আশ্রয় লইয়াছে। তৈলাভাবে কেশ রুক্ষ, অন্নাভাবে দেহ শীর্ণ। ক্ষুধার জ্বালায় বালকবালিকাগণ চীৎকার করিতেছে, শিশু ভূমিতলে লুটাইতেছে। নারীর বসন শতগ্রন্থিযুক্ত, লজ্জা নিবারণে অক্ষম।

দয়াল ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত হইল; দারিদ্র্যের এমন করুণ রূপ পূর্ব্বে কখনও তিনি প্রত্যক্ষ করেন নাই। রসদ্‌দার মথুরানাথকে বলেন,—ওগো সেজবাবু, এ দৃশ্য তো সহ্য করা যায় না। মা তোমায় প্রচুর অর্থ দিয়েছেন, তুমি এদের রুক্ষ্ মাথায় একটু তেল দিয়ে দাও, পেট ভ'রে এদের খেতে দাও, আর একখানি ক'রে কাপড় দাও। আমার মায়েরই এই এক রূপ। এদের সেবা ক'রে তুষ্ট কর বাবা। তোমার কল্যাণ হবে।

এতগুলি দরিদ্র নরনারীকে তুষ্ট করিবার মত অর্থ বিদেশে এখন কোথায় পাইবেন মথুর? তীর্থযাত্রার ব্যয়ও লাগিবে অনেক। বাবার নির্দ্দেশ কিভাবে পালন করিবেন তিনি? ইতস্ততঃ করিয়া বলেন,—বাবা, অনেক খরচ পড়বে এতে। এত টাকার ব্যবস্থা এখানে কি ক'রে হবে?

বাবার হৃদয়গোমুখী তখন উদ্বেল, মহামায়ার অর্দ্ধ-উলঙ্গ বুভুক্ষা-পীড়িত সন্তানদিগের দুঃখে; নয়নপথে করুণাগঙ্গা বহিয়া যাইতেছে। তাঁহার অবকাশ নাই মথুরের বিচার এবং অর্থাভাবের কথা ভাবিবার।

—তোমার টাকায় কুলোবে না? আচ্ছা।

সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। ছিলেন দূরে দণ্ডায়মান, এইবার দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। রুষ্ট হইয়া বলেন মথুরকে,—যা তবে, তোর যেখানে খুশী তুই যা, করগে তীর্থধর্ম্ম। আমি এখানেই রইলুম এই অনাথ কাঙ্গালদের সঙ্গে। কোথাও যাবো না আমি।

আশ্চর্য্য মনে হয় সেইসকল বালকবৃদ্ধ নরনারীর এই অদ্ভুত মানুষকে দেখিয়া।—এমন দরদী প্রাণ হয় মানুষের!

সমূহ বিপদ গনিলেন মথুর।

বাবার নির্দ্দেশ পালিত না হইলে তিনি এস্থান ত্যাগ করিবেন না। অগত্যা প্রতিশ্রুতি দিলেন, বাবার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হইবে। তাঁহার পায়ে ধরিয়া, তুষ্টিবিধান করিয়া, লইয়া চলিলেন তাঁহাকে বাসস্থানে।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য অবিলম্বে কলিকাতায় নির্দ্দেশ চলিয়া গেল। সকল ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন সহৃদয় মথুর কয়েকদিনের মধ্যেই।

কতকাল পরে কে জানে, দীনদুঃখীর রুক্ষ কেশ ও শুষ্ক দেহ তৈলসিক্ত হইল, উদরপূর্ত্তি করিয়া তাহারা নানাবিধ উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিল, নূতন বস্ত্র পাইল, নগদ দক্ষিণাও কিছু লাভ হইল।

—তবে কি স্বর্গ হইতে দেবতা নামিয়া আসিলেন ধরায়, দুঃখীর দুঃখ-মোচন করিতে? আবালবৃদ্ধবনিতা অনাথ দরিদ্রের সকৃতজ্ঞ হাস্যে জীর্ণ কুটীরগুলিও যেন আজ আনন্দোজ্জ্বল হইয়া উঠিল! দীনদুঃখীর মুখে হাসি দেখিয়া প্রেমাবতার শ্রীরামকৃষ্ণেরও আনন্দ আর ধরে না, শিশুর মত তিনিও আনন্দ করিতে লাগিলেন।

প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন দানবীর মথুরকে।

একদিন ঠাকুর গঙ্গার তরঙ্গরঙ্গ দর্শন করিতেছিলেন। উন্মাদিনীর ন্যায় নাচিয়া গাহিয়া সুরধুনী ছুটিয়াছে সাগরের সঙ্গে মিলিত হইতে।······

অকস্মাৎ এক আর্ত্তনাদ!

সুরধুনীর নৃত্যসঙ্গীত যেন আচম্বিতে থামিয়া যায়। ঠাকুরের ভাব-তরঙ্গও থামিয়া যায়, চাহিয়া দেখেন—গঙ্গাবক্ষে নৌকার মাঝিদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদ। এক সবল ব্যক্তি অপর এক দুর্ব্বল ব্যক্তির পিঠে দারুণ আঘাত করিতেছে, প্রহৃত ব্যক্তি যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে।

সেই প্রচণ্ড আঘাত যেন ঠাকুরের পিঠেও আসিয়া পড়িল। তীব্র যন্ত্রণায় তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, আর হাত বুলাইতে

লাগিলেন পিঠে। তাঁহার চীৎকার শুনিয়া লোক ছুটিয়া আসিল; সবিস্ময়ে তাহারা দেখে, সত্যই ঠাকুরের পিঠে সদ্য আঘাতের চিহ্ন, লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে!

কেবল জীবের ব্যথাতেই তাঁহার চিত্ত ব্যথিত হইত না, এক এক সময়ে তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইত যে, তৃণরাজির উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেও পারিতেন না। তৃণেরও প্রাণ আছে, তাহাদের দেহে আঘাত লাগিবে। পত্রপুষ্প বৃন্তচ্যুত করিতে পারিতেন না, আহা, তাহাদের কোমল দেহে ব্যথা লাগিবে!

ইহা সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতির কথা, বেদান্তের কথা।

ত্রিতাপদগ্ধ জীবের কল্যাণেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের শুষ্ক জ্ঞানকে ভক্তিরসসিক্ত করিয়া তাঁহার অন্তরঙ্গগণের হৃদয় আলোকিত করিলেন।

একদিন সমবেত সকলকে বৈষ্ণবধর্ম্মের সারমর্ম্ম বুঝাইয়া প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর,—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্ব্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্ব্বজীবে দয়া' (প্রকাশ করিবে)। 'সর্ব্ব জীবে দয়া' পর্য্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্দ্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা! কীটানুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না,—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।"

"ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐ কথা সকলে শুনিয়া যাইল বটে, কিন্তু উহার গূঢ় মর্ম্ম কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা করিতে পারিল না। একমাত্র নরেন্দ্রনাথই সেদিন ঠাকুরের ভাবভঙ্গের পরে বাহিরে আসিয়া বলিলেন, 'কি অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্ম্মম বলিয়া প্রসিদ্ধ বেদান্তজ্ঞানকে ভক্তির সহিত সম্মিলিত

করিয়া কি সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন করিলেন।···সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দেখিতে পাওয়া যায়, ততদিন যথার্থ ভক্তি বা পরাভক্তিলাভ সাধকের পক্ষে সুদূরপরাহত থাকে। শিব বা নারায়ণ-জ্ঞানে জীবের সেবা করিলে ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপূর্ব্বক যথার্থ ভক্তিলাভে ভক্তসাধক স্বল্পকালেই কৃতকৃতার্থ হইবে, একথা বলা বাহুল্য। ···ভগবান যদি কখন দিন দেন ত আজি যাহা শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্ব্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।" (৩)

আর একদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ নহবতের সন্নিকটে গৌরীমাকে বলেন, "দ্যাখ গৌরি, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা।" গৌরীমা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "এখানে কাদা কোথায় যে চট্‌কাবো? সবই যে কাঁকর।"

হাসিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি? এ দেশের মায়েদের বড় দুঃখু, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।"

গৌরীমা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই, পরে উপলব্ধি করিয়াছিলেন গুরুবাক্যের তাৎপর্য্য। তখন বিস্মিত হইয়া নিজের অন্তরে অনুভব করিলেন, আত্মভোলা ঠাকুরের অন্তরে দীনদুঃখি-নিপীড়িতের জন্য কত গভীর ব্যথা সঞ্চিত, কতভাবে জীবের দুঃখে ঝরিয়া পড়িত তাঁহার হৃদয়-বিগলিত করুণাধারা।

সেই দৃষ্টিতে সমাজসংসারের দিকে চাহিয়া শিষ্যা মানসনেত্রে দেখিতে পাইলেন,—অজ্ঞতা ও অবিবেক পুঞ্জীভূত হইয়া মূক নারীহৃদয়ের উপর পাষাণভারের মত চাপিয়া আছে। গুরুকর্ত্তৃক জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় উন্মীলিত দিব্য নেত্রে তিনি যেন আজ নূতনভাবে এইসকল দেখিতে পাইলেন। আজ নূতন করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিল,—সত্যই তো, নারীর ব্যথা যদি নারী না অনুভব করে, নারীর ব্যথা যদি নারী না দূর করে, তবে আর করিবে কে?

এইভাবে দক্ষিণেশ্বরের লীলাতীর্থে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এবং 'জ্যান্ত জগদম্বা'-জ্ঞানে নারীসেবার নব দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই মহান ব্রতে প্রেরণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাময় হৃদয় হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছিল শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দ এবং সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতার অন্তরে এবং ইহাই অদূরভবিষ্যতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ ও অনুপ্রাণনায়।

দক্ষিণেশ্বরে মাতাঠাকুরাণী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের এবং তাঁহার সাধনার পরিপূর্ণতার কথা বুঝিতে হইলে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতাঠাকুরাণীর অবদান লঘু অথবা পৃথক করিয়া দেখিলে ভুল হইবে। তাঁহারা একে অন্যের পরিপূরক। ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরাণী উভয়ের জীবন, চরিত্র এবং সাধনা ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত,—এই সত্য স্মরণ রাখিয়া সমগ্রভাবে বিচার করিলে, তবেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের চরম সিদ্ধি এবং পরিপূর্ণতার সম্যক উপলব্ধি হইবে।

মাতাঠাকুরাণীর প্রসঙ্গে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ও সারদা—সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। * * * ও কি যে সে! ও আমার শক্তি।"

তিনি বলিতেন, "ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন শক্তি বলি, কিন্তু একই বস্তু; অভেদ। অগ্নি বললে, অমনি দাহিকাশক্তি বুঝায়; দাহিকাশক্তি বললে, অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে অন্যটাকে চিন্তা করবার যো নাই।" (১)

ঠাকুর এবং ঠাকুরাণী একই সত্তা, একই মূল হইতে উদ্ভূত যেন সহস্রদল কমল-কমলিনী। একজন পূর্ণবিকশিত কমল, সকলকে সৌরভ ও মধু বিতরণ করিতেছেন; অপরজন অবগুণ্ঠনবতী কমলিনী,—ধ্যানমগ্না। বাহিরের মানুষ তাঁহার রূপও দেখিতে পাইল না, স্বরূপও বুঝিতে পারিল না। কৃপাপরবশ হইয়া মা আত্মপ্রকাশ না করিলে মাকে জানিবার উপায় নাই, অর্গল মোচন না করিলে জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার পথ নাই। মোহমুগ্ধ জগৎকে এই তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজীবন মাতৃ-পূজা করিয়াছেন। আর মাতৃপূজার পূর্ণাহুতি দিয়াছেন ষোড়শীপূজায়।

জগতের কল্যাণে ঠাকুর জ্ঞানদায়িনী এবং কল্যাণরূপিণী মাতাকে আত্মপ্রকাশ করিতে আহ্বান জানাইলেন,—

"আবিরাবীর্ম এধি।"

—হে স্বপ্রকাশ, তুমি প্রকাশিত হও।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবাহন ও পূজা নিষ্ফল হয় নাই, তাঁহার পূজিতা অবগুণ্ঠনবতী সহধর্ম্মিণী এইবার ধীরে ধীরে নিজেকে বিশ্বকল্যাণে প্রকাশ করিতে লাগিলেন জগজ্জননীরূপে।

শ্যামাসুন্দরী দুঃখ করিতেন, "এমন পাগল জামায়ের সঙ্গে আমার সারদার বে দিলুম, আহা! ঘরসংসারও করলে না, ছেলেপিলেও হল না; মা বলাও শুনলে না!' একদিন ঠাকুর তাই শুনতে পেয়ে বলছেন, 'শাশুড়ী ঠাকরুণ, সেজন্য আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মেয়ের এত ছেলেমেয়ে হবে, শেষে দেখবেন—মা ডাকের জ্বালায় আবার অস্থির হ'য়ে উঠবে।" (৪)

অতঃপর একদা ঠাকুর স্পষ্ট ভাষায় মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করেন,—তোমার কি ছেলেপিলের ইচ্ছে আছে না-কি মনেতে?

মা ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন,—না, আমি কিছুই চাই না, চাই কেবল তোমার আনন্দ।

—বেশ বেশ, তোমার অনেক ভাল ভাল ছেলে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যদ্রষ্টা; ভবিষ্যৎ জানিয়াই তিনি মাকে আরও কতদিন বলিয়াছিলেন,—তোমার কত সন্তান আসবে, কত দেশবিদেশের ভক্ত আসবে; তুমি সকলের মা হবে, সকলকে দেখবে।

মায়ের সম্মুখে বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র। ধর্ম্মার্থীদিগকে পথের সন্ধান দিতে হইবে, জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তিতে সকলকে পালন করিতে হইবে, অভয়ামূর্ত্তিতে দুঃখী, আর্ত্ত ও উদ্‌ভ্রান্তকে সান্ত্বনা দিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার আত্মগোপন করিয়া থাকিলে চলিবে কেন?

নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলেন,—এমন চোখ তোমায় দেখাবো, যেমনটি আর কখনো দেখনি! নরেন একেবারে মূর্ত্তিমান জ্ঞান, সপ্তর্ষিমণ্ডল থেকে এসেছে। কী তা'র চোখ দু'টি, তুমি দেখো।

মা তাহাতে বলিলেন,—কি ক'রে তা'কে দেখবো? আমি তো ছেলেদের সামনে বেরুই না।

—আচ্ছা, সে হবে'খন।

সেইদিন এই পর্য্যন্ত। অন্য একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে নহবৎ-ঘরে পাঠাইলেন, কি-একটা জিনিষ আনিতে। তিনি নহবতের নিকট আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে ডাকিয়া সেই জিনিষ চাহিলেন।

মায়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পর নহবৎ-ঘরের চারিদিক দরমার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বেড়ার ফাঁক দিয়া তিনি নরেন্দ্রনাথকে দেখিলেন। —সত্যই চমৎকার চোখ, দেখলে চোখ জুড়োয়। কেমন স্বচ্ছ, যেন আরশি!

লাটু মহারাজ একদিন ধ্যানে বসিয়াছেন, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আরে, তুই যাঁর ধ্যান কচ্ছিস, তিনি তো নবতে ময়দা ঠেসছেন।" অনন্তর তাঁহাকে মায়ের নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন, "এ ছেলেটি বেশ। এ তোমার ময়দা ঠেসে দেবে, রুটি বেলে দেবে। তোমার যখন যা' প্রয়োজন হবে একে বলো, ক'রে দেবে।"

এইভাবে লাটু মহারাজ মায়েরও আশ্রয় পাইলেন।

আর একদিন আর একটি সন্তানকে ঠাকুর নহবতে লইয়া গেলেন এবং মাতাঠাকুরাণীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ওঁর চরণ ধ'রে প'ড়ে থাক, ওখানে তোর সব হবে।" ইনি যোগেন মহারাজ।

সারদা মহারাজকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—তোর দীক্ষা ঐ ঘরে হবে, (অর্থাৎ নহবতে মায়ের নিকট হবে)।

সন্ন্যাসী সন্তানগণ সকলেই ঠাকুরের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত নহেন। অন্ততঃ দুইজন—সারদা মহারাজ এবং যোগেন মহারাজ—মাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

ঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল বিবাহিত, ইহাতে ঠাকুরের মনে ভাবনা হইয়াছিল। বধূকে একবার স্বচক্ষে দেখিতে চাহিলেন। বধূ দক্ষিণেশ্বরে আসিলে তাঁহাকে আপাদমস্তক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন,—না, মেয়েটি বিদ্যাশক্তি, রাখালের ক্ষতি করিবে না।

প্রথমবার পুত্রবধূর মুখদর্শনকালে তাঁহাকে কিছু দিবার প্রথা

আছে। মায়ের নিকট ঠাকুর সংবাদ পাঠাইলেন,—আমার রাখালের বৌ এসেছে। খালি হাতে দেখতে নেই, টাকা দিয়ে যেন আশীর্ব্বাদ করেন।

মা পরমস্নেহে পুত্রবধূকে গ্রহণ করিলেন, টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। বধূও আজীবন মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিয়াছেন।

•

এইসকল অন্তরঙ্গসন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে মায়ের পরিশ্রমও বহুল-পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল। সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার দায়িত্ব তাঁহার উপরই ছিল। কখন কি প্রয়োজন হইবে, কোনই স্থিরতা নাই; সময়-অসময়েরও কোন হিসাব নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির আবার বিভিন্ন রুচি। ক্ষুদ্র নহবতের মধ্যে বিরাট সমারোহ লাগিয়াই থাকিত।

মা বলিয়াছেন, "ঠাকুরের রান্না হত, * * * অপর সব ভক্তদের রান্না হত। * * * দিন রাত রান্নাই হচ্ছে। এই হয়ত রামদত্ত এল। গাড়ী থেকে নেমেই বলছে, 'আজ ছোলার ডাল আর রুটি খাব।' আমি শুনতে পেয়েই এখানে রান্না চাপিয়ে দিতুম। তিন চার সের ময়দার রুটি হত। রাখাল থাকত, তার জন্য প্রায়ই খিচুড়ি হত।" (৪)

দক্ষিণেশ্বরে যে-সকল ত্যাগী সন্তান আসিতেন, ঠাকুরের নির্দ্দেশমত তাঁহারা কেহ তাঁহার ঘরে, কেহ মন্দিরে, কেহ পঞ্চবটীতলায়, কেহ-বা বেলতলায় বসিয়া জপধ্যান করিতেন। ক্ষুধায় কষ্ট হইবে ভাবিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে ডাকিয়া খাইতে দিতেন। তিনি বলিতেন, "ওরে, তোরা খেয়ে নে, তারপর আবার জপধ্যান করবি। মা ত পর নন, পেট ঠাণ্ডা ক'রে ডাকলেও মা রাগ করবেন না।"

"একদিন রাখালের বড় ক্ষিধে পেয়েছে, ঠাকুরকে বল্‌লে। ঠাকুর ঐ কথা শুনে গঙ্গার ধারে গিয়ে 'ও গৌরদাসী, আয় না, আমার রাখালের যে বড় ক্ষিধে পেয়েছে'—বলে চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন। তখন দক্ষিণেশ্বরে খাবার পাওয়া যেত না। খানিক পরে গঙ্গায় একখানা নৌকা দেখা গেল। নৌকাখানা ঘাটে লাগতেই তার মধ্য হতে বলরাম বাবু, গৌরদাসী প্রভৃতি নামলো এক গামলা রসগোল্লা

নিয়ে। ঠাকুর ত আনন্দে রাখালকে ডাকতে লাগলেন, 'ওরে আয় না রে, রসগোল্লা এসেছে, খাবি আয়। ক্ষিধে পেয়েছে বললি যে।' রাখাল তখন রাগ করে বল্‌তে লাগল, 'আপনি অমন করে সকলের সামনে ক্ষিধে পেয়েছে বল্‌লেন কেন?' তিনি বল্‌লেন, 'তাতে কি রে, ক্ষিধে পেয়েছে, খাবি, তা বল্‌তে দোষ কি?" (৪)

এমনই আন্তরিক এবং গভীর ছিল ঠাকুরের ভালবাসা। তাই একদিন বাবুরাম মহারাজ তাঁহার গর্ভধারিণীকে ঠাকুরের প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—তোমার কী ভালবাসা? ঠাকুরের ভালবাসার তুলনা নেই। কোটি মায়ের ভালবাসা জোড়া দিলেও আমাদের ঠাকুরের ভালবাসার সঙ্গে তুলনা হয় না।

একদা নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলে মাতাঠাকুরাণীকে ঠাকুর বলিলেন,—আজ নরেন খাবে, ভাল করে রেঁধো। মা যত্নসহকারে তাঁহার জন্য রুটি, মুগের ডাল ইত্যাদি রন্ধন করিলেন। নরেন্দ্রনাথের আহার হইয়া গেলে, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—রান্না কেমন খেলি রে?

উত্তরে তিনি বলিলেন,—হয়েছে ভালই, রুগীর পথ্যির মত।

মায়ের ঘরে গিয়া ঠাকুর বলিলেন,—নরেনের জন্যে ভাল ক'রে ঘন ডাল আর মোটা রুটি তৈরি করবে। আজকের খাওয়া পছন্দ হয়নি।

পরে একদিন মা সেইরূপ ডালরুটি প্রস্তুত করিয়া নরেন্দ্রনাথকে খাইতে দিলেন, তাহা খাইয়া নরেন্দ্রনাথ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। ঠাকুরও প্রীত হইয়া মাকে তাহা জানাইয়া দিলেন।

সন্তানদিগের পরিতোষের জন্য মাতাঠাকুরাণী প্রসন্নমনে সকলপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতেন; এবং তিনি যে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত স্নেহযত্ন করিতেন, ইহাতে ঠাকুর তৃপ্তি অনুভব করিতেন। কিন্তু ঠাকুরের অন্তর মাতৃস্নেহে পূর্ণ থাকিলেও সন্তানদিগের ইষ্টানিষ্টের প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য-পালনপূর্ব্বক ভগবানের পথে অগ্রসর হইবেন, তাঁহাদিগের দেহমনের সংযম, এবং সর্ব্বাধিক জিহ্বার সংযম থাকা প্রয়োজন; এই বিষয়ে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন।

জনৈক সন্তানের রুচিকর খাদ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল। মা তাহা জানিতেন এবং স্নেহবশতঃ তাঁহার রুটিতে কোন কোন দিন কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে ঘৃত মাখিয়া দিতেন। ঠাকুর তাহা জানিতে পারিয়া একদিন নহবতে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উদ্বিগ্নচিত্তে বলিলেন,—ছ্যাখ গো, ছেলেরা সব বয়ঃস্থ, অত পরিপাটি ক'রে খাওয়া তো ভাল নয়। জিহ্বার সংযম না থাকলে সাধু হবে কি ক'রে ?

অভিযোগশ্রবণে স্নেহময়ী মাতা কুণ্ঠিত হইয়া মনে করিলেন,—আহা, বাছারা একটু খাবে না ! কি আছে আমার ঘরে, কি-ই-বা পরিপাটি ক'রে দিতে পারি ওদের। পুনরায় ভাবিয়া দেখিলেন, উনি তো ঠিক কথাই বলেছেন, ছেলেরা সব সাধু হ'তে এসেছে, যদি ওদের লোভ বেড়ে যায়। সুতরাং ঠাকুরের কথার উত্তরে ভালমন্দ কিছুই আর তিনি বলিলেন না। তাঁহাকে নির্ব্বাক দেখিয়া ঠাকুর বুঝিলেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

ভক্তিমতী মায়েদের মধ্যে লক্ষ্মীদিদি এবং গৌরীমা প্রায়শঃ মায়ের সঙ্গে নহবতে বাস করিতেন। গোপালের মা, ভাবিনী এবং গোলাপমাও আসিয়া মধ্যে মধ্যে মায়ের সঙ্গে থাকিতেন। যোগেনমা, কৃষ্ণভাবিনী দেবী (বলরাম বসুর পত্নী), অসীমের মা (চুনীলাল বসুর পত্নী), নিকুঞ্জবালা দেবী (শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়ের পত্নী), বঙ্কিম সেনের পত্নী এবং আরও কতিপয় ভক্তিমতী মহিলাও মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন এবং কদাচিৎ নহবতে রাত্রিযাপনও করিতেন।

পূজনীয়া লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তসংঘে লক্ষ্মীদিদি নামে সুপরিচিত। ঠাকুরের মধ্যম সহোদর রামেশ্বরের তিন সন্তান,—রামলাল, লক্ষ্মীমণি ও শিবরাম। লক্ষ্মীঠাকুরাণীর মতই রূপলাবণ্যবতী আমাদের লক্ষ্মীদিদি ; বিধাতা যেন কাঁচা সোনা বাটিয়া তাঁহার অঙ্গে মাখিয়া দিয়াছেন ! যেমন বাহির, তেমনই তাঁহার অন্তর—পবিত্রতা ও সরলতায়,

পরিপূর্ণ। বাল্যকাল হইতে ঠাকুরদেবতার-পূজা খেলাতেই তাঁহার অধিক আনন্দ ছিল।

একাদশবর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু দুইমাস পরেই স্বামী নিরুদ্দেশ হইলেন। লোকাচারমতে স্বামীর নিরুদ্দেশের দ্বাদশবর্ষ পরে কুশপুত্তলিকা-দাহপূর্ব্বক লক্ষ্মীদিদি বৈধব্যবেশ ধারণ করেন। স্বামীর সংসার আর করা হইল না, স্বামীর সম্পত্তির অংশও তিনি গ্রহণ করিলেন না। ঠাকুর পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, লক্ষ্মী মা-শীতলার অংশ। সাধারণ মানুষের ভোগে আসিবে না, সে বিধবা হইবে। ভালই হইবে, বাড়ীর ঠাকুরদেবতার সেবাপূজা করিবে।

মাতাঠাকুরাণী অপেক্ষা লক্ষ্মীদিদি বছর দশেকের কনিষ্ঠ। তিনি বাল্যকাল হইতেই মায়ের সঙ্গিনী। কামারপুকুরে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে পশ্চিমাঞ্চলের জনৈক সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, লক্ষ্মীদিদি তাঁহার নিকট শক্তিমন্ত্র প্রাপ্ত হন। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পর ঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র লিখিয়া দেন, কর্ণেও উচ্চারণ করিয়া শুনাইয়া দিয়াছিলেন।

লক্ষ্মীদিদি চিরকাল আনন্দময়ী, আনন্দদায়িনী এবং কৌতুকপ্রিয়া। খুল্লতাতের ন্যায় তাঁহারও সঙ্গীত, কীর্ত্তন, অভিনয় এবং অনুকরণ করিবার শক্তি ছিল। ঠাকুরের কণ্ঠস্বর এমন অনুকরণ করিতেন যে, শুনিয়া মানুষ আশ্চর্য্য হইত। তিনি নৃত্য করিতেও পারিতেন। এইভাবে সাধারণ এবং অসাধারণ নানাবিধ গুণের তিনি অধিকারিণী ছিলেন।

গৌরীমাও ব্রাহ্মণের কন্যা। বাল্যকাল হইতেই তিনি অতিশয় ভগবদ্‌-ভক্তিপরায়ণা এবং কৌমারব্রতধারিণী। দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্ত্তী নিমতে-ঘোলা গ্রামে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি বাল্যকালেই দীক্ষা লাভ করেন। তাহার পর সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া আসমুদ্রহিমাচল ভারতের বহু তীর্থে বহু বৎসর তিনি কঠোর তপস্যায় অতিবাহিত করেন। পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীগুরুর চরণপ্রান্তে আসিয়া মিলিত হইলেন ১২৮৯ সালে, তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ।

ইহারও দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে ভক্ত বলরাম বসুর পিতার সহিত তাঁহার পরিচয় হয় বৃন্দাবনধামে। তিনি গৌরীমাকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহাদিগের বাটীতে গৌরীমা অবস্থান করিলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। অতঃপর কলিকাতায় আসিলে গৌরীমা সাধারণতঃ তাঁহাদের বাগবাজারস্থ বাটীতেই থাকিতেন। ঠাকুরের সহিত বলরাম বসুর প্রথম সাক্ষাতের কয়েকমাস পরে ঐ বাটীতে অবস্থানকালে গৌরীমার একদিন ভাবাবেশ হয়। বসুপরিবারের মহিলাবৃন্দ তাঁহাকে সেই অবস্থাতেই সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া ঠাকুরের নিকট লইয়া আসেন।

গৌরীমার বস্ত্রাবৃত মুখ ঠাকুর দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু—

"আকার কি হৃদি-ভাব কি প্রকার কার।
প্রভুদেব সুবিদিত সব সমাচার॥
অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইয়া গৌরমায়।
বলরামে পুছিলেন প্রভু দেবরায়॥
কেবা এই ভক্তিমতী কহ পরিচয়।
গুপ্ত উপযুক্ত মুখ ইহার ত নয়॥
লজ্জা-ঘৃণা-ভয়হারা ঘরবাড়ী-ছাড়া।
কৃষ্ণহেতু বিদেশিনী অনুরাগে ভরা॥" (২)

বলরাম বসুর নিকট তাঁহার পরিচয় পাইয়া ঠাকুর সহাস্যবদনে বলিলেন, "তাই বল, এ-যে এখানকার থাকের লোক। অনেক কালের চেনা।" গৌরীমাকে তিনি আবার আসিতে বলিয়া দিলেন।

পরদিবস গৌরীমা যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন, ঠাকুর তাঁহাকে মাতাঠাকুরাণীর নিকট লইয়া গিয়া বলিলেন, "ওগো ব্রহ্মময়ি, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই নাও, একজন সঙ্গিনী এলো।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মা অত্যন্ত লজ্জাশীলা ছিলেন, তিনি কোন পুরুষমানুষের, এমন-কি অন্তরঙ্গ সন্তানদিগের সমক্ষেও বাহির হইতে হইলে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিতেন। গৌরীমাকে সঙ্গিনী পাইয়া বাহিরের

কাজের পক্ষে, বিশেষতঃ ঠাকুরের কক্ষে যাইয়া পরিবেশন করা, সংবাদ আদানপ্রদান ইত্যাদি ব্যাপারে মায়ের খুবই সুবিধা হইল।

গৌরীমাও দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া পরমারাধ্য গুরুদেব এবং গুরুমাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলেন।* মাতাঠাকুরাণী কখনও দক্ষিণেশ্বরে অনুপস্থিত থাকিলে কলিকাতায় থাকিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট যাতায়াত করিতেন।

গোপালের মায়ের নাম অঘোরমণি। তিনি ব্রাহ্মণ বালবিধবা, গোপালমন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন। শুনিয়াছি, গোপালের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাবের ভক্তি ও ভালবাসা এতই প্রবল ছিল যে, বালগোপাল তাঁহার সহিত খেলা করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্ত্তী কামারহাটি গ্রামের এক দেবালয়ে তিনি বাস করিতেন। পরমহংস মহাশয়ের নাম শুনিয়া তিনি রাণী রাসমণির কালী-মন্দিরে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। পরমহংস মহাশয়কে বৃদ্ধার ভালই লাগিল, কিন্তু তাঁহার আচারনিষ্ঠতা এত অধিক ছিল যে, প্রথম সাক্ষাতের দিনে ঠাকুরপ্রদত্ত সন্দেশপ্রসাদ তিনি নিজে গ্রহণ না করিয়া অন্যকে দান করিয়াছিলেন। কারণ, পরমহংস মহাশয় শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ, তাঁহার স্পর্শকরা সন্দেশ ব্রাহ্মণবিধবা কি করিয়া খাইবেন?

---

* এইসময়ের কথায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেবাসঙ্গী পূজনীয় রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্তা গৌরী দিদিমণি * * শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রিয়শিষ্যা। মেয়েদের ভিতরে ঠাকুর ইঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ ও ভালবাসিতেন এবং ইনি নিজহস্তে ঠাকুর যাহা ভোজনাদিতে খুবই প্রীতি-প্রসন্ন হইতেন ঐ সমস্ত উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী তৈয়ারি করিয়া পরমযত্নে সেবাদি কত সময় করাইতেন। এবং অতি সুকণ্ঠে নহবতে ঠাকুরকে কতোই অতিশয় ভাব ও মহাভাব সংযুক্ত গান এবং কীর্ত্তনাদিতে সমাধিস্থ করিয়া দিতেন। এহা আমি প্রত্যক্ষে কতোই আনন্দিত হইতাম * * আরোও ঠাকুর বলিতেন যে গৌরী মহাতপস্বিনী এবং মহাভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী। * *"

ড. গাঙ্গুলীর সৌজন্যে

কিন্তু অল্পকালমধ্যেই ঠাকুরের প্রীতির নিকট তাঁহার আচারনিষ্ঠতা পরাভূত হইল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব, ভক্তি এবং আকর্ষণ ক্রমশঃ এতই বৃদ্ধি পাইল যে, দুই-চারি দিন তাঁহার নিকট যাইতে না পারিলে বৃদ্ধার প্রাণ ব্যাকুল হইত; জপ করিবার সময়েও তাঁহার দর্শন পাইতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার গোপালই এই রামকৃষ্ণ। সুতরাং তাঁহাকেও গোপাল বলিয়াই ডাকিতেন।

মাতাঠাকুরাণী গোপালের মায়ের স্নেহযত্নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিতেন,—ঠাকুরকে আর আমাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াতে বৃদ্ধা স্বর্গসুখ পেতেন। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ব'লে ব'লে আমাকে দিয়ে অনেকরকম রাঁধাতেন। আমি তো শেযাস্তি অনেকসময় ঠাকুরের ঘরে যেতে পারতুম না; তিনিই কাছে ব'সে পাখা দিয়ে হাওয়া করতেন, কত স্নেহ ক'রে খাওয়াতেন। বলতেন, "ও গোপাল, তুমি ভাল ক'রে খাও বাবা। ছোলা দিয়ে শাক ভাজা হয়েছে, এটি আগে খাও। বড়ি দিয়ে ঝোল আর একটু খাও বাবা। সজনে ডাঁটার চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে? এ রান্না স্বয়ং লক্ষ্মী রেঁধেছেন, অমৃততুল্য হয়েছে রান্না! তুমি পেট ভ'রে খাও গোপাল।" এমন-কি তাঁর নিজের রান্নাও 'বৌমার রান্না' ব'লে চালিয়ে দিতেন। আবার কোনদিন সত্যরক্ষার জন্যে আমায় দিয়ে হাতাখুন্তি নামমাত্র স্পর্শ করিয়ে নিতেন।

—বৃদ্ধার স্নেহবিহ্বলতায় ঠাকুর প্রসন্ন হতেন, হেসে বলতেন,—"সবই যদি বৌমার রান্না, তুমি কবে রেঁধে খাওয়াবে, বলতো?"

—বৃদ্ধা কাঁচুমাচু হ'য়ে বলতেন, "বাবা, বৌমার রান্নার কাছে কি আমার রান্না! আমার বৌমার হাতধোয়ানি জলেই রান্না চমৎকার হয়।" নিজে যেন কিছু নয়, আমাকে বড় করার জন্যে, আমার প্রশংসার জন্যে তাঁর কী প্রাণপণ চেষ্টাই ছিল! আমায় কি-যে ভালবাসতেন তিনি! আমিও তাঁকে শাশুড়ীর মতই মান্য করতুম।

গোপালের মা-ও আমাদিগকে সেইকালের কথায় বলিয়াছেন,—তখন আমার মনে আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না, কোন প্রার্থনাও ছিল না

গোপালের আর বৌমার চাঁদমুখ দেখবো, এই ছিল আশা ; রকমারি রান্না ক'রে গোপালকে খাওয়াবো, বৌমাকে খাওয়াবো, এই ছিল প্রার্থনা। তা' পূর্ণ হ'লেই প্রাণ ভ'রে যেতো।

গোপালের মায়ের আগমনের কিছুকাল পরে যোগেনমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাতায়াত আরম্ভ করেন। তাঁহার নাম যোগীন্দ্রমোহিনী, খড়দহের সুপ্রসিদ্ধ বিশ্বাসবংশের বধূ। তাঁহার পতি ও পিতা উভয়েই সঙ্গতিপন্ন ছিলেন ; কিন্তু পতির আচরণে তিনি গার্হস্থ্যজীবনে শান্তি ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার একমাত্র পুত্র শৈশবে ইহলোক ত্যাগ করে, একমাত্র কন্যাও দীর্ঘজীবিনী হন নাই।

তিনি সাধারণতঃ বাগবাজারে পিত্রালয়েই বাস করিতেন, কদাচিৎ পতিগৃহেও যাইতেন। মনে যতই কষ্ট থাকুক, তিনি অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। "পতির আচরণ যেরূপই হউক, সাধ্বী নারীর কর্ত্তব্য পতির সেবাযত্ন করা এবং পতিকে ধর্ম্মপথে আনিতে চেষ্টা করা",—ঠাকুর তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিতেন। যোগেনমাও এই নির্দ্দেশ যথাসাধ্য পালন করিয়াছেন।

ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর কৃপায় তিনি সাংসারিক অশান্তি ভুলিয়া ঈশ্বরীয় আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। ঠাকুর তাঁহার গৃহে (অর্থাৎ তাঁহার পিতৃগৃহে) পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছিলেন।

ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে যোগেনমা এক শোকসন্তপ্তা প্রতিবেশিনীকে লইয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। ইনি গোলাপসুন্দরী দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে গোলাপমা নামে পরিচিত।

গোলাপমা ব্রাহ্মণবিধবা, তাঁহার সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকালে মৃত্যু হয়। একটি কন্যাও ছিল, নাম —চণ্ডী, দেখিতে সুন্দরী। কন্যাকে সুখী করিবার আশায় প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবংশে তাঁহার বিবাহ দিলেন।
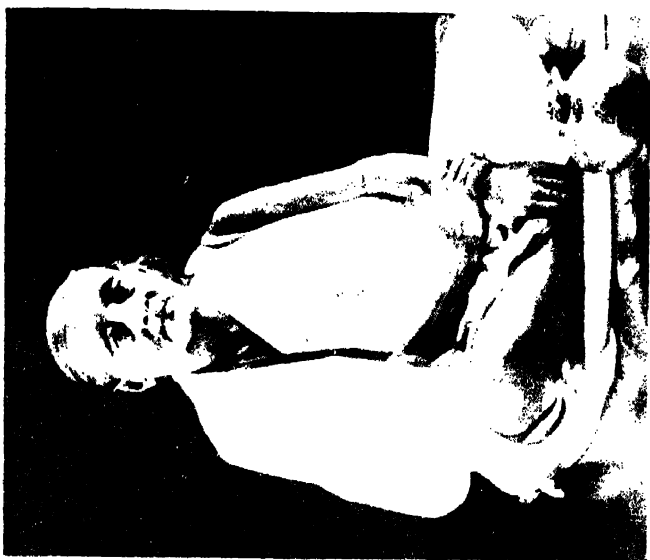
গোলাপ-মা

যোগেন-মা

জুড়িগাড়ী, সিপাহীলস্কর, ধনসম্পদ কন্যার ভাগ্যে অনেক জুটিল; কিন্তু দরিদ্রবিধবার কন্যার এ সুখ সহিল না, অকালেই তাঁহারও মৃত্যু হইল। সংসারে শোকসন্তপ্তা বিধবার আর কোন অবলম্বন রহিল না। পুত্রকন্যা হারাইয়া তিনি শোকে মুহ্যমানা এবং উন্মাদিনীপ্রায় হইলেন।

এইসময়ে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে শোকাতুরা গোলাপমাকে লইয়া ব্যথার ব্যথী যোগেনমা একদিন ঠাকুরের পদপ্রান্তে উপনীত হইলেন। শোকাতুরা বিধবা নয়নজলে ভাসিয়া নিজের মর্ম্মন্তুদ ইতিহাস ঠাকুরের নিকট বলিয়া যাইতে লাগিলেন। অফুরন্ত তাঁহার কথা, অসহনীয় তাঁহার ব্যথা। তাঁহার ব্যথায় ঠাকুরের হৃদয়ও করুণায় বিগলিত হইল। তিনি সহজ ও হৃদয়গ্রাহী কথায় সংসারের অসারতা বুঝাইয়া দিলেন, শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দিলেন তাঁহার তাপিত হৃদয়ে। মাতাঠাকুরাণীও সকল কথা শুনিলেন, ব্যথাতুরা কন্যাকে সস্নেহে বুকে টানিয়া লইলেন।

কোথায় চলিয়া গেল চণ্ডীর অকাল মৃত্যুর প্রচণ্ড আঘাত! প্রচণ্ড আঘাতই আনিয়া দিল পরম আনন্দ। এই আনন্দের আকর্ষণে তিনি প্রায়ই ছুটিয়া আসিতেন দক্ষিণেশ্বরে; ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে নহবতে বাসও করিতেন।

গোলাপমার গৃহেও ঠাকুর পদার্পণ করিয়াছিলেন। নিজের গৃহে ঠাকুরকে পাইয়া তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, "ওগো, আমি যে আহ্লাদে আর বাঁচিনা গো! * * * যাই, সকলকে বলি, আয়রে আমার সুখ দেখে যা * * * ওগো! খেলাতে (লটারিতে) একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাখ টাকা পেয়েছিল; সে যাই শুনলে, এক লাখ টাকা পেয়েছে, অমনি আহ্লাদে ম'রে গিছল—সত্য সত্য ম'রে গিছল! ওগো আমার যে তাই হলো গো! তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ কর, না হলে আমি সত্য সত্য ম'রে যাব।" (১)

ঠাকুর-ঠাকুরাণীর কতিপয় লীলাসঙ্গি-সঙ্গিনীর কথা আমরা সংক্ষেপে বলিয়াছি। অতঃপর এই অধ্যায়ে কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিব,

যাহা হইতে মহিমময়ী মাতাঠাকুরাণীর চরিত্রের বিভিন্ন রূপ প্রতিভাত হইবে, আর প্রতিভাত হইবে—দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেই কত আর্ত্ত ও ধর্ম্মার্থিনী নারী মায়ের নিকটও আসিয়াছেন এবং তাঁহার পূত সঙ্গলাভে সান্ত্বনা ও পথের সন্ধান পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন।

একদিন এক আর্ত্ত নারী আসিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পরমহংস ঠাকুর দৈবশক্তিসম্পন্ন সাধু, এই কথা তিনি লোকমুখে শুনিয়াছেন। আর, সাধুসন্ন্যাসী ও দেবতার কৃপা হইলে যে মানুষের দুঃখ দূর হয়, রোগমুক্তি হয়, অসাধ্য সুসাধ্য হয়,—ইহা কে না জানে?

পরমহংস ঠাকুরের নিকট দণ্ডবৎ হইয়া নারী কাতরভাবে নিবেদন করিলেন, বিপথগামী স্বামীকে লইয়া তাঁহার দারুণ অশান্তি। স্বামীর স্বভাবটি সংশোধন করিয়া তাঁহাকে ঘরে স্থিতু করিয়া দিতে হইবে।

নারীর দুঃখে ঠাকুরের চিত্ত ব্যথিত হইল। নহবৎ-ঘর দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—মাগো, এ বিদ্যে আমার জানা নেই। হোথা যে সাধু-মায়ী থাকেন, তিনি ইচ্ছে করলে তোমার দুঃখ অবিশ্যি দূর করতে পারবেন, তুমি তাঁকে গিয়ে সব জানাও।

অনেক আশা লইয়া নারী নহবতে সাধুমায়ের নিকট যাইয়া দণ্ডবৎ হইলেন। মাতাঠাকুরাণী বিষণ্ণবদনা নারীকে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে নারী দুঃখের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—পরমহংস ঠাকুর বলেছেন, আপনার করুণা হ'লে আমার সকল দুঃখমোচন হবে। মেয়েমানুষের প্রাণের ব্যথা আপনি বুঝবেন ভাল। আমার ব্যথা দূর করুন মা।

মাতা মনে মনে ঠাকুরের রহস্য বুঝিলেন, কিন্তু ভাবিলেন, আমি ইহার কি করিতে পারি? দুঃখিনীকে কিভাবে সান্ত্বনা দিব? অবশেষে বলিলেন,—আমি সামান্য নারী, আমার তো এমন কোন ওষুধ বা তন্ত্রমন্ত্র জানা নেই, যা'তে তোমার উপকার করতে পারি। তোমায় যিনি পাঠিয়েছেন, দৈববল তাঁর অধীন। তাঁর ইচ্ছামাত্র সব মঙ্গল হয়। তুমি সেখানে গিয়েই আবার প্রার্থনা জানাও।

সংশয়যুক্তা নারী আবার ঠাকুরের নিকট আসিয়া সাধুমায়ের উক্তি জানাইলেন। ঠাকুর মৃদুহাস্যে বলেন,—আমি সত্যি কথাই বলেছি মা। তোমার ওষুধ হেথা পাবে না। আর, তাঁকে সামান্য ভেবো না, আমার চাইতেও তিনি বড়; তাঁর যদি কৃপা হয় তোমার সব দুঃখ যাবে। তবে হ্যাঁ, তিনি ভারী চাপা লোক, সহজে কারুকে ধরা দিতে চান না। তুমি গিয়ে তাঁরই শরণাগত হও, তোমার আশা পূর্ণ হবে।

নারী ভাবেন,—এমন মানুষের কথা কি অবিশ্বাস করা যায়? আমি হতভাগী, তাই দয়া হলো না; একবার হেথা, একবার হোথা; কি হবে আর গিয়ে?

কিন্তু ফিরে গেলেই-বা চলবে কেন? একটা বিহিত তো করতেই হবে।

আবার গেলেন নহবতে। সজলনয়নে বলিলেন,—দয়াময়ী মাগো, আমি বড় দুঃখী, বড় হতভাগী, আমায় ফাঁকি দেবেন না। পরমহংস ঠাকুর কিছু মিছে কথা বলেন না; তিনি বললেন, আপনি তাঁর চেয়েও বড়, এর বিহিত আপনার কাছেই আছে। আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন মা।

ঠাকুরের ইঙ্গিত মাতাঠাকুরাণী বুঝিলেন। কিঞ্চিৎ প্রসাদী নির্ম্মাল্য নারীর হাতে দিয়া বলিলেন,—ভক্তি ক'রে এ নির্ম্মাল্য ঘরে নিয়ে যাও, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক, তুমি শান্তি পাও মা।

নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া নারী হৃষ্টমনে গৃহে ফিরিলেন। মায়ের আশীর্ব্বাদে অদূরভবিষ্যতে তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইয়াছিল।

বরাহনগর পল্লী হইতে এক ব্রাহ্মণবিধবা ঠাকুরের নিকট আসিতেন। লোকে তাঁহাকে গৌরের মা বলিয়া ডাকিত। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র, দশজনের সাহায্যে তাঁহার খাওয়াপরা কোনক্রমে চলিয়া যাইত। দুঃখিনীর একটিমাত্র পুত্র, সেও নিরুদ্দেশ। একে দারিদ্র্যের নিপীড়ন, তাঁহার উপর পুত্রশোক, মণিহারা ফণিনীর ন্যায় তিনি অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

গৌরের মা অশান্ত চিত্ত লইয়া ঠাকুরের দর্শনে আসেন, ভরসা—যদি তাঁহার কৃপায় চিত্তে শান্তি আসে। তাঁহার দুঃখে ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত

হইল, মাতাঠাকুরাণীকে একদিন তিনি বলিলেন,—তুমি ওকে একটু দয়া করো ; আহা, বড় দুঃখী।

মা বলেন,—তোমার দয়া যে পেয়েছে, তার আর ভাবনা কি ?

ঠাকুরকে পাইয়া গৌরের মা যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাবের উদয় হয় ; মাতাঠাকুরাণীও তাঁহাকে অতিশয় আদরযত্ন করিতেন। ইহাতে শেষ পর্য্যন্ত গৌরের মা সকল অভাব, সকল ব্যথা ভুলিয়া গেলেন। নহবতে আসিয়া তিনি মায়ের গৃহ-কার্য্যেও সাহায্য করিতেন।

দক্ষিণেশ্বরে যে-সকল নারী যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতেন, মাতাঠাকুরাণী যে কর্ণাভরণাদি অলঙ্কার ধারণ করিতেন তাহা আদর্শবিরোধী, কারণ, পরমহংস যাঁর স্বামী, তাঁর কি গয়না পরা ভাল দেখায় ? খাদ্য পরিবেশনের জন্য, অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে তিনি যে ঠাকুরের কক্ষে যাইতেন, তাহাও তাঁহাদের মনঃপূত হইত না, কারণ, পরমহংস মহাশয়ের একটা মানসম্মান আছে, লোকজনের সম্মুখে তাঁহার পরিবারের যাতায়াত ভাল দেখায় না। অথচ এইসকল নারী যে মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি লোকে মায়ের সম্বন্ধে কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা করে, এই ভয়েই তাঁহারা ঐরূপ মনে করিতেন।

গোপালের মা, গৌরীমা, কৃষ্ণভাবিনী-প্রমুখ কয়েকজন বিপরীত মতাবলম্বী ছিলেন। মাতাঠাকুরাণী যাহা করিতেন, তাঁহারা তাহাই নিশ্ছিদ্র ও নির্ভুল বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহার যাহাতে তৃপ্তি, তাঁহাদেরও তাহাতেই তৃপ্তি হইত। কে কি সমালোচনা করিল বা করিবে, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেন না, শুনিবারও অযোগ্য মনে করিতেন। মা যে দিনান্তে একটিবার ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন, এত নিকটে থাকিয়াও হয়তো দিনের পর দিন ঠাকুর ও

তাঁহার মধ্যে সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হইত না,—এই দুঃখ সত্যই তাঁহাদের অন্তরকে পীড়িত করিত।

মা বলিতেন,—অনেকক্ষণ ঠাকুরের দর্শন না পেলে মনে পীড়া পেতুম; তবু চুপ ক'রে থাকতুম, কিন্তু মন মানতো না। শেষাশেষি লোকজনের আনাগোনা এত বেড়ে গেল যে, তাঁকে একটিবার দেখাই দুর্ঘট হ'য়ে উঠলো। অনেকদিন দেখাই পেতুম না, একবার দেখা হ'য়ে গেলে ভাবতুম,—আহা, আবার দর্শন পাবো তো?

—কোনদিন ঠাকুরের ঘর একটু ফাঁকা দেখলেই গোপালের মা ছুটে এসে বলতেন,—ও বৌমা, শীগ্যির চল, গোপালকে একটু দেখা দিয়ে এসো, তোমাদের একত্তর না দেখতে পেলে মনে আমার তৃপ্তি হয় না। ওঠ, শীগ্যির চল, আবার কে কখন এসে পড়বে।—আমার আনন্দের জন্মে তাঁর মনে এত ভালবাসা জমা ছিল!

—আর, গৌরমণি তো ভৈরবীর মত; কাউকে দ্বিধাও নেই, ভয়ও নেই। বলতো,—তোমার অত ভয় কিসের বলতো মা? তোমায় দেখতে পাওয়া লোকেদের ভাগ্যে থাকা চাই! আমাকে সাজিয়ে গুজিয়ে ধ'রে নিয়ে যেতো ঠাকুরের ঘরে। কোনদিন হয়তো ভক্তদেরও ঘর থেকে স'রে যেতে বলতো। আমার ভারী লজ্জা করতো। কিন্তু তা'র যে কথা সেই কাজ, কাজটি হাসিল ক'রে তবে ছাড়তো। এমনি মেয়ে সে!

অলঙ্কারসম্বন্ধে একদিন জনৈকা ভক্তিমতীর প্রতিকূল মন্তব্য শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী সকল অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন। পতির চিহ্ন কিছু-একটা গায়ে থাকা উচিত, বালাজোড়া কেবল হাতে রহিল। সোনার অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়াও মনে কোনদিন গর্ব্ব হয় নাই, এখন তাহা বর্জ্জন করিয়াও কোনপ্রকার ভাবান্তর হইল না। সমালোচকদের প্রতিও মনে কোন বিরূপভাব জন্মিল না।

অলঙ্কারবর্জ্জনের ব্যাপারটা ঘটিয়াছিল গৌরীমার অনুপস্থিতিতে। তিনি সেদিন কলিকাতায় ভ্রাতা অবিনাশচন্দ্রের বাটীতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিতেই যোগেনমা মায়ের যোগিনীবেশের কারণ তাঁহাকে

জানাইলেন। গৌরীমা চিরকালই তেজস্বিনী, মাতৃ-অঙ্গের আভরণ খুলিতে যাঁহারা উপদেশ দিয়াছিলেন, প্রথমতঃ তাঁহাদিগের উদ্দেশে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহার পর মাকে বলিলেন,—তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, তোমায় কি এমন বেশ ধরতে আছে! তোমার গায়ে সোনা থাকলে তা'তে জগতেরই কল্যাণ।

গৌরীমা ও যোগেনমা দুইজনে মিলিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সকল-প্রকার আভরণে এবং উত্তম বস্ত্রে সজ্জিত করিলেন। তাহার পর চরণে প্রণত হইয়া গৌরীমা বলিলেন,—কেমন সুন্দর মানিয়েছে, বলতো! চল, একবার কত্তাকে দর্শন দেবে।

মা এইরূপ বেশে ঠাকুরের নিকট যাইবেন না, গৌরীমাও ছাড়িবেন না; একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে ঠাকুরের ঘরে লইয়া গেলেন।

ঠাকুরের প্রতি গৌরীমার ভক্তি ও আকর্ষণ যেরূপ গভীর ছিল, মায়ের প্রতিও তদ্রূপ ছিল। বরং সময় সময় অধিক বলিয়াই মনে হইত। "শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি গৌরীমার অনুরাগাধিক্য দর্শনে ঠাকুর একদিন কৌতুকচ্ছলে বলেন, 'তুই কা'কে বেশী ভালবাসিস? গৌরীমা গান গাহিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন,—

'রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী,
লোকের বিপদ হ'লে ডাকে মধুসূদন ব'লে,
তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাই-কিশোরী।"

গান শুনিয়া শ্রীশ্রীমা কুণ্ঠায় গৌরীমার হাত চাপিয়া ধরিলেন। ঠাকুর ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে সেইস্থান হইতে চলিয়া গেলেন।" (৬)

গৌরীমা মাতাঠাকুরাণীকে জগজ্জননীরূপে পূজা করিলেও মায়ের সঙ্গে তাঁহার ছিল এক অপূর্ব্ব সম্পর্ক। কখনও মাতাপুত্রী, কখনও সঙ্গিনী, আবার কখনও সখীরূপে তাঁহাদের মধ্যে নিঃসঙ্কোচ হাস্যপরিহাসও

চলিত।—একদিন শেষরাত্রে নহবৎ-ঘরের সম্মুখস্থ ঘাটে মা স্নান করিতে গিয়াছেন। গৌরীমা তখনও কয়েক ধাপ উপরে আছেন। জলের নিকটে সিঁড়িতে প্রকাণ্ড কি-একটা পড়িয়া ছিল, তাহাতে মায়ের একখানি পা লাগিবামাত্র তিনি "আ-রে বাপ্-রে" বলিয়া ত্রস্তপদে উপরে উঠিয়া আসিলেন। গৌরীমা তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, মা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—কু-মী-র গো!

গৌরীমা সহাস্যে বলিলেন,—কুমীর নয় মা, কুমীর নয়; ও শিব, তোমার চরণপরশ পাবার লেগে প'ড়ে আছে।

মা বলিলেন,—রাখ তোমার রঙ্গ, আমি ব'লে ভয়ে মরি! কী সর্ব্বনাশ! একেবারে কুমীরের ওপর গিয়ে পড়েছিলুম!

—তুমি অভয়া, তোমার আবার ভয় কিসের? উত্তরে বলেন গৌরীমা।

ভাবিনী নামে এক ব্রাহ্মণকন্যা ঠাকুর ও মাতাঠাকুরাণীর প্রতি অতিশয় ভক্তিমতী এবং মমতাময়ী ছিলেন। প্রথম দিন কেবল পরমহংস মহাশয়ের দর্শনমানসেই তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভক্তি নিবেদন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার মনে হইল, নহবতে যেন কোন নারীমূর্ত্তি রহিয়াছেন এবং তাঁহাকে আকর্ষণ করিতেছেন।

সঙ্গিনীগণ বলিলেন,—ওখানে পরমহংস মশায়ের পরিবার থাকেন।

ভাবিনী অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন,—মা কৈ গো, মেয়েকে একটু পায়ের ধূলো দিন।

প্রসন্নবদনে মা বাহিরে আসিলেন। ভাবিনী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—এমন দেবীমূর্ত্তি মা আমার! এমন রূপ তো কখনো দেখিনি!

তোর চেয়েও সুন্দর না-কি? জনৈকা সঙ্গিনী নিম্নকণ্ঠে মন্তব্য করেন।

ভাবিনী লজ্জারক্তমুখে প্রতিবাদ জানাইলেন,—কি যে বলিস তোরা, ধানে আর তুষে! মা আমার জ্যোতির্ম্ময়ী, পূর্ণিমার শশী; দেখে আমার প্রাণটা ভ'রে গেল। মাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—আমায় তুমি নিয়ে নাও মা। তোমার চরণতলে থেকে যাই।

মা হাসিয়া বলিলেন,—তোমার সংসার আর পরিজনের কি হবে ?

—একটি মেয়ে আছে, তা'কে ছেড়ে খুব থাকতে পারবো।

—আহা যাট্ ! ও কথা বলতে নেই, তা'কে ছেড়ে কাজ নেই, তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসো ! তা'কেও নিয়ে এসো, আমি দেখবো।

প্রথম দিনেই ভাব জমিয়া উঠিল, তাহার পর যাতায়াত আরম্ভ হইল। মায়ের প্রথম দর্শন হইতেই ভাবিনীর মন মায়ের সেবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। তিনি মায়ের সেবায় তৎপর হইলেন। মা তাঁহার চুল-বাঁধার প্রশংসা করিতেন।

ভাবিনীর যেমন রূপ, স্বভাবও তেমনই মধুর, রান্নায় হাতও ছিল পাকা। মধ্যে মধ্যে তিনি নহবতে আসিয়া রন্ধন করিতেন এবং যত্ন করিয়া ঠাকুরকে খাওয়াইতেন। ঠাকুরও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহার রন্ধনের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—ভাবিনী বৈকুণ্ঠের রাঁধুনী।

—তা'হলে আপনি জনার্দ্দন, আর ওখানে যিনি আছেন, তিনি মা কমলা, ভাবিনী সহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন।

উত্তরটি সকলেরই প্রীতিকর হইয়াছিল।

ভাবিনী অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু রূপের গর্ব্ব তাঁহার ছিল না ; বরং তাঁহার অতিশয় বিনয় ছিল। আর একজন রূপবতী নারী মায়ের নিকট আসিয়াছিলেন, যিনি নিজের রূপ এবং স্বামীর কুরূপ সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন ছিলেন। স্বামী প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী, তাঁহার স্বভাবও দূষিত নয়, কিন্তু রূপের অভাবের জন্য পত্নী তাঁহার উপর নিতান্তই বিরূপা। রূপের অতিগর্ব্বে স্বামীর প্রতি তিনি এতই অপ্রসন্না যে, স্বামীর সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা যায় কি-না, ইহাই তাঁহার প্রধান চিন্তা হইয়া উঠে।

লোকমুখে তিনি শুনিয়াছিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে পরমহংস মহাশয় বিবাহান্তে পরিবারকে ত্যাগ করিয়াছেন, এবং পরিবার যদিও দক্ষিণেশ্বরে বাস করেন, তথাপি স্বামীর সহিত কোন সম্পর্ক নাই। উক্ত নারী মনে

করিলেন, তাঁহার অবস্থার সহিত ইঁহাদের সাদৃশ্য আছে; সুতরাং যথেষ্ট আশান্বিত হইয়া তিনি পরমহংস মহাশয়ের পরিবারের নিকট আসিলেন এবং জানিতে চাহিলেন যে, তাঁহার এইরূপ অবস্থায় স্বামীকে ত্যাগ করিলে ঘোরতর অন্যায় বা অপরাধ হইবে কি-না।

তাঁহার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া মাতাঠাকুরাণী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—জিভ্ দিয়ে আর উচ্চারণ করো না অমন কথা, যে শোনে তারও পাপ। স্বামী আর নারায়ণ এক, তাঁকে কি ত্যাগ করা যায়? কুরূপ ব'লে স্বামীকেই যদি ত্যাগ করবে, তবে আর নারীর রইলো কি?

মাতা তাঁহাকে আরও বলিলেন,—স্বামীর কাছে যেয়ে ক্ষমা চাও, তাঁর পায়ে তোমার এই রূপ ঢেলে দাও। ক'দিন থাকে রূপ? একটা কঠিন ব্যামো যদি হয়, কোথায় ভেসে যাবে রূপ। মেয়েমানুষকে রূপের বড়াই করতে নেই।

নৈরাশ্যে মর্ম্মাহত হইয়া রূপসী চলিয়া গেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে পুনরায় তিনি আসিয়াছিলেন। বসন্তরোগের আক্রমণে তখন তাঁহার পূর্ব্বের রূপলাবণ্য সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। অনুতাপানলে মানসিক অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মাতাঠাকুরাণীর নিকট এইবার তিনি মার্জ্জনা এবং আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া মা বলিলেন,—পতিসেবায় সুখী হও মা।

দক্ষিণেশ্বর গ্রামের এক গৃহস্থবধূ নহবতের ঘাটে আসিয়া মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেন। তাঁহার নাম শতদলবাসিনী। একদিন মাতাঠাকুরাণীর নিকট নিজের দুরদৃষ্টের কথা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তাঁহার দুঃখের কারণ, স্বামী তাঁহার দীর্ঘকাল নিরুদ্দেশ। তাঁহার জন্য কতস্থানে কতভাবে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, শাস্ত্রের বিধানে অল্পকাল-মধ্যেই স্বামীর কুশপুত্তলিকা দাহ করিয়া তাঁহাকে বৈধব্যবেশ ধারণ করিতে হইবে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—মাগো, স্বামীকে আমি কি

ফিরে পাবো না ? মায়ের চরণ ধরিয়া প্রার্থনা জানাইলেন,—আপনি আমায় এই আশীর্ব্বাদ করুন মা, এ বেশ ছাড়ার আগেই যেন আমি মরতে পারি ; বিধবা হ'য়ে আমার আর বাঁচতে না হয়।

দুঃখিনীকে সান্ত্বনা দিয়া মা বলিলেন,—কেঁদোনি মা, এমনও তো শোনা যায়, লোকে যা'র জন্যে সারা পৃথিবী খুঁজে বেড়ায়, তা' কাছেই রয়েছে। যেদিন যেটি হবার, ঠিকই হবে। তুমি সতী সাধ্বী, একান্তমনে নারায়ণকে ডাকো ; তাঁর কৃপা হ'লে তোমার এয়োতির বেশ ঘুচবে না।

মাতাঠাকুরাণীর কথায় তিনি সান্ত্বনা লাভ করেন, আশার সঞ্চার হয় তাঁহার মনে। এবং মায়ের কথাই সত্য হইল, সতীর পুণ্যে দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শতদলবাসিনীর নিরুদ্দেশ স্বামী অকস্মাৎ একদিন গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

একদা মাতাঠাকুরাণী নহবতে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, কে যেন অসহায়ভাবে 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতেছে, বুকফাটা দুঃখে কাঁদিতেছে। কে এমন আর্ত্তনাদ করিতেছে ?—

সেই দিনই এক নারী নহবতে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন মায়ের চরণে। নাম তাঁহার সরযূ। দেখিলেই মনে হয়, প্রচণ্ড ঝড়ঝাপটায় ছন্নছাড়া ; তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ ধূলিমলিনতায় আচ্ছন্ন, নয়নে অশ্রুধারা।

বলিলেন,—মাগো, চারিদিকে কেবল জমাট অন্ধকার, আর দুঃখ। রাত্রে স্বপ্ন দেখলুম,—কে যেন বলছে, 'যা না, দক্ষিণেশ্বরে যে দেবী থাকেন, তাঁর কাছে গিয়ে কেঁদে পড়, তাঁর যদি করুণা হয়, ত'রে যাবি।' তাই ছুটে এলুম মায়ের মন্দিরে অনেক আশা নিয়ে। এখানে তো দেখছি দুই দেবী,—এক পাষাণী, আর এক মানবী। পাষাণী দেবীর প্রাণ তো আমি গলাতে পারবো না, সে যোগ্যতা আমার নেই। আপনার যদি করুণা হয়, হয়তো ত'রে যেতে পারি।

তাঁহাকে দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া মায়ের প্রাণও বিচলিত হয়, বলেন,—কি হয়েছে তোমার ? কি কষ্ট খুলেই বল-না মা।

নারীর মুখ দিয়া প্রকাশ করা যায় না, এমনই তাঁহার কথা। তথাপি সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া মায়ের নিকট সরযূ সকলই বলেন অকপটে, তাঁহার নিদারুণ ইতিহাস।—তিনি ব্রাহ্মণের কন্যা। কুল, মান, অর্থ, পতি, পুত্র সবই এককালে ভগবান তাঁহাকে দিয়াছিলেন। অতর্কিতে কোথা হইতে ঝড় আসিয়া একদিন তাঁহার সাজানো গোছানো ঘরসংসার লণ্ডভণ্ড করিয়া দিল; সেই প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে তিনি নিজেকে সামলাইতে পারেন নাই। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল অসহায়ভাবে পথের ধূলির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মনের সঙ্গে অবিরাম সংঘর্ষের ফলে তিনি আজ ক্লান্ত।

একটি একটি করিয়া মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া পড়ে মায়ের নয়নকোণ হইতে, সরযূ বলিয়া চলেন তাঁহার মর্ম্মান্তিক কাহিনী।—চেষ্টা করিলে তিনি সব ভুলিতে পারেন, স্বামীকে পর্য্যন্ত, কিন্তু খোকাকে তো ভুলিতে পারিতেছেন না। খোকার কথা মনে হইলেই বুকটার মধ্যে হাহাকার করিয়া ওঠে, ধক্ ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিয়া ওঠে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। নিজের কর্ম্মদোষে, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় সকল সম্পদই তিনি হারাইয়াছেন, জীবনে তাঁহার ধিক্কার আসিয়াছে। আজ তাঁহার চারিদিক রুদ্ধ।

উদ্ধারের পথ কি আছে মা? বলিয়া সরযূ মুখে কাপড় দিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মমতাময়ী মাতাও সর্ব্বহারা অভাগিনী কন্যার জন্য কাঁদেন। তাহার পর সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—উদ্ধারের পথ আছে মা। ঐ ঘরে যিনি আছেন, তাঁকে একবার দেখে এসো। একটা প্রণাম দিয়ে এসো, কিন্তু ছুঁয়ো না যেন। শুধু ভাল ক'রে দেখে এসো।

সরযূ দূর হইতেই প্রণাম করেন সেই আত্মভোলা ব্যথাহারী ঠাকুরকে। নিবিষ্টমনেই চাহিয়া দেখেন তাঁহাকে, আরও বিস্ফারিত নয়নে দেখেন।

কি দেখিলেন সেখানে?...মনে ও নয়নে ধাঁধাঁ লাগে তাঁহার! পাগলিনীর মত ছুটিয়া আসিলেন পুনরায় নহবতে মায়ের নিকট।

—মা, ওমা কি দেখলুম মা! আমি-যে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার খোকাকে আমি কি ফিরে পাবো মা? বল, বল তুমি।

—হাঁ পাবে তুমি, আশ্বাস দিয়া মা বলেন।

উত্তাল-তরঙ্গায়িত সমুদ্রের মধ্যে যেন আজ অদূরে দেখা যায় কূল, নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে আশার আলোক দেখিতে পান সরযূ। করুণাময়ীর আশিসধারায় অভিষিক্ত হয় তাঁহার দেহ আর মন।...

তীব্র অনুতাপে অহর্নিশ দগ্ধ হইয়া অগ্নিশুদ্ধ হইলেন সরযূ। আরম্ভ হইল তাঁহার নূতন জীবনযাত্রা। মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে বাৎসল্যের উপাসনায় দীক্ষা দিলেন। করুণাময়ী মাতার কৃপাধন্য হইয়া সরযূ অনতিবিলম্বে তাঁহার হারানো পতিপুত্রের সহিতও পুনর্মিলিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদিতা জনৈকা কন্যা একদা নহবতে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার কোন জিজ্ঞাসা নাই, প্রার্থনা নাই, জোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। এতই তাঁহার ভক্তি যে, মাতৃদর্শনে দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার আকৃতি এবং বেশ দেখিয়া মা বুঝিতে পারিলেন যে, এই কন্যা বাঙ্গালী নহেন। বাংলাভাষায় মা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার কিছু কিছু কন্যা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু যে-ভাষায় উত্তর দিলেন, মা সেই ভাষা বুঝিতে পারিলেন না।

তিনি কেন আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলে, মাতাঠাকুরাণীর চরণযুগল দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আকাশের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে এমনভাবে বুঝাইয়া দিলেন, যেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্বামীই তাঁহার স্বামী।

মা তাঁহাকে বলিলেন, ঠাকুরের ঘরে গেলে তাঁহার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

ঠাকুরের নিকটে গিয়াও কন্যা ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জোড়হস্তে দণ্ডায়মান রহিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—কৃষ্ণে ভক্তি হোক। ইহাতে তাঁহার ভক্তির আবেগ বৃদ্ধি পাইয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল।

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এই কন্যা শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবেদিত একটি অনাঘ্রাত পুষ্প।

একদিন এক বৃদ্ধা দক্ষিণহস্তে যষ্টি ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিলেন, বামহস্তে ছোট একটি পাতার ঠোঙায় কিছু সন্দেশ। বৃদ্ধার প্রাণের আকিঞ্চন—সাধুসেবা। কিন্তু পরমহংস মহাশয়ের কক্ষে গিয়া দেখেন, সেখানে বহুভক্তের সমাগম। এমন অবস্থায় বৃদ্ধা কি করিয়া তাঁহার নিকট প্রাণের কথা বলিবেন?

অতঃপর নহবতে আসিয়া বলিলেন,—তুমিই বুঝি মা, পরমহংস মশায়ের পরিবার? একটু সন্দেশ এনেছিলুম তাঁকে খাওয়াবো ব'লে; তা' ওখানে যা' ভিড়, সে আর হলো না। তুমিই আমার হ'য়ে এটুকু তাঁকে খাইয়ে এসো মা। আমি তোমার এখানেই ব'সে রইলুম।

মাতাঠাকুরাণী বুঝাইয়া বলেন,—বাইরের লোক থাকলে আমি তো ওখানে যাই না। আপনিই নিজে হাতে ক'রে ঠাকুরকে দিয়ে আসুন, সেটাই ভাল হবে। যাবার সময় আমায় কিন্তু ব'লে যাবেন।

অগত্যা নিরুপায় হইয়াই বৃদ্ধা ঠাকুরের কক্ষে পুনরায় গিয়া প্রবেশ করিলেন; লক্ষ্য করিলেন, তক্তাপোষের নিকটে এক কোণে ভক্তগণ নৈবেদ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অতি সন্তর্পণে তাঁহার ছোট ঠোঙাটি তাহার মধ্যে গুঁজিয়া রাখিলেন এবং সাধুকে একটি দণ্ডবৎ করিয়া চলিয়া গেলেন। সাধুকে বসিয়া খাওয়াইতে পারিলেন না, মাতাঠাকুরাণীকেও কিছু বলিয়া গেলেন না।

ঐ দিবস ঈশ্বরীয় কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হয়। তাহা প্রশমিত হইলে ইঙ্গিতে কিছু ভোজনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গৌরীমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি নিজের মনোমত একটি বড় ঠোঙা বাহির করিলেন। ঠাকুরের তাহা মনঃপূত হইল না, তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে অন্য একটি দেখাইলেন। একটির পর অন্যটি করিয়া গৌরীমা বৃদ্ধার ঠোঙাটি স্পর্শ করিলে ঠাকুর উহা আনিতে নির্দ্দেশ দিলেন এবং বৃদ্ধার নিবেদিত সন্দেশ সমস্তই গ্রহণ করিলেন।

খালি ঠোঙাটি ফেলিয়া দিবার জন্য নহবতের নিকট দিয়া যাইবার সময়—ঠাকুর সেদিন নিজে চাহিয়া খাইয়াছেন, বেশী সন্দেশ খাইয়াছেন,

গৌরীমার এই কথা শুনিয়াই মাতাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন,—এই তো সেই বুড়ীর ঠোঙা! আনন্দে তাঁহার বদনমণ্ডল উজ্জ্বল হইল, তিনি পরম তৃপ্তির সহিত বলিলেন,—আহা গো, বুড়ী আমায় সাক্ষী মেনে গেছলো, ঠাকুর যা'তে তা'র মিষ্টিটুকু খান। তা' সত্যি হ'য়ে গেল। বুড়ীর কি ভাগ্যি! বলতো মা?

পরবর্ত্তী কালে একদিন এই ঘটনাটি বলিতে বলিতে মা একেবারে নীরব হইয়া গেলেন, তাহার পর ঘটনাটি শেষ করিয়া বলিলেন,—'ভক্তের ভগবান,' কথাটি ঠিক।

বরাহনগর-নিবাসী বঙ্কিম সেনের পত্নী গঙ্গাস্নান এবং মায়ের চরণ-দর্শনের উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। কোন কোন দিন মায়ের অনুমতিতে নহবৎ-ঘরে বসিয়া জপও করিতেন। মা তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং উৎসাহ দিয়া বলিতেন,—সংসারের কাজ করতে করতেও মনে মনে ইষ্টনাম স্মরণ করবে। সকল অবস্থায় ভগবানের নাম করা যায়। দিনে অবসর না পেলে রাত্রে জপ করবে।

মায়ের প্রতি এই মহিলার অচলা ভক্তি এবং গভীর বিশ্বাস ছিল। তিনি মায়ের নির্দ্দেশমত পুরশ্চরণ করিয়াছিলেন। মাকে তাঁহার মনে হইত—সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী, এবং তাঁহার প্রেরণায় জপ করিতে করিতে তাঁহার আনন্দানুভূতি হইত। মায়ের কৃপায় অচিরে এই ভক্তিমতী স্বাভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন।

অসীমের মা প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। নহবতে বসিয়া অনেক সময় ধর্ম্মালোচনা করিতেন, ঠাকুরের কথা শুনিতেন। তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ছিল যে, ঠাকুরই বাবা বিশ্বনাথ। আবার ভাবিতেন, কিন্তু তিনি যদি বিশ্বনাথ, তবে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গরা কোথায়?

একদিন নহবতে লক্ষ্মীদিদির সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, এমন সময় ঠাকুর বেলতলার দিকে যাইতেছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশে

তিনি বলিয়া গেলেন,—ওগো, তোমরা অত কি কথা বলছো ? এসো, আমরা বেলতলায় গিয়ে বসি, সেখানে কথা হবে। তাঁহারা তখন গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, যাইতে কিছু বিলম্ব হইল। লক্ষ্মীদিদি এবং অসীমের মাকে সেইদিকে যাইতে দেখিয়া, গঙ্গাস্নানার্থিনী আরও দুইজন মহিলা সঙ্গে গেলেন। তাঁহারা গিয়া দেখেন, বেলতলায় ঠাকুর ভাবাবিষ্ট।

অসীমের মা দেখিতে পাইলেন, বৃহদাকার একটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ঠাকুরের পশ্চাতে দুলিতেছে, অদূরে আরও কয়েকটি সর্প খেলা করিতেছে। এইরূপ লোমহর্ষণ দৃশ্যে তাঁহার শরীর কণ্টকিত হইল। —কী সব্বরক্ষে ! কি হবে এখন ? কেন শিবের সাঙ্গোপাঙ্গ দেখতে সাধ হয়েছিলো আমার ? অসীমের মা ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন।

আর লক্ষ্মীদিদি একই সময়ে দেখিলেন কি ?—শিবের মত ঠাকুর যোগাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার বাম ঊরুতে বসিয়া মাতাঠাকুরাণী হাসিতেছেন। তিনি ভাবেন, এটা কেমন হলো ! এইমাত্র খুড়ীমাকে নবতে দেখে এলুম আমরা। দিনের বেলায় তিনি এখানে এলেন কি ক'রে ? লক্ষ্মীদিদি ছুটিয়া গেলেন নহবতে। সেখানে দেখেন, খুড়ীমা রন্ধনের আয়োজন করিতেছেন, পরিধানে ঠিক সেইরকম একখানি সাড়ী। তাঁহাকে কিছুই না বলিয়া পুনরায় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গেলেন তিনি বেলতলায়, পুনরায় দেখিলেন, সেই দৃশ্য !

সর্পকুল ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুর তখনও ভাবাবিষ্ট। অসীমের মা ভাবে গদগদ। লক্ষ্মীদিদি এবং অন্যান্য সকলে তাঁহার নিকটে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে লাগিলেন। ভাবাবেশ কমিয়া গেলে ঠাকুর তাঁহার কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। লক্ষ্মীদিদি নহবতে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীর চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা দিয়া বলিলেন,—খুড়ীমা, তুমি তো সামান্য মেয়ে নও ! এজন্যেই খুড়োমশাই বলেন,—আমি কি আর লাউশাক-খাকী পুঁইশাক-খাকীকে বে করেছি ?

দক্ষিণ-কলিকাতা হইতে ব্রজবালা দেবী গৌরীমার সহিত সাক্ষাৎ

করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন; সঙ্গে ভগবতী, সিদ্ধেশ্বরী, প্রিয়তমা-প্রমুখ কয়েকজন মহিলা। গৌরীমা সেদিন কলিকাতায় ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে গিয়াছিলেন; স্তুতরাং যে আশায় আসা, তাহাতে ব্রজবালা নিরাশ হইলেন বটে, কিন্তু লাভ হইল এই যে, তিনি ঠাকুরের চরণদর্শন পাইলেন এবং ঠাকুরই তাঁহাকে নহবৎ-ঘরে পাঠাইয়া দিলেন মাতৃ-সকাশে। এইভাবে ঠাকুর-ঠাকুরাণীর দর্শন লাভ করিয়া এই দিনটিকে তিনি পরম স্মরণীয় শুভদিন বলিয়া গণ্য করিতেন।

অতঃপর আরও কয়েকবার তিনি ঠাকুরের দর্শন লাভ করিয়াছেন, মাকেও বহুবার দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছে। তাঁহাদের প্রতি ব্রজবালার ভক্তি ও আকর্ষণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। ঠাকুরকে তিনি ইষ্টদেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার দেহে স্বীয় ইষ্টমূর্ত্তির দর্শনও পাইয়াছিলেন।

মায়ের তিনি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন এবং জীবনের বিশেষ বিশেষ কার্য্যাদি তাঁহার অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তবে করিতেন।

একদিনের কথা। তিন-চারি বৎসর বয়সের এক সুদর্শন শিশু আসিয়া ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিল। সম্মুখে শ্মশ্রুমণ্ডিত অপরিচিত ব্যক্তি, পশ্চাৎ হইতে অগ্রসর হইবার জন্য মায়ের উৎসাহ; মনে ভয় ও কৌতূহল লইয়া শিশু ঠাকুরের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরপদক্ষেপে অগ্রসর হয়। একে সরল শিশু, তদুপরি সচকিতভাব, বেশ লাগে ঠাকুরের; অভয় দিয়া ডাকেন,—আয়, এখানে আয়। কোন ভয় নেই, সন্দেশ খেতে দেবো।

নিকটে আসিলে ঠাকুর তাহাকে আদর করিয়া দুই হাতে তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুই কা'দের ছেলে রে?

আদর পাইয়া শিশু হাসে, কথা কয় না।

—নাম কি তোর, বল-না?

—শিবকালী।

—বাবার নাম বল। কা'র সঙ্গে এলি এখানে?

শিশুর অসহায় চক্ষু কাহাকে যেন অনুসন্ধান করে বাহিরের দিকে।

ব্রজবালা কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরের চরণে প্রণত হইলেন।

—ওঃ, তাই বল, তোমার খোকা বুঝি ? বেশ নামটি।

বারত্রয় উচ্চারণ করিলেন,—শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী।

ব্রজবালা পুত্রকে বলেন,—প্রণাম করেছিস ? মাঠাকরুণ যে অত ক'রে ব'লে দিলেন বাবার পায়ে গড়াগড়ি দিতে, ভুলে গেছিস ? শিশু ভূমিতে গড়াগড়ি দেয়, ঠাকুর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন,—ছেলের সাধুর লক্ষণ, যত্ন করো ওকে। হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলেন,—খা।

কিন্তু শিশুর কি হইল, খায় না, কথাও বলে না ; ঠাকুরের অনুকরণে কেবল উচ্চারণ করিতে লাগিল,—শিবকালী, শিবকালী, শিবকালী।

মাতাপুত্র পুনরায় নহবতে গেলে শিশুর অবস্থা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী ব্রজবালাকে বলেন,—তোমার খোকার কাজ হ'য়ে গেল।

গৌরীমার গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবী কালীসাধিকা। 'শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি মা-কালীর শ্রেষ্ঠপুত্রজ্ঞানে ভক্তি করিতেন ; কিন্তু 'পরমহংস মশায়ের পরিবার'কে সাধারণ মানবী বলিয়াই মনে করিতেন।

গর্ভধারিণীর সহিত এইহেতু গৌরীমার তর্কবিতর্ক হইত।

কন্যা বলিতেন,—তুমি সারাজীবন সাধনভজন ক'রে, কালীসিদ্ধা হ'য়েও ব্রহ্মময়ীকে চিনতে পারলে না, এতে তোমার অপরাধ হচ্ছে।

গিরিবালা বলিতেন,—তোদের এখনো অভাব রয়েছে। আমার অন্তরে স্বয়ং ত্রিপুরেশ্বরী বিরাজ কচ্ছেন, আমার আর কারুর প্রয়োজন নেই।

দুঃখিত হইয়া গৌরীমা বলিতেন,—ভাগ্যে থাকলে তবে তো হবে !

এইরূপ বাদানুবাদের পর কন্যার একান্ত আগ্রহে গিরিবালা একদিন মাতাঠাকুরাণীর নিকট গেলেন। মা তখন নহবতে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন, বৃদ্ধাকে দেখিয়া অভ্যর্থনা জানাইলেন।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই গিরিবালা বিস্মিতকণ্ঠে "এ্যাঁ, মা, তুমি ! তুমি ! এ-যে আমার সেই—"বলিয়া পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া

তাঁহার পদধূলি মাথায় মাখিতে লাগিলেন। ইহাতে মা হাসিয়া বলিলেন,—কি হয়েছে মা, অমন কচ্ছেন কেন?

ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই কিছু ঘটিয়াছে বুঝিয়া গৌরীমা বিজয়গর্ব্বে বলিলেন,—হবে আবার কি? যা' হবার তাই হয়েছে। মাতাঠাকুরাণী এবং গৌরীমা খুব হাসিতে লাগিলেন। গিরিবালা নির্ব্বাক!

গিরিবালা দেবীর আমন্ত্রণে ঠাকুর ও ঠাকুরাণী ভবানীপুরে তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। গিরিবালা ছিলেন বিদুষী এবং কবি, অনেক কালীসঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কালীসঙ্গীত শ্রবণে ঠাকুর আনন্দ পাইতেন।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের সন্নিকটে ভক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের একটি উদ্যানবাটী ছিল। ঠাকুর সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতেন। মথুরানাথ বিশ্বাসের মৃত্যুর পর শম্ভুচরণই ঠাকুরের 'রসদ্দার' হইয়াছিলেন; অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা নানাভাবে তিনি ঠাকুরের সেবা করিতেন। মাতাঠাকুরাণীর বাসের জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের নিকটে একখানি গৃহও নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

ঠাকুর ও ঠাকুরাণী উভয়কেই শম্ভুচরণ ও তাঁহার পত্নী দেবতা জ্ঞান করিতেন। তাঁহাদিগের সনির্ব্বন্ধ আমন্ত্রণে তাঁহাদের বাটীতে মা কয়েক-বার পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি মল্লিকগৃহিণীর এতই প্রগাঢ় ভক্তি ছিল যে, তাঁহাকে ভগবতীজ্ঞানে একাধিকবার তিনি ষোড়শোপচারে পূজা করিয়াছেন।

আর এক পরম ভক্তের বাটীতে ঠাকুর-ঠাকুরাণীকে গৌরীমা লইয়া গিয়াছিলেন; তাহা দক্ষিণ-কলিকাতায় বেলতলার মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের কুটীরে। ঠাকুর এই ভক্ত ব্রাহ্মণদম্পতিকে বলিতেন—বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী। বলরাম বসুর বাটীতেও মা গিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। এতদ্ব্যতীত মায়ের প্রতি যাঁহাদের ভক্তি অতিশয় গভীর ছিল,

তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেই কাহারও কাহারও বাটীতে তিনি ক্বচিৎ কখনও গিয়াছেন।

এইসময়ে তরুণ ভক্তদিগের সহিত মাতাঠাকুরাণী বাক্যালাপ করিতেন না, নির্দ্দিষ্ট দুই-একজন ব্যতীত। বলা বাহুল্য বয়ঃস্থ গৃহী ভক্তদিগের কাছে তিনি ততোধিক সঙ্কোচ বোধ করিতেন। তাঁহারাও মায়ের নিকট যাইতেন না; অথচ প্রাণের মধ্যে অনেকেরই প্রার্থনা ছিল, তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করা, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করা। কিন্তু ঠাকুরের কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগের অনুশাসন এবং মায়ের অত্যধিক লজ্জাসঙ্কোচ উভয় মিলিয়া এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল যে, মা নিতান্ত প্রয়োজনবশতঃ কদাচিৎ ভক্তদিগের উপস্থিতিতে ঠাকুরের কক্ষে প্রবেশ করিলে, তখন তাঁহার উদ্দেশে মনে মনে প্রণাম নিবেদন করিয়াই ভক্তগণ ক্ষান্ত থাকিতেন।

ঠাকুরের এইরূপ কঠোর অনুশাসনের ফলেই, যে-সকল ভক্তিমতী নারী ঠাকুরের দর্শনে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন, তাঁহাদের নামও তৎকালে অনেক পুরুষভক্ত জানিতেন না, তাঁহাদিগের পরিচয় লওয়া অথবা তাঁহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করা তো দূরের কথা।

বলরাম বসু বৈষ্ণববংশের সন্তান, তিনি ভাবেন, লক্ষ্মীনারায়ণ ধরাধাম পবিত্র করিতে দক্ষিণেশ্বরে প্রকট হইয়াছেন। একবার নদীয়াতে আসিয়াছিলেন গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে, এইবার আসিয়াছেন দক্ষিণেশ্বরে সারদা-রামকৃষ্ণরূপে। কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর দর্শন ছিল সুদুর্লভ, সুতরাং বলরাম বসু ক্ষোভ করিয়া পত্নীকে বলিতেন,—সেজবৌ, তোমাদের ভাগ্যি বেশী ভাল, দু'দিকের ভাগই পাচ্ছ। আমাদের প্রাণ ব্যাকুল হ'লেও তো সেদিকে যাবার উপায় নেই। যেদিন মাঠাকরুণের কাছে যাবে, তাঁর চরণ-ছোঁয়া হাতখানি আমার মাথায় বুকে বুলিয়ে দিও।

মাতাঠাকুরাণীকে একটিবার ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবার আকিঞ্চন তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইলেও তাহা অপূর্ণই থাকিয়া যায়। গুরুপত্নীর চরণ দর্শন করিবার সুযোগ তাঁহার আর ঘটিয়া উঠে না।

একদিন তিনি পরিজনগণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন, মহিলাগণ ঠাকুরকে প্রণামান্তে মায়ের নিকট গেলেন, তিনি ঠাকুরের ঘরে রহিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার দৌহিত্র মাণিক নহবৎ হইতে আসিয়া জানাইল যে, সকলে বাড়ী ফিরিতে ইচ্ছুক। ঠাকুরের ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া তিনি গঙ্গার শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ভক্তিমতীদিগের বিদায়-অভ্যর্থনার জন্য মা নহবৎ-ঘরের বাহিরে আসিয়াছেন, অন্যমনস্কতায় এইসময় সম্পূর্ণ অবগুণ্ঠনবতী ছিলেন না। তাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন, বলরাম বসুর পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিলেন,—আবার এসো মা তোমরা, আবার এসো।

মাণিক ঠিক এমন মুহূর্ত্তেই দাদুর হাত ধরিয়া বলিয়া উঠিল,—দাদু, দাদু, ঐ দ্যাখ, মাঠাকরুণ বেরিয়েছেন। তিনিও মুখ ফিরাইতেই মাতার মুখারবিন্দ দর্শন করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার মনে হইল, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই মাতাঠাকুরাণী বলিতেছেন,—বাবা এসো, বাবা এসো। এই অবস্থায় তিনি অধিক চিন্তা করিবারও অবসর পাইলেন না, ত্রস্তপদে গিয়া গুরুপত্নীর শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হইলেন।

এইরূপ পরিস্থিতির জন্য মা আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না, তিনি বলরাম বসুকে দেখিবামাত্র মুখের উপর অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন। কিন্তু ভক্তের মনস্কাম ততক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে।

ভাগ্যবান বলরাম বসুকে ভগবান যেমন ধনসম্পত্তি দিয়াছিলেন, তাঁহার পরিবারে অনেক ভক্তও পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের তিন জনের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, এখন আর একজনের কথা বলিব, তিনি তাঁহার কন্যা ভুবনমোহিনী। পিতার ন্যায় ভুবনের শ্বশুরও সম্ভ্রান্ত এবং বিত্তশালী ছিলেন। একবার পিতৃগৃহ হইতে ভুবনকে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার স্বামী স্বয়ং আসিয়াছেন, কন্যাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহার মন দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। পিতাকে বলিলেন,—বাবা, ঠাকুর-মাঠাকরুণের পায়ের ধুলো নিয়ে তারপর আমি যাবো।

পরিজনেরা বাধা দিয়া বলেন,—সে-কি! বর এসে গাড়ী নিয়ে ব'সে আছে, এই-কি তোর দক্ষিণেশ্বরে যাবার সময়? ভুবনের মাতা কৃষ্ণভাবিনীও বুঝাইয়া বলেন,—বাড়ীতে জামাই এসে পড়েছে, এখন যদি তুই বাড়ী থেকে চ'লে যাস, সে অসন্তুষ্ট হবে। বড়লোকের মেজাজ, সে যদি তোর ওপর রাগ ক'রে চ'লে যায়, পরিণাম ভাল হবে না। আজ ওর সঙ্গে যা, পরে একবার এসে দক্ষিণেশ্বরে যাস।

কিন্তু কন্যার সেই এক কথা,—ঠাকুর-মাঠাকরুণকে একটিবার দর্শন ক'রে তবে আমি যাবো। তোমাদের যা' খুশী বল।

এমনই যোগাযোগ, গৌরীমা সেইস্থানে হঠাৎ গিয়া উপস্থিত। তাঁহার মতে, ঠাকুরদর্শনে কালাকাল নাই। শুভ ইচ্ছা মনে জাগিলে তাহা ফেলিয়া রাখিতে নাই। বৃন্দাবনে ব্রজবালারাও এমনই আকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ছুটিয়া যাইতেন।*

বলরাম বসু বলিলেন,—এতই যখন আকাঙ্ক্ষা, তখন একবার দণ্ডবৎ ক'রেই আসুক-না। গৃহকর্ত্তার আদেশে বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। ভুবন অর্দ্ধসজ্জিত অবস্থাতেই চলিলেন। সঙ্গে চলিলেন গৌরীমা, কৃষ্ণভাবিনী এবং আরও দুই-একজন মহিলা। বলরাম বসু তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন না, জামাতার আদর-আপ্যায়ন এবং তাঁহার সঙ্গে নানারকম গল্প-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিবার জন্য বাড়ীতেই রহিয়া গেলেন।

গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। সময় অতি অল্প, দর্শনাদি ত্বরায় সমাধা করিতে হইবে। প্রণামান্তে কৃষ্ণভাবিনী

* এই বলরাম বসুর গৃহে অবস্থানকালেই একদিন আহার করিতে করিতে গৌরীমার দক্ষিণেশ্বরে যাইবার এমন ব্যাকুল আগ্রহ হইয়াছিল যে, তাঁহার আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব সহিল না। হাতমুখ ধুইবার কথাও ভুলিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বর অভিমুখে ছুটিলেন। যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিবার পর তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, হাতমুখ তখনও ধোয়া হয় নাই। অতঃপর তিনি গঙ্গায় হাতমুখ ধুইয়া আসিলেন।

সংক্ষেপে ঠাকুরকে অবস্থা জানাইলেন,—বড্ডো ঝক্কি মাথায় নিয়ে এসেছি বাবা, আপনি একটু আশীর্ব্বাদ করুন।

ভুবনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঠাকুর মৃদুহাস্যে বলেন,—বিপত্তারিণীর আশীর্ব্বাদ নিয়ে যাও, বিপদ কেটে যাবে।

অতঃপর নহবতে যাইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট কৃষ্ণভাবিনী সকল কথা বলিলেন,—জামাইকে ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি, রাগ ক'রে না চ'লে যায় আবার! মেয়ে জেদ ধরেছে আপনার পায়ের ধূলো না নিয়ে কিছুতেই শ্বশুরবাড়ী যাবে না। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন মা, কোন অমঙ্গল না হয়।

মাতাঠাকুরাণীর চরণযুগল ধরিয়া ভুবন বলিলেন,—কিসের এত ভয় বলুন তো মা! এই অপরাধে ত্যাগ করে তো করবে, আপনার কাছে এসে থাকবো, বাসন মাজবো, সেবা করবো, চারটি খেতে তো পাবো—

কন্যার কথায় বাধা দিয়া কৃষ্ণভাবিনী বলেন,—ষাট্ ষাট্ কি-যে বলিস? গৌরীমা মন্তব্য করেন,—বলরামদাদার মেয়ের উপযুক্ত কথাই বলেছে ভুবন।

মাতাঠাকুরাণী ভুবনের মুখখানি সস্নেহে তুলিয়া আদর করিয়া বলিলেন,—এই বয়সে এত ভক্তমেয়ে তুমি! ত্যাগ করবে কেন মা, স্বামিপুত্র নিয়ে তুমি সুখী হও।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা দেখিলেন, শ্বশুরজামাতা তখনও নানাবিষয়ের আলোচনায় মগ্ন, এবং সেই রাত্রিতে শ্বশুরালয়ে থাকিতেই জামাতা সম্মত হইয়াছেন।

জনৈকা বালিকা তাঁহার গর্ভধারিণীর সহিত মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন। একদিন মা তাঁহাকে পরম স্নেহভরে বলেন,—এসো মা, তোমায় আমি দীক্ষা দেবো।

মাতাঠাকুরাণী এইরূপে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া কন্যাকে দীক্ষা দিবেন, কন্যার এই সৌভাগ্যে তাঁহার গর্ভধারিণী নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। গঙ্গাস্নানান্তে সিক্তবসনে আসিয়া কন্যা মায়ের নিকট উপবেশন করিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর দিব্যভাব এবং আকর্ষণে বালিকার সরল পবিত্র হৃদয়ে এক অভাবনীয় প্রেরণা এবং আনন্দের সঞ্চার হইল।

দীক্ষা হইয়া গেলে মা তাঁহাকে বলিলেন,—তোমাকে আজ যা' দিলুম মা, এ সন্ন্যাসের মন্ত্র। তোমার মৃত্যুর পূর্ব্বে এ মন্ত্র কারুর কাণে দিয়ে যেও; তুমি না হ'লেও, সে সন্ন্যিসী হবে।

যথাকালে এই বালিকা সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক পথেও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। সময় সময় তাঁহার মনে এমন উচ্চভাবের উদয় হইত যে, স্বামী, সংসার, ধনসম্পদ সকলই অকিঞ্চিৎকর এবং তুর্ব্বিহ বোধ হইত, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া উদাসিনী হইয়া যাইবার তীব্র প্রেরণা তিনি অনুভব করিতেন। কিন্তু নিয়তি তাহা হইতে দেয় নাই।

তারপর একদিন—

এই ভক্তিমতী নারী যেন মন্ত্রশক্তির অদম্য প্রভাবেই নিজের পুত্রকে মাতাঠাকুরাণী-প্রদত্ত সেই অমোঘ মন্ত্র দান করিয়া ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন,—বাবা, আমার গুরুর আদেশ, এই মন্ত্র কাউকে দিয়ে যেতে হবে। মন্ত্র তা'কে সন্ন্যিসী করবে। যা' এতদিন আমি বুকের মধ্যে যখের ধনের মত আগলে রেখেছিলুম, আজ তোমায় দান করলুম। তাঁর নিকট প্রার্থনা করছি,—তাঁর বীজ তোমাতে সফল হোক।

মনে পড়ে, তত্ত্বদর্শিনী মহিষী মদালসার কথা, নিজের পুত্রদিগকে যিনি রাজৈশ্বর্য্যের পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসে দীক্ষা দিয়া পাঠাইয়াছিলেন পরমার্থের সন্ধানে। ধন্য এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ, যুগে যুগে যেখানে মমতাময়ী জননীও আপন বুক শূন্য করিয়া আত্মজকে কঠোর কর্ত্তব্যের পথে এবং অমৃতের সাধনায় আত্মোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

ধন্য ভারতের নারী, মানসিক শক্তির দৃঢ়তা, ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও ভোগে অনাসক্তি এবং সুদুর্লভ পরমধনের প্রতি অন্তরের আকর্ষণ যাঁহাদের চরিত্র মহিমান্বিত করিয়াছে। ভাবিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, শ্রদ্ধায় অন্তর ভরিয়া উঠে।

আর, ধন্য মাতা সারদামণি, এই ভোগবাদের যুগেও যাঁহার অমোঘ মন্ত্রশক্তি ঐশ্বর্য্যশালিনী কুলবধূকে অনুপ্রেরণা দিয়াছে ত্যাগের পথে, মমতাময়ী জননীকেও উদ্বুদ্ধ করিয়াছে একমাত্র প্রাণাধিক পুত্রকে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী করিতে।

কত ধর্ম্মপিপাসু, কত ব্যথাতুরা নারী দক্ষিণেশ্বরে মাতাঠাকুরাণীর লীলানিকেতনে আসিয়া সান্ত্বনা পাইয়াছেন, পথের সন্ধান পাইয়াছেন, অভীষ্ট বস্তু লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। মা বলিতেন,—সংসার থেকে ছুটি নিয়ে বৌঝিরা কেন-যে দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসতো, পতিপুত্রের কথা ভু'লে কেন-যে তা'রা সারারাত ঐ ছোট্ট কুঠরিতে প'ড়ে থাকতো, ভেবে আশ্চর্য্য মনে হয়।

—শুধু কি তাই? কত কাণ্ডই না হতো ওখানে! ঐ তো ঘর, জিনিষপত্র রেখে কতটুকু জায়গাই-বা খালি ছিল! তা'তেই আবার কীর্ত্তন হতো। লক্ষ্মীমণি বেশভূষা প'রে কখনো গৌরাঙ্গ, কখনো বৃন্দাসখী সেজে নাচতো; আর গৌরমণি ব্রজবালার বেশে কীর্ত্তন করতো। কত ভাবসমাধি হতো। কীএক আনন্দের মধ্যে কত রাত ভোর হ'য়ে যেতো!

এই মাতৃপীঠের মণিকোঠায় যে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য পরিবেশিত হইয়াছে, আজিও তাহার অনেক তথ্য অপ্রকাশিত। যেদিন সেইসকল পুণ্যকথা সম্যক প্রকাশিত হইবে, মানুষ সবিস্ময়ে উপলব্ধি করিবে যে, তাহারা এতকাল যাহা জানিয়া আসিয়াছে তাহাই সম্পূর্ণ চিত্র নহে; দক্ষিণেশ্বর কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের নহে, দক্ষিণেশ্বর শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ উভয়েরই বিচিত্র লীলাভূমি।

ঠাকুরের মহাসমাধি

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কক্ষে এবং মাতাঠাকুরাণীর কক্ষেও যে অফুরন্ত আনন্দমহোৎসব চলিত, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। ভক্তিমতী মহিলাগণ ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেও তাঁহাদের প্রাণ পড়িয়া থাকিত নহবৎ-ঘরে—মাতৃপীঠে; আর মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ পড়িয়া থাকিত ঠাকুরের নিকটে।

তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—আমি থাকতুম বটে নহবতে, কিন্তু প্রাণ মন সর্ব্বদা ঠাকুরের ঘরেই প'ড়ে থাকতো। সেখানে কি হচ্ছে শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হ'য়ে থাকতুম। লক্ষ্মী, গৌরদাসী, গোপালের মা এদের দিয়েও খবর নিতুম। নহবতের বারান্দায় যে দরমার বেড়া ছিল, জায়গায় জায়গায় তা'র ফাঁক ক'রে রেখেছিলুম, তা'র মধ্য দিয়ে ঠাকুরকে আর তাঁর সব কাণ্ডকারখানা দেখতুম। বেড়ার ফাঁক ক্রমশঃ বড় হচ্ছে দেখে শেষে কি-না ঠাকুর একদিন হাসতে হাসতে বলেন, "ও রামলাল, তোর খুড়ীর বাড়ীর বেড়ার ফাঁক যে দিনকে দিন বেড়েই চলেছে, শেষ পর্য্যন্ত আবরুর অস্তিত্বটুকু থাকবে তো রে!" শুনে লজ্জায় ম'রে যেতুম। কিন্তু না দেখেও থাকতে পারতুম না। এমনই তীব্র ছিল সেখানকার আকর্ষণ।

আচম্বিতে একদিন ভাঙ্গিয়া যায় এই আনন্দমেলা।

নির্ম্মল আকাশে কোথা হইতে ভাসিয়া আসে ভীমকায় একখণ্ড কৃষ্ণ মেঘ, আচ্ছন্ন করে পৃথিবীকে, রাহু যেমন গ্রাস করে প্রচণ্ড সূর্য্যকে। গঙ্গার কল্‌কল্ ছল্‌ছল্ আনন্দোচ্ছ্বাসও যেন স্তব্ধ হইয়া যায়।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে" লিখিত আছে,—

"আজ মঙ্গলবার, ১১ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ;

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা পর্য্যন্ত মৌন অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন। * * *

"শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্চার হইয়াছে ; * * * তিনি কথা কহিতেছেন না দেখিয়া শ্রীশ্রীমা কাঁদিতেছেন ; রাখাল ও লাটু কাঁদিতেছেন ; বাগবাজারের ব্রাহ্মণীও এই সময় আসিয়াছিলেন, তিনিও কাঁদিতেছেন। ভক্তেরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনি কি বরাবর চুপ করিয়া থাকিবেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, 'না।"

"রবিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ ;

"বহুবাজারের রাখাল ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া মাষ্টার আসিয়া উপস্থিত ; ডাক্তারকে ঠাকুরের অসুখ দেখাইবেন।

ডাক্তারটি ঠাকুরের গলায় কি অসুখ হইয়াছে দেখিতেছেন। * * *

ডাক্তার ব্যবস্থা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রতি)—আচ্ছা, লোকে বলে, ইনি যদি এত (এত সাধু)—তবে রোগ হয় কেন ? * * *

গোস্বামী—আজ্ঞা, আপনার যে অসুখ সে পরের জন্য ; যারা আপনার কাছে আসে তাদের অপরাধ আপনার নিতে হয়, সেই সকল অপরাধ, পাপ লওয়াতে আপনার অসুখ হয়।

একজন ভক্ত—আপনি যদি মাকে বলেন মা, এই রোগটা সারিয়ে দাও, তা হলে শীঘ্র সেরে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না ; আবার ইদানীং সেব্যসেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে। একবার বলি 'মা, তরবারির খাপটা একটু মেরামত করে দাও' ; কিন্তু ওরূপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে, আজকাল 'আমি'টা খুঁজে পাচ্ছি না। দেখছি তিনিই এই খোলটার ভিতরে রয়েছেন।

কীর্ত্তনের জন্য গোস্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন—কীর্ত্তন কি হবে ? শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ, কীর্ত্তন হইলে মত্ততা আসিবে ; এই ভয় সকলে করিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—হোক একটু। আমার নাকি ভাব হয়, তাই ভয় হয়। ভাব হলে গলার ঐ খানটায় গিয়ে লাগে।

কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ করিতে পারিলেন না; দাঁড়াইয়া পড়িলেন ও ভক্তসঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন।"

•

সাধারণ বুদ্ধির ব্যক্তিরাই এই প্রশ্ন করিয়াছে,—রামকৃষ্ণ পরমহংস যদি সত্যই অবতার, তবে তাঁহার আবার রোগভোগ কেন? রোগ তো হয় সাধারণ মানুষের।

কিন্তু ঠাকুর নিজেই বহুপূর্ব্বে ইহার উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "নরলীলায় অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয়,—তাই চিনতে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ, সেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, কখন-বা ভয়—ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীতার শোকে কাতর হয়েছিলেন।" "সীতার শোকে রাম ধনুক তুলতে না পারাতে লক্ষ্মণ আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল, কিন্তু পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।"

তবে, পার্থক্য এই যে, আমরা স্থূলদৃষ্টিতে তাঁহাদিগের সুখদুঃখ যেরূপ মনে করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা ভ্রমপূর্ণ। দেহসর্ব্বস্ব মানুষ মোহজালে এবং স্বকৃত কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইয়া যেমন ঘুরপাক খায়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পুরুষের আকার সাধারণ মানুষের ন্যায় হইলেও তাঁহাদের মন দেহে আবদ্ধ থাকে না, উচ্চস্তরে অবস্থিত থাকে; সুতরাং সুখদুঃখ তাঁহাদিগকে আদৌ বিচলিত করিতে পারে না। মন তাঁহাদিগের অধীন, তাঁহারা মনের অধীন নহেন। যে-সময়ে মন সাধারণ ভূমিতে বিচরণ করে, তখনই কেবল তাঁহারা দেহের সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন, সর্ব্বসময় নহে।

যোগসাধনায় সিদ্ধ হইলে ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং ব্যাধিকেও অনেকাংশে জয় করা যায়, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ দেহের দুঃখযাতনা লাঘবের প্রয়োজনে যোগশক্তির প্রয়োগ করিতে কখনও ইচ্ছা করেন নাই। নিজের আচরণের দ্বারা তিনি সকলকে এই শিক্ষাই প্রদান করিয়াছেন যে, ভগবানের নিকট

কেবল শুদ্ধা ভক্তিই কামনা করিতে হয়, দৈহিক সুখশান্তি অথবা ঐশ্বর্য্য নহে। প্রিয় অন্তরঙ্গগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও বলিয়াছেন, "রোগের কথা মাকে বলতে পারি না, লজ্জা হয়।"

স্থূলদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণের রোগের মূলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি চিরকাল বালকস্বভাব ছিলেন, ভক্তগণ যখন গ্রীষ্মকালে তাঁহাকে বরফ খাওয়াইতে আরম্ভ করিলেন, তিনি তাহাতে আরাম পাইতেন, এবং অবশেষে অধিক বরফ খাইবার ফলে তাঁহার গলায় ব্যথা হয়। এই অবস্থাতেও চিকিৎসার সকল নিয়ম পালন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তাঁহার পক্ষে তাহা কার্য্যতঃ সম্ভব হইত না; ভক্তদিগের সহিত অধিক কথা বলিতেন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে ভাবস্থ হইতেন, এমন-কি নৃত্যও করিতেন; ব্যাধির কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইতেন।

অনিয়ম ও অত্যাচার চরমে উঠে ১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, যেদিন তিনি পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান করেন। অসুস্থতার কথা বিবেচনা করিয়া পানিহাটিতে যাইবার বিরুদ্ধে কেহ কেহ যুক্তি দেখাইলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই স্থির হইল। সেইস্থানে গিয়া অধিক বিলম্ব করা হইবে না, রৌদ্রতাপে থাকা হইবে না, ভাবসমাধির সহায়ক কোন কার্য্য করা হইবে না,—ভক্তগণের এবম্বিধ কতকগুলি সর্ত্তে ঠাকুর স্বীকৃত হইলেন। নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, রামচন্দ্র দত্ত-প্রমুখ অনেক ভক্ত এবং কোন কোন ভক্তিমতী নারী তাঁহার সহিত নৌকাযোগে চলিলেন।

পানিহাটির মহোৎসবে ঠাকুর যে বিরাট লীলা দেখাইলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এইস্থানে দিব না; কিন্তু কার্য্যতঃ ইহাই হইল যে, কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর প্রথমতঃ ভাবাবিষ্ট হইলেন, তৎপর উদ্দাম নৃত্য-গীত আরম্ভ করিলেন। ভাবাবিষ্ট মহাপুরুষকে ঘিরিয়া একের পর এক কীর্ত্তনসম্প্রদায় নৃত্যগীত করিতে লাগিল। পানিহাটিতে তাঁহার অসুস্থ দেহের উপর সারাদিন এইভাবে অত্যাচার হইল; সর্ব্বোপরি গ্রীষ্ম ও বৃষ্টির প্রকোপ। রোগ বৃদ্ধি পাইল।

অবস্থা গুরুতর হইলে শারদীয়া পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে সুচিকিৎসার

জন্য ভক্তগণ তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর হইতে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। ৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটের বাটীতে অদ্যাপি একখণ্ড প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কিছুকাল এই বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন।" পথচারিগণ পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সেই গৃহকে শ্রদ্ধায় নমস্কার করে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা দেবীর মূর্ত্তি তাহাদিগের মানসপটে ভাসিয়া উঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার সুব্যবস্থা হইল। সন্তানগণ দিবারাত্র প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের আয়ত্তের মধ্যে কোন ত্রুটি থাকিতে দিলেন না। ভক্তিমতীদিগের মধ্যে লক্ষ্মীদিদি ও গোলাপমা আসিয়া মধ্যে মধ্যে সেবাকার্য্যে সহায়তা করিতেন।

কিন্তু এত করিয়াও শীঘ্রই সকলের এই কথাই মনে হইতে লাগিল, এক মাতাঠাকুরাণীর অনুপস্থিতিতে সকলই ত্রুটিপূর্ণ। তিনি যেমন যত্ন ও দক্ষতাসহকারে পথ্যাদি প্রস্তুত করিতে পারেন, নানাকথার কৌশলে ঠাকুরকে আহার্য্য গ্রহণ করাইতে পারেন, ইঙ্গিতের পূর্ব্বেই তাঁহার প্রয়োজন বুঝিতে পারেন, অন্য কাহারও দ্বারা তেমনটি সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের ঐকান্তিকতা এবং সমবেত চেষ্টা সত্ত্বেও একমাত্র মাতাঠাকুরাণীর অভাবে সকল ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য যেন ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে।

ঠাকুরের সেবাযত্নের উদ্দেশ্যে শ্যামপুকুরের বাটীতে পুরুষ সন্তানগণই সর্ব্বদা থাকিতেন, তাঁহাদিগের সংশ্রব হইতে পৃথক থাকিবার মত অন্তঃপুর এই বাটীতে ছিল না। সুতরাং লজ্জাশীলা মাতাঠাকুরাণী এইরূপ অপ্রশস্ত স্থানে পুরুষদিগের মধ্যে কিভাবে দিবারাত্র বাস করিবেন? সন্তানগণ চিন্তা করিয়া এই সমস্যার কোনও সমাধান করিতে পারিলেন না।

অবশেষে রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের নিকট প্রস্তাব করিলেন, এখানে মাতাঠাকুরাণী না থাকায় সেবাযত্নের অনিয়ম হইতেছে, রোগ উপশমের পথে বিঘ্ন হইতেছে, তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ঠাকুর আপত্তি করিলেন, না রে বাপু, সপত্নীক এখানে থাকিলে শহরের লোকেরা 'হংস-হংসী' বলিয়া নিন্দা করিবে। তাঁহাকে আনিয়া কাজ নাই, বর্ত্তমান

ব্যবস্থায় বেশ আছি। সন্তানগণ যুক্তি দেখাইলেন, মিনতি জানাইলেন, অগত্যা সকলের আগ্রহাতিশয্যে ভক্তবৎসল মৌনী রহিলেন।

দীর্ঘকাল বাস করিবার পক্ষে দক্ষিণেশ্বরের নহবৎ-ঘরও উপযোগী নহে, কিন্তু শ্যামপুকুরের বাটীর ব্যবস্থা মাতাঠাকুরাণীর পক্ষে তদপেক্ষা অধিক কষ্টদায়ক, তথাপি এইস্থানে আসিতে তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন। পতি রোগে শয্যাগত, নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? ভক্তগণ প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি শ্যামপুকুরে চলিয়া আসিলেন। ইহাতে সকলেই পরম নিশ্চিন্ত হইলেন।

ছাদের উপর সঙ্কীর্ণ একখানি চালার তলায় মায়ের স্থান নির্দ্ধারিত হইল। সেখানে পুরুষের যাতায়াত ছিল না। তিনি সর্ব্বক্ষণ তথায় থাকিতেন, জপধ্যান ও রন্ধনাদি করিতেন। তাঁহার স্নানের জন্য পৃথক ব্যবস্থা ছিল না, পুরুষভক্তগণ শয্যাত্যাগ করিবার পূর্ব্বেই, রাত্রিশেষে তিনি একতলায় স্নানাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ছাদে উঠিয়া যাইতেন। পুনরায় রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে দ্বিতলে একখানি ঘরে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন, অবশ্য নিতান্ত অল্প সময়ের জন্য। এইভাবে নিভৃতে নীরবে আত্মগোপন করিয়া তিনি একান্ত নিষ্ঠার সহিত ও অক্লান্তভাবে পতির সেবাশুশ্রূষা করিয়া যাইতে লাগিলেন।

চিকিৎসকগণের অভিমত,—অত্যধিক কথা বলিবার দরুণ ঠাকুরের গলক্ষত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মালোচনা এবং সেই প্রসঙ্গে দুর্ব্বল দেহে ভাবাবেশের বিরাম ছিল না; বরং কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার নিকট যাতায়াত সহজসাধ্য হওয়ায় ভক্তসমাগম এবং সাধারণ দর্শনার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল, সুতরাং কথাবলাও বৃদ্ধি পাইল। ফলে রোগের নিবৃত্তি আশানুরূপ হইল না; কখনও উপশম হয়, কখনও-বা বৃদ্ধি পায়।

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। ভক্তিতত্ত্ব, কীর্ত্তন ও নর্ত্তনাদিতে তিনি প্রীতিযুক্ত ছিলেন না। ঠাকুরের প্রতি প্রথমতঃ তাঁহার শ্রদ্ধারও অভাব ছিল। ব্রাহ্মসমাজের

স্বয়ং কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামি-প্রমুখ ব্যক্তিগণ যে ঠাকুরের অতিশয় অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমতেরও যে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, ইহা অনেকেই জানিতেন। মহেন্দ্রলাল জ্ঞানী এবং বৈজ্ঞানিক, প্রথম হইতেই সাবধান রহিলেন।

ভাবসামাধি যে স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা, তাহা তিনি মনে করিতেন না। নিরাকার ব্রহ্ম যে মানবাকারে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহের চিকিৎসা করিতে আসিয়া, তাঁহার সঙ্গে ঈশ্বরীয় আলোচনা এবং নরেন্দ্রনাথ, মাষ্টার মহাশয় ও গিরিশচন্দ্রের সহিত তর্কবিচারের ফলে চিকিৎসকের অজ্ঞাতসারে তাঁহার নিজের বৈজ্ঞানিক মনেরও চিকিৎসা হইতে লাগিল। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি-অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ইহা মস্তিষ্কের বিকার অথবা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা নহে, ঐশ্বরিক ভাবই বটে। কেবল তাহাই নহে, শ্রীরামকৃষ্ণ যে স্পর্শমাত্র, এমন-কি ইচ্ছামাত্র যে-কেহকে এবং একসঙ্গে বহুলোককেও ভাবাবিষ্ট করিয়া দিতে পারেন, ইহা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার নিজেও প্রত্যক্ষ করিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যই একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ, এই বিষয়ে তাঁহার আর কোনই সন্দেহ রহিল না।

শ্যামপুকুরের একটি ঘটনা।

ঠাকুরের পরমভক্ত নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের রঙ্গমঞ্চে অনেক নারী অভিনয় করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিত। ঠাকুরকে দর্শন করিবার সৌভাগ্যও তাহাদের অনেকেরই হইয়াছে। তাহারা ঠাকুরকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি করিত।

মহাপুরুষের দর্শনেও পুণ্য হয়। স্বাতীনক্ষত্রের জল লাভ করিয়া শুক্তির মধ্যে মুক্তা-ফলার মত ভগবদ্‌বিমুখ অন্তরেও ভক্তির উদয় হয়।

গুরুদেবের অসুস্থতাহেতু গিরিশচন্দ্রের চিত্তচাঞ্চল্য এবং ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। রঙ্গমঞ্চেও এই কথার আলোচনা হইত। বিনোদিনী নামে

একজন অভিনেত্রী ঠাকুরের অসুস্থতার কথা শুনিয়া বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। 'বাবা' কঠিনরোগে শয্যাগত,...কতকাল সে তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পায় নাই,...এইরূপ কত কথা ভাবিয়া বিনোদিনীর অন্তর ব্যথিত হইতে লাগিল। বাবার জন্য যে এত আকর্ষণ তাহার মনে সঞ্চিত ছিল, পূর্ব্বে তাহা সে নিজেই অনুভব করে নাই। তাঁহাকে দর্শন করিবার আগ্রহ তাহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু সেই পুণ্যস্থানে সে কেমন করিয়া প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে? ভাবিয়া সে কূল পায় না। তাহার এমন কি পুণ্যবল আছে যে, দেবতার দর্শন পাইবে? অধিকন্তু পুরুষ সন্তানগণ সর্ব্বক্ষণ তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকে। সে নারী, তাহাকে উপরে যাইতে দিবে কেন? সে রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী, দেখিয়া হয়তো কেহ চিনিয়া ফেলিবে, দেখা করিতে দিবে না। অপমানই সার হইবে।...কিন্তু উপায় কি?...

—বাবার কি দয়া হইবে না?

—কয়েকজন মিলিয়া গিরিশচন্দ্রকে তাহাদের এই প্রার্থনা জানাইবে কি? কিন্তু তাঁহার মেজাজ কখন যে সহজ থাকে, আর কখন যে সপ্তমে চড়ে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। হয়তো এমন স্পর্দ্ধার কথা শুনিলে গালিগালাজ করিয়া তিনি তাড়াইয়া দিবেন। না, কাহারও কাছে এই কথা সে প্রকাশ করিবে না।

দীক্ষার মন্ত্রের মত হৃদয়মধ্যে গোপন করিয়া রাখে সে দেবদর্শনের এই তীব্র ব্যাকুলতা; কিন্তু চঞ্চল মনকে স্থির রাখিতে পারে না। দর্শন একবার করিতেই হইবে, যেমন করিয়াই হউক।

রঙ্গমঞ্চের অভিনেত্রী বিনোদিনীর এখন অনুক্ষণ ধ্যান—শ্রীরামকৃষ্ণ।

একদিন সন্ধ্যার পর পরমহংসদেবের দর্শনমানসে শ্যামপুকুরের বাড়ীতে একব্যক্তি ধীরপদক্ষেপে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহার বেশ ও ভঙ্গীতে সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান বলিয়াই মনে হয়। কত নবীন ভক্ত ও দর্শক ঠাকুরের নিকট এখন যাতায়াত করে, কে কাহার সন্ধান রাখে? নবাগতকে কেহ বাধা দেয় না, প্রশ্নও করে না।

দ্বিতলে নির্জ্জন কক্ষে দেবমানব শয্যায় শায়িত। জীর্ণ দেহ, কিন্তু তাহার জ্যোতিতে যেন চারিদিক উদ্ভাসিত, দিব্যভাবে কক্ষটি পরিপূর্ণ।

দূর হইতেই ভূমিতে প্রণাম করিয়া এক কোণে কৃতাঞ্জলিপুটে নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া থাকে নবাগত।

—কে ও? আলো-আঁধারের মধ্যে দেবমানব একবার সেইদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মুহূর্ত্তের ব্যাপার মাত্র।

—কিগো, তুমি এখানে!···এমন বেশে!

বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল বিনোদিনীর। অন্তরের আলোড়ন এতক্ষণে নয়নপথে বাহির হইয়া মুক্তাবৃষ্টির ন্যায় ঝরিয়া পড়ে পতিত-পাবনের চরণকমলের উদ্দেশে।

—একটিবার আপনাকে দর্শন করবো ব'লে, বিনোদিনী শুষ্ক কম্পিত-কণ্ঠে বলে। সর্ব্বদেহ আবেগে কাঁপিতে থাকে, আর কিছুই বলিতে পারে না সে, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে।

—তা' বেশ, ভক্তি হোক।

আবার নিস্তব্ধতা। যায় কিছুক্ষণ। এইবার ঠাকুর স্মিতমুখে বলেন,—দর্শন তো হলো, এবার এসো গে তবে।

ঠাকুরের আরোগ্যসংকল্প লইয়া কোন কোন সন্তান দৈবকৃপালাভের আশায় জপধ্যানে অধিক সময় নিয়োগ করিতে লাগিলেন। একদিন তাঁহারা কাতরভাবে তাঁহারই নিকট নিবেদন জানান, এইভাবে অনাহারে থাকিলে, দেহ আর কতদিন রক্ষা পাইবে? দুধভাত না খাইলে দেহে শক্তিসঞ্চার হইবে কি করিয়া? আপনি মা-কালীকে জানাইলে, আপনার যাহাতে ভোজন চলিতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থাই তিনি করিয়া দিবেন।

সে-কি হয়! দেহের জন্যে এমন কথা মাকে কি ক'রে বলবো? ঠাকুর সবিস্ময়ে বলেন।

আমাদের মুখ চেয়ে মাকে এই কথা আপনার বলতেই হবে, ভক্তগণ সমস্বরে অনুনয় করেন।

সন্তানদিগের অভিমান, ভালবাসার আবদার; কি আর করেন ঠাকুর। সরলমতি বালকের ন্যায় তাঁহাদিগের ব্যাকুল প্রার্থনা যথাস্থানে জানাইলেন। মা-কালীর উত্তর পাইয়া তিনি উত্তেজিতভাবে বলেন,—দ্যাখ্ তো, তোদের কথায় প'ড়ে আমাকে এমন লজ্জা পেতে হলো! নিজের উপর ধিক্কার আসছে। মা বললেন,—সন্তানদের লক্ষ লক্ষ মুখে খাচ্ছ, আর একটা মুখে যদি না-ই খাও তা'তে কী আসে যায়?

শারদীয় উৎসবের পর অমাবস্যা আগতপ্রায়। ঠাকুর ভক্তদিগকে কালীপূজার আয়োজন করিতে বলিলেন। সকলে সোৎসাহে আয়োজন করিলেন। তাঁহার কক্ষেই পূজার ব্যবস্থা হইল। কিভাবে পূজা হইবে, কে পূজা করিবে, কিছুই স্থির হয় নাই। পূজাদিবসে সন্ধ্যার পর ভক্তগণ বসিয়া আছেন, ঠাকুর তাঁহাদিগকে জপধ্যান করিতে বলিলেন।

এমন সময় কি হইল,—

ঠাকুরকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ভক্ত গিরিশচন্দ্রের মনে এক নবভাবের উদয় হইল,—ঠাকুরই মা-কালী, আজ তাঁহারই পূজা। এইরূপ ভাবিয়া গিরিশচন্দ্র পূজার পুষ্পপাত্র হইতে সচন্দন পুষ্পপত্র তুলিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় মা-কালী' বলিয়া ঠাকুরের চরণযুগলে অঞ্জলি দিলেন। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সকলেই তদনুরূপ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন, দুই হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক যেন বরাভয় বিতরণ করিতে-ছেন। ভক্তগণ দিব্যভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া 'জয় মা, জয় মা' ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সকলে অনুভব করিলেন, ঠাকুরের দেহে মা-কালীর আবির্ভাব হইয়াছে। কেহ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন, কেহ-বা গান গাহিতে লাগিলেন।

শ্যামপুকুরে প্রায় তিন মাস অবস্থানের পরেও স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকগণ তাঁহাকে কোন মুক্তস্থানে স্থানান্তরিত করিতে পরামর্শ দিলেন। শহরের বাহিরে কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরের

মধ্যপথে ৯০ নম্বর কাশীপুর রোডে ভক্তগণ একটি উদ্যানবাটী ভাড়া করিলেন। প্রশস্ত স্থান, দ্বিতল বাটী, সম্মুখে পুষ্করিণী, ফলফুলের তরু-লতায় বেষ্টিত,—স্থানটি মনোরম। ঠাকুর দ্বিতলে একখানি ঘরে এবং মাতাঠাকুরাণী একতলায় থাকিতেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য লক্ষ্মীদিদিও আসিলেন। শ্যামপুকুরে স্থায়ী সেবকগণের সংখ্যা অল্প ছিল, কাশীপুরে তাঁহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। দক্ষিণেশ্বর হইতে রামলাল-দাদাও সময় সময় আসিতেন। দূরত্ব বৃদ্ধি পাইলেও কলিকাতার গৃহী ভক্তগণের যাতায়াত কমিল না, তাঁহারাই অর্থসাহায্য করিতেন। সকলে সেইস্থানের ব্যবস্থায় সন্তোষ লাভ করিলেন। বিশেষ করিয়া মায়ের স্থানাভাবের অসুবিধা দূর হইল। তিনি পূর্ব্ববৎ মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ঠাকুরের সেবা করিতে লাগিলেন।

নূতন স্থানের জন্যই হউক, মুক্ত বাতাসের গুণেই হউক, অথবা মনের প্রসন্নতার জন্যই হউক, কাশীপুরে আসিয়া ঠাকুরের স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং দেহে বলসঞ্চার হইতেছে বলিয়া অনেকেরই ধারণা হইল। ঠাকুরও মনের আনন্দে বিস্তীর্ণ উদ্যানে কখন কখন ভক্তসঙ্গে বেড়াইতেন। সকলের মনেই উৎসাহ এবং আনন্দ বৃদ্ধি পাইল।

দুই-তিন সপ্তাহ এইভাবে অতিবাহিত হইল।

তাহার পর আসিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী, যাহাকে কোন কোন ভক্ত 'কল্পতরু দিবস' আখ্যা দিয়াছেন।

ইংরাজী নববর্ষের পর্ব্বদিনে বহু ভক্ত সমাগত হইয়াছেন, উদ্যানের স্থানে স্থানে তাঁহারা দলে দলে মিলিত হইয়া আনন্দকোলাহল করিতে-ছেন। মনোহর বেশে সজ্জিত ঠাকুর অপরাহ্নে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া প্রফুল্লমনে উদ্যানে আসিয়া পাদচারণ করিতে লাগিলেন। অকস্মাৎ তাঁহাকে সেই অবস্থায় দর্শন করিয়া ভক্তগণ তাঁহার নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহাদিগকে মিলিত দেখিয়া ঠাকুরের আনন্দ উথলিয়া উঠিল, সমুদ্রে যেন জোয়ার আসিয়াছে। তিনি হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন, 'তোদের চৈতন্য হোক।'

সকলে তাঁহার পাদপদ্মে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন, কেহ পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সকলের মন ভক্তি ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দে আপ্লুত হইয়া ঠাকুরও অকাতরে করুণা বিতরণ করিতে লাগিলেন। কাহাকেও হস্তস্পর্শদ্বারা, কাহারও মস্তকে পদার্পণদ্বারা পরমানন্দ অনুভব করাইলেন, কাহাকেও-বা দীক্ষা দান করিয়া কৃতার্থ করিলেন।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"তে অক্ষয়কুমার সেন লিখিয়াছেন, তাঁহাকেও করুণাময় ঠাকুর এই সময়ে কৃপা করেন,—

"কানে কিবা বলিলেন আছয়ে স্মরণে।
মহামন্ত্র বাক্য তাই রাখিনু গোপনে॥
কি দেখিনু কি শুনিনু নহে কহিবার।
মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার॥" (২)

কোন কোন ব্যক্তি এইরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদিগের বক্ষে অথবা জিহ্বায় অঙ্গুলিদ্বারা স্পর্শ করিয়া অথবা মন্ত্র লিখিয়া দীক্ষাদান করিতেন, কিন্তু কাহারও কর্ণে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক দীক্ষাদান করিতেন না; তাঁহাদিগের ধারণা যে ভ্রমাত্মক, তাহা উক্ত বর্ণনা হইতেই বুঝা যায়। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে"ও এইভাবে কয়েকজনকে কর্ণে দীক্ষাদানের কথা উল্লেখ আছে। ঠাকুরের এইরূপে কর্ণে দীক্ষাদানের কথা আমরা অন্য সূত্রেও জানিয়াছি।

নির্ব্বাণের পূর্ব্বে তৈলহীন প্রদীপ সর্ব্বশক্তিতে একবার জ্বলিয়া উঠে। 'কল্পতরু দিবসে' সকলকে আনন্দ দান করিয়া জীর্ণতনু শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমে অবনতির দিকে যাইতে লাগিল। চিকিৎসক ও ভক্তগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন।

এইকালে একটি অপ্রীতিকর ব্যাপার ঘটিয়া গেল। কাশীপুরের সেবাব্যয়ের ব্যবস্থা লইয়া গৃহী ও ত্যাগী সন্তানগণের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। গৃহী ভক্তদের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া ত্যাগী সন্তানগণ ভিক্ষাদ্বারা সেবার কার্য্য চালাইবেন স্থির করিলেন। দক্ষিণেশ্বরে একদিন

কতিপয় ত্যাগী সন্তান ঠাকুরের নির্দ্দেশে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন,—ভিক্ষান্ন পবিত্র। এইবার প্রয়োজনবশতঃ তাঁহাদের অনেককেই ভিক্ষা করিতে হইল। মাতাঠাকুরাণীর নিকট প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে ভিক্ষায় বাহির হইতেন এবং ভিক্ষালব্ধ-দ্রব্যাদি-দ্বারাই কয়েকদিবস ঠাকুর-ঠাকুরাণী ও সকলের আহারের ব্যবস্থা হইল।

নিত্যনিরঞ্জন দরজায় প্রহরী থাকিতেন, গৃহী ভক্তদিগকে ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। কিন্তু করুণাময় ঠাকুরের হৃদয় গৃহী সন্তানগণের জন্য ব্যথিত হইত, তিনি অনতিবিলম্বে বিবদমান সন্তানদিগের মধ্যে মিলন ঘটাইয়া দিলেন। সকলের মনোমালিন্য দূর হইয়া গেল।

পূর্ব্বের আনন্দ ফিরিয়া আসিল না। ঠাকুর সেই-যে শয্যাগ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহার দৈহিক অবস্থার উন্নতি হইল না। বিষাদের করালছায়া সকলকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করিল। একদা রাত্রিতে মাতা-ঠাকুরাণী স্বপ্নে দেখিলেন যে, চিন্ময়ী মাতা ভবতারিণীও ঠাকুরের ন্যায় গলক্ষতে কষ্ট পাইতেছেন। তবে আর কে তাঁহার পতিকে রক্ষা করিবেন? তিনি শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুরের দেহ বিশেষ অসুস্থ। একদিন গভীর রাত্রিতে নরেন্দ্রনাথ, রাখালচন্দ্র ও শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় তাঁহার পদসেবা করিতেছেন, কথা বলিতেও কষ্ট, "আস্তে আস্তে অতিকষ্টে বলিতেছেন—'তোমরা কাঁদবে ব'লে এত ভোগ করছি, সব্বাই যদি বল যে, 'এত কষ্ট, তবে দেহ যাক্,' তাহ'লে দেহ যায়।"

"কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যিনি তাঁহাদের পিতামাতা রক্ষাকর্ত্তা, তিনি এই কথা বলিতেছেন। সকলে চুপ করিয়া আছেন। কেহ ভাবিতেছেন, এরই নাম কি 'ক্রুসিফিক্সন? ভক্তদের জন্য দেহ বিসর্জ্জন?" * * *

"ঠাকুর একটু সুস্থ হইতেছেন, বলিতেছেন,—'অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখিতেছি। তার মধ্যে এই রূপটীও (নিজের মূর্ত্তি) দেখছি।" (১)

পতির নিরাময়তার উদ্দেশ্যে শেষচেষ্টা করিতে একদিন মাতাঠাকুরাণী কলিকাতার অদূরবর্ত্তী তীর্থস্থান তারকেশ্বরে যাইয়া আশুতোষ তারকনাথের শরণাপন্ন হইলেন। বাবার কৃপা হইলে কেহ দৈবাদেশ পায়, কেহ ঔষধ পায় ; কেহ শীঘ্র পায়, কেহ বিলম্বে পায়।

মন্দিরসংলগ্ন দীঘিতে স্নানান্তে মা নানা-উপচারে বাবা তারকনাথের পূজা করিলেন, তাহার পর সিক্তবসনে এবং অনাহারে থাকিয়া পতির রোগশান্তির জন্য একান্তভাবে কামনা করিয়া বাবার নিকট ধন্না দিলেন। দিন যায়, রাত্রি যায়, তিনি অনন্যমনে তারকনাথের করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। আহার নাই, নিদ্রা নাই, একস্থানে নিশ্চল পড়িয়া রহিলেন।

এমন সময় কিসের শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল,—সৃষ্টির অন্তকাল উপস্থিত, জরাজীর্ণ পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মহাশূন্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আবার ধীরে ধীরে নূতন সৃষ্টি জাগিয়া উঠিতেছে। সেই ধ্বংস এবং সৃষ্টির মধ্যে তিনি একা। অনন্তকাল ধরিয়া তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই লীলা দেখিয়া আসিতেছেন। তাঁহারই সৃষ্টি, আর ধ্বংসও তাঁহারই। তিনি এই দুয়েরই অতীত—অনাদি, অনন্ত, শাশ্বত পরমাত্মা।

ঘটাকাশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন তিনি মায়াবন্ধনহীন। ভাবেন,—জন্ম এবং মৃত্যু প্রকৃতির বিধান, জলবুদ্বুদের ন্যায় একবার ভাসে, আবার সাগরলহরীতে লয় পায়। কে কাহার পতি, কে কাহার পত্নী! এ জগতে কেহ তো কাহারও নয়। একা আসা, একা যাওয়া; কেহ কাহারও সঙ্গে আসে না, সঙ্গে যায়ও না। তবে?—

মাত্র দুইদিন পূর্ব্বে পতিগতপ্রাণা সতী অন্তরে যে দারুণ উদ্বেগ এবং পতির রোগশান্তির একান্ত কামনায় জীবনমরণ-সংকল্প লইয়া আসিয়াছিলেন, অদ্য তাহা সমস্তই অতীতের স্বপ্নকাহিনী হইয়া গেল।

ফিরিয়া আসিলেন তিনি কাশীপুরে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কিগো, ওখানে কিছু সুবিধে হলো? তাহার

পর নিজের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শূন্যে আন্দোলন করিয়া রোগক্লান্ত মুখে হাসিয়া বলিলেন,—কি-চ্ছু-ই হবার নয়।

পতির সেবাযত্নে পুনরায় তিনি দেহমন সমর্পণ করিলেন। পতির অস্থিচর্ম্মসার দেহ চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বের মানসিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল; তখন ভাবেন, কেন দেবতার ছলনায় ভুলিয়া চলিয়া আসিলাম? আরও কিছুকাল পড়িয়া থাকিলে বাবা তারকনাথের কৃপা অবশ্যই লাভ করিতাম।

পতির অবস্থা এবং আচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে এই অনুমানই দৃঢ় হইতে লাগিল যে, তিনি মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। পতিবিচ্ছেদের ভাবনায় তাঁহার চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিত, পৃথিবী শূন্য মনে হইত, কর্ম্মে নিরুৎসাহ আসিত। নিজের দেহসম্বন্ধেও তিনি উদাসীন হইলেন।

একদিন পথ্যসহ দ্বিতলে উঠিবার সময় তিনি পড়িয়া গেলেন। পথ্য ও থালাবাটি সকলই সশব্দে পড়িয়া গেল। শব্দ শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ ও বাবুরাম ছুটিয়া আসিলেন। মা এমন আঘাত পাইলেন যে, চিকিৎসক ডাকিতে হইল। পায়ের হাড় সরিয়া গিয়াছিল, পা ফুলিয়া যন্ত্রণা হইতে লাগিল। কয়েকদিন তিনি শয্যাগত থাকিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু মনে মহাদুঃখ,—এই কয়দিন আর পতিকে আহার করাইতে উপরে যাইতে পারিবেন না। লক্ষ্মীদিদি এবং নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেবার ভার লইলেন।

পতিপত্নী উভয়েই অসুস্থ, যে-যাঁহার ঘরে শয্যাগত, এমন অবস্থাতেও আনন্দময় ঠাকুরের রঙ্গরসে ভাঁটা পড়ে নাই। মা বলিয়াছেন,—আমার পায়ের অবস্থার কথা শুনে ঠাকুর বাবুরামকে বলেন, "তাইত, বাবুরাম, এখন কি হবে, খাওয়ার উপায় কি হবে? কে আমায় খাওয়াবে?' তখন মণ্ড খেতেন। আমি মণ্ড তৈরী করে উপরের ঘরে গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতুম্। আমি তখন নত্ পরতুম। তাই বাবুরামকে নাক দেখিয়ে হাতটি ঘুরিয়ে ঠারে ঠোরে বলছেন, 'ও বাবুরাম, ঐ যে ওকে তুই ঝুড়ি করে মাথায় তুলে এখানে নিয়ে আসতে পারিস্?' ঠাকুরের কথা শুনে নরেন বাবুরাম ত হেসে খুন। এমনি রঙ্গ তিনি এদের নিয়ে করতেন।" (৪)

গভীর নিরানন্দের মধ্যেও ঠাকুর রঙ্গরসদ্বারা সকলের মনে আনন্দ-সঞ্চার করিতে চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গসান্নিধ্য আর অধিক দিন নহে, এইরূপ আশঙ্কাই সকলের মনে দৃঢ় হইল। অনাগত বিপদের আশঙ্কায় সাধ্বীর হৃদয় কম্পিত করিয়া অজ্ঞাতে দীর্ঘশ্বাস বাহির হইত। পতির পদসেবা করিতে করিতে অবাধ্য অশ্রু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িত। কাজকর্ম্মে ভুল হইয়া যাইত, কথার সূত্র হারাইয়া যাইত। বিনিদ্র রজনীতে নিশাচর পক্ষীর কর্কশ ডাকে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত।

তাহার পর ঠাকুর যেদিন সোনার ইষ্টকবচখানি বাহু হইতে মোচন করিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন, সেদিন আর কোনই সন্দেহ রহিল না যে, মহাপ্রস্থানের কাল অতি সন্নিকট। দেহত্যাগকালে তিনি ইষ্টকবচ দেহে রাখিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই তাহা খুলিয়া ফেলিয়াছেন।

সকলেই নির্ম্মম সত্যের সম্মুখীন হইবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। জ্যোতিষ্করাজ সূর্য্যের নিয়ন্ত্রিত গতি কেহ রোধ করিতে পারে না, কঠোর নিয়তির দুর্ব্বার পথও কেহ রোধ করিতে পারে না। সেই মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদের দিন অজগরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মাতৃসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের নরদেহ ছিল মহাকালীর লীলাক্ষেত্র। সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীকাল ব্যাপিয়া তাঁহার নিত্যশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বল দেহমনকে কেন্দ্র করিয়া কত বিচিত্র লীলাই-না প্রকটিত হইয়াছে! কর্ম্মজ্ঞানভক্তির যে অমোঘ বীজ তিনি বপন করিয়াছেন, নিজেই অসংশয়ে জানিতেন, অদূরভবিষ্যতে তাহা ফলফুলে সমৃদ্ধ মহামহীরুহে পরিণতি লাভ করিয়া তাহার শান্তিময় ছায়াতলে আর্ত্ত জগৎকে আশ্রয় দিবে। 'জগদ্ধিতায়' তাঁহার আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সার্থক হইয়াছে, ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে; আর কতকাল তিনি ধূলিমলিন মরজগতে আবদ্ধ থাকিবেন ?

১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাস সমাপ্তির দিকে।

"ঠাকুরের গলরোগ ক্রমশঃ ভীষণভাব ধারণ করিল। মৃদুস্বরে ফিস্

ফিস্ করিয়া কোনমতে দুই চারিটি কথা কহিতে পারেন মাত্র ; আহার জল-বার্লি ; তাহাও গিলিতে পারেন না। তথাপি মহাপুরুষের কৃপার অবধি নাই, সদাসর্ব্বদা বালক ভক্তগণকে উপদেশ দিতেছেন ; কখনও বা নরেন্দ্রকে ডাকিয়া বলিতেছেন, 'নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রহিল, তুই সকলের চেয়ে বুদ্ধিমান, শক্তিমান, ওদের রক্ষা করিস, সৎপথে চালাস, আমি শীগ্‌গীরই দেহত্যাগ করবো।'

"আর একদিন রাত্রে নরেন্দ্রের দিকে সজল-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, 'বাবা! আজ তোকে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফকীর হলুম।' নরেন্দ্র বুঝিলেন, ঠাকুরের লীলাবসানকাল আসন্নপ্রায় ; তিনি বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার বিরহে কেমন করিয়া জীবনধারণ করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন ; ভাবাবেগ দমন করিতে অসমর্থ হইয়া নরেন্দ্রনাথ কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

"অবশেষে সত্যসত্যই সে ভীষণ দিন উপস্থিত হইল, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট, রবিবার। মহাপুরুষের শয্যা ঘিরিয়া ভক্ত শিষ্যবৃন্দ শোক-ভারাক্রান্ত স্তম্ভিতহৃদয়ে মহাসমাধির প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগের ব্যথিত অন্তরে কি ভাবের প্রবাহ খেলিতেছিল তাঁহারাই জানেন।

"নরেন্দ্রনাথ ভাবিতেছিলেন, রামচন্দ্র, গিরিশ প্রমুখ ভক্তগণ ঠাকুরকে যে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করেন, সে কথা কি সত্য! এই একটি সমস্যা এখনও তো অমীমাংসিত রহিয়াছে। এখন যদি ঠাকুর স্বয়ং এ সমস্যা ভঞ্জন করিয়া দেন, তবেই বিশ্বাস করিব, নচেৎ নহে। যে শক্তি যুগে যুগে ধর্ম্মস্থাপনের জন্য করুণায় অবতীর্ণ হন, শ্রীরামকৃষ্ণ কি তাঁহার সমষ্টিস্বরূপ? সত্যই কি শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক অবতার পুরুষ? অন্তর্য্যামী ভগবান্ চক্ষু মেলিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে নরেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয় নাই? যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ—কিন্তু তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।

"সহসা যদি কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত তাহা হইলেও নরেন্দ্র বোধ হয় অতখানি চমকিয়া উঠিতেন না!

"ক্রমে রজনী গভীর হইতে গভীরতর হইল। উপাধান আশ্রয়ে ঠাকুরের কৃশতনুখানি মৃদু কাঁপিতেছে। জীর্ণপঞ্জর-পিঞ্জর ছাড়িয়া মহান্ আত্মা মহাকাশে বিলীন হইবার জন্য যেন পাখা মেলিয়াছে। নাসাগ্র-নিবদ্ধ দৃষ্টি স্থির, বদন মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত।" (৫)

সর্ব্বধর্ম্মের সাধনা, সিদ্ধি ও সমন্বয়ের মূর্ত্তবিগ্রহ—পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ সুমধুরকণ্ঠে বারত্রয় মহামন্ত্র মাতৃনাম 'কালী, কালী, কালী' উচ্চারণ করিয়া শ্রাবণসংক্রান্তির পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মহানিশায় ধীরে ধীরে মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন।

তাঁহার লীলাসঙ্গিনী যখন আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার পরম আরাধ্য প্রিয়তমের দেহ নিষ্কম্প, দৃষ্টি স্থির, বদনমণ্ডল অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত, তখন তিনি নিদারুণ যাতনায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন,—"মা কালী গো, কোথায় গেলে গো?"......

মাতাঠাকুরাণীর শোকবিহ্বলতা, তাঁহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন পিতৃহারা শোকসন্তপ্ত সন্তানদিগের হৃদয় অধিকতর বিচলিত করিল। সেই করুণ দৃশ্য তাঁহাদিগের অসহনীয় বোধ হয়। নয়নে নয়নে অঝোরে বহিতে লাগিল শ্রাবণের ধারা। বিশ্বপ্রকৃতিও যেন আকুল হইয়া উঠিল বিরাট পুরুষের বিয়োগব্যথায়।

স্বামী অভেদানন্দ লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের দিব্য দেহ পীতবস্ত্র দিয়া সজ্জিত করান হইল। গলায় ফুলের মালা এবং পাদপদ্মে সচন্দন পুষ্প দিয়া একটি খাটের উপর শায়িত করা হইল। * * * তৎপরে বেলা ৫টার সময় কাশীপুরের বাগান হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্মশানঘাটে চলিলাম। সঙ্গে নিশান, খোল, করতাল, ওঁকার, ত্রিশূল, বৈষ্ণবদিগের খুন্তি, cross (খৃষ্টানদিগের ক্রুশ), crescent (মুসলমানদিগের অর্দ্ধচন্দ্র), সকল ধর্ম্মের symbols (প্রতীক) একত্রে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-ভাবের প্রতীক লইয়া procession (শোভাযাত্রা) হইয়াছিল।"

পরমপুরুষের দিব্যদেহের স্পর্শে কাশীপুর শ্মশানভূমি আজ রূপান্তরিত হইল মহাতীর্থে। সুরধুনী পূতধারায় ধৌত করিয়া দিলেন বিশ্বপিতার বরণীয় চরণযুগল। ঘৃতপুষ্পচন্দনের শেষ আহুতিতে ভক্তবৃন্দের হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া হোমানল স্বর্ণ-আভায় জ্বলিয়া উঠিল। দেব বৈশ্বানর তাঁহার শুদ্ধ সত্ত্ব কনকরথে তুলিয়া লইয়া চলিলেন লোকলোচনের অন্তরালে; আর পবনদেবতা মধুর পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-নামে পরিব্যাপ্ত করিলেন পৃথিবী, অন্তরীক্ষ,—সর্ব্বলোক।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানের পর যখন মাতাঠাকুরাণী অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিতেছিলেন, ঠাকুর সশরীরে আবির্ভূত হইয়া বলেন, "কেন গো, আমি কি কোথাও গেছি? এ তো এঘর আর ওঘর।" এই ঘটনায় মাতাঠাকুরাণী বুঝিলেন, ঠাকুরের ইচ্ছা নয় যে, তিনি সধবার বেশ পরিত্যাগ করেন। সুতরাং সুবর্ণবলয় হস্তেই রহিল, সূক্ষ্মপাড়যুক্ত বস্ত্র ধারণ করিয়া তিনি সধবার চিহ্ন রক্ষা করিলেন।

কিন্তু এই দর্শন সাময়িক প্রবোধমাত্র, পূর্ব্বের ন্যায় স্থূলদৃষ্টিতে সর্ব্ব সময়ের জন্য তো ঠাকুরের দর্শন আর পাওয়া যাইবে না। তাঁহার সেবা করিয়া যে তৃপ্তি, তাহাও তো আর পাওয়া যাইবে না। পুনরায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। এইসময়ের কথায় তিনি বলিয়াছেন,--হাতপা, দেহমন সবই যেন অসাড় হ'য়ে যেতো। ক্ষুধাতৃষ্ণার কোন প্রবৃত্তিই নেই, ব'সে আছি তো শুধু ব'সেই আছি। ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা, খুঁটিনাটি প্রত্যেক কাজ মনে পড়তো। আর কোন কাজ যেন আমার নেই।

মাতাঠাকুরাণীর অবস্থাদর্শনে ভক্তদের কাহারও কাহারও মনে আশঙ্কা জাগিল যে, তিনি আর উঠিবেন না, আর কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা বলিবেন না, নিশ্চল প্রতিমার মতই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবেন। তাঁহার স্নানাহার, সকল কাজ রামলালদাদা এবং লক্ষ্মীদিদি করাইয়া দিতেন বলিয়াই তাহা সম্ভব হইত। স্নেহময়ী জননী যেমন শিশুর বলিবার অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাকে লালনপালন করেন, তাঁহারাও এইসময় সেইভাবে মায়ের সেবাযত্ন করিয়াছেন।

মা বলিয়াছেন,—ওরাই আমায় খাইয়ে দিয়েছে, মুখ ধুইয়ে দিয়েছে। আমার মুখের কাছে খাবার নিয়ে ব'সে থাকতো, বলতো,—খুড়ীমা, তুমি হাঁ কর, তুমি খাও খুড়ীমা, নইলে বাঁচবে কি ক'রে? আমরা-যে শেষে মাতৃহত্যার পাপে পড়বো। কিছু খাবার গ্রহণ কর।

লক্ষ্মী-দিদি

রামলাল-দাদা
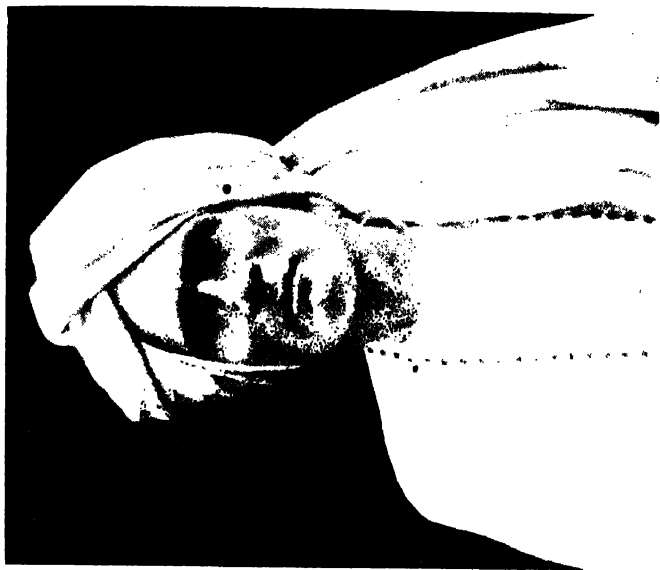
ঠাকুরের অদর্শনে সকলেই মুহ্যমান, কে কাহাকে বুঝাইবে? কে কাহাকে সান্ত্বনা দিবে? ঠাকুর সকল শক্তি হরণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছেন, সকলেই আজ দিশাহারা। তথাপি সন্তানগণ সর্ব্বদা মায়ের সংবাদ লইতেন, তাঁহার অবস্থার জন্য উদ্বেগ বোধ করিতেন; কিন্তু তাঁহার এইরূপ সেবা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

এই অবস্থাতেও মানুষের সমালোচনা বন্ধ থাকে না। মৃত্যু বা ভালমন্দ তো জগতের দৈনন্দিন ঘটনা, কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য সমাজের চিরাচরিত প্রথার পরিবর্ত্তন হইবে কেন? কেহ কেহ বিস্ময় প্রকাশ করেন,—এ-কি, পতির দেহত্যাগের পরও ব্রাহ্মণকন্যা হাতে সোনার বালা পরে, পেড়ে কাপড় পরে, এ কি রকম! হিন্দুসমাজে তো এ রীতি নেই। কোন কোন ভক্ত ও ভক্তিমতীর মনেও এইপ্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, কিন্তু তাহার কোন সমাধান হয় না। ক্রমে তাহা মাতাঠাকুরাণীরও কর্ণগোচর হইল। লোকমত গ্রাহ্য করিয়া, তিনি আর একদিন হাত হইতে সোনার বালা খুলিতেছিলেন, ঠাকুর তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আমি কি মরেছি যে বিধবার বেশ ধরবে? গৌরীকে জিজ্ঞেস করো, সে ওসব শাস্ত্র জানে।"

এই বলিয়া ঠাকুর পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। সেই দিব্যস্পর্শে মায়ের দেহে ও মনে বিদ্যুৎশক্তি ক্রিয়া করিল। তাঁহার দৃঢ়প্রত্যয় হইল,—না, না, তিনি আছেন, আজও আছেন। আমার কাছেই আছেন।

সধবার বেশ পরিত্যাগ করা হইল না।

কিন্তু, গৌরীকে কোথায় পাবো? সে তো এখন বৃন্দাবনে, ভাবেন মাতাঠাকুরাণী।

নরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ দুই-একজন অন্তরঙ্গ উপলব্ধি করিলেন যে, মাতাঠাকুরাণীকে আশ্রয় করিয়াই ঠাকুরের ভাবধারা অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং তাহা একদিন বিশ্ব প্লাবিত করিবে। লোককল্যাণে তাঁহার জীবনধারণ প্রয়োজন, এই কার্য্যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ এবং প্রত্যক্ষ সহযোগিতা

প্রয়োজন। সুতরাং তাঁহার শোকার্ত্ত চিত্তকে নিরন্তর ঠাকুরের অনুধ্যান হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া জগতের কল্যাণে আকৃষ্ট করিতে হইবে ; অন্যথা বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার দেহরক্ষা দুরূহ হইবে। গৃহী ও ত্যাগী সন্তানগণ এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহাকে অবিলম্বে ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত আবেষ্টনী হইতে দূরে,—তীর্থদর্শনে লইয়া গেলে তাঁহার ভারাক্রান্ত চিত্তে প্রশান্তি আসিতে পারে। শ্রীধাম বৃন্দাবনে যমুনাতীরে অবস্থিত বলরাম বসুদের 'কালাবাবুর কুঞ্জে' যাইয়া তাঁহার কিছুকাল বাস করাই সকলের অভিমত হইল। বৃন্দাবনযাত্রার প্রস্তাবে মাতাঠাকুরাণী সহজেই স্বীকৃত হইলেন।

ঠাকুরের লীলাসম্বরণের অনতিকাল পরে কাশীপুর উদ্যানবাটী ত্যাগ করিয়া বলরাম বসুর আমন্ত্রণে তাঁহাদের ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে মাতাঠাকুরাণী কয়েকদিবস অবস্থান করিলেন। অতঃপর তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইল ; সঙ্গে চলিলেন লক্ষ্মীদিদি, গোলাপমা, স্বামী যোগানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়ের পত্নী নিকুঞ্জবালা দেবী এবং কালিদাসী দেবী।*

পথিমধ্যে তাঁহারা বৈদ্যনাথধামে বাবা বৈদ্যনাথ এবং কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথ ও মাতা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিলেন।

সেবকবৃন্দের কাহারও কাহারও অভিমত হইল যে, প্রয়াগের ত্রিবেণীতে পুণ্যস্নান করিয়া পরে বৃন্দাবনে যাইবেন। কিন্তু বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া মায়ের কেবলই মনে হইতে লাগিল,—যিনি রাম, তিনিই কৃষ্ণ, আর তিনিই রামকৃষ্ণ। সুতরাং অযোধ্যায় রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া তিনি বৃন্দাবনে যাইবেন, অন্যতীর্থে পরে যাইবেন। তাঁহার প্রাণের এইপ্রকার অভিলাষ জানিতে পারিয়া যোগানন্দজী প্রয়াগগমন আপাততঃ স্থগিত রাখিলেন, অযোধ্যাভিমুখেই তাঁহারা যাত্রা করিলেন।

---

* কালিদাসী দক্ষিণেশ্বরের নিকটস্থ গ্রামবাসিনী জনৈকা ব্রাহ্মণবিধবা। তিনি কালীবাড়ীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া মায়ের স্নেহলাভ করেন এবং কদাচিৎ মায়ের নিকট নহবতে বাসও করিতেন।

সরযূতীরবর্ত্তী অযোধ্যার যতই সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, মায়ের ভাবাবেগ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি অযোধ্যায় রাজা রামচন্দ্র এবং জানকীমাতাকে দর্শন করিলেন এবং অনুভব করিলেন, এইসকল স্থান তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত।

মাতাঠাকুরাণীর সহিত সীতারামের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সন্তানগণ নিজেদের ভাগ্যবান মনে করিলেন। অধিকন্তু, অযোধ্যাতীর্থে মাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া সন্তানদিগকে ভোজন করাইলেন। এইরূপ অভাবনীয় যোগাযোগে সকলের কী অপরিসীম আনন্দ ও পরিতৃপ্তি! যোগানন্দজী আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, কী ভাগ্য! আজ আমরা অযোধ্যাতীর্থে সীতামায়ীর প্রসাদ পাইলাম।

অতঃপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবন।

কৃষ্ণবিরহে উন্মাদিনী রাধারাণীর হৃদয়ের আর্ত্তি, জীবনসর্ব্বস্বের জন্য কুঞ্জে কুঞ্জে আকুল অন্বেষণ, প্রিয়তমের অদর্শনে তনুত্যাগের সংকল্প,—এইপ্রকার কত কথা একে একে মাতাঠাকুরাণীর মনে উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, নয়নের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দরবিগলিত ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল।

পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট কালাবাবুর কুঞ্জে গিয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবনে মায়ের প্রধানতঃ তিনটি আকর্ষণ,—ঠাকুরের প্রিয় স্থানগুলি দর্শন, মন্দিরে মন্দিরে কুঞ্জে কুঞ্জে তাঁহার অন্বেষণ এবং গৌরীমার সন্ধান।

বহুকাল পূর্ব্বে মথুরানাথ বিশ্বাসের আগ্রহে ঠাকুর কাশীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে আগমন করিয়াছিলেন। বঙ্কুবিহারীর মন্দির ছিল তাঁহার অতিশয় প্রিয়; এইস্থানে বিগ্রহ দর্শন করিতে করিতে তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। এইকারণে বঙ্কুবিহারীর প্রতি মায়ের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি তন্ময় হইয়া বিগ্রহ দর্শন করিতেন। কখন মনে হইত, ঠাকুরও তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া দর্শন করিতেছেন, কখনও বিগ্রহের সিংহাসনোপরি ঠাকুরের মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহারও ভাবাবেশ হইত।

কুঞ্জের মধ্যে নিধুবন ঠাকুরের অধিক প্রিয় ছিল। এই নিধুবনে ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস গোস্বামীর নিকট বঙ্কুবিহারী প্রকট হইয়াছিলেন। এইস্থানেই বর্ষীয়সী তাপসী গঙ্গামায়ী শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে শ্রীরাধার আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিলেই 'মেরী লালী, মেরী লালী' বলিয়া প্রেমবিহ্বলা হইতেন। তাঁহাকে কয়েকদিবস নিজের আশ্রমে আনিয়াও রাখিয়াছিলেন। রাধাকৃষ্ণের পাদস্পৃষ্ট এবং লীলাপুষ্ট ব্রজমণ্ডলের রজের প্রতি অণুপরমাণুই পবিত্র, নিধুবনের রজঃ মাতা-ঠাকুরাণীর নিকট বিশেষ প্রিয় ও পবিত্র হইল। তথায় তিনি ঠাকুরের সান্নিধ্য অনুভব করিতেন, আত্মস্থ হইয়া বসিয়া থাকিতেন। অধিকক্ষণ অতিবাহিত হইলে সঙ্গীদিগের মিনতিতে অগত্যা তিনি বাসভবনে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতেন। বৃন্দাবনের ভাবমাধুরীর সহিত ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত, এইস্থানে মায়েরও ভাবাবেশ হইতে লাগিল। নারীভক্তগণ বলিতেন,—মা, তোমারও-যে ঘন ঘন ভাবসমাধি হ'তে লাগলো ঠাকুরের মত।

ক্রমে বৃন্দাবনের অনেক পথঘাট মায়ের পরিচিত হইয়া গেল। অন্যের অজ্ঞাতসারেও তিনি কখন কখনও কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া পড়িতেন। ব্যাকুল অন্বেষণে তাঁহার চিত্ত ছুটিত যমুনার তীরে, দেবতার মন্দিরে, রাধাগোবিন্দের লীলাকুঞ্জে। কখনও যমুনাতীরে বসিয়া জপ করিতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইত। সেবকগণ যখন তাঁহার অনুপস্থিতি বুঝিতে পারিতেন, তখন চিন্তাকুলচিত্তে চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করিতেন।

কালাবাবুর কুঞ্জের অতিনিকটেই বংশীবট। অনেকসময় মা বংশীবটে গিয়াও একাকিনী বসিয়া থাকিতেন। মন চলিয়া যাইত সেই দ্বাপর যুগে, চিত্তপটে ভাসিয়া উঠিত কত চিত্র,—এই সেই বংশীবট, যেখান হইতে ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণ প্রাণমাতানো বংশীধ্বনি করিতেন। আর, শৃঙ্গারবটের ছায়ায় বসিয়া বেণীরচনায় ব্যাপৃতা রাধারাণী তাহা শ্রবণে বিহ্বল হইয়া ছুটিয়া আসিতেন। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর সহিত রাসলীলা করিয়াছেন, ব্রজবালাগণ নৃত্যগীত করিয়াছেন, মহাদেব ব্রজগোপীর বেশে তাহা দর্শনে ধন্য হইয়াছেন। পরম পবিত্র এই স্থান।

একদা বংশীবটমূলে বসিয়া মাতাঠাকুরাণী মানসপটে সুদূর অতীতের চিত্র দর্শন করিতেছিলেন,—যমুনাপুলিনে মনোরম এক কুঞ্জবন, ব্রজবালা-দিগের সহিত তিনিও মধুর বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। কোন্ মুহূর্ত্তে তিনি ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে মিলিত হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীরাধাকে দেখিতে পাইলেন না,···ইহার পর আর কিছু তাঁহার স্মরণ হয় না। বাহ্যচৈতন্য যখন ফিরিয়া আসিল, ব্রজবিহারী তখন অদৃশ্য হইয়াছেন। বংশীবটে তিনি একাকিনী, বিরহব্যথায় ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুনরায় বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন।

কালিদাসী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মাকে বাসস্থানে অনুপস্থিত দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বপ্রথম বংশীবটে আসিয়াই তাঁহার দর্শন পাইলেন; তখনও তিনি ভূলুণ্ঠিতা, নয়নযুগল কখনও উন্মীলিত, কখনও নিমীলিত, অশ্রুধারা এবং রজোরাশির মিশ্রণে বদনমণ্ডল বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। মুখে ভাষা নাই। এই অবস্থাদর্শনে শঙ্কিত হইয়া কালিদাসী মায়ের মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিলেন এবং অবিরত 'রাধেশ্যাম' নাম শুনাইতে লাগিলেন। অবিলম্বে আরও লোক আসিয়া উপস্থিত হইল, মাকে সন্তর্পণে কুঞ্জে লইয়া যাওয়া হইল। এইদিবস তাঁহার স্বাভাবিক চৈতন্য ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণীর ধারণা ছিল যে, বৃন্দাবনে গেলে সহজেই গৌরীমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, অথবা তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। আসিয়া বুঝিলেন, অবস্থা অন্যরূপ। যোগানন্দ এবং অদ্ভুতানন্দজীকে তিনি গৌরীমার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। তাঁহারা অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু গৌরীমার সহিত কোন মন্দিরে বা অন্য কোথাও সাক্ষাৎ হইল না।

গৌরীমা একটি বিশেষ সাধনার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন। সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া এবং একাসনে বসিয়া

ক্রমান্বয়ে নয়মাস সাধনা করিবেন। প্রথমতঃ বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে উপস্থিত হইলেন, পরে তিনি এক নির্জ্জন স্থানে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে যোগেনমাও বৃন্দাবনে আসেন, কিন্তু গৌরীমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে বলরাম বসু বৃন্দাবনে গৌরীমাকে দুইবার পত্র লেখেন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার জন্য। কালাবাবুর কুঞ্জের কর্ম্মচারিগণ গৌরীমার তৎকালীন সাধনস্থানের সন্ধান জানিতেন না, সেইজন্য ঠাকুরের নির্দ্দেশ ও পীড়ার গুরুত্বের সংবাদ গৌরীমাকে জানাইতে পারেন নাই। তাঁহার কঠোর সাধনা যখন শেষ হইল, তখন এদিকেও সব শেষ হইয়া গিয়াছে। বৃন্দাবনে আসিয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়া "মর্ম্মন্তুদ বেদনায় তিনি পিতৃহারা কন্যার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। আবার অভিমানও হইল, ঠাকুর শেষ-কালে তাঁহাকে কেন এইভাবে ফাঁকি দিবার জন্য বৃন্দাবনে পাঠাইলেন।

"আর দেহধারণ অপ্রয়োজন মনে করিয়া 'ভৃগুপাতে' দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভৎর্সনা করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'তুই মরবি না-কি?' ঠাকুরকে এইরূপে দর্শন করিয়া গৌরীমা স্তম্ভিত হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামান্তে উঠিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দেহত্যাগ ঠাকুরের অভিপ্রেত নহে, তাঁহার জীবনের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হয় নাই। বাধা পাইয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

"ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর গৌরীমা বৃন্দাবনে ভাণ্ডারা উৎসব করিতে ইচ্ছা করিলেন। অথচ তাঁহার নিকট টাকাপয়সা নাই। বৃন্দাবনের এক জনবহুল স্থানে যাইয়া তিনি দোকানদারদের নিকট নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। তীর্থস্থানের ধর্ম্মপ্রাণ অধিবাসিগণ এইপ্রকার ব্যাপারে অভ্যস্ত। দোকানদারেরা তাহাদের সাধ্যানুসারে ঘি, ময়দা, মিঠাই প্রভৃতি নানা-বিধ দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করিল। তিনি তদ্দারা অনেক সাধু এবং দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিলেন।" (৬)

ইহার পর আবার তিনি সাধনস্থানে চলিয়া গেলেন।

একদিন যোগানন্দজী রাওলে রাধারাণীর আবির্ভাবক্ষেত্র দর্শন করিতে গিয়া তথায় এক নির্জ্জন স্থানে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন যে, একখানি গৈরিক সাড়ী শুকাইতেছে, ইহাতে তাঁহার কৌতূহল হয়। নিকটে গিয়া দেখেন, একটা গুহার মধ্যে গৌরীমা যোগাসনে বসিয়া আছেন,—ধ্যানমগ্না। তখন কোনপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা তিনি সমীচীন মনে করিলেন না; কিন্তু এই শুভসংবাদ অবিলম্বে মাতাঠাকুরাণীকে জানাইতে পারিবেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহার মনে বড়ই আনন্দ হইল।

পরদিবস মা এবং আরও কয়েকজন গৌরীমার অদ্ভুত সাধনার স্থান দর্শন এবং তাঁহাকে আনয়নের জন্য চলিলেন। অনেকদিন পরে সাক্ষাৎ, ঠাকুরের লীলাসম্বরণের পর ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ। মা ও গৌরীমা সদ্য-শোকার্ত্তার ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুরের বিচ্ছেদবেদনা পুনরুদ্দীপিত হওয়ায় সকলেই শোকবিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

লীলাসম্বরণের পর ঠাকুর দর্শন দিয়া তাঁহাকে যে সধবার বেশ ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, সেই বিবরণ জানাইয়া মা বলিলেন,—ঠাকুর একথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে বলেছেন। শাস্ত্রে না-কি কি লেখা আছে? এখন তুমি বল। তোমায় সেই থেকে খুঁজছি।

গৌরীমা বলিলেন,—আমাদের অন্য শাস্ত্রের কি কাজ মা? ঠাকুরের কথা শাস্ত্রের ওপরে। ঠাকুর নিত্য বর্ত্তমান, আর তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী; তুমি সধবার বেশ ত্যাগ করলে জগতের অকল্যাণ হবে।

ঠাকুরের প্রসঙ্গে উভয়েই মগ্ন হইলেন। গৌরীমাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া দেহত্যাগের পূর্ব্বে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "এতকাল কাছে থেকে শেষটায় দেখতে পেলে না, আমার ভেতরটা যেন বিল্লিতে আঁচড়াচ্ছে"; মায়ের নিকট এই কথা শুনিয়া গৌরীমার অন্তর যেন দগ্ধ হইতে লাগিল।

মা আরও জানাইলেন, "ঠাকুর ব'লে গেছেন, 'তোমার জীবন জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায় লাগবে।"

"রাত্রিকালে গুম্ফার মধ্যে ধুনি জ্বালিয়া দুইজনে কথা বলিতেছিলেন,

এমন সময়ে সেখানে দুইটা সাপ প্রবেশ করিল। শ্রীশ্রীমা এত নিকটে সাপ দেখিয়া ভীতস্বরে বলিয়া উঠিলেন 'ও গৌরদাসি, কি হবে গো, দুটো সাপ যে।' গৌরীমা শান্তভাবে বলিলেন, 'ব্রহ্মময়ীকে দর্শন করতে এসেছে ওরা। কিছু ভয় নেই মা, পেসাদ পেয়ে এক্ষুণি চ'লে যাবে।' এই বলিয়া গৌরীমা এক কোণে দামোদরের খানিকটা প্রসাদ ঢালিয়া দিলেন। সাপ দুইটা তাহা নিঃশেষ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শ্রীশ্রীমা এতক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া তাহাদের ব্যাপার দেখিতেছিলেন, তাহারা চলিয়া গেলে বলিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ! তুমি সাপ নিয়ে কি ক'রে থাক এখানে ?" (৬)

মাতাঠাকুরাণী সেই রাত্রিতে গৌরীমার নিকট রহিলেন, পরদিবস তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিলেন। তদবধি মায়ের তীর্থবাস-কালে গৌরীমা তাঁহার সঙ্গেই রহিয়া গেলেন।

বৃন্দাবনের দেববিগ্রহের মধ্যে গোবিন্দ, গোপীনাথ, বঙ্কুবিহারী এবং মদনমোহনজীর প্রতি মায়ের অধিক আকর্ষণ ছিল। একদিন একাকী হাঁটিতে হাঁটিতে মদনমোহনের মন্দিরে চলিয়া গেলেন, একদিন কালীয়-দমনের মন্দিরে। উত্তরকালে মা বলিয়াছিলেন,—একদিন কালীয়দমনের মন্দিরে হেঁটে গিয়ে যমুনার তীরে শুয়ে পড়্লুম; ভাবলুম,—কোথায় কালাবাবুর কুঞ্জ, আর কোথায় কালীয়দমন! কিন্তু যেই প্রাণের ভিতর হলো, শ্যামসুন্দরকে দর্শন করবো, অমনি যেন খাবারঘর শোবারঘর হ'য়ে গেল। খুব অল্প সময়ের ভেতর কুঞ্জে ফিরে এলুম। সন্তানরা কিন্তু আমার এভাবে একা যাতায়াতে বড়ই চিন্তিত হতো।

আর একদিন মাএকাকিনী চলিয়া গেলেন 'ধীরসমীরে'। ধীরসমীরের চতুর্দ্দিকে শান্ত পরিবেশ, সম্মুখে নীল যমুনা। তাঁহার দৃষ্টি চলিয়া গেল নিকট হইতে দূরে, ভাবিতে লাগিলেন তিন কালের লীলা,—সরযূতীরে শ্রীরামচন্দ্র, যমুনাতীরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আর গঙ্গাতীরে শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরের বৃন্দাবনবাসের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি তন্ময় হইয়া গেলেন।

ওদিকে কালাবাবুর কুঞ্জে অনেকক্ষণ মাকে দেখিতে না পাইয়া সকলে চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইলেন। গৌরীমা গেলেন ধীরসমীরে, দেখেন—মা একাকিনী, বাহ্যজ্ঞানহীনা, চক্ষে পলক পড়িতেছে না, শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভূত হইতেছে না। গৌরীমা ভাবিলেন, গোবিন্দভাবিনী শ্রীরাধা আজ কৃষ্ণবিরহে তন্মনা, কৃষ্ণের অদর্শনে ভাববিহ্বলা। তিনি রাধানাম গাহিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে যোগেনমা এবং যোগানন্দজীও আসিয়া ধীরসমীরে উপস্থিত হইলেন। সকলেই সম্মিলিতকণ্ঠে রাধানাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

ধীরে ধীরে স্পন্দন অনুভূত হয় মায়ের দেহে। ওষ্ঠে ঈষৎ হাস্য, নয়ন অর্দ্ধোন্মীলিত। অস্ফুটভাষায় কি যেন বলিলেন, কেবল বুঝা গেল একটি কথা—'কোথায়'?

মাতাঠাকুরাণী কখন কখনও নৌকাযোগে যমুনায় বেড়াইতেন। কোন কোন দিন অনেকদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যাইতেন। একদিন এইরূপ বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি যমুনার জলে অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, কি যেন দেখিতেছেন। অতঃপর কাহাকে ধরিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিলেন। মাতার দেহের অধিকাংশ নৌকার বাহিরে এবং তাঁহার নিজের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তের মধ্যে জলে পড়িয়া যাইবেন, তাহা বুঝিয়াই ভীতত্রস্ত যোগানন্দজী চীৎকার করিয়া উঠিলেন; এবং যুগপৎ গৌরীমা ও গোলাপমা মাকে ধরিয়া ফেলিলেন। নৌকার উপর অনেকক্ষণ তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিলেন।

সম্পূর্ণ চেতনা ফিরিয়া আসিলে গোলাপমা বলিলেন,—মা-ঠাকরুণ, তোমার যদি রোজ রোজ এমন ভাবসমাধি হয়, তা'হলে তোমার দেহ থাকবে কি ক'রে? ঠাকুর বলতেন,—ঘন ঘন ভাবসমাধি হ'লে নরদেহ ভেঙ্গে যায়। গোলাপমা সেদিন অধীর হইয়া মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—তুমি শান্ত হবে ব'লে আমরা তোমায় নিয়ে বৃন্দাবনে এলুম। এখন ভাবনা হচ্ছে, কি ক'রে তোমায় দেশে ফিরিয়ে

নিয়ে যাবো। তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া গৌরীমা বলেন,—কেন ভাবছো গোলাপ, কোন ভয় নেই, মা এতেই শান্তি পাচ্ছেন। কিন্তু এই ঘটনার পর আর কদাচিৎ তাঁহাকে লইয়া নৌকাভ্রমণে যাওয়া হইত।

এইসময়ে এক জ্যোতির্ম্ময় বৃদ্ধ সাধু কালাবাবুর কুঞ্জে মাধুকরী করিতে আসিতেন। কালিদাসী একদিন তাঁহাকে বলিলেন,—বাবা, তোমায় অনেক মাধুকরী দেবো, তুমি এমন একটা মন্ত্র জপ কর, যাতে আমাদের মা'র শোক নিবারণ হয়।

সাধু হাসিয়া বলেন,—ঐ মায়ের আবার শোক কি? ঐ মাকে ছুঁলে সর্ব্বশোকের বিনাশ হয়। মায়ের কোন শোক নেই।

গোলাপমা প্রশ্ন করেন,—তবে মা এমন হ'য়ে থাকেন কেন?

উত্তরে সাধু বলেন,—ঐ মায়ী সদাসর্ব্বদা ওঁর পিয়াকে দেখতে পান, তাই আনমনা থাকেন। আরও কিছুকাল এভাবে থাকবেন, তারপর তিনি ভাণ্ডার উজাড় ক'রে দেবেন।

বস্তুতই কয়েকমাস বৃন্দাবনে বাস করিবার পর মাতাঠাকুরাণীর মনের অবস্থা এইরূপ হইল যে, প্রত্যেক বিগ্রহেই তিনি যেন ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। চিত্ত তাঁহার ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া আসিল।

ব্রজমণ্ডলের আরও দর্শনীয় স্থানগুলি তিনি দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৃন্দাবনের সকল লীলাস্থল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গৌরীমার পরিচিত; তিনি রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন সকলকে দর্শন করাইলেন।

শ্যামকুণ্ডে মা অবগাহন-স্নান করিলেন; কিন্তু রাধাকুণ্ডের জলে অবতরণ করিলেন না, হস্তদ্বারা তাহার জল মস্তকে ধারণ করিলেন। জনৈক কৌতূহলী ভক্ত ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিলেন,—আরে বাপ্‌রে, শ্রীরাধা চিন্ময়ী, রাধাকুণ্ডে আমি নাবতে পারবো না।

জনৈকা ভক্তিমতী সবিস্ময়ে বলিলেন,—এ কেমন কথা? শ্যামকুণ্ডে আপনি অসঙ্কোচে পা দিলেন, আর যত বাধা রাধাকুণ্ডে!

মাতাঠাকুরাণী মৃদুহাস্যে বলেন,—কিছু-একটা বাধা আছে, রাধাকুণ্ডে আমি নাববো না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে আসেন, মথুরায় যমুনাতীরে রাখাল-কৃষ্ণের দর্শন পাইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"মথুরার ধ্রুবঘাট যেই দেখলাম, অমনি দপ্ করে দর্শন হল, বসুদেব কৃষ্ণকোলে যমুনা পার হচ্ছেন। আবার সন্ধ্যার সময় যমুনাপুলিনে বেড়াচ্ছি * * * গোধূলি সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আসছে। দেখলাম, হেঁটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরেই কতকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে। যেই দেখা অমনি 'কোথায় কৃষ্ণ!' বলে বেহুঁস হয়ে গেলাম!" (১)

একদা গোধূলিতে যমুনাতীরে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীরও স্মরণ হয় সেই কথা। অপলকনয়নে চাহিয়া থাকেন যমুনার পরপারে, মনে পড়ে—কৃষ্ণলীলার কথা।

নীল যমুনার কথায় বলেন,—সেই-যে জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে যমুনাদেবীকে কৃপা করতে পিতা বসুদেবের বক্ষ থেকে শ্রীকৃষ্ণ জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেই থেকেই তাঁর অঙ্গস্পর্শে যমুনার জল নীল হয়েছে!

মথুরার বিশ্রামঘাটে সন্ধ্যারতি দর্শনে মা অতিশয় সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। প্রদীপের প্রজ্বলিত শিখা দোলাইয়া বেদীর উপর হইতে পূজারী নিবিষ্টচিত্তে যমুনাদেবীর আরতি করেন, তালে তালে বাজে কাঁসর ঘণ্টা। আর তীর্থযাত্রিগণ যমুনার জলে অসংখ্য প্রদীপ ভাসাইয়া দেয়। সেই আলোকের মালাদর্শনে মনে হয়, যমুনাদেবী সর্ব্বাঙ্গে শত শত স্বর্ণালঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়াছেন। সে এক অপূর্ব্ব শোভা!

গৌরীমা, স্বামী যোগানন্দ এবং অন্যান্য সন্তানগণসহ মাতাঠাকুরাণী বৃন্দাবনধাম পরিক্রমাও করেন।

মায়ের সঙ্গে যাঁহারা বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের দুই-একজন পূর্ব্বেই কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে মাতাঠাকুরাণী হরিদ্বার গমন করেন। হরিদ্বার বস্তুতঃ হরদ্বার—হরপার্ব্বতীর লীলাতীর্থ,—'হর হর, ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত। অনতিদূরে সতীর দেহত্যাগের স্থান। গঙ্গার অপর পারে গিরিমালার দৃশ্য রমণীয়। হরিদ্বারের বিভিন্ন স্থানের দৃশ্য ও তীর্থ-

সমূহ মাতা দর্শন করেন। হরিদ্বারের সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় স্থান ব্রহ্মকুণ্ড। এক শুভদিনে মা ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সমাপন করিয়া ঠাকুরের পূত দেহসত্ত্ব গঙ্গায় উৎসর্গ করেন।

হরিদ্বার হইতে তাঁহারা জয়পুর অভিমুখে যাত্রা করেন। জয়পুরের গোবিন্দজীর অপরূপ রূপদর্শনে সকলে মুগ্ধ হইলেন, পরম আনন্দ লাভ করিলেন। গোবিন্দজী প্রথমতঃ বৃন্দাবনেই ছিলেন। এই সুদর্শন বিগ্রহের নির্ম্মাণ, প্রকট ও জয়পুর-গমনের বিচিত্র কাহিনী আছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্র তাঁহার জননী উষাদেবীর নির্দ্দেশে এবং পরিকল্পনা-অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের একে একে তিনটি শিলামূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। তন্মধ্যে তৃতীয় মূর্ত্তিটি এমনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং নিঁখুত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্র উষাদেবী শ্বশুরের জীবন্ত পিতৃদেব মনে করিয়া লজ্জাবশতঃ অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করেন। এই তিন বিগ্রহ—মদনমোহন, গোপীনাথ ও গোবিন্দ।

পরবর্ত্তী কালে বিধর্ম্মীদের অত্যাচারে যখন মথুরার ঐশ্বর্য্য ধ্বংস হয়, বৃন্দাবনের কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায় হয়, তখন এইসকল বিগ্রহেরও অন্তর্দ্ধান ঘটে। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের নির্দ্দেশে উত্তরকালে রূপ, সনাতন ও জীব-প্রমুখ গোস্বামিগণ কঠোর সাধনাদ্বারা বৃন্দাবনের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন।

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাই যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥"

তাঁহাদেরই সাধনায় এবং প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া দেবতা পুনরায় প্রকট হইলেন; রূপ গোস্বামীর কাছে গোবিন্দ, সনাতন গোস্বামীর কাছে মদনমোহন এবং মধুপণ্ডিতের কাছে গোপীনাথজী আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু বৃন্দাবন পুনরায় আক্রান্ত হয়। সেই সময় গোবিন্দজী ও গোপীনাথজী গিয়া উপস্থিত হইলেন জয়পুরে, আর মদনমোহনজী গেলেন করৌলিতে।

জয়পুরের পর মাতাঠাকুরাণী প্রয়াগতীর্থে গমন করেন। ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নানকালে স্বীয় কেশদাম জলে বিসর্জ্জন করিবেন, এই অভিলাষ মায়ের মনে প্রচ্ছন্ন ছিল, কাহাকেও তখন পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। স্নানের পূর্ব্বরাত্রির অবসানে মা সহসা শুনিতে পাইলেন, "লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মী!" স্বর অতি গম্ভীর, যেন বেদনাহত। দরজার দিকে চাহিয়া মা দেখিলেন,—ঠাকুর দুই হাত দিয়া দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দর্শন দিয়াই তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মায়ের প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল, ভাবিলেন, ঠাকুরের এ কাতরতা কেন? অবশেষে তাঁহার মনে হইল, ত্রিবেণীসঙ্গমে স্বীয় কেশদাম বিসর্জ্জন দেওয়া ঠাকুরের অভিপ্রেত নহে, ইহা কাশীপুরে সুবর্ণবলয়-ত্যাগের নিষেধেরই অনুরূপ।

রাত্রি প্রভাত হইলে মাতাঠাকুরাণী সকলকে ঠাকুরের দর্শনদানের কথা জানাইলেন। শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। একজন বলিলেন,—ঠাকুর লক্ষ্মীদিদিকে ডেকেছিলেন। গৌরীমা বলিলেন,—না, মা, ঠাকুর তোমাকেই ডেকেছিলেন। ত্রিবেণীতে তুমি আজ ভোরে স্নান করবে, তাই ঠাকুর তোমায় ডেকে দিয়ে গেলেন।

সেইদিনই মাতাঠাকুরাণী তীর্থসলিলে অবগাহনপূর্ব্বক ঠাকুরের পবিত্র দেহসত্ত্ব যুক্তবেণীর মুক্তধারায় উৎসর্গ করিলেন।

করিয়াছেন; কত কথা, কত কীর্ত্তন, কত আনন্দস্মৃতিতে মণ্ডিত এই গৃহ। ঠিক এই স্থানটিতে কোন্‌দিন বসিয়াছিলেন, ঐ স্থানে কোন্‌দিন শয়ন করিয়াছিলেন, প্রত্যেকটি স্থানের প্রত্যেকটি কথা মনে পড়ে আজ। গৃহের ভূমি, দ্বার, প্রাচীর স্পর্শ করিয়া অনুভব করেন ঠাকুরেরই পবিত্র স্পর্শ। প্রত্যক্ষভাবে ঠাকুরের সান্নিধ্যেই যেন তিনি রহিয়াছেন, এই উপলব্ধিই তাঁহাকে অনুক্ষণ তদ্‌গত করিয়া রাখে।

এইভাবে নির্জ্জন গৃহে প্রবাহিত হয় মাতার নূতন জীবনধারা। যে প্রশান্তি তিনি বৃন্দাবনে লাভ করিয়াছিলেন, আজিও তাহা অব্যাহত আছে। দেহের বোধ নাই, অভাবের অনুভব নাই, মনের অসন্তোষ নাই। দৃষ্টি যাঁহার অন্তর্মুখী, কোন্ বাহ্য অবস্থা তাঁহাকে বিচলিত করিবে? পতির অনুধ্যানে তিনি বিভোর।

সঙ্গিনী কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন, গদাধরের পরিবার একাকিনী বাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া প্রসন্নময়ী একজন নারীকে তাঁহার গৃহে রাত্রিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। জয়রামবাটী হইতে সহোদরগণের কেহ কেহ আসিয়াও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট থাকিতেন, বিশেষ করিয়া বরদামামা প্রায়ই আসিতেন।

•

বড়মামা প্রসন্নকুমার কলিকাতায় বাস করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে মাতাঠাকুরাণীর কঠোর জীবনযাত্রার কথা ভক্তবৃন্দের মধ্যে প্রচারিত হয়। অবস্থাশ্রবণে সকলেই দুঃখিত এবং ভাবিত হইলেন। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ অনেকেই এইসময় বিভিন্ন স্থানে তপস্যায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কোথায় কিভাবে মাতার থাকিবার ব্যবস্থা হইবে, গৃহী সন্তানগণ এই বিষয়ে কোন সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছেন না।

যে-সকল নারী দক্ষিণেশ্বর হইতেই মাতার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার স্নেহলাভে ধন্য হইয়াছিলেন, মায়ের অবস্থা জানিয়া তাঁহারা বিচলিত হইলেন। কলিকাতা শহরে তাঁহারা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বসবাস

করিতেছেন, আর পূজনীয়া মাতা কোথায়, কতদূরে একাকিনী পড়িয়া আছেন, তাঁহার না-জানি কত কষ্ট হইতেছে, তাঁহার সেবা করিবার কেহ নাই, একটি সান্ত্বনার কথা বলিবার কেহই নিকটে নাই,—এইরূপ কত কথা তাঁহাদের মনে জাগে! প্রাণ সমবেদনায় কাঁদিয়া উঠে। এই অবস্থার প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা অনুভব করেন। কৃষ্ণভাবিনী, ভুবনমোহিনী, সিদ্ধেশ্বরী-প্রমুখ কয়েকজন ভক্তিমতী তাঁহার সেবার জন্য কিছু শ্রদ্ধাঞ্জলিও প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘকাল আনন্দময়ী মাতার দর্শন না পাইয়া তাঁহারা অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং যেভাবেই হউক তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা নিজ নিজ অলঙ্কার বিক্রয়দ্বারা অর্থের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া পরামর্শ করিলেন।

ঠাকুরের অপ্রকট হইবার অব্যবহিত পরেই কলিকাতা হইতে মাতা-ঠাকুরাণীর অনুপস্থিতি পুরুষ সন্তানগণের মনকেও ব্যথিত করিতেছিল। ঠাকুরের প্রকটকালে তাঁহাদিগের সহিত মাতার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না বটে, তথাপি অদূরে তাঁহার উপস্থিতি তাঁহাদের চিত্তে ভক্তি ও উৎসাহের উদ্রেক করিত। অনেকেই তাঁহার আশীর্ব্বাদ এবং করুণা-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। গুরুমাতা ব্যতীত এখন তাঁহাদিগের সান্ত্বনা পাইবার, আশ্রয় পাইবার, স্থানই-বা আর কোথায়?

সন্তানগণ কেহ কেহ আবার এই কথাও ভাবেন, ক্রমেই তাঁহারা একে অন্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন, ভবিষ্যতে তাঁহাদের মনো-বলও হয়তো ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ঠাকুর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাদিগের জীবনে যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছেন, তাহা যথাযথভাবে সংহত না হইলে এক বিরাট সম্ভাবনা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে। মাতা-ঠাকুরাণীকে তাঁহাদিগের সংঘজননীরূপে পাইলে, তাঁহার আশীর্ব্বাদে এবং অনুপ্রেরণায় সকল কার্য্যই কল্যাণমণ্ডিত হইবে। শ্রীগুরুমহারাজেরও ইহাই অভীপ্সিত বলিয়া তাঁহাদিগের সুদৃঢ় প্রতীতি হইল।

মাতাঠাকুরাণীর চরণে সন্তানদিগের এই কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতে হইবে, তাঁহাকে সম্মত করাইতে হইবে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে। এই বিষয়ে রামলালদাদা এবং প্রসন্নমামার সহিত কতিপয় সন্তানের আলোচনা হয়। সকলের প্রার্থনা প্রসন্নমামা ভগ্নীকে জানাইয়া দিলেন। অতঃপর ১২৯৪ সালের ফাল্গুন মাসে নিকুঞ্জবালা দেবী এবং আরও কেহ কেহ মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে জয়রামবাটী গমন করেন এবং তাঁহাকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

ইহাতে আর এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইলেন মাতাঠাকুরাণী।

তিনি এখন পল্লীসমাজে বাস করেন, সমাজের মতামতকে উপেক্ষা না করিয়া এই বিষয়ে পল্লীর প্রধান কয়েকজনের পরামর্শ চাহিলেন। অনেকেই বলিলেন, গদাধরের শিষ্যদিগের সহিত এই ব্রাহ্মণকন্যার কোন আত্মীয়তাসম্বন্ধ নাই, অতএব তাঁহাদিগের নিকট থাকা সমর্থনযোগ্য নহে। রামলাল অথবা শ্যামাসুন্দরীর নিকট বাস করাই তাঁহার পক্ষে সমীচীন হইবে।

প্রসন্নময়ী সমাজপতিগণের এইরূপ মতামতে প্রসন্ন না হইয়া গদাধরের পরিবারকে বলিলেন,—তা' কেনে গো, গদাই-এর শিষ্যরা তোমারও শিষ্যসন্তান। তাঁরা ছাড়া আর কে তোমায় বুঝবে? তাঁদের আহ্বানে তোমার নিশ্চয় যাওয়া উচিত। গাঁয়ের লোকেরা তোমার প্রয়োজনে কেউ দেখবে না। প্রসন্নময়ীর যুক্তি ও প্রতিপত্তি কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না। তদানীন্তন সমাজবিধানের ভয়ে জননী শ্যামাসুন্দরী প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, কিন্তু সকল দিক বিবেচনা করিয়া অবশেষে প্রসন্নময়ীর পরামর্শই তিনি অনুমোদন করিলেন।

প্রয়াগতীর্থে মাতাঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইয়া গৌরীমা পুনরায় বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছিলেন, ইতোমধ্যে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এমন সময়ে তাঁহার অপ্রত্যাশিত উপস্থিতিতে ভক্তগণও আশান্বিত হইলেন যে, তিনি কামারপুকুর হইতে মাতাঠাকুরাণীকে অবশ্যই

কলিকাতায় ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন। ভক্তগণের নিকট মায়ের সকল সমাচার অবগত হইয়া মাতৃদর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। বলরাম-ভবনে এই বিষয়ে গৌরীমা, স্বামিজী, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় এবং কতিপয় ভক্তের মধ্যে আলোচনা হয়। অতঃপর গৌরীমা কামারপুকুর যাত্রা করেন।

মাতাকন্যা উভয়ের মধ্যে দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ নাই; গৌরীমাকে তথায় পাইয়া মাতাঠাকুরাণী অতীব আনন্দিত হইলেন। কামারপুকুরের বিজন-তীর্থে ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া তাঁহারা উভয়েই বেদনামিশ্রিত আনন্দ অনুভব করিতেন। গুরুমাতার সঙ্গে এইভাবে একান্তে বাস এবং তাঁহার সেবা করিয়া গৌরীমাও পরম তৃপ্তি পাইলেন।

অতঃপর জননী শ্যামাসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মাতাঠাকুরাণী গৌরীমাসহ কলিকাতায় বলরাম-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।*

আনন্দদায়িনী মাতার দর্শন ও উপদেশলাভের আশায় ভক্তগণ সোৎসাহে তাঁহার চরণপ্রান্তে সমবেত হইতে লাগিলেন। তিনি যখন যেই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সকলের চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। পূর্ব্বে যে-সকল পুরুষভক্ত মাতার সান্নিধ্যলাভ হইতে বঞ্চিত ছিলেন, তাঁহারাও এইসময় হইতে তাঁহার পুণ্যদর্শন পাইতে লাগিলেন। সকলে গুরুমাতাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতেন, তাঁহার চরণ দর্শন ও স্নেহাশিস লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। অবশ্য, গুরুমাতা অবগুণ্ঠনবতীই থাকিতেন।

এইভাবে কিছুদিন কলিকাতায় অবস্থিতির পরে ভক্তগণের ব্যবস্থানু-যায়ী মাতাঠাকুরাণী বেলুড়ে এক ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। গৌরীমা ও গোলাপমা এবং মধ্যে মধ্যে যোগেনমাও মায়ের সহিত থাকিতেন। সেখানেও ভক্ত সমাগম হইত। মাষ্টার মহাশয় কোন কোন দিন তথায় গিয়া "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে"র পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া

---

* ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসে নিকুঞ্জবালা দেবী কামারপুকুর হইতে ফিরিয়া আসেন। ইহার মাস দুয়ের মধ্যেই মাতাঠাকুরাণীও কলিকাতায় আগমন করেন।

মাকে শুনাইতেন। বেলুড়ের নির্জ্জন পরিবেশে মা অনেকসময় ভাবাবিষ্ট হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হইত, ভাবাবেশে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক কথা বলিতেন, সময় সময় দেহবোধ পর্য্যন্ত থাকিত না।

পরবর্ত্তী কার্ত্তিক মাসে জগন্নাথদেবের দর্শনমানসে মা শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন লক্ষ্মীদিদি, যোগেনমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ-প্রমুখ সন্তানগণ। তৎকালে রেলপথের যোগাযোগ না থাকায় শ্রীক্ষেত্রে যাতায়াত অত্যন্ত কষ্টকর এবং সময়সাপেক্ষ ছিল। এই যাত্রায় তাঁহারা বঙ্গোপসাগরের পথে জাহাজে এবং কিয়ৎপথ গোযানে গিয়াছিলেন।

মা ক্ষেত্রধামে আসিয়া বলরাম বসুদের বাটীতে অবস্থান করিতেন। বলরাম বসুর ভ্রাতা হরিবল্লভ বসু ছিলেন কটকের প্রসিদ্ধ উকিল। তিনিও ঠাকুরের ভক্ত ছিলেন; ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলেন,—তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।

যে-কয়েকজন বাঙ্গালী নিজ প্রতিভাবলে উড়িষ্যায় যথেষ্ট প্রতিপত্তি এবং জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হরিবল্লভ বসু, ত্রৈলোক্যনাথ বসু এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পিতা জানকীনাথ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথদেবের পাণ্ডা এবং কর্ম্মচারিগণ, এমন-কি রাজকর্ম্মচারিগণও তাঁহাদিগকে মান্য করিতেন।

মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা গোবিন্দ শৃঙ্গারী এবং হরিবল্লভ বসুর স্থানীয় কর্ম্মচারী মাতাঠাকুরাণীর কষ্টলাঘবের উদ্দেশ্যে মন্দিরে যাতায়াতের জন্য শিবিকার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু মাতাঠাকুরাণী শিবিকারোহণে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন, আমি তীর্থযাত্রী, পদব্রজে গিয়াই মহাপ্রভুকে দর্শন করিব। মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মা অপার আনন্দ লাভ করিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ মঙ্গলারতি এবং সন্ধ্যারতির সময় তাঁহার দর্শনে যাইতেন। মাস দুই তিনি তীর্থবাস করেন এবং পৌষসংক্রান্তির দিনে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

কলিকাতায় কয়েকদিবস থাকিয়া তিনি শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় এবং

আরও কতিপয় ভক্তসহ স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি আঁটপুর হইয়া কামারপুকুর গমন করেন। এইবার কামারপুকুর এবং জয়রামবাটীতে মা বৎসরাধিককাল থাকেন, এবং তথাকার প্রয়োজনীয় * কার্য্যাদি নিষ্পন্ন করিয়া ১২৯৬ সালে ফাল্গুন মাসের শেষে কলিকাতায় আসিয়া তিনি কম্বুলিয়াটোলায় মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে কিছুকাল বাস করেন।

এইসময় মা গয়াধাম যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। এই তীর্থেই তাঁহার শ্বশুর মহাশয় স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, গদাধর তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। কাশীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শনকালে ঠাকুর গয়াধামে গমন করেন নাই। তথায় গেলে তাঁহার দেহ আর থাকিবে না, ইহাই তিনি মনে করিতেন। তাঁহার অগ্রজ পিতার পিণ্ডদান করিয়া গিয়াছিলেন; জননীর উদ্দেশে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়াছিলেন।

চৈত্র মাসের মধ্যভাগে মাতাঠাকুরাণী বৈদ্যনাথধাম দর্শন করিয়া গয়া-তীর্থে উপস্থিত হইলেন। তথায় পিণ্ডদান কার্য্য সুসম্পন্ন হইল, মাতা ইহাতে নিশ্চিন্ত ও তৃপ্ত হইলেন। গয়ার সমীপবর্ত্তী তীর্থসমূহ এবং গৌতম বুদ্ধের সিদ্ধিস্থান বুদ্ধগয়া দর্শন করিয়া সপ্তাহকাল পরে তিনি কলিকাতায় মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে ফিরিয়া আসেন।

ভক্ত বলরাম বসু তখন অন্তিমশয্যায়। পত্নী কৃষ্ণভাবিনীর প্রার্থনায় মাতাঠাকুরাণী তাঁহার গৃহে পদার্পণ করেন। গুরুপত্নীর চরণদর্শনে মুমূর্ষু ভক্ত কৃতার্থ হইলেন। অন্তিমকালেও স্বীয় পত্নী এবং একমাত্র পুত্র রামকৃষ্ণ বসুকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিলেন, ধর্ম্ম লাভ করিতে আমাদের কেহ অন্য কোথাও যাইবে না। আমাদের মাথা আর মন ঠাকুর-

* শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়কে লিখিত মাতাঠাকুরাণীর পত্র (৫ই মাঘ, ১২৯৬),—

আমার বর্ত্তমান মাসে যাইবার কথা ছিল, বোধ হয় যাওয়া ঘটিল নাই। কারণ এই সময় জমি বিক্রীর সময় ও প্রজা বিলির সময়। আর অন্য মাসে হইলে আর হইবে নাই এজন্য যাওয়া হইল নাই।

ঠাকুরাণীর চরণে বাঁধা আছে। মা-ঠাকরুণ যতদিন দেহে আছেন, মন-প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইও। আমার গুরুভাইদেরও সেবা করিবে। ইহা অপেক্ষা বড় ধর্ম্ম আমাদের আর কিছু নাই।

১লা বৈশাখ ভক্ত বলরাম বসু পরলোকগমন করেন। ইহাতে মা অতিশয় ব্যথিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন, দক্ষিণেশ্বরে আসিবার পূর্ব্বেই কোন কোন ভক্তসন্তানকে ঠাকুর মানসনেত্রে দেখিতে পাইতেন, বলরামবাবু তাঁহাদের অন্যতম। একদিন ঠাকুর দেখিলেন, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভক্তগণসহ পঞ্চবটীর দিক হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে আসিতেছেন। সেই দলের মধ্যে বলরামও ছিলেন। তিনি যেদিন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঠাকুর বলিয়াছিলেন, এইটি সেই কীর্ত্তনের দলের লোক।

তাঁহার নিষ্ঠাভক্তি ও সেবার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মা বলিয়াছেন, বলরামের ছিল বৈষ্ণবোচিত দীনভাব। ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতেন, কিন্তু চরণ স্পর্শ করিতেন না। মনে হইত, তিনি কি ঠাকুরকে স্পর্শ করিবার যোগ্য ? সাধারণতঃ দরজার পার্শ্বে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়াই তিনি ঠাকুরের উপদেশাবলী শ্রবণ করিতেন, নিকটে গিয়া বসিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইত। তিনি এতই ভাগ্যবান ছিলেন যে, ঠাকুর অনেকবার তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। যখন ইচ্ছা ঠাকুর সেখানে যাইতেন এবং তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া বলিতেন, 'বলরামের শুদ্ধ অন্ন'।

ঠাকুর, মাতাঠাকুরাণী এবং অন্তরঙ্গগণ সকলেই বলরাম বসুকে এবং তাঁহার গৃহকে আপনার বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ কাশীধাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর অপ্রকট হইবার পরে মাতাঠাকুরাণী অনেকবার এই বাটীতে বাস করিয়াছেন। বলরাম বসু, তাঁহার পত্নী ও পুত্র আজীবন অকুণ্ঠভাবে তাঁহার ও ভক্তবৃন্দের সেবাযত্ন করিয়াছেন।

বৈশাখ মাস হইতে কিছুকাল মাতাঠাকুরাণী বেলুড়ের নিকটবর্ত্তী ঘুষুড়ীর এক বাটীতে বাস করেন। স্বামিজী প্রব্রজ্যায় যাত্রার পূর্ব্বে

এইস্থানে আসিয়া সর্ব্বার্থসাধিকা মাতার চরণ বন্দনা করেন এবং নিজের সংকল্প জানাইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন,—ঠাকুরের নাম যেন সারা পৃথিবীতে প্রচার করিতে পারি এবং মনোবাঞ্ছা যেন জয়যুক্ত হয়।

বরপুত্রকে মাতা আশীর্ব্বাদ করিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হোক।" মাতার আশিসলাভে স্বামিজীর মনে হইল, তিনি মহাশক্তি লাভ করিয়াছেন, এইবার সকল সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত। তিনি প্রস্থান করিলে উপস্থিত সকলকে লক্ষ্য করিয়া মা বলিয়াছিলেন,—নরেন যেমন পবিত্র, তেমনি মহান। ঠাকুরের ওপর কী গভীর তা'র ভালবাসা, তাঁর স্তুতিগানে কী আনন্দ নরেনের!

১২৯৭ সালের জগদ্ধাত্রীপূজার পূর্ব্বেই মাতাঠাকুরাণী জয়রামবাটী গমন করেন, সঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ও ছিলেন। এইবার মা দীর্ঘকাল জয়রামবাটী এবং কামারপুকুরে বাস করেন। রামলালদাদা, শিবরামদাদা, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, শিবানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ-প্রমুখ সন্তানগণ এবং ভক্তিমতী মায়েরাও কেহ কেহ এইসময় তথায় গিয়াছিলেন। যোগেনমা, তাঁহার গর্ভধারিণী, গোলাপমা এবং নিকুঞ্জবালা দেবী একবার গৌরীমার সহিত তারকেশ্বর হইয়া পদব্রজে মাতৃদর্শনে গিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষও এইবার জয়রামবাটীতে কয়েকমাস বাস করেন। পুত্রশোকজনিত অবসাদে কাতর হইয়া চিত্তের শান্তিলাভের আশায় তিনি তথায় গিয়াছিলেন। মাকে তিনি সাধারণতঃ দূর হইতেই প্রণাম করিতেন। প্রথম যেবার নিকটে গিয়া প্রণাম করেন, সেবারও কেবল মায়ের চরণযুগলই দর্শন হইয়াছিল; এমন-কি কিছুদিন পূর্ব্বে যখন মাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন, তখনও তাঁহার মুখারবিন্দ দর্শন হয় নাই। এইবার মাতার শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়া তিনি অতিমাত্রায় বিস্মিত হইলেন; অকস্মাৎ অতীতের এক স্মৃতি তাঁহার চিত্তে জাগিয়া উঠিল।

দীর্ঘকাল পূর্ব্বে একবার তিনি বিসূচিকারোগে প্রবলভাবে আক্রান্ত

হইয়াছিলেন। চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা ত্যাগ করেন। এমন সময় অর্দ্ধচৈতন্য অবস্থায় তিনি এক মাতৃমূর্ত্তির দর্শন লাভ করেন। তাঁহার মুখে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিয়া সেই করুণাময়ী মাতা আশীর্ব্বাদ করেন। এই ঘটনার পরেই গিরিশচন্দ্র শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠেন।

সেদিন মুমূর্ষু অবস্থায় যে-মাতৃমূর্ত্তি জীবন-দান করিয়াছিলেন, আজ মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমুখ প্রত্যক্ষ করিয়া গিরিশচন্দ্র বুঝিলেন, এই মা তিনিই। বিস্ময় ও আনন্দে গিরিশচন্দ্র অভিভূত হইলেন।

জয়রামবাটীতে তিনি একদিন দেখেন, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া মা পুষ্করিণীতে যাইতেছেন। মাকে এইসকল কার্য্যও করিতে হয় ভাবিয়া তাঁহার মনে তখন দুঃখ হইল। তিনি স্তম্ভিত হইলেন রাত্রিতে শয়নকালে, যখন দেখিলেন, এতদিনের মলিন বস্ত্রাদি পরিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার বুঝিতে বিলম্ব হইল না, ইহা কাহার কর্ম্ম। পুরুষসিংহ গিরিশচন্দ্রের বলিষ্ঠ মন ইহা ভাবিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল যে, তাঁহার ব্যবহৃত বস্ত্রাদি পূজনীয়া গুরুমাতা স্পর্শ করিয়াছেন, এবং স্বহস্তে তাহা পরিষ্কার করিয়া শয্যাটিও পরিপাটি করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে ইহা কত বড় অপরাধের কথা!

গিরিশচন্দ্র আজ মর্ম্মে মর্ম্মে ইহাই উপলব্ধি করিলেন যে, ঠাকুরও সন্তানদিগকে গভীর স্নেহ করিতেন, কিন্তু মাতাঠাকুরাণী ততোধিক মমতাময়ী এবং করুণাময়ী। এইবার তিনি মায়ের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারিলেন, নিঃসংশয়ে বুঝিলেন যে, ইনি সত্যিকারের মা,—আপন মা।

এই যাত্রায় মাতাঠাকুরাণীর কামারপুকুরে অবস্থানকালে গৌরীমা আর একবার তথায় গিয়াছিলেন। একদিন হালদার-পুকুরের নিকট গিয়া তিনি দেখেন, জনৈক বৃদ্ধ সাধু অবসন্নদেহে বৃক্ষতলে পড়িয়া রহিয়াছেন; গৌরীমা নিকটে গেলে তিনি ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—এ মায়ি, জগন্নাথজী কতদূর? আর কত পথ হাঁটলে প্রভুর দর্শন মিলবে?

দেখিয়াই মনে হইল, অনাহার ও পথশ্রমে সাধু ক্লান্ত, পথ চলিতে

অক্ষম। কথাপ্রসঙ্গে গৌরীমাকে তিনি জানাইলেন, রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, পদ্মপলাশলোচন এক দীর্ঘকায় পুরুষ তাঁহাকে বলিতেছেন, কেন উপবাসে কষ্ট পাইতেছ? আমিই জগন্নাথ, এখানে আছি; আমায় দর্শন কর, প্রসাদ খাও।

বিবরণ শুনিয়া গৌরীমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়, বলেন,—আপনি একটু অপেক্ষা করুন। এখানে এক সাধুমায়ী আছেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস ক'রে আসি, এই দীর্ঘকায় পুরুষ কে?

তিনি দ্রুতপদে মায়ের নিকটে আসিয়া বলিলেন,—ও মা, শুনেছো তোমার কত্তার কাণ্ড! এক সাধুর কাছে কামারপুকুরকেই শ্রীক্ষেত্র ব'লে প্রচার কচ্ছেন!

শুনিয়া মা বলিলেন,—তাঁকে তুমি নিয়ে এসো।

গৌরীমা সাধুকে লইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার পর গৃহদেবতা রঘুবীরকে দেখাইয়া মা বলেন,—আপনি যাঁর দর্শন পেয়েছেন, ইনিই তিনি, ইনিই জগন্নাথ। আপনি এঁর প্রসাদ গ্রহণ করুন।

সাধু প্রশ্ন করিলেন,—এ মায়ি, ইনি আর জগন্নাথদেব কি অভেদ? এঁর প্রসাদ গ্রহণ করলেই কি আমার জগন্নাথদেবেরই প্রসাদ পাওয়া হবে? আপনি বলুন আমাকে।

মাতা পুনরায় বলিলেন,—হাঁ বাবা, জগন্নাথ আর ইনি অভেদ। জগন্নাথের প্রসাদ আর এঁর প্রসাদ এক, কোন পার্থক্য নেই। ইনিই আপনাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে প্রসাদ পেতে বলেছেন। এই কথা বলিয়া মা প্রসাদ লইয়া আসিলেন।

গৌরীমা এতক্ষণ নির্ব্বাক ছিলেন, এখন সাধুকে বলিলেন,—মনে আপনি দ্বিধা রাখবেন না, দুই-ই এক। আর ইনি মা কমলা, এঁর হাতের প্রসাদ পাওয়া মহাভাগ্যের কথা।

সাধুর মনে আর কোন সংশয় রহিল না। এইবার তিনি ভক্তিভরে 'গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তমহং ভজামি' বলিতে বলিতে মহাপ্রসাদকে

প্রণাম করিয়া হৃষ্টমনে তাহা গ্রহণ করিলেন। এবং তথায় কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সাধু পুনরায় শ্রীক্ষেত্র-অভিমুখে যাত্রা করেন।

দীর্ঘকাল দেশে বাস করিয়া মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন, * এবং বেলুড়ে গঙ্গাতীরে এক উদ্যানবাটীতে অবস্থান করেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় মায়ের চরণদর্শনার্থী হইয়া একদিন এই বাটীতে আগমন করেন। তাঁহার আনীত মিষ্টান্ন মাতা স্বয়ং কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া এই পবিত্রাত্মা বৃদ্ধসন্তানকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। মাতার এইরূপ অভাবিত করুণালাভে আত্মহারা হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—আহা, বাপের চাইতে মা দয়াল, বাপের চাইতে মা দয়াল!

ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণের মধ্যে নাগ মহাশয়ের অত্যধিক ভক্তি এবং বিনয় ভক্তসমাজে সুবিদিত। স্বামিজী এবং নাগ মহাশয়ের তুলনা করিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্র সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে বলিয়াছিলেন,—মহামায়া এই দুইটি সন্তানকে সংসারজালে আবদ্ধ করিতে গিয়া পরাজয় মানিয়াছেন। বেদান্তবাদী স্বামী বিবেকানন্দকে আবদ্ধ করিতে গেলে, তিনি বড় হইতেও এত বড় হইলেন যে, জালের বেড় আর কিছুতেই কূল পাইল না। পক্ষান্তরে বৈষ্ণবোচিত দীনতায় নাগ মহাশয় নিজেকে এতই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মনে করিতেন যে, জালের ক্ষুদ্রতম ছিদ্রও তাঁহাকে আটকাইতে পারিল না। পৃথক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুই-ই সুন্দর এবং মহান।

নাগ মহাশয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে স্বামিজীর একটি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে,—পৃথিবীর বহুস্থান ভ্রমণ করিলাম, নাগ মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।

এই সময়ে বলরাম বসুর কন্যা ভুবনমোহিনীর অকালে পরলোকগমনে

---

* শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়ের দিনপঞ্জিকা পাঠে অনুমিত হয় যে, এই যাত্রায় ১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ মাস হইতে দুই-তিন বৎসরকাল মা জয়রামবাটী এবং কামারপুকুরে বাস করেন।

শোকাতুরা কৃষ্ণভাবিনী আরও কাতর হইয়া পড়েন। স্থানপরিবর্ত্তনে মানসিক ও দৈহিক অবস্থার উন্নতি হইবে মনে করিয়া তাঁহাকে বিহার-প্রদেশে কৈলোয়ারে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার ব্যাকুলতায় মাতা-ঠাকুরাণীও তাঁহাদের সঙ্গে গমন করেন। মায়ের সান্নিধ্যে বাস করিয়া কৃষ্ণভাবিনীর শোক অনেকাংশে প্রশমিত হইল, তিনি প্রাণে সান্ত্বনা পাইলেন। মাস দুই পরে মা কলিকাতা হইয়া দেশে গমন করেন।

জননী শ্যামাসুন্দরী একবার কন্যার নিকট অভিলাষ জানাইয়াছিলেন,—সারু, তোর অনেক শিষ্যসেবক আছে, তোকে তীর্থধর্ম্ম করাবে। আমার কে আছে মা, তুই ছাড়া? আমার বড় সাধ, তোর সঙ্গে একবার কাশীবৃন্দাবন ঘুরে আসি। কন্যা স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। এইবার ১৩০১ সালের শেষভাগে জননী এবং ভ্রাতৃগণসহ মাতাঠাকুরাণী তীর্থযাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী যোগানন্দ এবং আরও দুই-তিন জন।

প্রথমবার ঐসকল তীর্থদর্শনকালে ঠাকুরের অদর্শনজনিত ব্যথায় তাঁহার মন অত্যন্ত পীড়িত ছিল; সুতরাং সকল স্থান এবং মন্দির তিনি মনোযোগ-সহকারে দর্শন করিতে পারেন নাই। তখন তিনি যেন কাহারও কথা শুনিতে পাইতেন না, কথা কাণে গেলেও তাহা বুঝিতে পারিতেন না। বহির্জগৎ যেন ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। এইবার তিনি মনের প্রশান্তিতে জননীর সহিত সকল স্থান দর্শন করিতে লাগিলেন।

কাশীধামে মাতাপুত্রী বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিলেন। বিশ্বনাথের শিরে জল ঢালিবার সময় মাতাঠাকুরাণীর এক দিব্য দর্শন এবং আবেশ হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন,—অনাদিলিঙ্গ আর দেখতে পাচ্ছি না, ঠাকুর এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন। যত জল ঢালছি, সব যেয়ে তাঁরই পায়ে পড়ছে। আমার হাতপা কাঁপতে লাগলো, অবস্থা দেখে মা আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

"কাশীপুরাধীশ্বরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী"র ভুবন-আলোকরা রূপদর্শনে তাঁহাদিগের পরম আনন্দ হইল। মা বিহ্বল হইয়া সেই রূপ দর্শন করিতে

লাগিলেন ; পরে গর্ভধারিণীকে বলিলেন,—এই অন্নপূর্ণা রামপ্রসাদের মাসী, আর বিশ্বনাথ তাঁর মেসো ! মায়ের উপর তাঁর বড্ডো অভিমান ছিল কি-না ! যা' পেয়েছেন তা'তে মন ভরতো না, তাঁর আরো চাই। তাই কখনো কখনো অভিমানে মাকে বিমাতাও বলতেন, অর্থাৎ নিজের মা হ'লে যেন আরো বেশী কৃপা পেতেন। এই কারণেই ভক্তের অত অভিমান।

একদিন তাঁহারা সকলে মাতা অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রসাদ পাইলেন।

এইবার মণিকর্ণিকা ঘাটের কথা উল্লেখ করিতেছি।

একদা বিহারকালে মহেশমহিষীর মণিকর্ণিকা অর্থাৎ কর্ণের রত্নকুণ্ডল এইস্থানে হারাইয়া যায়। তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া মহেশ্বরের নিকট স্বীয় প্রিয়-বস্তু দাবী করিয়া বলেন,—তোমার জন্যই আমার মণিকর্ণিকা হারাইয়া গেল, তোমাকে ইহা উদ্ধার করিয়া দিতে হইবে ; না দিলে আমি এইস্থান হইতে যাইব না। মহেশ্বর প্রমাদ গণিলেন ; স্থলে জলে তিনি অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুণ্ডল উদ্ধার হইল না, মহেশ্বরীর দাবী তিনি পূরণ করিতে পারিলেন না। নিজের অক্ষমতায় লজ্জিত হইয়া, ভিক্ষাদ্বারা পুনরায় তদনুরূপ আভরণ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, কিন্তু অভিমানিনী শিবরাণী তাঁহার দাবী প্রত্যাহার করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অগত্যা নিরুপায় মহেশ্বর মণিকর্ণিকার ঘাটে পাহারায় নিযুক্ত রহিলেন।

এই কাহিনী বলিতে বলিতে মাতাঠাকুরাণীর এক অভাবনীয় অবস্থা হইল। 'লজ্জাপটাবৃতা' মাতা ঐরূপ প্রকাশ্যস্থানে আলুলায়িতকুন্তলা এবং অনবগুণ্ঠিতা হইয়া সকলের সমক্ষেই গাহিতে লাগিলেন,—

"যে মণিকর্ণিকায় মায়ের কুণ্ডল পড়েছিল খসি',
সে অবধি তা'রে মণিকর্ণি ব'লে ঘোষি।"......

গান শেষ করিয়া মা বলিলেন,—কাশীতে দেহত্যাগ করলে শিব 'তত্ত্বমসি' দান করেন, কিন্তু 'তত্ত্বমসি'র ওপরে মা আমার মহেশমহিষী।

আর একদিন তাঁহারা প্রাতঃকালে স্নানার্থে গেলেন অসিঘাটে। পূর্ব্ববারে মায়ের অসিমাধব দর্শন হয় নাই। স্নানান্তে সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। অসিমাধব জগন্নাথের রূপ ; বিগ্রহদর্শনে সানন্দবিস্ময়ে

মাতা বলিয়া উঠিলেন,—ওমা, কাশীতেও জগন্নাথ এসে ব'সে আছেন! তা' বেশ হয়েছে, যিনি জগন্নাথ, তিনিই বিশ্বনাথ।

মন্দির হইতে বাহিরে আসিতেছেন, এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। কোথা হইতে এক সধবা নারী ছুটিয়া আসিয়া মাতাঠাকুরাণীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। মা স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন,—কেন এমন করলে মা? একা মেয়েমানুষ, তুমি এখানে এলেই-বা কি ক'রে!

নারী বিনয়বচনে বলেন,—তবে শুনুন মা। ভোররাত্রে স্বপ্ন দেখলুম,—আমার ইষ্টদেবী বলছেন, আমায় যদি দেখতে চাস্, ফুলবেলপাতা নিয়ে চ'লে আয় অসিঘাটে। তুই গিয়ে প্রথম যাকে দেখবি, সে-ই আমি।

—আমি দূর থেকে প্রথম আপনাকেই দেখতে পেয়েছি, তাই আপনার পায়ে অঞ্জলি দিলুম। এই ফলটিও আপনি দয়া ক'রে গ্রহণ করুন মা। ঈষৎ-হাস্যে মাতা ফলটি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন,—তোমার ইষ্টলাভ হোক মা।

এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অতীব বিস্মিত হইলেন।

জননীকে কাশীর প্রধান প্রধান দেবদেবী, প্রসিদ্ধ সাধুমহাপুরুষ এবং স্থানসমূহ দর্শন করাইয়া পরে তাঁহারা বৃন্দাবনে গমন করেন।

একদিন বঙ্কুবিহারীর মন্দিরে জননীকে কন্যা বলেন,—এই ঠাকুরকে দর্শন ক'রে তোমার জামাই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। ইহাতে শ্যামাসুন্দরী জামাতার উদ্দেশে যুক্তকরে নমস্কার জানাইলেন।

জননীর এইরূপ পরিবর্ত্তনের কথায় পরবর্ত্তী কালে মাতা বলিতেন,—আমার মা এককালে যে-জামায়ের কতই-না নিন্দে করেছেন, শেষাশেষি তা'র চেয়ে ঢের বেশী বন্দনা গেয়েছেন।

বিহারিজীর সিংহাসনের সম্মুখে পর্দ্দা ঝোলানো থাকে। মুহূর্ত্তের জন্য একবার সেবায়েতগণ তাহা সরাইয়া দেয়,—প্রভুজীর মুখচন্দ্র দর্শন করা যায়; মুহূর্ত্ত পরেই আবার টানিয়া দেয়,—তখন প্রভুকে দেখা যায় না। ইহা দেখিয়া বিস্ময় বোধ হয় শ্যামাসুন্দরীর; তিনি বলেন,—

ও সারদা, এ কেমন ঠাকুর ? আর কোথাও তো ঠাকুরের সামনে পর্দ্দা টানাটানি করে না ! ব্যাপারটা কি বল তো মা।

—একে এখানে ঝাঁকিদর্শন বলে।

ইহার এক আশ্চর্য্য কাহিনী আছে।

একদা এক ব্রজবালা আসেন বিহারিজীর দর্শনে। প্রভুর রূপমাধুরী দেখিয়া তিনি ভাবস্থ হইয়া পড়েন। আকুল আগ্রহে প্রার্থনা জানান, আহ্বান করেন তাঁহাকে নিজগৃহে, বলেন—'আও মেরা সাথ'। ভক্ত-বৎসলের চিত্ত বিচলিত হয় প্রেমের আহ্বানে। বিহারিজী চলিয়া গেলেন সেই ভক্তিমতীর দীনকুটীরে। পরদিবস সেবায়েতগণ মন্দিরদ্বার খুলিয়া দেখে,—সিংহাসন শূন্য, দেবতা অদৃশ্য ! তন্নতন্ন করিয়া প্রতিগৃহে অনুসন্ধান আরম্ভ হইল ; ঘাটে, বাটে, মাঠে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল।

অবশেষে তাহারা গিয়া উপস্থিত হয় সেই ব্রজবালার প্রাঙ্গণে। পরম তৃপ্তিসহকারে তাঁহার হাতের ভোজ্য গ্রহণ করিয়াছেন বিহারিজী, এইবার ব্রজবালা কত যত্নে তাঁহাকে আচমন করাইয়া দিতেছিলেন। এমন সময় তাহারা নিষ্ঠুর দস্যুর মত সবলে ছিনাইয়া লইল বিহারিজীকে। বিচ্ছেদবেদনায় ছিন্নলতিকার ন্যায় ব্রজবালা ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

সেই হইতে বিহারিজীকে অধিকক্ষণ কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না ; যদি আবার কাহারও আকর্ষণে তিনি চলিয়া যান ! তাই মন্দিরে থাকিয়াই ঠাকুর ভক্তের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেন এইভাবে।

একদিন বংশীবটের মহিমার কথা বলিতে বলিতে মাতাঠাকুরাণী সেইস্থানের রজ জননীর ললাটে মাখাইয়া দিয়া বলিলেন,—এখানে এলে আমি গোপীদের পায়ের নূপুরধ্বনি শুনতে পাই, আজও তাঁরা আসেন গোবিন্দের দর্শনে। এখানে এলে আমার ভারী আনন্দ হয়। সেবার ব্রজের রজ ছেড়ে ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল না। মনে হতো সারাজীবন ব্রজের ধূলোতেই প'ড়ে থাকি।

কন্যার উক্তিশ্রবণে শ্যামাসুন্দরী শঙ্কিত হইয়া বলেন,—বৃন্দাবন তো দেখা হলো মা, এবার ভালয় ভালয় চল দেশে ফিরে যাই।

—সে কি গো! এখানকার সব জায়গা এখনো দেখা হয়নি; আরবার যাঁদের সঙ্গে আমি চেনাপরিচয় ক'রে গেছি, মন্দিরে মন্দিরে তাঁদের সবাইকে দেখবো, তবে আমি যাবো

আর একদিন যমুনার জলে অবগাহনকালে মাতা ভাবাবিষ্ট হইয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন জলের মধ্যে। যমুনার জলকে তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের ধারা বলিয়া মনে হয়, আর তাহাতে মা-যশোদার নীলমণি যেন লুকাইয়া আছেন! জল হইতে মাতা উঠেন না, অবশেষে শ্যামাসুন্দরী কন্যাকে ধরিয়া তীরে তুলিয়া আনিলেন।

নিকুঞ্জবনে সকলে একদিন কৌতুকপ্রিয় বালকের ন্যায়, বানরদিগকে ছোলাভাজা ও কলা খাওয়াইতেছিলেন। তাহাদিগের চকিতদৃষ্টি এবং হর্ষ লক্ষ্য করিয়া মা বলেন, রামভক্ত বানরেরা কৃষ্ণভক্তও বটে! ত্রেতাযুগে সীতার উদ্ধারের জন্য সেতুবন্ধনকালে সাগরতীরে বানরকুল ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া খাইতে চাহিলে, তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এইস্থানে বালি আর লবণাক্ত জল ছাড়া কিছুই দেখিতেছি না। দ্বাপরযুগে বৃন্দাবনলীলার সময় তোমাদিগকে ভাল ভাল অনেক কিছু খাইতে দিব।

সকলের সঙ্গে কাশীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া শ্যামাসুন্দরী অতীব আনন্দিত হইলেন। অতঃপর তিনি পুত্রগণের সহিত দেশে ফিরিয়া গেলেন। মাতাঠাকুরাণী কিছুদিন মাষ্টার মহাশয়ের বাটীতে থাকিয়া ১৩০২ সালের প্রথমভাগে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের সহিত কামারপুকুরে গমন করেন। এইসময়ে বরদামামার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। পরবর্ত্তী দুই বৎসর মা একাধিকবার দেশ এবং কলিকাতায় যাতায়াত করেন; অবশেষে ১৩০৪ সালে বাগবাজারে বোসপাড়া লেনে ১০।২নং বাটীতে আগমন করেন।

সংঘ ও প্রচার

পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, কেবল ভাগবতপ্রসঙ্গ, ভাবসমাধি এবং আনন্দোৎসবেই দক্ষিণেশ্বর-লীলা সাঙ্গ হয় নাই, ঠাকুর-ঠাকুরাণীর লীলা অনন্তভাবে প্রসারিত। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য—সাধনভজন সহায়ে ভগবান-লাভ। সংসারবিরাগী সাধক নিজেকে নিঃশেষে ভগবচ্চরণে বিলাইয়া দিতে পারেন, নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ঠাকুর-ঠাকুরাণীর সংস্পর্শে আসিয়া কোন কোন অন্তরঙ্গের অন্তরে আর এক নবভাবের আলোকসম্পাত হইয়াছিল। কেবল নিজের কল্যাণ, নির্ব্বাণ বা আত্মোপলব্ধিই সাধকজীবনের একমাত্র অথবা শেষ কথা নহে, তাঁহাদের তপঃসিদ্ধ জীবন বিশ্বকল্যাণেও উৎসর্গ করিবার প্রয়োজন আছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে দুইটি থাক আমরা দেখিতে পাই। * * একদল শুধু তপস্যায় সত্যোপলব্ধি করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই, তাঁহাদের সাধনালব্ধ শক্তি পরার্থে নিয়োজিত করিয়া সন্ন্যাসীর মহান্ আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই শেষোক্ত দলের মধ্যে পুরুষগণের অগ্রণী-রূপে আমরা দেখিতে পাই শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দকে, আর স্ত্রী-সম্প্রদায়ের পুরোভাগে দেখিতে পাই সন্ন্যাসিনী গৌরীমাতাকে।" [১]

"বেদান্তের যে বাণী ও আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনায় বাস্তবতার স্পর্শে জ্বলন্ত হইয়া উঠিয়াছে, স্বামিজী দেশ দেশান্তরে তাহা প্রচার করিয়া সমস্ত জগৎটা মাতাইয়া তুলিলেন; আর হিন্দুসভ্যতায় নারীর যে মহান আদর্শ শ্রীসারদেশ্বরী মাতার অসাধারণ ত্যাগ, বাৎসল্য ও করুণার মধ্যে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, গৌরীমা তাহা দিকে দিকে প্রচার করিয়া নব-জাগরণের সৃষ্টি করিলেন। আমাদের এই অর্দ্ধসুপ্ত মাতৃজাতির মধ্যে তিনি নূতন প্রেরণা ও নূতন উদ্দীপনা আনিয়া দিলেন।" [২]

১. রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দের এবং

২. অধ্যাপক ডক্টর হরিদাস চৌধুরীর ভাষণ

(কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট, ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৪৬)

তাঁহারা কিভাবে তাঁহাদের তপস্যালব্ধ শক্তিকে লোককল্যাণে নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারই ইতিহাস আমরা সংক্ষেপে এই অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর মাতাঠাকুরাণী এবং সন্তানবৃন্দ অর্থাভাবহেতু তাঁহার শেষ পুণ্যলীলাস্থল কাশীপুর উদ্যানবাটী অতিদুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়েই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। নানাকারণে তরুণ অন্তরঙ্গগণও কেহ কেহ স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। তরুণ গুরুভ্রাতাদিগকে সংঘবদ্ধ করিবার প্রয়াসে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা আসিয়া ঠাকুরের চিহ্নিত প্রিয়তম সন্তান স্বামী বিবেকানন্দকে চিন্তাকুল করিয়া তুলিল।

এই সময়েই কোন কোন ত্যাগী ও গৃহী সন্তানের মধ্যে পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইল গুরুমহারাজের দেহাবশেষের সমাধিস্থান নির্দ্ধারণ-প্রসঙ্গে। গভীর দুঃখেই মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন,—এমন সোনার মানুষই চ'লে গেলেন, এখন ওরা অস্থিভস্ম নিয়ে ঝগড়া সুরু করেছে! অবশ্য, স্বামিজীর উদারতা এবং মধ্যস্থতায় অচিরে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়া আসিল।

কাশীপুর ত্যাগ করিবার পর ত্যাগী সন্তানগণ বরাহনগরে এক জীর্ণ পরিত্যক্ত বাটীতে মঠ স্থাপন করেন। স্বামিজী অনতিবিলম্বে সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া মঠবাসী হইলেন। তাঁহার আকর্ষণ এবং উৎসাহে ত্যাগী সন্তানগণ একে একে আসিয়া তথায় মিলিত হইলেন। অন্তর্দ্ধানের প্রাক্কালে গুরুমহারাজ তাঁহারই উপর ভ্রাতৃবৃন্দের দায়িত্ব এবং সকলকে প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া এবং নিজের স্বভাবসিদ্ধ মাধুর্য্যে সকলকে তিনি আপন করিয়া লইলেন। বস্তুতঃ সেকালের অর্থসঙ্কট এবং কঠোর জীবনযাত্রার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ পুরোভাগে থাকিয়া তরুণ ভ্রাতৃবৃন্দকে প্রেমবন্ধনে বিশেষভাবে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

গুরুগতপ্রাণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করিয়া গুরুভ্রাতাদের কল্যাণসাধনে তৎপর হইলেন, গুরুর মহান আদর্শে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতেন; শাস্ত্রানুশীলন এবং সাধনভজনে সকলে মগ্ন থাকিতেন। সময় সময় তাঁহাদের অনেকেই বিভিন্ন তীর্থে এবং গিরি-গুহায় যাইয়াও কঠোর তপশ্চর্য্যায় রত থাকিতেন; পুনরায় আসিয়া মিলিত হইতেন বরাহনগর মঠে।[১] কিন্তু একনিষ্ঠ সেবক রামকৃষ্ণানন্দজী অনন্যমনে মঠেই পড়িয়া থাকিতেন গুরুমহারাজের সেবাপূজা লইয়া। আবার স্নেহময়ী জননীর ন্যায় ভ্রাতৃবর্গেরও সেবাযত্ন তিনি করিতেন। তাঁহার সেবা, নিষ্ঠা ও ভক্তির কথা বলিয়া শেষ করা যায় না।

১. এইসময়ে বরাহনগর মঠ হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকর্তৃক বৃন্দাবনে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট লিখিত একখানি পত্র (২৫শে আগষ্ট, ১৮৮৮),—

"ভাই নরেন। গতকল্য তোমার দুখানি পত্র পাইয়া আমরা সকলে অত্যন্ত আহ্লাদীত হইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে মাতাঠাকুরাণির পত্রের দ্বারা তোমার সংবাদ পাইয়াছিলাম। * * বহু দিবসের পর গঙ্গাধরের সংবাদ তোমার পত্রের দ্বারা পাইয়া আমরা * * আনন্দিত হইয়াছি। বোধ করি তোমার সহিত তাহার দেখা হইবে। ধন্য সেই ছোকরা অল্পবয়সে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া খুব পর্য্যটন করিতেছে। * * তোমার কথা মনে হইলে আমাদের বড় কষ্ট হয়। বোধ হয় তারকদাদা সত্বর হরিদ্বার জাইবেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।

গত বুধবার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) তিরোভাব উপলক্ষে এখানে প্রাতঃকাল হইতে রাত্র ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুদেবের এবং সকল দেবদেবীর * * যথাবিহিত বিধি অনুসারে পূজাপাঠ * * হইয়াছিল। আমাদের খুব আনন্দ হইয়াছিল, তথাপি তোমার absence খুব feel করিয়াছি। এখানকার প্রায় সকলে সে দিবস উপবাস করিয়াছিল। এবার কালী তপস্বী তন্ত্রধারক হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুদেবের পূজার সময় একটী সংস্কৃত স্তব chorusএ পাঠ করা হইয়াছিল। তাহা তোমার দেখিবার জন্য পাঠান গেল। সেটী কালীর দ্বারা রচিত। * *

মা-ঠাকুরাণি এবং সেখানকার সকলে ভাল আছেন। * * আমার একটা নিবেদন এই যে তুমি যেখানে যাও কিম্বা থাক মধ্যে ২ এখানে সংবাদ লিখিও, * *

মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে কয়েকমাস বাস করিয়া গৌরীমাতা ১২৯৫ সালে পশ্চিম-ভারতে চলিয়া গিয়াছিলেন তপস্যা করিতে; গঙ্গোত্রীর পুণ্যবারি লইয়া পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ১২৯৭ সালে। ইতোমধ্যে তাঁহার সহিত বৃন্দাবনে স্বামী বিবেকানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল।[২] গৌরীমার পূজিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটোখানি লইয়া গিয়া তাহারই সমক্ষে স্বামিজী হাতরাসের ষ্টেশন মাষ্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তকে দীক্ষাদান করেন। ইনি স্বামী সদানন্দ—স্বামিজীর প্রথম মন্ত্রশিষ্য।

কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গৌরীমা বরাহনগর মঠে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, রামকৃষ্ণানন্দ-প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানদের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং গঙ্গোত্রীর পুণ্যবারির কিয়দংশ ঠাকুরের স্নানপূজায় নিবেদন করিয়া অপরাংশ রামেশ্বর মহাদেবের জন্য রাখিয়া দিলেন। মাতাঠাকুরাণী তখন দেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় গিয়া গৌরীমা কিছুকাল মাতৃসেবায় পরম আনন্দে কাটাইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং রামেশ্বরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

"গৌরীমার দক্ষিণাপথ পর্য্যটনকালে স্বামী বিবেকানন্দও দক্ষিণাপথ পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে তাঁহাদের কদাচিৎ সাক্ষাৎও হইয়াছে। কোথাও যাইয়া গৌরীমা শুনিতে পাইতেন, 'এই দুই-চারি

শ্রীশ্রীগুরুদেবের নিকট প্রার্থনা করি যেন তোমার মনবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভাই যেন একেবারে ভূলে যেও না—এই ভিক্ষা তোমার নিকট রহিল। আমাদের সকলকার প্রণাম জানিবে এবং G. motherকে প্রণাম জানাইবে।"

২. মাতাঠাকুরাণীর বেলুড়ে অবস্থানকালে তথা হইতে স্বামী যোগানন্দকর্ত্তৃক বৃন্দাবনে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট ১৮৮৮ সালের আগষ্ট মাসে লিখিত পত্র,—

"মাতাঠাকুরাণি ও আর ২ সকলে ভাল আছেন মাতাঠাকুরাণির আশীর্ব্বাদ ও আর সকলের প্রণাম জানিবে গৌরমাকে মাতাঠাকুরাণির আশীর্ব্বাদ জানাইবে ও আর সকলের প্রণাম জানাইবে। আমার প্রণাম তুমি জানিবে ও গৌরমাকে জানাইবে।"

দিন পূর্ব্বে রাজপুত্রের মত এক বাঙ্গালী সাধু এখানে আসিয়াছিলেন, —ভারী পণ্ডিত, খুব বাগ্মী।' আবার কোথাও স্বামিজী যাইয়া শুনিতে পাইতেন, 'এক বাঙ্গালী সাধুমায়ী আসিয়াছিলেন,—খুব ভক্তিমতী, ভারী তেজস্বিনী।' উভয়েই বুঝিতে পারিতেন, অপর ব্যক্তিটি কে। উভয়েই স্থানে স্থানে ঠাকুরের অমৃতোপম উপদেশ এবং অনুপম জীবনচরিত প্রচার করিতে করিতে যাইতেন। নরনারী এই অপূর্ব্ব কথামৃত শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।" (৬)

একদিন ভারতের শেষ প্রান্তে—কন্যাকুমারীর বেলাভূমিতে সূর্য্যাস্ত-কালে নবীন সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বসিয়া আছেন। সম্মুখে অনন্ত বারিধি, পশ্চাতে বিরাট মহাদেশ; স্বামিজী ভাবিতেছেন, বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী আমি, তপস্যাবলে মোক্ষলাভ করিলেই কি শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা সার্থক হইবে? ইহাই কি আমার জীবনের চরম কথা? এই যে বিরাট জরাজীর্ণ দেশ, স্বর্গাদপি গরীয়সী এই জন্মভূমির নিকট আমার কি কোন ঋণ নাই? তাহার প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই?

—না, না, স্বর্গ আমি চাহি না, নিজের মোক্ষও আমি চাহি না; দক্ষিণেশ্বরের শিক্ষা তাহা নহে। আমার মাতৃভূমির সেবায় আমি আত্মোৎসর্গ করিব, আমার কোটি কোটি দীনদুঃখী স্বদেশবাসীর জন্য আত্মবলি দিব। গুরুমহারাজের ভাবধারা জগৎ-ময় প্রচার করিব, ভারতকে জগৎসভায় পুনরায় গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করিব।

বিপুল শক্তির চাঞ্চল্য অনুভব করেন স্বামিজী অন্তরের মধ্যে; কিন্তু তাহা যে কত গভীর, কত বিরাট, নিজেই তাহা বুঝিতে পারেন না।

"ইতোমধ্যে একদিন স্বামিজী স্বপ্নে দেখিলেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব দিব্যদেহে সমুদ্রকূল হইতে বিস্তীর্ণ সলিলোপরি পদব্রজে অগ্রসর হইতেছেন এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিবার জন্য হস্ত-সঙ্কেতে ইঙ্গিত করিতেছেন। এইবার সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ-সন্দেহ বিদূরিত হইল, স্বামিজী আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল,

এ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর আদেশ লওয়া হয় নাই। তাঁহার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ ব্যতীত সুদূর বিদেশে যাওয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে স্বামিজী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট স্বীয় সঙ্কল্প বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া এক পত্র লিখিলেন।

"প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র নরেন্দ্রনাথের পত্র পাইয়া স্নেহবিহ্বলা জননী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া পড়িলেন। রামকৃষ্ণসঙ্ঘের নেতা, রাজাধিরাজসেবিত বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার দৃষ্টিতে সংসারানভিজ্ঞ বালকমাত্র, তাঁহাকে কোন প্রাণে সুদূর বিদেশ যাত্রায় অনুমতি দিবেন! ইতোমধ্যে ঠাকুরের আদেশ সমস্ত সমস্যা মীমাংসা করিয়া দিল। অগত্যা স্নেহমুগ্ধ-হৃদয় বাঁধিয়া জগতের কল্যাণকামনায় স্বামিজীর সঙ্কল্পে তিনি আনন্দে সম্মতিপ্রদান করিলেন।

"যথাসময়ে পত্রোত্তর আসিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। পত্রখানি পরমভক্তিভরে মস্তকে ধারণ করিয়া স্বামিজী ভাবাবেগে অশ্রুসিক্তনেত্রে, বালকের মত আনন্দ-বিহ্বল হইয়া কক্ষমধ্যে নৃত্য করিতে লাগিলেন। * * *

"নিয়মিত সময়ে তদীয় শিষ্য ও ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় স্বামিজী তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'বৎসগণ! শ্রীশ্রীমায়ের আদেশ পাইয়াছি, সমস্ত সংশয়-ভাবনা দূর হইয়াছে, আমি আমেরিকা যাইবার জন্য প্রস্তুত। করুণাময়ী জননী আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন, আর চিন্তা কি?" (৫)

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। মাতাঠাকুরাণী তখন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, একদিন গঙ্গাতীরে বসিয়া ঠাকুরের কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ দেখেন, —তাঁহারই নিকটবর্ত্তী একস্থানে তীর হইতে ঠাকুর গঙ্গায় অবতরণ করিয়া জলে মিলাইয়া গেলেন; অব্যবহিত পরেই স্বামী বিবেকানন্দ সেই পূত শান্তিবারি চতুর্দ্দিকে সিঞ্চন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।'

এই ঘটনার কিছুকাল পরেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারা বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যাত্রা করেন। পরবর্ত্তী কালে মাতাঠাকুরাণীর দৃষ্ট বেলুড়ের উক্ত স্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণমঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ বাহ্যদৃষ্টিতে বেদান্তকেশরী হইলেও অন্তরে তিনি ছিলেন মায়ের করুণাভিখারী। মায়ের প্রতি ছিল তাঁহার অগাধ ভক্তি, শিশুসুলভ নির্ভরশীলতা।

দূরদেশে গিয়া দারুণ কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও মাতাঠাকুরাণীর চিন্তা, মাতৃভূমির কল্যাণচিন্তা, তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিত। তাঁহার চিন্তাধারা এবং পরিকল্পনা তিনি এতদ্দেশে বিভিন্ন ব্যক্তিকেও লিখিয়া জানাইতেন, তাঁহার গুরুভ্রাতা এবং গুণগ্রাহীদিগকে নানাভাবের মহৎ প্রেরণাদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিতেন। মাতাঠাকুরাণীর সেবাযত্নের সুব্যবস্থা করিতে হইবে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের সুপ্ত মাতৃশক্তিকে জাগরিত করিতে হইবে, এইরূপ কত চিন্তা স্বামিজীর চিত্তে উদয় হইত।

স্বামী শিবানন্দকে তিনি লিখিয়াছেন (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে),—

"মা-ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী, জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে। এইজন্য তাঁর মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস বরং যান আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্ব্বনাশ! শক্তির কৃপা না হলে কি ছাই হবে। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে? আমার চোখ খুলে যাচ্ছে, দিন দিন সব বুঝতে

পারছি। * * * তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি। মায়ের কৃপা আমার উপর বাপের কৃপার চেয়ে লক্ষ গুণ বড়। * * *

"রামকৃষ্ণ পরমহংস ঈশ্বর ছিলেন কি মানুষ ছিলেন যা হয় বল দাদা, কিন্তু যার মায়ের উপর ভক্তি নাই তাকে ধিক্কার দিও।"

"আমি প্রথমে মাতাঠাকুরাণীর জন্য একটি জায়গা করবার দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি, কারণ মেয়েদের জায়গারই প্রথম দরকার। * * * আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা আর মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পার কি?"

চিকাগো হইতে স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি এক পত্রে লিখিয়াছেন; "গৌর মা কোথায়? ঐরূপ মহতী এবং চৈতন্যসঞ্চারিণী শক্তিতে দীপ্ত হাজার মা আমাদের প্রয়োজন।"

অন্য পত্রে লিখিয়াছেন, "গৌর মা, যোগেন মা, গোলাপ মা, কি করছেন? চেলা চাই at any risk (যে কোন রকমে হোক)। তাঁদের গিয়ে বল্‌বে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো।"

"যোগেন মা, গোলাপ মা, কতকগুলি বিধবা চেলা বানাতে পারে না কি? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে সাদ্দি দিতে পার না কি? তার পর তাদের ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পার না কি?"

পুনরায় লণ্ডন হইতে স্বামিজী লিখিয়াছেন (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে),—

"যদি আমার বুদ্ধিতে চলা তোমাদের উচিত বিচার হয় এবং এই সকল নিয়ম পালন কর, তা হলে আমি মঠভাড়ার এবং সমস্ত খরচ-পত্র পাঠিয়ে দেব। নতুবা তোমাদের সঙ্গত্যাগ একদম। অপিচ গৌর মা, যোগীন মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐ প্রকার একটা (মঠ) মেয়েদের জন্য স্থাপন করাইবে। সেখানে গৌর মাকে এক বৎসর মহান্ত করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউই সেখানে

যেতে পাবে না। তারা আপনারা সমস্ত করিবে, তোমাদের হুকুমে কাউকে চলিতে হবে না। তারও সমস্ত খরচ-পত্র আমি পাঠিয়ে দেব।"

গৌরীমার চিত্তও মাতৃজাতিসেবার সংকল্প লইয়া পূর্ব্ব হইতেই আন্দোলিত হইতেছিল। ভারতের বিভিন্নস্থানে প্রব্রজ্যাকালে মাতৃজাতির দুঃখদুর্দ্দশা তিনি নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নারী আদর্শ গৃহলক্ষ্মী হইতে পারে না, সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে পারে না, সংসারে সুখশান্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। কেবল দৈহিক বল নয়, আত্মিক বলের অভাবে ও অতিতুচ্ছ কারণে নারীকে অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয়। সমাজে নারীশিক্ষার অভাব, নারীর আত্মিক বলের অভাব, অসহায়া নারীর নিরাপদ আশ্রয়ের অভাব,—এইসকল সমস্যা তাঁহার চিত্তকে ভাবিত করিয়া তুলিল। নারী-জাতির প্রতি সমবেদনায় তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের আদেশবাণী যাহা এতদিন তাঁহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ছিল, ক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া ধীরে ধীরে শাখাপল্লব বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার মনে পড়িত, 'মায়েদের বড় কষ্ট'—ঠাকুরের এই প্রাণস্পর্শী বাণী; মনে পড়িত, জীবের দুঃখে তাঁহার বিষণ্ণ বদন এবং ছলছল নয়ন। মাতৃজাতির সেবার কল্পনাকে অবিলম্বে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য গৌরীমা দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

অবশেষে তিনি দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ১৩০১ সালে (১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতার অনতিদূরে বারাকপুরের গঙ্গাতীরে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। গুরু-পত্নীর নামেই ইহার নামকরণ হইল "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম"।

আশ্রমের উদ্দেশ্য,—হিন্দুধর্ম্ম এবং সমাজের আদর্শ অনুযায়ী স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, এতদুদ্দেশ্যে শিক্ষাব্রতধারিণীদিগের একটি সংঘগঠন, সদ্বংশজাতা দুঃস্থা বালিকা ও বিধবাদিগকে আশ্রয়দান এবং আদর্শ-জীবনযাত্রার পথে নারীজাতিকে সহায়তাদান।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পরও গৌরীমার কর্ম্মপরিধি কেবল আশ্রমেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার ছিল পরিব্রাজিকার জীবন, আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমার মাহাত্ম্যপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা এবং বাঙ্গলার বাহিরে বিভিন্ন প্রদেশে গমন করিয়াছেন। তিনি যখনই যেখানে যাইতেন নরনারীকে উচ্চভাবে অনুপ্রাণিত করিতেন। *

তিনি বিশেষ করিয়া মাতৃজাতিকে নূতন আশা ও উৎসাহের বাণী শুনাইতেন। মাতাঠাকুরাণীর শিক্ষা ও আদর্শে তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেন। মাতা সারদেশ্বরী নারীর মুকুটমণি, নারীর চরম আদর্শ। এই মহান আদর্শের অনুশীলনই নারীর পরম সাধনা এবং ইহার সিদ্ধিতেই নারীজীবনের সার্থকতা,—ইহাই নারীজাতির প্রতি গৌরীমার সার কথা।

স্বামিজী পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে তাঁহার আরব্ধ কার্য্যভার স্বামী অভেদানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের উপর অর্পণ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং ১৩০৪(১৮৯৭)সালে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ (শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন) প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরের পদরজে পবিত্রীকৃত বলরাম-ভবনে এই প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হয়।

সেদিন গৃহী ও সন্ন্যাসিভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, "আমরা যাঁর নামে সন্ন্যাসী হয়েছি, আপনারা যাঁহাকে জীবনের আদর্শ কোরে সংসারাশ্রমে কর্ম্মক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁহার দেহাবসানের বিশ বৎসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতে তাঁহার পুণ্য নাম ও অদ্ভুত জীবনের

* "Gauri Ma's was a striking personality. She was what the Upanishads ask one to be—strong, courageous and full of determination. She passed through very hard experiences of life, but it is doubtful whether she wavered or faltered for a moment at any time. She did not know what it was to fear. Her very presence radiated strength and would infuse courage and hope into drooping spirits. She was all positive, there was nothing negative in her. She had a dynamism rare even amongst men". ("The Disciples of Sri Ramakrishna",—Advaita Ashrama).

আশ্চর্য্য প্রসার হয়েছে, এই সঙ্ঘ তাঁহারই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভুর দাস, আপনারা এ কার্য্যে সহায় হোন।" (৫)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও শিক্ষা প্রচার, জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে আত্মীয়তাস্থাপন, মানুষের ঐহিক ও পারমার্থিক উন্নতির উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান, আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবা ইত্যাদি লোককল্যাণকর ব্রতই হইল যুগাচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের উদ্দেশ্য।

পরবৎসর গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড়গ্রামে মঠের জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করা হয়। সকল দেশেই একটা কথা প্রচলিত আছে, স্বদেশে সাধু এবং সৎকার্য্য সহজে সমাদৃত হয় না। ভারতবর্ষে বেলুড়মঠ নির্ম্মাণেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধাশীলা বিদেশীয়া মহিলাদের মুক্তহস্তের দানই ছিল এই মহৎ কার্য্যের প্রথম ও প্রধান উপকরণ।

১৩০৫ সালে কালীপূজা-দিবসে স্বামিজীর প্রার্থনা অনুসারে মাতাঠাকুরাণী বাগবাজার হইতে গিয়া বেলুড়ে পদার্পণ করেন। বিপুল উৎসাহ এবং শঙ্খধ্বনি-সহকারে সন্তানগণ পরমারাধ্যা সংঘজননীকে শ্রীরামকৃষ্ণমঠের নিজস্ব ভূমিতে ভক্তিভরে অভ্যর্থনা করিলেন। মাতাঠাকুরাণী স্বয়ং শ্রীশ্রীকালীমাতা এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা সম্পন্ন করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে ঠাকুরের ভাবধারা প্রচার করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ জগতে নবযুগের অবতারণা করিয়াছেন, ঠাকুরের সন্তানগণের সহযোগিতায় তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য আজ দেশে দেশে বাস্তবে মূর্ত্ত হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে তাঁহাদের সেবাধর্ম্মের সাধনা।

ধর্ম্ম, জ্ঞান ও মৈত্রীর বাণীপ্রচার এবং দুঃখ, দৈন্য ও অভাব দূরীকরণ যাহাদের মূল মন্ত্র, তদনুরূপ লোককল্যাণব্রতের অনুষ্ঠান জগতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রসার লাভ করুক শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অপার করুণায়।

———

ডি. গাঙ্গুলীর সৌজন্যে

সন্তানবৎসলা

কলিকাতায় ১০।২ বোসপাড়া লেনে অবস্থানকালে দুইটি বিশেষ ঘটনা মাতাঠাকুরাণীর মনে গভীর রেখাপাত করে। প্রথমটি স্বামী যোগানন্দের দেহত্যাগ, ১৩০৫ সালের চৈত্র মাসে। যোগানন্দজী মায়ের শরণাগত শিষ্য ও সেবক। শত শত নরনারী মাতার নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছেন, কেহ কেহ তাঁহার সেবা করিয়াও কৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু যোগানন্দজীর মত নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত এমন ত্রুটিহীন সেবা আর কয়জন করিয়াছেন? কিসে মায়ের সুবিধা, কিসে তাঁহার সন্তোষ, তিনি অন্তরে তাহা বুঝিতে পারিতেন এবং তদনুযায়ী সেবা করিতেন।

তাঁহার উপর মাতার অত্যন্ত নির্ভর ও বিশ্বাস ছিল। পক্ষান্তরে, যোগানন্দজীও মাতার উপর নিতান্ত নির্ভরশীল ছিলেন, "যেমন বিড়ালীর ছানা, মা-বিনা জানে না।" তাঁহার প্রসঙ্গে মা বলিতেন,—ছেলে-যোগেনের গুণের কথা কত বলবো? যে-কাপড়খানি আমার পছন্দ, যে-শাকটি আমি ভালবাসি, যে-ফলটি আমার প্রিয়, কত কষ্টে তা' সংগ্রহ ক'রে আনতো। খাওয়া হ'য়ে গেলে আবার জিজ্ঞেস করতো,—আজ কেমন খেলেন মা? ভাল বললে, বাছা আমার ভারী খুশী হতো।

যোগানন্দ স্বামীর একটি কথা বলিয়া মাতা গর্ব্ব বোধ করিতেন। আর্থিক অসচ্ছলতাহেতু যোগানন্দজীর শেষসময়ে যথোচিত চিকিৎসা সম্ভব হইতেছে না, স্বামী ধীরানন্দ একদিন এইরূপ দুঃখ প্রকাশ করায়, যোগানন্দজী তাঁহাকে সহাস্যবদনে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন,—সুখদুঃখে আমাদের অধীর হ'লে চলবে কেন? আমরা সন্ন্যিসী, ভিক্ষুক, আমাদের তো ফুটপাথে প'ড়ে মরার কথা। তা' না হ'য়ে এখানে মা-ঠাকরুণের চরণাশ্রয়ে যে প'ড়ে আছি, এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হ'তে পারে ভাই?

এই প্রিয় সন্তানটির দেহত্যাগ হইলে মা অনেক কাঁদিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—ছেলে যোগেন তো হাসতে হাসতে ঠাকুরের কাছে চ'লে

গেল, আমার বুকটা যেন ছিঁড়ে গেল। নিজের পেটের ছেলের জন্যে মায়ের যে শোক হয়, আমার কষ্টের চেয়ে তা' কি আর বেশী গা ?

দ্বিতীয় আঘাত আসে কয়েকমাস পরেই, ছোটমামা অভয়চরণের অকালমৃত্যুতে। তিনি ছিলেন মাতাঠাকুরাণীর সর্ব্বকনিষ্ঠ সহোদর। অন্যান্য ভ্রাতাদের অপেক্ষা তিনি অধিক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। মাতার স্নেহও সমধিক পাইয়াছিলেন।

তৎকালে পল্লীগ্রামে সুচিকিৎসার বড়ই অভাব ছিল।* এইকারণে ছোটমামা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাতা ও তাঁহার সন্তানগণের পরামর্শ-অনুসারে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সন্তানগণ কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন, স্বামী যোগানন্দ ও শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় এই বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। অধ্যবসায়গুণে ছোটমামা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সংসারের অবস্থার উন্নতি হইবে, সকলেই এইরূপ আশা করিতেছিলেন; এমন সময়ে সকলের আশা-আনন্দ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল।

কাল বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হইলেন ছোটমামা। তিনি তখন কলিকাতাতেই ছিলেন, অন্তিমকালে সজলনয়নে সহোদরাকে বলেন,—দিদিগো, আমি চল্লুম, ওদের ওপর দয়া রেখো। সামান্য কয়েকটি কথায় অভয়চরণ পত্নী সুরবালা এবং তাঁহার গর্ভস্থ অনাগত সন্তানের সকল দায়িত্ব অভয়ার চরণে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

ছোটমামী দেখিতেছিলেন সুখস্বপ্ন, আর নির্ম্মম নিয়তি নিষ্ঠুর বজ্র হানিয়া চূর্ণ করিয়া দিল তাঁহার অন্তরের গর্ব্ব, ভূমিসাৎ করিল তাঁহার সুখের সংসার। কেবল-কি উপযুক্ত স্বামীই শোকসাগরে ভাসাইয়া গেলেন তাঁহাকে, অল্পকালমধ্যে তাঁহার আরও দুইজন নিকট আত্মীয়েরও মৃত্যু

---

* শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়কে লিখিত মাতাঠাকুরাণীর পত্র,—

* * * অভয় ডাক্তারি পড়িতে ইচ্ছা করে তাহা ডাক্তারি পড়িতে দিইবেন কারণ এ দেশে ডাক্তার নাই জাহাতে ভালরকম ডাক্তার হয় তাহা তুমি করিবেন * * * এখানে ধান্য হইয়াছে কোন কষ্ট হইবেক নাই

হইল। ফলে, এই সন্তানসম্ভবা দুঃখিনী বালিকাবধূ হৃদয়ের স্থৈর্য্য এবং মস্তিষ্কের প্রকৃতিস্থতা সবই হারাইলেন।

ছোট্‌মামার মৃত্যুর পর বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য মাতাঠাকুরাণী দেশে গমন করেন। ১৩০৬ সালে মাঘ মাসে সুরবালার এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়; তাহার নাম রাখা হইল রাধারাণী। অভয়চরণ তাঁহার পত্নীর গর্ভস্থ শিশুর সকল ভার লইতে অন্তিমকালে মায়ের চরণে যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, রাধারাণী জাত হইবামাত্র মা তাহার দায়িত্ব গ্রহণপূর্ব্বক অভয়চরণের সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; দুঃখিনী সুরবালাকেও করুণাময়ী মাতা তাঁহার স্নেহাশ্রয় হইতে বঞ্চিত করেন নাই।

এইসময়ে একদিন জয়রামবাটীর জমিদার শম্ভুনাথ রায়ের কন্যা শ্রীমতী সরোজবাসিনী* মাকে প্রথম দর্শনের সুযোগ লাভ করেন। তিনি বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপরায়ণা, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী। পরমহংস মহাশয়ের পরিবারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পূর্ব্বেই হইয়াছিল; কিন্তু তৎকালে বাড়ীর বাহিরে তাঁহাদের যাতায়াত সীমাবদ্ধ ছিল, বিশেষতঃ প্রজার বাড়ীতে যাইবার রীতি ছিল না।

বিবাহান্তে দেবী সিংহবাহিনীকে দর্শন করিবার সুযোগে সরোজবাসিনী মাতাঠাকুরাণীকেও দর্শন করিলেন। মায়ের চরণে বালিকা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন, মাতাও তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই সুলক্ষণা বালিকাকে দেখিয়াই মাতার চিত্ত প্রসন্ন হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—তুমি কাদের মেয়ে গা? উত্তরে, শম্ভুনাথের কন্যা জানিয়া মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিয়াছিলেন,—মেয়েটির ভক্তির লক্ষণ আছে। একে দিয়ে সাধুসন্তদের সেবা হবে, মেয়েটি ভাগ্যবতী।

মায়ের আশীর্ব্বাদ সরোজবাসিনীর জীবনে পরিপূর্ণভাবে সফল হইয়াছে।

---

* বেলিয়াঘাটার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলে মহাশয়ের পত্নী।

এইবার বৎসরাধিককাল দেশে বাস করিবার পর ছোটমামী, রাধারাণী প্রভৃতিকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় আসিয়া ১৬নং বোসপাড়া লেনের ভাড়াটিয়া বাটীতে অবস্থান করিতে থাকেন।

মায়ের এক অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। আবালবৃদ্ধ যে-কেহ একবার তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছে, তাঁহার অহেতুক স্নেহ ও আকর্ষণ জীবনে ভুলিতে পারে নাই। দক্ষিণ-কলিকাতার এক ব্রাহ্মণকন্যা শৈশব হইতেই মায়ের দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করে। মাকে তাহার এত ভাল লাগিত যে, আত্মীয়পরিজনের সঙ্গে যখন-তখন সে মায়ের বাড়ীতে চলিয়া আসিত তাঁহার দর্শনের জন্য। মধ্যে মধ্যে মায়ের নিকট রাত্রিযাপনও করিত। মাতাও তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

একদিন সে মাতামহীর নিকট শুইয়া আছে, ঠাকুরদেবতার গল্প করিতে করিতে মাতামহী বলেন,—ভক্তি হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায়।

ভক্তি যে কি বস্তু, সে জ্ঞান তখনও কন্যার হয় নাই, প্রশ্ন করিল,—ভক্তি কোথায় পাওয়া যায় দিদিমা?

—সেই-যে পরমহংস মশায়ের পরিবার, তাঁর কাছে আছে। তিনিই ভক্তি দিতে পারেন

কন্যার মনে কৌতূহল জাগে, ঐ বস্তুটি পাইতে হইবে।

দ্বিতীয় সহোদর তাহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহাকে সে পরদিবসই বলিল,—সেই মায়ের কাছে নিয়ে চল, ভক্তি আনতে হবে। কথা শুনিয়া তিনি তো প্রথমে খুব হাসিতে লাগিলেন, পরে তাহার আবদারে স্বীকৃত হইলেন। মাকে তিনিও ভক্তি করিতেন, ভাবিলেন, ভগ্নীকে উপলক্ষ করিয়া তাঁহারও মাতৃদর্শন হইবে।

দুইজনে ভবানীপুর হইতে বোসপাড়া লেনে মাতাঠাকুরাণীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মা তখন সবেমাত্র ঠাকুরঘর হইতে বাহিরে আসিয়াছেন, কন্যা প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেল, ছুটিয়া গিয়া মায়ের বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বলিল,—তোমার কাছে না-কি ভক্তি আছে, আমায় দাও।

শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে বলেন,— ওমা, এ খুদেভক্ত বলে কি গো! আমার কাছে যে ভক্তি আছে, কে বলেছে তোমায়?

—দিদিমা-যে বললে, তোমার কাছে আছে।

গিরিশচন্দ্রের ভগ্নী ন'দিদি এবং যোগেনমার গর্ভধারিণী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন,—শক্ত ক'রে ধরো খুকি, মা-ঠাকরুণের কাছেই ভক্তি আছে। মায়ের বস্ত্রাঞ্চল সে আরও শক্ত করিয়া ধরিল এবং একেবারে গাত্রসংলগ্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আচ্ছা, দাঁড়া বাপু, এনে দিচ্ছি; এই বলিয়া মা ঠাকুরঘর হইতে একখানি প্রসাদী অমৃতি-জিলিপি আনিয়া কন্যার হাতে দিলেন।

ভক্তিপ্রাপ্তির কাহিনী ততক্ষণে প্রচার হইয়া গিয়াছে। অনেকে আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাহাকে ঘিরিয়া সকলেই ভক্তির জন্য হাত পাতিলেন; এ বলে,—দিদি, আমায় একটু দাও; ও বলে,— খুকি, আমায় একটু দাও। মা-ঠাকরুণ তোমায় ভক্তি দিয়েছেন, আমাদের সবাইকে ভাগ দিতে হবে।

এই অবস্থার জন্য কন্যা আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সকলকে কিছু কিছু ভাগ দিয়া নিজে একটু গ্রহণ করিল এবং অবশিষ্ট একটু রাখিয়া দিল।

একদিন মায়ের বাড়ীতে দীর্ঘকায়া শ্যামাঙ্গী এক বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার হাতে কয়েকটি ফল। তাঁহাকে দর্শনমাত্র মাতাঠাকুরাণী কক্ষের বাহিরে গিয়া আপ্যায়িত করিলেন,— মা এসেছ! এসো, এসো। কতদিন তোমায় দেখিনি, কেমন আছ মা? বৃদ্ধাকে মা প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে, তিনি ত্রস্তভাবে পিছাইয়া গিয়া বলিলেন,— এখনো বেটীর আমাকে ফাঁসাবার বুদ্ধি গেল না! যে বাপের নাম আমি জপি, সেই বাপ যে দিবানিশি তোমার নাম জপেন। আর আমাকেই তুমি চাও কি-না প্রণাম করতে! এই বলিয়া তিনি মাতাঠাকুরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিতে নত হইলেন। মা শিশুর ন্যায় আবদারের সুরে বলিলেন,— না, না, তোমার প্রণাম নিতে পারবো না আমি। সে কিছুতেই হবে না।

অতঃপর বৃদ্ধা ঠাকুরের পটের সমক্ষে উপবিষ্ট হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—বাবা, এত দয়া তোমার! এ আবাগীকে 'মা' ব'লে উদ্ধার করলে! আর কেন? এবার টেনে নাও কাছে।

মায়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি ঠাকুরের কিছু আদেশ পেয়েছ মা? মা বলিলেন,—তুমি কিছু পেয়েছ? ভাষায় আর অধিক কিছু নহে, নয়নে নয়নে তাঁহাদের কিছু বার্ত্তা বিনিময় হইল।

বৃদ্ধাকে মা এইদিন ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন,—এ তো ভাগ্যের কথা বৌমা! ঠাকুর খাবেন, তুমি খাবে; তারপর তোমাদের পেসাদ আমি পাবো। এই যদি তুমি দাও, তবে ব'সে রইলুম।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মা বলিলেন,—আমারটা কি ক'রে হবে? তুমি যে শাশুড়ী। তুমি ঠাকুরের পেসাদ পাবে।

এই বৃদ্ধার নাম রমণী। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ইঁহাকেই মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

আর এক দিবস এই বৃদ্ধা আসিয়া মাকে প্রণাম করিলেন। অন্য-মনস্কতা অথবা যে-কারণেই হউক, এই দিবস মাতাঠাকুরাণী তাঁহার প্রণাম গ্রহণে কোন আপত্তি করেন নাই। ইহাতে রমণীর আনন্দ আর ধরে না।

উদ্দীপনাবশে তিনি বলিতে লাগিলেন,—বৌমা, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর যেমন লীলা করেছিলেন, এখন যে তুমি তেমনি ভাবে জীব তরাচ্ছ গো। তোমার লীলা দেখতে আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে ছুটে এসেছি।

—পরশু রাত্রে কাঁদছিলুম, ঠাকুর, কত কাল তোমার কাছ-ছাড়া হ'য়ে আছি। কবে আবার যাবো তোমার কাছে, তেমনি ক'রে তোমায় দেখতে পাবো? ঠাকুর বললেন, তোমার ভেতর দিয়েই এখন তিনি লীলা কচ্ছেন। তোমায় এসে দেখলেই আমার দুঃখু ঘুচবে। ওগো, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন,—যা, ওর কাছে যা, গেলেই আনন্দ পাবি। তাই আজ তোমার কাছে ছুটে এলুম মা।

বৃদ্ধাকে শ্রান্ত বোধ হইতেছিল। মাতাঠাকুরাণী একখানি পাখা লইয়া

আসিলেন, কিন্তু বৃদ্ধা অতিশয় তৎপরতার সহিত তাহা হস্তগত করিলেন এবং মাকে বাতাস করিতে করিতে কাতরভাবে বলিলেন,—মাগো, এখন পথ খুলে দে, ছেলের কাছে চ'লে যাই।

তিনি কি আর কিছু বাকী রেখেছেন? মা একটু হাসিয়া বলিলেন।

বৃদ্ধা চলিয়া গেলে মা বলিলেন,—ভগবানের করুণা যখন আসে, তখন তা' উত্তম অধম বিচার করে না।

আর একদিন এক সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধা যষ্টিভর করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন মাতাঠাকুরাণীর বাটীতে। বৃদ্ধার মুখশ্রীতে সরলতা ও পবিত্রতার জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে। মা প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে বৃদ্ধা তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন।

ইনি গোপালের মা। ক্ষণকাল বিশ্রামান্তে বস্ত্রাঞ্চল হইতে তিনি একটি ফুলের মালা ও কিছু ফলমিষ্টি বাহির করিয়া বলিলেন,—গোপালকে দিও বৌমা। আর শোন, আজ আমি একখানি তরকারী রেঁধে দেবো, তুমি গোপালকে খাইয়ো।

মায়ের বাটীতে তখন যে উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ পাচকের কার্য্য করিতেন, তিনি অত্যন্ত আচারসম্পন্ন ছিলেন। গোপালের মা রন্ধন করিতে গেলে, তিনি আপত্তি করিতে পারেন, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া মা বুঝাইয়া বলিলেন,—ইনি ঠাকুরের মা। আজ একখানি তরকারী রাঁধবেন, তুমি একটু ব্যবস্থা ক'রে দিও। ব্রাহ্মণ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন।

রন্ধন করিতে করিতে বৃদ্ধা স্বগতঃ বলিতে লাগিলেন,—গোপাল তুমি এটা খেতে ভালবাস, তুমি ওটা খেতে ভালবাস। রন্ধনান্তে মাকে বলিলেন,—বৌমা, তুমি কাছে ব'সে আমার গোপালকে খাইয়ো। আর বলো, আমি এসব রেঁধে দিয়েছি, গোপাল যেন খায়। তুমি যা' বলবে, গোপাল তাই শুনবে।

ভোগ নিবেদনান্তে মা যখন পূজাকক্ষের বাহিরে আসিলেন, বৃদ্ধা প্রশ্ন করিলেন,—হ্যাঁ বৌমা, গোপাল কি বললে, রান্না কেমন হয়েছে?

মৃদুহাস্যে মা বলিলেন,—আপনার রান্না চমৎকার! খেয়ে ঠাকুর খুব খুশী হয়েছেন।

বহু নরনারী যেমন মায়ের বাটীতে আসিতেন, সন্তানগণের ব্যাকুল আমন্ত্রণে সময় সময় মা-ও তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন। বিশেষতঃ ঠাকুর যে-সকল ভক্তের গৃহে গমন করিয়াছেন, সেইসকল স্থানে গিয়া মা পরম সন্তোষ লাভ করিতেন।

এইস্থানে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।—

শ্যামবাজারনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় একবার ঠাকুরকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী বগলামণি দেবীর প্রস্তুত পরমান্ন ঠাকুর স্বয়ং উপযাচক হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন। বগলা দেবীর ইহা ছিল পরম গর্ব্ব। গৌরীমার আশ্রমে আসিয়া তিনি সেইকালের কথা আমাদিগকে শুনাইয়া আনন্দ পাইতেন, আমরাও শুনিয়া ধন্য হইতাম।

মাতাঠাকুরাণীকে স্বভবনে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতে তাঁহার বাসনা হইল। রামলালদাদাকে একদিন তিনি মনের অভিলাষ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া মা সহজেই তাঁহার নিমন্ত্রণে স্বীকৃত হইলেন। রামলালদাদা, লক্ষ্মীদিদি, শিবরামদাদা এবং দুই-তিন জন সাধুসেবকও মায়ের সঙ্গে তথায় গমন করেন। গৃহকর্ত্রী মাতার পদ ধৌত করিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন এবং একখানি নূতন বস্ত্র ও পুষ্পমাল্যে মাকে ভূষিত করিলেন। ঠাকুর যে-স্থানে বসিয়াছিলেন, ঠিক সেইস্থানেই আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

বগলা দেবী ছিলেন অতিশয় আচারসম্পন্না বিধবা, তিনি গঙ্গাজলে রন্ধন করিলেন। নানাবিধ ভোজ্য, পিষ্টক এবং পরমান্ন প্রস্তুত হইল। তাঁহার ভক্তি এবং আন্তরিকতায় সকলেই প্রসন্ন হইলেন।

লক্ষ্মীদিদি বলিয়াছিলেন,—অনেক জায়গায় গেছি, অনেক জায়গায় নেমন্তন্ন খেয়েছি। খুড়ীমার সঙ্গে এ ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে যেমন আদরযত্ন, আর পেসাদ পেলুম, তা' অনেককাল মনে থাকবে।

রায় বাহাদুর মাধবচন্দ্র রায়ের পত্নী সাধিকা কেশবমোহিনী দেবীর আমন্ত্রণে একবার রাসপূর্ণিমার দিনে মাতাঠাকুরাণী মধ্য-কলিকাতায় ইটালিতে তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করেন। অনেক নরনারী এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন এবং সমস্তদিবসব্যাপী আনন্দোৎসব হয়।

সেদিন জপের প্রসঙ্গে জনৈকা ভক্তিমতীর প্রশ্নের উত্তরে মা বলেন, —ছুপুরের পূর্ব্বেই জপ সারবে, তা' নইলে ইষ্টকে উপবাসী রাখা হয়। ইষ্টকে উপবাসী রাখতে নেই। তিনি চান, ভক্ত নিয়মমত নাম জপ করুক; এই জপই তাঁর ভোজ্য। মানসে ভোগ দিলে, বাতাস করলে, আরতি করলেও ইষ্ট প্রসন্ন হ'ন।

ঠাকুরের ভক্ত কালীপদ ঘোষের বাটীর মহিলাগণ একদিন মাতা-ঠাকুরাণীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তদনুযায়ী মা, সারদানন্দজী এবং আরও কতিপয় সাধু তাঁহাদের গৃহে গিয়াছিলেন। তথায় কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান হয়, কন্যাগণ গীতার অংশবিশেষ এবং মোহমুদ্গর আবৃত্তি করেন। লক্ষ্মীদিদি পালাকীর্ত্তন গাহিয়াছিলেন। ঐদিন তিনি বৃন্দারাণীর অভিনয় করেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে মথুরা হইতে ফিরাইয়া আনিতে যাইবেন, বৃন্দারাণী শ্রীরাধার উদ্দেশে হাত দোলাইয়া বলিতেছেন, 'আমি প্রভুকে আনতে যাই।' আবার মাতাঠাকুরাণীর সম্মুখে হাত দোলাইতে দোলাইতে বলিতেছেন, 'আমি রামকৃষ্ণকে আনতে যাই।'

তাহার পর মথুরায় যাইয়া বিরহবিধুরা ব্রজমায়ীদিগের মর্ম্মবেদনার বর্ণনা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে কাতর মিনতি জানাইলেন,—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর, দিনেক ছুয়ের মত,
তোমার মা যশোদা পিতা নন্দ কেঁদে হল গত।"...

লক্ষ্মীদিদির ভাবমধুর কীর্ত্তনশ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আনন্দময়ী লক্ষ্মীদিদি যখন যেখানে যাইতেন, এইভাবে সকলকে আনন্দ দিতেন। কোন কোন দিন অলঙ্কার এবং

বেশভূষায় সজ্জিত হইয়াও কীর্ত্তনাভিনয় করিতেন। অধিকন্তু, তিনি একাই বিভিন্ন ব্যক্তির ভূমিকায় বিভিন্ন স্বরে অভিনয় করিতে পারিতেন।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসু[১] লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীমার বাড়ী তখন তৈয়ারী হয় নাই। শ্রীশ্রীমা আসিয়া ৫৭নং বাগবাজারে[২] থাকতেন। বাড়ীতে হৈ হৈ, পবিত্র আবহাওয়া। * * * কি আনন্দের দিনই গেছে। বাড়ীর ভিতর সেই লক্ষ্মীদিদির উদ্ধব সংবাদ, বৃন্দাবনলীলা। একাই লক্ষ্মীদিদি শ্রীকৃষ্ণ, বিন্দেদূতী, উদ্ধব, রাধারাণী, শিঙ্গাফুকার ইত্যাদি দেখাইয়া কত আনন্দ দিতেন। পূজনীয়া গৌরপিসিমা কি সুন্দর গান গাহিতেন, * * * অতি সুকণ্ঠী ছিলেন।"

কৃষ্ণচন্দ্র বসু বলরাম বসুদের জ্ঞাতি, কিন্তু তাঁহাদিগের পৃথক বাটী, পৃথক গুরু। মাতাঠাকুরাণীর প্রতি তাঁহাদেরও গভীর ভক্তি। এই পরিবারের মায়েদের আকাঙ্ক্ষা, মা একদিন তাঁহাদিগের গৃহে পদার্পণ করিয়া দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন কি-না, ইহা লইয়া জল্পনা চলে।

অবশেষে তাঁহাদিগের আবেদন একদিন মাতার শ্রুতিগোচর হইল, মাতা তাঁহাদের কুণ্ঠার কথাও শুনিলেন; আশ্বাস দিয়া তিনি বলেন,—কেন যাবো না? সব্বাই আমার ছেলে, না-ই-বা নিলে মন্ত্র, গুরু কি আলাদা? শিবের গুরু জগন্নাথ, আবার জগন্নাথের গুরু শিব; গুরু সব এক।

এমন উদার মতবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে মহা-উৎসাহে তাঁহারা পত্রপুষ্পে গৃহ সুসজ্জিত করিলেন। গুরু, পুরোহিত, আত্মীয়, প্রতিবেশীদেরও নিমন্ত্রণ করিলেন। যথাকালে মাতাঠাকুরাণী অনেক ভক্তসহ গিয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ হইল তাঁহাদের গৃহ, যেন শারদীয়া পূজার মহোৎসব।

---

১. স্বামী প্রেমানন্দজীর ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বসু, আই.সি. এস, জেলা-জজের পত্নী।

২. বাগবাজারে ৫৭নং রামকান্ত বসু ষ্ট্রীটে বলরাম বসুর বাটীতে।

গৃহদেবতা রাধাকৃষ্ণের পূজা ও ভোগারতি হইল। নানাবিধ ভোজ্যের আয়োজন হইয়াছিল, সকলে পরিতৃপ্তি-সহকারে প্রসাদ পাইলেন।

প্রত্যাগমনের প্রাক্কালে মাতাঠাকুরাণী গৃহকর্ত্রীকে বলেন,—তোমরা আমায় এতদিন দূরে রেখেছিলে, তোমাদের এখানে এসে আজকের দিনটি বেশ আনন্দে কাটলো।

নারীপুরুষ সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া মাকে প্রণাম করিলেন। কুলগুরুর পত্নীও প্রণাম করিলেন, ইহাতে বড়ই সঙ্কোচ বোধ করিয়া মা বলেন,—ওমা, একি কাণ্ড! আপনার দণ্ডবৎ নিতে নেই, আপনি যে গুরুমাতা!

আর, আপনি যে জগন্মাতা, উত্তর দিলেন কুলগুরু।

কাশীমিত্রের ঘাটে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার নাম রামদয়াল চক্রবর্ত্তী। ঠাকুরের সহিত বলরাম বসুর যোগাযোগ স্থাপনে তিনিই সহায়তা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অতিশয় ভক্তিমান। প্রাণে তাঁহার একান্ত অভিলাষ—মাতাঠাকুরাণী যদি কৃপা করিয়া একদিন তাঁহার কুটীরে পদধূলি দেন। দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু সাহস করিয়া কাহাকেও বলিতে পারেন না। শুনিলে লোকে হয়তো উপহাস করিবে, বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার দুরাশা কেন?

কিন্তু মন মানে না। অবশেষে সাহস করিয়া একদিন তিনি গোলাপ-মার নিকট মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গোলাপমা ব্রাহ্মণের কাতর প্রার্থনা নিবেদন করিলেন মায়ের নিকট। ভক্তের আকুলতায় মায়ের প্রাণ বিচলিত হইল,—আহা, ঠাকুরের ভক্ত, একদিন চল-না গোলাপ, যাই।

তাঁহার কুটীরে ভগবতীর শুভাগমন হইবে ভাবিয়া ভক্ত রামদয়াল আনন্দে অধীর হইলেন। মাতৃপূজার জন্য তিনি যথাশক্তি আয়োজন করিলেন, নানাবিধ উপচার সংগ্রহ করিলেন। যাঁহার উপর মায়ের কৃপা হয়, তাঁহার উপর সকলেই প্রসন্ন। এই উপলক্ষে গোলাপমা তাঁহার বাড়ীতে গিয়া নানাভাবে সাহায্য করিলেন, গৌরীমা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা

হইলেন। শাকসুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মালপোয়া পরমান্ন ইত্যাদি বহুবিধ ভোজ্য প্রস্তুত হইল।

মাতাঠাকুরাণী ব্রাহ্মণের কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; সঙ্গে যোগেনমা, কালিদাসী, অসীমের মা এবং আরও কয়েকজন ভক্তিমতী; রাধারাণীসহ তিন-চারিজন কুমারীও ছিল। স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ডাক্তার প্রিয়নাথও গিয়াছিলেন। অপ্রত্যাশিত ভক্ত-সমাগমে ব্রাহ্মণের আনন্দের সীমা রহিল না।

মাতাঠাকুরাণীর চরণে ব্রাহ্মণ একখানি গরদের বস্ত্র উৎসর্গ করিলেন, কুমারীদিগকেও একখানি করিয়া সাড়ী দিলেন। ভক্তের আন্তরিকতায় সমস্ত ভোজ্য, সমস্ত ব্যবস্থাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। যাঁহার তৃপ্ত্যর্থে এই আয়োজন, তিনি হইলেন অতিপ্রসন্না।

বিদায়কালে করুণাময়ী মাতা ব্রাহ্মণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাতার স্নেহস্পর্শ পাইয়া সন্তান আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, দুই গণ্ডে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। ভক্তিগদগদ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, —জগদম্বা, আপনার যে এত কৃপা হবে, আগে তা' বুঝতে পারিনি। আমি কৃতার্থ হলুম।

স্বামী বিবেকানন্দের আমন্ত্রণে মাতা ১৩০৮ সালে বেলুড়ে দুর্গাপূজায় উপস্থিত হইলেন। ইহাই মঠে প্রথম দুর্গোৎসব। মায়ের অনুমতি লইয়া পূজার ব্যবস্থা এবং তাঁহার নামেই সংকল্প হয়। মঠপ্রাঙ্গণে বিরাট সুরম্য মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছিল। মায়ের উপস্থিতিতে বিপুল উৎসাহ এবং আনন্দের মধ্যে মহাপূজা সুসম্পন্ন হয়। মায়ের নির্দ্দেশে দেবীপূজায় জীববলি বন্ধ থাকে।

স্বামিজীর অনুরোধে গৌরীমা কুমারীপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পাদ্য-অর্ঘ্য-শঙ্খবলয়-বস্ত্রাদি সহযোগে স্বামিজী স্বয়ং নয়জন অল্পবয়স্কা কুমারীর পূজা করেন।* এইসকল জীবন্ত প্রতিমার চরণে অঞ্জলি এবং

* কৃষ্ণময়ীদিদি (রামলালদাদার জ্যেষ্ঠকন্যা) বলিয়াছেন,—উক্ত কুমারীগণের

তাঁহাদের হাতে মিষ্টান্ন, দক্ষিণাদি প্রদান করিয়া স্বামিজী তাঁহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করেন। একজন কুমারী এতই অল্পবয়স্ক ছিলেন এবং পূজাকালে এমনই ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কপালে রক্তচন্দন পরাইবার সময় স্বামিজী শিহরিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন,—আহা, দেবীর তৃতীয় নয়নে আঘাত লাগেনি তো!

এইসময় হইতে পূর্ব্বপরিচিত ভক্তগণ ব্যতীত অনেক অপরিচিত নরনারীও মাতার উপদেশ এবং কৃপা লাভের আশায় আসিতে থাকেন।

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সঙ্গতিপন্ন এবং সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণ বীরনগরে বাস করিতেন। মা-ভবানীর প্রতি ছিল তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি" এই স্তবটি তিনি প্রত্যহ ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন। তৎকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের কথা কলিকাতার বাহিরেও প্রচারিত হইয়াছে, মধুসূদনও তাঁহার লোকোত্তর জীবনের কথা শুনিয়াছেন। তিনি ভাবিতেন, পরমহংস মহাশয় যদি অবতার পুরুষ হ'ন, তবে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিশ্চয়ই জগন্মাতা—মা-ভবানী। পরমহংস মহাশয়কে দর্শন করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয় নাই, মাতা-ঠাকুরাণীর চরণদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য; তাঁহার মনে এই চিন্তা চলিতে থাকে। ক্রমে মাতাকে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার প্রবল হইয়া উঠে।

মাতাঠাকুরাণী তখন বলরাম-ভবনে অবস্থান করিতেছিলেন, ব্রাহ্মণ ঐ বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন, কিন্তু দর্শনের সুযোগসুবিধা ঘটিয়া উঠে না। এইরূপ অবস্থায় একদিন স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই ব্রাহ্মণ

মধ্যে তাঁহার কনিষ্ঠা রাধারাণীও অন্যতম ছিলেন। মাতাঠাকুরাণী এইদিন কৃষ্ণময়ী-দিদিকে এবং আরও কয়েকজন সধবাকেও 'এয়োরাণী-পূজা' করেন। সমবেত কোন কোন ভক্তিমতী মহিলাও তাঁহাদিগকে এয়োরাণী-পূজা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে কৃষ্ণময়ীদিদি ও তাঁহার কনিষ্ঠার প্রচুর সাড়ী, দক্ষিণা এবং নানাবিধ দ্রব্য লাভ হইয়াছিল।

মা-ঠাকরুণের স্নেহাস্পদা জনৈকা কন্যার স্বামী। পরিচয় জানিয়া মহারাজ সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন,—আরে, তুমি-যে আমাদের জামাই হে! এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মায়ের চরণে প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণ স্বীয় অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিলেন,—মা, আপনি ইচ্ছাময়ী, আমার প্রাণের বাসনা আপনি তো জানেন। আমার যেন কাশীপ্রাপ্তি হয়, মা-ভবানীর চরণে যেন স্থান পাই।

মা কহিলেন,—ষাট্ ষাট্, সবেমাত্র বিয়ে করেছ, আমার মেয়ে রয়েছে, এখুনি কাশীপ্রাপ্তি হ'লে চলবে কেন? বেঁচে থেকেই মায়ের নাম কর বাবা।

অতঃপর একদিন মধুসূদনের পত্নী মাতৃদর্শনে আসিলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই এই কন্যা মাতার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কন্যা যেমন রূপবতী, তেমনই বিদুষী। তিনি বয়সে তরুণী, কিন্তু পতি ছিলেন প্রৌঢ়। সন্তানবৎসলা মাতা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিবার কালে বলিয়া ফেলিলেন, —আহা, বুড়ো বেঁচে থাক, তোমার নোয়াগাছটা বজায় থাকুক।

ইহাতে ব্যথিত হইয়া কন্যা বলেন,—ওঁকে বুড়ো বললে, আমার বড়ো কষ্ট হয় মা। বাপ-মা যাঁর পায়ে সঁপে দিয়েছেন, তিনিই আমার নারায়ণ। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন মা, ওঁকে রেখে আমি যেন মরতে পারি।

ব্যথাক্লিষ্টা কন্যার মস্তক টানিয়া লইলেন মাতা নিজক্রোড়ে। নিকটে উপবিষ্ট নিত্যানন্দ বসুর মাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—দেখলে গো, আমার মেয়ের সুবুদ্ধি! যেই ওর বরকে বুড়ো বললুম্, অমনি কেঁদে ফেললে। বলে কি-না, ওঁকে বুড়ো বলো না মা। এরা হচ্ছে জাতকাঠের সতী। এদের জন্যেই আজও ধম্ম রক্ষে হচ্ছে, চন্দ্রসূয্যির উদয় হচ্ছে।

আরও কয়েকবৎসর পরের কথা।

মায়ের সেই সাধ্বী শিষ্যা বৃদ্ধ পতিকে রাখিয়া সাবিত্রীলোকে গমন করিয়াছেন। মাতৃসাধক ব্রাহ্মণ আত্মীয়পরিজন এবং বিষয়সম্পত্তির মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া মায়ের নিকট পুনরায় একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।

এইবার মাতা তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করিলেন এবং ভক্তসন্তান কাশীধামে যাইয়া মা-ভবানীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

জীর্ণবাস এক দরিদ্র সন্তান অপরাজিতার একটি মালা লইয়া মায়ের বাটীর দ্বারে একদিন উপস্থিত হইলেন। লোকমুখে তিনি শুনিয়াছিলেন, পরমহংসদেব ভগবান, আর তাঁহার সহধর্ম্মিণী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। সেই অন্নপূর্ণাদর্শনে জীবন সার্থক করিবার আশায় তিনি হাওড়া জিলার আমতা গ্রাম হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন উত্তর-কলিকাতায়।

জনৈক সেবক জানাইলেন,—এখন তো মা-ঠাকরুণের দর্শন হবে না।

দর্শনার্থী বলেন, বহুদূর হইতে অনেক আশা করিয়া তিনি আসিয়াছেন, একবার মাতৃদর্শন না পাইলে তিনি স্থানত্যাগ করিবেন না। জানিতে চাহিলেন, কখন মায়ের দর্শন পাওয়া যাইবে; তথাপি সেবকদিগের নিকট সদুত্তর না পাইয়া তিনি নিরুপায় হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন। ইহা লইয়া বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়।

সেবক বলেন,—মা-ঠাকরুণের দর্শন পাওয়া কি এতই সহজ?

ব্যর্থকাম সন্তান তখন মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত। আহারান্তে মা বিশ্রাম করিতে যাইবেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—এখানে এত গোলমাল কিসের? আগন্তুকের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—কি চাও বাবা, তুমি?

কাঙ্গাল সন্তান অশ্রুসিক্তনয়নে বলিতে লাগিলেন,—আমার দুঃখের কথা কি আর বলবো মা? আমতা থেকে এতদূর হেঁটে এসেছি একটি অপরাজিতার মালা নিয়ে। শুনেছিলুম, এখানে মা অন্নপূর্ণার দর্শন পাওয়া যায়। সাধ ছিল, তাঁর গলায় এই মালাটি পরাবো; ১০৮টি অপরাজিতা মা অন্নপূর্ণাকে দিলে না-কি সকল সিদ্ধিলাভ হয়। কিন্তু এরা বলছেন,—সারাজীবন তপস্যা করলেও অন্নপূর্ণার দর্শন আমি পাবো না। ইহা বলিয়া তিনি পুনরায় শিশুর ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

এই পরিস্থিতিতে সেবকগণ অপ্রস্তুত হইলেন। কাহারও মুখে কোন কথা নাই। মাতাঠাকুরাণী আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাবা, তুমি কি এখুনি মাকে দেখতে চাও?

গরীবের প্রতি মায়ের এত কৃপা কি হবে? আমি কি তাঁর দেখা পাবো মা? করজোড়ে ব্যাকুল হইয়া বলেন সন্তান।

মা তাঁহার দিকে সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,—দীনদুঃখীরাই তো মাকে আগে পায় বাবা।

নিমেষের ব্যাপার! ভক্তটি কি দর্শন করিলেন, কি তাঁহার অনুভূতি হইল, তাহা তিনিই জানেন; অকস্মাৎ তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—এ-ই-বা-র চিনতে পেরেছি গো, তুমিই আমার অন্নপূর্ণা মা। এই বলিয়া তিনি অপরাজিতার মালাটি এবং একটি সুপক্ব বিল্বফলও কম্পিতহস্তে মাকে অর্পণ করিলেন। মা হস্ত প্রসারিত করিয়া তাঁহার মালা ও ফল সানন্দে গ্রহণ করিলে ভক্তসন্তান ভূলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

মা তাঁহাকে সান্ত্বনা এবং প্রসাদ দিয়া শান্ত করিলেন।

আহীরিটোলা হইতে অত্যন্ত দরিদ্র এক ভক্তদম্পতি মায়ের নিকট আসিতেন। তাঁহারা উভয়েই মাতাঠাকুরাণীর আশ্রিত। কতদিন তাঁহারা দেখিয়াছেন,—কেহ মূল্যবান বস্ত্রাদি দ্বারা, কেহ বহুবিধ ফলমিষ্টান্ন দ্বারা মায়ের সেবা করেন। আবার কোন কোন ভাগ্যবান তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে মহোৎসব করেন। তাঁহারা ভাবেন, এই ভক্তগণের কী সৌভাগ্য! আহা, এমন সৌভাগ্য যদি আমাদের হইত! জগজ্জননীকে যদি আমরাও একদিন সামান্য ফলমিষ্টান্ন কিছু, অল্পমূল্যের একখানি বস্ত্রদ্বারাও সেবা করিতে পারিতাম!

একদিন মাতাঠাকুরাণীর চরণপ্রান্তে এই ভক্তদম্পতি বিমর্ষচিত্তে বসিয়া আছেন, মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন নাই, কিন্তু অন্তর্যামিনী মাতা তাহা অনুভব করিয়া বলিলেন,—পরে যেদিন আসবে, পাঁচ পয়সার রসমণ্ডী নিয়ে এসো তো! রসমণ্ডী খেতে ইচ্ছে হয়েছে

ভক্তদম্পতি বুঝিতে পারেন এই ইঙ্গিত। সন্তানের ব্যথায় মাতা ব্যথিত হইয়াই মাত্র পাঁচ পয়সার রসমণ্ডী চাহিতেছেন, তাঁহাদেরই সন্তোষের জন্য। বাষ্পাকুল হইয়া উঠে তাঁহাদের নয়নদ্বয়। মাতা সান্ত্বনা দিয়া বলেন,—তোমাদের ভালবাসাকে কেন ছোট ক'রে দেখছো? খাওয়াটাই কি সব? খাওয়া ফুরিয়ে যায়, ভালবাসা অক্ষয় হ'য়ে থাকে।

পরদিবস স্নানান্তে পরমভক্তি-সহকারে পাঁচ পয়সার রসমণ্ডী লইয়া তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া দুই-চারিটি মাতা স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদিগকেও দিলেন, অবশিষ্ট উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া বলিলেন,—ভক্তের দান, বড়ই পবিত্র।

বিনোদবিহারী সোম নামে জনৈক ব্যক্তি ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরাণীর দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। ভক্তগণের নিকট তিনি পদ্মবিনোদ নামে পরিচিত। স্বামী সারদানন্দকে তিনি দোস্ত বলিয়া ডাকিতেন। পদ্মবিনোদ সুরাপায়ী, মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রিতে আসিয়া মায়ের বাটীর সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতেন।

মাতাঠাকুরাণী তখন ২।১নং বাগবাজার ষ্ট্রীটের বাটীতে,

"রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। * * * (পদ্মবিনোদ) রাস্তায় দাঁড়াইয়া শ্রীমাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে থাকেন, 'মা, ছেলে এসেছে তোমার; ওঠ মা।' আর উহা বলিয়াই নেশার ঝোঁকে তান ধরেন সুকণ্ঠে,—

ওঠ গো করুণাময়ী, খোল গো কুটীর দ্বার।
আঁধারে হেরিতে নারি, হৃদি কাঁপে অনিবার॥
সন্তানে রাখি' বাহিরে, আছ সুখে অন্তঃপুরে।
(আমি) ডাকিতেছি মা মা ব'লে, নিদ্রা কি ভাঙে না তোমার?

গানের প্রথম কলির সঙ্গে সঙ্গে উপরে শ্রীমার ঘরের খড়খড়ির একটা পাখী খুলিবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; আর শরৎ মহারাজ বলেন, 'এই রে, মাকে তুলেছে!' গানের চতুর্থ কলির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমার জানালা সম্পূর্ণ খুলিয়া যায়। * * * শ্রীমার জানালা খোলার শব্দে পদ্মবিনোদ

'উঠেছ মা? সন্তানের ডাক কাণে গেছে? উঠেছ ত পেন্নাম নাও' বলিয়া রাস্তায় গড়াগড়ি দিতে থাকেন। পরে উঠিয়া সেই স্থানের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া চলিয়া গেলেন। নিঃশব্দে গেলেন না, পুনরায় তান ধরিয়া গাহিতে গাহিতে গেলেন। * * *

যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে।
(মন) তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥
—আমি দেখি, দোস্ত না দেখে॥

শ্রীমার খড়খড়ি বন্ধ হইয়া গেল। * * *

পরদিন প্রাতে শ্রীমার নিকট গেলে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ছেলেটী কে?' এবং সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'দেখেছ? জ্ঞানটুকু টন্‌টনে আছে!'

আর একবার ঐ প্রকার গভীর রাত্রে পদ্মবিনোদ আসিয়াছেন। *** পূর্ব্ববৎ রাস্তায় দাঁড়াইয়া শ্রীমার ঘরের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন,—

শ্মশান ভালবাসিস্ ব'লে, শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা, নাচবি সেথা নিরবধি॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে, সদাই আগুন জ্বলছে চিতে।
(ওগো) চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা, আসিস্ যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে রাখিয়ে চরণতলে।
নাচ দেখি মা, তালে তালে, হেরব (আমি) নয়ন মুদি'॥

গানের প্রভাবে পূর্ব্ববৎ শ্রীমার খড়খড়ি খুলিবার শব্দ হইল। শ্রীমার দর্শন পাইয়া পূর্ব্বের মত রাস্তায় গড়াগড়ি দিয়া পদ্মবিনোদ পূর্ব্ববারের মত—গানটী গাহিতে গাহিতে আর উৎপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে শ্রীমা বলিলেন, 'দেখেছ—জ্ঞান কি টন্‌টনে?' বলিলাম, আপনার যে ঘুমের ব্যাঘাত করেন! শ্রীমা বলিলেন, তা হ'কগে, বাবা। ওর ডাকে যে থাকতে পারিনে, তাই দেখা দিই।" (৭)

পদ্মবিনোদের মৃত্যুর দৃশ্যটিও অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী। দীর্ঘকাল কঠিন রোগে ভুগিয়া তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শুনিতে শুনিতে একবারমাত্র 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাতাঠাকুরাণী

এই সংবাদ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "তা হবে না ?—ঠাকুরের ছেলে যে ! কাদা মেখেছিল, তা হয়েছে কি ? যাঁর ছেলে, তাঁরই কোলে গেছে।"

প্রিয়নাথ ডাক্তার মাতাঠাকুরাণীর স্নেহভাজন সন্তান। আজীবন অবিবাহিত থাকিয়া সাধুজীবন যাপন করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার সংকল্প। ব্রত তাঁহার কঠোর, কিন্তু আত্মপ্রত্যয় তদনুরূপ ছিল না ; সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন,—শাণিত ক্ষুরধারার ন্যায় দুর্গম জীবনপথ কি করিয়া তিনি উত্তীর্ণ হইবেন !

আত্মপ্রত্যয় না থাকিলেও মায়ের কৃপার উপর তাঁহার ছিল অটল বিশ্বাস। মায়ের কৃপা এবং আশীর্ব্বাদে পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, এই বিশ্বাসই ছিল তাঁহার একমাত্র সম্বল। সময় সময় যখন মন সংশয়ে আচ্ছন্ন হইত, ভয়ে কাতর হইত, তিনি ব্যাকুলচিত্তে ছুটিয়া আসিতেন মাতার চরণপ্রান্তে ; অন্তরের সকল দৈন্য, সকল দ্বিধা অকপটে নিবেদন করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতেন। সর্ব্বার্থসাধিকা মাতাও শরণাগত সন্তানকে অভয় দিতেন, উপদেশ দিতেন, উৎসাহ দিয়া বলিতেন,—ভয় কি বাবা ? তোমার হবে।

প্রিয়নাথ মায়ের নিকট দীক্ষিত নহেন, কিন্তু মাকে তিনি ইষ্টদেবী-জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। অর্থে ও সামর্থ্যে যথাশক্তি মায়ের সেবা করিতেন। চিকিৎসাবৃত্তিকে তিনি ব্যবসায় মনে করিতেন না, অর্থের জন্য কাহাকেও পীড়ন করিতেন না ; উপার্জ্জনের অধিকাংশই পরার্থে ব্যয় করিতেন। মায়ের আশীর্ব্বাদে সাধনভজন ও সেবার ভিতর দিয়া প্রিয়নাথের শুভ সংকল্প শেষ পর্য্যন্ত সফল হইয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ নামে এক সন্তান উত্তর-কলিকাতায় বাস করিতেন। বৃদ্ধা মাতা এবং এক ভগ্নী লইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার। গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দের পূজার্চ্চনাতে তিনি অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। জীবনে অনেক জপধ্যান তিনি করিয়াছেন, ত্যাগী সংযমী বলিয়া মনে

তাঁহার প্রত্যয়ও ছিল। সন্ন্যাসে দীক্ষা দিবার জন্য মাতাঠাকুরাণীকে সুরেন্দ্রনাথ অনেকবার নিবেদন জানাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে মায়ের যেন কেমন-একটা ইতস্ততঃ ভাব দেখা যাইত। মা বলিতেন,—তোমার অষ্টমটা কেটে যাক, তারপর হবে। জানতো বাবা, "হাতীরও পিছলে পা, সুজনেরও বোড়ে না'।"

এইভাবে যায় কিছুদিন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে পরিবর্ত্তন আসে, জপতপপূজা করিবার অবসর কমিয়া যায়। সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবার জন্য একদিন তিনি মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। করুণদৃষ্টিতে মা বলেন,—তখনি তো বলেছিলুম বাবা, এত ব্যস্ত কেন, ধীরে সুস্থে হবে।

অবশেষে সুরেন্দ্রনাথ গার্হস্থ্যজীবনে ব্রতী হইলেন, ক্রমে চিত্ত আরও বিষয়মুখী হইল, রাধাগোবিন্দের প্রতি প্রীতিও কমিয়া গেল। মা একদিন জিজ্ঞাসা করেন,—সুরেন, তুমি তো বিষয়কর্ম্মে ম'জে গেলে, ঠাকুরসেবা এখন কি ক'রে চলবে? ঠাকুরকে ভুলে যেও না।

সুরেন্দ্রনাথ কি সদুত্তর দিবেন? অবনত মস্তকে নীরব থাকেন।

তাঁহার ভগ্নী—বালার পতিবিয়োগ হইয়াছে, রাধাগোবিন্দ তাঁহাকে নিকটে আকর্ষণ করিলেন। ভ্রাতার মতিগতিতে ভগ্নীর মনের উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়,—গৃহদেবতার সেবাপূজায় বিঘ্ন হইতেছে, দেবতার সেবা-অপরাধে যে বংশের মহা-অকল্যাণ হইবে। তিনি মাতাঠাকুরাণীর উপদেশপ্রার্থী হইলেন। দীক্ষিত না হইলে বিগ্রহের সেবা করা চলে না, মাতা তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন।

ভ্রাতা যে সুযোগ অবহেলায় হারাইয়াছেন, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিতে ভগ্নীর তাহা লাভ হইল। তাঁহার গর্ভধারিণীও ইতোমধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; সর্ব্ববন্ধনমুক্ত হইয়া মাতাঠাকুরাণীর নির্দ্দেশে, ভাগ্যবতী—বালা বৃন্দাবনে যাইয়া রাধাগোবিন্দের একান্ত সেবাধ্যানে নিজের তনুমন উৎসর্গ করিলেন।

বসিরহাটের উকীল দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরীর পত্নী শৈলবালা দেবী বিদুষী

এবং ধর্ম্মানুরাগিণী ছিলেন। বিবাহের পরেও সাধনভজন করিতেন, এইজন্য তাঁহাকে শ্বশুড়বাড়ীতে নির্য্যাতনও সহ্য করিতে হইয়াছে।

১৩০৬ সালে তাঁহার সহিত গৌরীমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঐ দিবস গৌরীমা উত্তর-কলিকাতায় রায় বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ সেনের বাটীতে এক ধর্ম্মসভায় গীতার ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান এবং ভগবদ্‌ভক্তিতে শৈলবালা মুগ্ধ হইলেন। ক্রমে গৌরীমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট তিনি দীক্ষা প্রার্থনা করেন। গৌরীমা স্বয়ং দীক্ষাদান না করিয়া তাঁহাকে একদিন মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত করিলেন।

"শ্রীশ্রীমায়ের কথায়" শৈলবালা লিখিয়াছেন, "শ্রীশ্রীমার বাটীতে পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথমে গৌরী মা দোতলায় যান; আমরা তাঁহার পরে যাই। উপরে গিয়া দেখিলাম, গৌরী মা আস্তে আস্তে মার সহিত কি বলিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কি কথা হইল জানি না, শ্রীশ্রীমা গৌরী মাকে বলিলেন, 'তুমি সেদিন সুরেনের বৌকে নিয়ে এসেছিলে, আজ এই বৌমাকে এনেছ, তোমার এই কাজ।' এই কথা শুনিয়া গৌরী মা জোরে বলিলেন, 'দেবে না ত কি? এসেছ কিসের জন্যে?' তাহা শুনিয়া মা আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তবে এস মা, এখন সময় ভাল আছে।"

"মা আমাকে পূজার আসনে বসাইলেন এবং আমাকে দিয়া ঠাকুরের পূজা করাইলেন। পরে ঘরের ভিতর হইতে গৌরী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৌরদাসি, কোন্ ঠাকুর দেব?' গৌরী মার কথামত আমার দীক্ষা হইল। আমি পূর্ব্ব হইতেই জপ করিতাম। মা আমাকে জপ করিতে বলিলেন; কিন্তু তখন আমার শরীর ও মনের অবস্থা এমন হইল যে, জপ করিতে পারিলাম না। মা নিজে আমার কর ধরিয়া জপ করাইলেন। তারপর ঠাকুরঘরের দরজা খোলা হইল। গৌরী মা ভিতরে আসিলেন ও আমাকে মার পায়ে ফুল দিতে বলিলেন। আমিও তাহাই করিলাম।"

বাগবাজার ষ্ট্রীটের দ্বিতল বাটীটি লেখিকার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া আজও তাহার স্মৃতিপটে মহিমোজ্জ্বল হইয়া

রহিয়াছে। আজও এই পুণ্যপীঠ স্মরণ করাইয়া দেয় মায়ের দীনা কন্যাকে তাঁহার অহেতুকী করুণার কথা।

১৩১১ সালের শারদীয়া মহাষ্টমী-পূজার শুভতিথি। মাতামহীর নির্দ্দেশে এমন দিনে মাতাঠাকুরাণীর চরণস্পর্শ করিতে কন্যা তাহার সহোদরের সহিত উত্তর-কলিকাতায় চলিল। রিক্তহস্তে সাধুদর্শনে যাইতে নাই, মাতামহী একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া গোদুগ্ধ দিলেন। গঙ্গার ঘাটে আসিয়া কয়েকটি পদ্মফুলও ক্রয় করা হইল। তাহার পর তাহারা মায়ের বাটীতে উপস্থিত হইল।

মাতাঠাকুরাণীর চরণদর্শন-মানসে এই শুভদিনে বহুভক্তের সমাগম হইয়াছে। অনেকেই ফলফুল লইয়া দণ্ডায়মান; দেখিয়া সংশয় জাগে কন্যার মনে, নিকটে গিয়া পদ্মফুল আর দুধ মাকে দিতে পারিবে কি-না।

মা স্বয়ং সকল সংশয়ের সমাধান করিয়া দিলেন। দৃষ্টিমাত্র বলিলেন, —এই যে, তুমি এসেছো! কাছে এসো। মহাষ্টমীর দিন, আজ তোমায় দীক্ষা দেবো। দুগ্ধের পাত্রটি মা গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া মৃদুহাস্যে বলিলেন,—এই তোমার পূর্ণঘট স্থাপন হলো।

অতঃপর মায়ের আদেশে কন্যা পূজাকক্ষে প্রবেশ করিলে মা সস্নেহে তাহাকে নিকটে বসাইলেন। কন্যার প্রার্থনায় নহে, তাহার সাধনার ফলস্বরূপ নহে, কল্যাণময়ী জননী নিজেই কৃপা করিয়া কন্যাকে দীক্ষাদান করিলেন, চরণে আশ্রয় দিলেন, তাহাকে কৃতার্থ করিলেন। মায়েরই নির্দ্দেশে কন্যা তাঁহার পাদপদ্মে পদ্মপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিয়া প্রণত হইলে মা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। মন্ত্রজপ করিবার নিয়মাদি বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর ভুক্তাবশেষ প্রসাদ দিলেন।

সমস্ত দিনটি মায়ের সান্নিধ্যে পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। অপরাহ্নে মায়ের জন্য সহোদর একখানি বস্ত্র এবং কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনিলেন। একটি রৌপ্যমুদ্রা দিলেন দক্ষিণার জন্য। বিদায়ের পূর্ব্বে কন্যা এইসকল মায়ের চরণে নিবেদন করিল। তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া মা বলিলেন,—শীগ্যির শীগ্যির আবার এসো মা।

এমন একটি-দুইটি ঘটনা মানুষের জীবনে সংঘটিত হয়, যাহা কোন অবস্থাতেই—সুখের উচ্ছ্বাসে, দুঃখের আঘাতে, অথবা কালের প্রবাহেও বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া যায় না ; মানসচক্ষে জাগিয়া থাকে ধ্রুবতারার মত, অকূল পাথারে অভ্রান্ত নির্দ্দেশে পথ দেখাইয়া দেয়, চিত্তে অনুক্ষণ শক্তি দেয়, আনন্দ দেয়।

ব্রহ্মচর্য্য এবং সাধনপথের অনুরাগীদিগকে মাতাঠাকুরাণী কিভাবে অনুপ্রেরণা দিতেন, আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহার আরও কয়েকটি বৃত্তান্ত এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

বাগবাজার ষ্ট্রীটে এক কন্যা বাস করিত, সকলে তাহাকে বেণীর বোন বলিয়া ডাকিত। পরিবারে তাহার পিতা, মাতা, চারি সহোদর ও সহোদরা। শৈশব হইতেই তাহার চিত্ত ঈশ্বরাভিমুখী। আজীবন কুমারী থাকিয়া ভগবানের ভজনা করিবে, ইহাই ছিল তাহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা।

প্রতিবেশীর মুখে সে মাতাঠাকুরাণীর মহিমার কথা শুনিয়াছিল। তখন তাহার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে, একদিন একটি সাজিতে সুন্দর সুন্দর ফুল ও মালা সুসজ্জিত করিয়া মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিল। সঙ্গে একখানি চিঠি, মায়ের নিকট করুণা ভিক্ষা করিয়া লিখিয়াছে, —মাগো, যে-বাড়ীতে আমি জন্মেছি, সেখানেই যেন মরতে পারি। ভগবানকে যেন ডাকতে পারি। বিবাহ আমি করবো না।

মাতাঠাকুরাণী পত্রবাহককে বলিয়া দিলেন,—মেয়েটি একদিন আমার কাছে আসুক। আমি তা'কে ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ দেবো।

অবিলম্বে কন্যা মাতৃসকাশে আসিয়া উপস্থিত হইল, মা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—যে পথ ধরেছ সে-পথ ধ'রে থেকো, ছেড়ো না মা। মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকো ; এইপথ যা'রা ধ'রে থাকে, তিনিই তা'দের রক্ষে করেন।

সংসারে পিতা ও সহোদরগণের আশ্রয়েই বেণীর বোন সাধনভজনে জীবনযাপন করিতে লাগিল। অনেক অনুরোধ-উপরোধ এবং শাসন-

তাড়না করিয়াও কেহ তাহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। পিতা তাহার নামে পৃথক কিছু অর্থের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহাও গ্রহণ করে নাই। ভগবানের স্মরণমননে কন্যা এতই তন্ময় হইয়া যাইত যে, সংসারকর্ম্মে তাহার ভুলত্রুটি হইত। এইজন্যও আত্মীয়পরিজনের নিকট অনেক গঞ্জনা এবং পীড়ন তাহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে, তথাপি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই সাধিকা মাতাঠাকুরাণীর প্রদর্শিত পথ ও আদর্শকে ত্যাগ করে নাই।

শম্ভুনাথ নামে আট-দশ বৎসর বয়সের এক বালক একদিন তাহার আত্মীয়ের সহিত মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল,—মা, আমি সাধু হবো, বেলুড়মঠে থাকবো। আপনি মহারাজদের ব'লে দিলেই আমার থাকা হবে।

সরল বালকের মুখে এমন কথা শুনিয়া মা হাসিতে হাসিতে বলেন,—কে তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে খোকা, এসব কথা?

—কেউ শেখায়নি মা। মাকে আমি একথা ব'লেছিলুম, মা বললে কি,—আমায় ছেড়ে কোথাও যাসনি তুই, তা'হলে আমি বিষ খেয়ে মরবো। আমি বললুম,—কেন? তোমার তো আরো ছেলে রয়েছে। আমি বেলুড়মঠে গিয়ে সাধু হ'য়ে থাকবো। যদি সাধু হ'তে না দাও, আমি ম'রে যাবো, বাঁচবো না।

মাতাঠাকুরাণী বালকের চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন, বক্ষে জপ করিয়া দিলেন, নিজহাতে একটি সন্দেশ খাওয়াইয়া দিলেন। তারপর আবার প্রশ্ন করিলেন,—খোকা, মাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?

—হ্যাঁ, ঠিক পারবো। আপনি একবার রেখেই দেখুন-না।

জননীর প্রাণে দুঃখ দিয়া বালকটি হয়তো এই বয়সেই বৈরাগ্যের পথে চলিয়া যাইবে, ইহা ভাবিয়া কোমলপ্রাণা যোগেনমায়ের হৃদয় বিচলিত হয়, কাতরভাবে মাতাঠাকুরাণীর নিকট বলেন,—ছেলেটাকে ওর মায়ের কাছেই পাঠিয়ে দাও মা! আহা, দুধের ছেলে!

—যোগেন, ওর এই শেষজন্ম। আয়ু অতি অল্প, যা' শুভ ইচ্ছে এখনই ক'রে নিক।

আত্মীয়টি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেলুড়ে গেলেন। মঠে উপস্থিত হইয়া বালক ঠাকুরের সম্মুখে গড়াগড়ি দিল ; স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ-প্রমুখ মহারাজদের পদধূলি লইল। কিছুতেই সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে না, মঠে থাকিয়া সাধুদিগের সেবা করিবে। স্বামী প্রেমানন্দ তাহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া তাহার জননীর নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন।

আশ্চর্য্যের কথা, তিন-চারি সপ্তাহ পরেই সংবাদ আসিল, সেই দেবস্বভাব বালক এই মরজগৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

কেনাদিদি (নীরদবাসিনী) গড়পার পল্লীতে বাস করিতেন। সংসারে তাঁহার স্বামী এবং একটিমাত্র পুত্র। পুত্রটি জন্মিবার পর হইতেই তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে পবিত্রতার আভা শোভা পাইত। লোকমুখে মাতাঠাকুরাণীর কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট যাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন।

অবশেষে কেনাদির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল, তিনি মাতাঠাকুরাণীর দর্শন লাভ করিলেন। সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! মাকে দেখিয়াই কেনাদি বাক্যহীন ; নির্নিমেষদৃষ্টিতে মায়ের মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে চণ্ডীর একটি প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন।

প্রথম দর্শনেই কেনাদি মাতাঠাকুরাণীর মধ্যে স্বীয় ইষ্টানুভূতি লাভ করিলেন। মায়ের চরণে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন,—কত দয়া মা, তোমার কত দয়া! দীক্ষা আমার আগেই হয়েছিলো ; কিন্তু আমার কেবলই মনে হতো, তোমার শ্রীমুখে মন্ত্রধ্বনি শুনতে পেলে আমার জীবন ধন্য হবে। আজ তুমি যে মন্ত্র আমায় শোনালে মা, আমি ধন্য হলুম।

অতঃপর কেনাদি প্রায়ই মায়ের নিকট যাতায়াত করিতেন। মায়ের কৃপায় তিনি সাধনভজনে অনেকদূর অগ্রসর হইলেন। সংসারবন্ধন তাঁহার

শিথিল হইয়া আসিল ; এমন-কি একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের যখন অকালে মৃত্যু ঘটে, কেনাদি বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না।

কেনাদির এইপ্রকার অবস্থা দেখিয়া জনৈকা ভক্তিমতী বলিয়াছিলেন,—আমাদের কেনাদি মা'র চরণে একেবারেই কেনা হ'য়ে রইলেন। তাঁর 'কেনা' নাম সার্থক হলো।

শ্রীমতী রাধারাণী হালদার তাঁহার গর্ভধারিণী নগেন্দ্রবালা দেবীর দীক্ষাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমাঠাকুরাণীকে দর্শন করেছিলেন এবং তাঁদের খুব ভক্তি করতেন। *** আমার মায়ের অনেক রকম গুণ ছিল, ধর্ম্মজ্ঞানও ছিল। মাঠাকুরাণীর কাছে মধ্যে মধ্যে যেতেন ও তাঁর উপদেশ শুনতেন, কিন্তু দীক্ষা নেবার আগ্রহ তাঁর ছিল না। এজন্য বাবা দুঃখু করতেন।

"গৌরীমাকে মধ্যে মধ্যে বাবা অনুরোধ করেন, তিনি যাতে এ বিষয়ে আমার মাকে কিছু উপদেশ দেন। গৌরীমা মাকে বলেন, 'বৌমা, তোমার এত গুণ, এত ভক্তি, তুমি মাঠাকুরাণীর কাছে দীক্ষা নাও, তোমার ভাল হবে।' মা উত্তর দিয়েছিলেন, 'দীক্ষা নিলে কি আর বেশী হবে, মা? গুরুকে যদি সাধারণ মানুষের ওপরে ভাবতে না পারি ; তবে শুধু শুধু একটা মন্তর নিয়ে কি হবে? বলুন আপনি।' গৌরীমা বলেন,—'মাঠাকুরাণীর মন্ত্রের কত শক্তি তুমি তা জান না। সে মন্ত্র জপ করলে তোমার মনের সব সন্দ সব দ্বন্দ্ব ঘুচে যাবে।' মা একথার কোন প্রতিবাদ করলেন না, স্বীকারও করলেন না।

"এরপর একদিন গৌরীমা আমার মাকে নিয়ে গঙ্গাস্নান শেষ করে মাঠাকুরাণীর বাড়ী গেলেন। মাঠাকুরাণী তখন পূজো করছিলেন। দুজনেই বসে তাঁর পূজো দেখতে লাগলেন। মা আরও কতদিন মাঠাকুরাণীর কাছে গেছেন, কিন্তু আজ তাঁর কাছে বসে, তাঁকে দেখে মায়ের

মনে কেমন নতুন ভাব হতে লাগলো। দীক্ষা সম্বন্ধে নিজস্ব ভাব যেন বদলে যাচ্ছে, পুরোণো জগৎ পেছনে ফেলে এক নতুন জগতে তিনি প্রবেশ করছেন।

"পূজো শেষ হলে গৌরীমা মাঠাকুরাণীকে ইসারায় কি বললেন। মাঠাকুরাণী আমার মাকে সেদিনই দীক্ষা দিলেন। মন্ত্রের প্রভাবে প্রথম দিনই মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। প্রাণের আবেগে গৌরীমাকে বলেছিলেন, 'আপনি যে আমার কি করলেন, আমি বলতে পাচ্ছি না।' প্রণাম শেষ করে বিদায় নেবার সময় মাঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, 'মা, তুমি সংসারে থাকবে বটে, তবে খড়ুলী নারকেলের মত থাকবে, আসক্তি হবে না।'

"কিছুদিনের মধ্যেই খুব খুসী হয়ে বাবা একদিন গৌরীমাকে বলেছিলেন, 'গৌরমা, আপনি যে কি যাদু করে দিলেন, এখন দেখছি ইনি আমাকে পেছনে ফেলে দিনকে দিন এগিয়েই যাচ্ছেন।' গৌরীমা হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'বাবা, কার কেমন আধার, আমরা দেখলেই বুঝতে পারি। মাঠাকরুণ তো সেদিনই বলে দিয়েছেন,—সংসারে থেকেও বৌমা যোগিনী হবে।"

এক তাপসীর কথা।

তিনি উত্তর-কলিকাতার এক কায়স্থপরিবারের কন্যা, পিতা তাঁহার বিত্তশালী। রাজা-উপাধিধারী সুবিখ্যাত এক ব্যক্তির পুত্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয়; এমন যোগাযোগ মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ!

বিবাহের অল্পকালমধ্যেই একদা রাত্রিকালে কন্যার স্বামী অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইয়া দাবী করিলেন, পত্নীকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সঙ্গে যাইতে হইবে। ঐরূপ অবস্থায় কন্যাকে তাঁহাদিগের নিকট সমর্পণ করা পিতা সঙ্গত মনে করিলেন না। জামাতাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন, শ্বশুরালয়ে আহার ও রাত্রিযাপন করিয়া পরদিবস প্রত্যুষে কন্যাকে লইয়া যাইবেন।

এই প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ হইয়া জামাতা কহিলেন,—না, না, এই মুহূর্ত্তে আমার সঙ্গে যেতে হবে। আমার বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি নিয়ে যাবো, আপনি বাধা দেবার কে? এই রাত্তিরে যদি আপনার কন্যা আমার সঙ্গে যায়, তা'কে আসতে বলুন; যদি না যায়, জন্মের শোধ তা'কে ত্যাগ ক'রে যাবো। আজই ঘুচে যাবে সম্পর্ক।

কন্যার পিতা শঙ্কিত হইলেন এইরূপ কথায়; কিন্তু জামাতা এবং সঙ্গীদিগের সহিত কন্যাকে সেইরাত্রে যাইতে দিতে পিতার ভরসাও হইল না। গমনোদ্যত জামাতার নিকট শ্বশুর করজোড়ে পুনরায় মিনতি জানাইলেন, তাঁহাকে সবান্ধবে সেইস্থানেই রাত্রিযাপন করিতে। জামাতা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন।

কয়েকদিবস পরে জামাতা শ্বশুরালয়ে সংবাদ প্রেরণ করিলেন,—তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন। প্রথম পত্নীকে তাঁহার প্রয়োজন নাই।

কন্যার মাতাপিতার শিরে যেন বজ্রাঘাত হইল; তাঁহার সুখ, ঐশ্বর্য্য, সকল আশা আজ নির্ম্মূল হইয়াছে। তাঁহার ভবিষ্যজীবনের জন্য ভাবিয়া তাঁহারা আকুল। অবশেষে তাঁহাকে লইয়া পিতা তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইলেন; নানাস্থানে দেবমন্দির ও দেবতা দর্শনে তাঁহাদের চিত্ত কথঞ্চিং শান্ত হয়। বৃন্দাবনধামে এক সিদ্ধপুরুষের নিকট কন্যার দীক্ষা হইল। পবিত্র জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে ভগবৎ-কৃপার প্রয়োজন; গুরু এবং পিতা সাধনভজনে মনোনিবেশ করিতে কন্যাকে উপদেশ দেন।

একদিন গৌরীমার সহিত কন্যার পিত্রালয়ে গিয়াছি, কন্যা জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবানে আত্মসমর্পণ ক'রে কি গোটা জীবনটা আনন্দে কাটিয়ে দেওয়া যায়? তুমি কার কাছ থেকে এমন ভাব পেলে বহিনজী?

মাতাঠাকুরাণীর সন্ধান দিলাম।

—তাঁর কাছে আমায় একটিবার নিয়ে চল। তোমার সাধনা আমি নেবো। আমি প্রভুকে ভালবাসবো, প্রভুর শরণাগত হবো।... কিন্তু, আমার কি হবে? অনাঘ্রাত ফুল তো আমি নই। প্রভু কি আমায় দয়া ক'রে নেবেন?

মাতাঠাকুরাণী কন্যাকে দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন।—এ-যে বৃন্দাবনের গোপী! তাঁহার সংসারজীবনের ইতিহাস শুনিয়া মাতা ব্যথিত হইলেন; সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—অতীতকে ভুলে যাও মা। রাধাগোবিন্দকে দেহমন সঁপে দাও, প্রাণভ'রে ডাকো তাঁকে। তিনিই ইহকাল আর পরকালের স্বামী। তাঁকে পেলে, জীবনে অপূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদ পাবে।

মাতাঠাকুরাণীর নিকট কন্যা অনুপ্রেরণা পাইলেন; মায়ের প্রতি তাঁহার অনুরাগও জন্মিল। সুগন্ধি পুষ্পমাল্য, মিষ্টান্নাদি সুস্বাদু ভোজ্যবস্তু স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়া তিনি মায়ের সেবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন।

ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে থাকিয়াও তিনি তাপসীর ব্রত বরণ করিলেন। মূল্যবান অলঙ্কার এবং পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিলেন। সধবার চিহ্নরূপে তিনি দুই হস্তে অতিসাধারণ দুইটিমাত্র সুবর্ণকঙ্কণ ধারণ করিতেন। রাধাগোবিন্দকে হৃদয়সর্ব্বস্ব করিয়া লইলেন; তাঁহার সেবায়, তাঁহার পূজায় বিভোর থাকিতেন।

দীর্ঘকাল আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর একদিন সংবাদ জানিতে গেলাম। দেখিলাম, ব্রজবাসিনীর বেশে সজ্জিতা, হস্তে সেই দুইটি সুবর্ণকঙ্কণ, ললাটে পূজারিণীর চন্দনতিলক।

প্রশ্ন করিলাম,—বহিনজী, তোমার রাজা-স্বামীর দেহান্তে তুমি বৈধব্য গ্রহণ করনি! তোমার মনে কি এতটুকুও দুঃখু হয়নি?

তাপসী উত্তর দিলেন স্মিতবদনে,—শ্রীমা-যে আমায় গোবিন্দচরণে নিবেদন করেছিলেন, তাঁকে নিয়েই আছি। তাঁর তো মৃত্যু হয় না, আমি সধবাই আছি বহিনজী। কোন দুঃখু নেই আমার।

ধন্য এই নারী!

আর, মাতাঠাকুরাণীর কৃপায় কী না হয়! মা-যে আমার স্পর্শমণি!

শ্রীক্ষেত্রে

মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের দর্শনমানসে মাতাঠাকুরাণী ১৩১১ সালে পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন এবং প্রায় দুই মাস তথায় বাস করেন। এইবার মায়ের নিকট বহুভক্তের সমাগম হয়। খুল্লতাত নীলমাধব, লক্ষ্মী-দিদি, গোলাপমা, স্বামী প্রেমানন্দ, রাধারাণী এবং আরও কয়েকজন মায়ের সঙ্গে গমন করেন। লেখিকারও মায়ের সঙ্গে যাইবার এবং বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। মাতাঠাকুরাণী প্রথমে সমুদ্রসন্নিকটে বসুপরিবারের 'শশীনিকেতনে' উঠিলেন। তথায় পুত্রকন্যাসহ কৃষ্ণভাবিনী এবং তাঁহার গর্ভধারিণীও ছিলেন।

গিরিবালা দেবী, গৌরীমা, বরদামামা, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়, অবিনাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরিধন ও কালু বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারমণ বরাট-প্রমুখ আরও কতিপয় নরনারী পরে গিয়া মিলিত হইলেন।

বাতের পীড়াহেতু এইবার মাতাঠাকুরাণী সাধারণতঃ হরিবল্লভ বসুর গাড়ীতে করিয়া দেবদর্শনে যাতায়াত করিতেন। কিছুদিন শশীনিকেতনে বাসের পর তিনি প্রস্তাব করিলেন, মহাপ্রভুর মন্দিরের নিকটে 'বড়দাণ্ডে' (বড় রাস্তায়) 'ক্ষেত্রবাসীর বাটী' নামে বসুদের যে একখানি বাড়ী আছে, তথায় থাকিলে পদব্রজে গিয়াই যদৃচ্ছা দেবদর্শন করিবার পক্ষে সহজ হইবে, তিনি মায়েদের সহিত তথায় থাকিবেন। বসুপরিবারের কাহারও ইহা মনঃপূত হইল না। শশীনিকেতন বাড়িখানি প্রশস্ত এবং উত্তম, দ্বিতল হইতে সমুদ্র দর্শন করা যায়, বিশেষতঃ স্বাস্থ্যকর পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত; তাহার তুলনায় ক্ষেত্রবাসীর বাটী পুরাতন এবং মাত্র দুইখানি ঘর ইষ্টকনির্ম্মিত, অবশিষ্টগুলির কেবল প্রাচীর পর্য্যন্ত ইষ্টকনির্ম্মিত, উপরে খড়ের আচ্ছাদন। এইরূপ স্থানে বাস করিলে মাতাঠাকুরাণীর কষ্ট হইবে বিবেচনা করিয়া সকলেই উদ্বেগ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু মা সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার পক্ষে ইহাই সুবিধাজনক হইবে;

সুতরাং মায়ের ইচ্ছানুসারেই ব্যবস্থা হইল। অবশ্য, তিনি কখন কখনও শশীনিকেতনে গিয়াও বাস করিতেন।

মন্দিরে গিয়া মাতাঠাকুরাণী পতিতপাবন হইতে আরম্ভ করিয়া সকল দেবতার পরিচয় জানাইয়া দিলেন। যদিও একাধিকবার এই তীর্থে আসিবার এবং দেবদেবীদর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছে, তথাপি মা যেভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইহাতে বৈশিষ্ট্য ছিল, আনন্দ ছিল। মায়ের সহিত প্রত্যহই দেবদর্শন হইতে লাগিল।

মূল মন্দিরে একদিন মাতাঠাকুরাণী কন্যাকে টানিয়া লইলেন তাঁহার নিকটে এবং বলিলেন,—ভাল ক'রে দেখো মা, তোমার প্রভুকে। জগন্নাথ বেদান্তের মূর্ত্তি। সর্ব্বদা তাঁকে মনে রাখবে। তাহার পর জগন্নাথদেবকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—আমার মেয়ের ভার নিয়েছো ঠাকুর, ওকে রক্ষে করো তুমি।

দিবসের অধিকাংশ সময় মহাপ্রভুর দর্শন সর্ব্বসাধারণে পাইতে পারে; কিন্তু তাঁহার কোন কোন বেশ মণিকোঠার ভিতরে গিয়া দেখিতে হইলে বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। একদিন মাতাঠাকুরাণী হরিবল্লভ বসুকে জানাইলেন, তিনি তাঁহার সন্তানগণসহ জগন্নাথদেবের বিভিন্ন বেশ দেখিবেন। হরিবল্লভ বসু মন্দির-পরিচালকবর্গের সহিত ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে একদিন সকলেই ভিতরে যাইয়া দর্শন পাইতে পারেন।

সেই বহুবাঞ্ছিত নির্দ্দিষ্ট দিন আগত হইলে সকলের উৎসাহ এবং আনন্দের আর সীমা রহিল না। মাতাঠাকুরাণীর সহিত সকলে মহাপ্রভুর সন্ধ্যারতি, চন্দনলাগি এবং বড়শৃঙ্গার বেশ দর্শন করিতে চলিলেন। গভীর নিশীথে বড়শৃঙ্গার বেশ হয়। মন্দিরসংলগ্ন বিস্তীর্ণ চত্বরে মাতাকে কেন্দ্র করিয়া সকলে উপবিষ্ট হইলেন। ঊর্দ্ধে তারকাখচিত নীলাকাশ, চতুর্দ্দিকে নিস্তব্ধতা, তাহার মধ্যে উন্নতশির মন্দির যেন ধ্যানগম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে। সেই শান্ত পরিবেশের মধ্যে মা সকলকে নিজ নিজ ইষ্টনাম স্মরণ করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

কিয়ংকাল পরে পাণ্ডা গোবিন্দ শৃঙ্গারী আসিয়া সংবাদ দিলেন,— এইবার মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হইবে। সকলে গিয়া মণিকোঠায় প্রবেশ করিলেন। আনন্দচিত্তে সকলে প্রভুর চন্দনলাগি দর্শন করিলেন। অতঃপর বেশকারিগণ নিপুণহস্তে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত করিলেন দেবতাত্রয়কে। অপূর্ব্ব সে বড়শৃঙ্গার বেশ। জনবিরল কোলাহলশূন্য মন্দির, আপনা হইতেই চিত্ত স্থির হইয়া আসে। ভক্তিবিগলিত-হৃদয় বলে, "জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।" মনে হয়, সেই প্রার্থনা শ্রুতিগোচর হয় জগন্নাথস্বামীর ; বিশাল কৃপালবাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া তিনি আহ্বান জানান সকলকে, মানুষের চিত্তকে বহির্জগৎ হইতে নিজের দিকে আকর্ষণ করেন।

কতক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হয় কাহারও মনে থাকে না, ততক্ষণে তিনখানি পালঙ্ক আনীত হইয়াছে, সজ্জিত হইল দেবতার শয্যা। সুরভিত গন্ধে মন্দির আমোদিত। এইবার তাঁহারা বিশ্রাম গ্রহণ করিবেন। মাতাঠাকুরাণী তখনও তদ্গত হইয়া প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হয় ফিরিবার কথা।

মন্দিরদ্বার অর্গলবদ্ধ হইল, দেবতার বিশাল পুরী এইবার জনশূন্য হইবে। মন্দিরচত্বরে রাত্রিযাপন যাত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, সুতরাং সকলে স্বস্থানে ফিরিলেন। চিত্ত আগ্রহাকুল, নিদ্রার অবকাশ স্বল্প। রাত্রি-শেষে মঙ্গলারতির সময় পুনরায় মন্দিরে আসিয়া সকলে মিলিত হইলেন।

বৈতালিকগণ উচ্চৈঃস্বরে শ্রুতিমধুর বিবিধ স্তুতিগানে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গে উদ্যোগী হইলেন,—ভো দেব মণিমা (প্রভু)! ত্রৈলোক্যেশ্বর মণিমা, অখিলকোটি-ব্রহ্মাণ্ডনাথ মণিমা! নিশা অপগত হইয়াছে, দিনমণির উদয় হইয়াছে। শ্রীরত্নপালঙ্ক পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নবেদীতে বিরাজ করিবার জন্য আপনি অবহিত হউন। আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছি, তজ্জন্য অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন মণিমা!

এইভাবে প্রার্থনার পর মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হয়।

মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া এইবার উৎকল ভক্তগণ করতালিযোগে

বলেন,—'দেখিলি পদ্মমুখ, খণ্ডিল সকল দুখ; মোতে নিস্তার, নিস্তার, নিস্তার।' তাঁহাদের এবম্বিধ প্রার্থনা মাতাঠাকুরাণীর হৃদয়ও স্পর্শ করে।

মাতাকে পুরোভাগে রাখিয়া সকলে মণিকোঠায় প্রবেশ করিলেন। ভক্তের ব্যাকুল আহ্বানে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, এইবার মঙ্গলারতি আরম্ভ হইবে; কিন্তু তাঁহার বিশাল নয়নদ্বয় তখনও তন্দ্রাঘোরে ঢুলুঢুলু, নিদ্রার রেশ যেন সম্পূর্ণ অপগত হয় নাই।

মঙ্গলারতির পর অবকাশ-বেশ। এই অবকাশে মাল্যভূষণাদি সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি নিরাভরণ অবস্থায় দন্তধাবন, মুখ-প্রক্ষালণ ইত্যাদি প্রাতঃকালীন কার্য্য সম্পন্ন করেন। অতিসাধারণ অনাড়ম্বর এই বেশ, তবু কত মাধুর্য্যপূর্ণ!

মাতাঠাকুরাণী এই অনুপম বেশ দর্শন করিতে করিতে একসময় কন্যাকে বলেন,—* * * প্রভুর এই রূপটি অতি সুন্দর! এই রূপ নিত্য ধ্যান করবে, অবকাশ-বেশটি ভাল ক'রে মনে রেখো। জগন্নাথদেব দয়াল ঠাকুর, যে তাঁর আশ্রয় নেয়, তা'র ভাবনা নেই।

মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বহিঃপ্রাকারমধ্যে জগন্নাথদেবের নিজস্ব একটি মনোরম পুষ্পোদ্যান আছে। মাতা মাঝে মাঝে তাহা দেখিতে যাইতেন। আনন্দচঞ্চলা বালিকার ন্যায় তিনি সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেন। একগুচ্ছ সুগন্ধি পুষ্পের নিকট উপস্থিত হইয়া একদিন মাতা বলেন, কি সুন্দর! ধন্য ইহাদের জীবন! প্রভুর পূজা ও সজ্জায় নিত্য ইহারা নিবেদিত হইতেছে। আর যাহারা দিনের পর দিন প্রভুর জন্য কত রকমারি বেশসজ্জা রচনা করে, তাহাদেরই-বা কত সৌভাগ্য!

কলিকাতা হইতে জনৈকা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণবিধবা পুরীধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আচারনিষ্ঠতা এতই কঠোর ছিল যে, অন্যের স্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনাদি তিনি ভোজন করিতেন না। কলিকাতায় থাকাকালে তাঁহার অভিলাষ হইত যে, অন্যান্য ভক্তিমতীদিগের ন্যায় তিনিও একদিন মাতাঠাকুরাণীর প্রসাদ গ্রহণ করেন; বাধা দিত তাঁহার আচারনিষ্ঠা। বৃদ্ধার ভালবাসা

এবং ব্যাকুলতায় মাতাঠাকুরাণী প্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু কাহারও সংস্কারে তিনি আঘাত দিতেন না। বৃদ্ধা মায়ের বাটীতে আসিলে মা তাঁহার হাতে তুই-একটি ফল দিতেন, অন্যপ্রকার প্রসাদ দিতেন না।

মাতাঠাকুরাণী জগন্নাথধামে গিয়াছেন, এই সংবাদ জানিয়া তিনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন পুরীতীর্থে। ক্ষেত্রবাসীর বাটীতে একদিন প্রচুর প্রসাদের আয়োজন তিনি করিলেন। বাল্যভোগের মুড়কী, লাড্ডু হইতে আরম্ভ করিয়া রাজভোগের কণিকাপিষ্টকাদি বহুপ্রকারের প্রসাদ আনীত হইল। মা সাগ্রহে সকলকে ডাকিয়া বলেন,—তোমরা এসো, বুড়োমা প্রচুর পেসাদ এনেছেন, আমরা সবাই মিলে গ্রহণ করবো। বৃদ্ধা স্বয়ং মাতার মুখে প্রসাদ অর্পণ করিলেন। মা প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে বৃদ্ধার মুখেও প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা আনন্দে অভিভূত হইয়া বলিলেন, —মাগো, আমার বহুদিনের অপূর্ণ সাধ আজ পূর্ণ হলো।

মন্দিরে একদা মাতাঠাকুরাণী ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, অক্ষয় বটের মূলে বসিয়া সন্তানদিগের সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবেন। মাতার ইচ্ছা জানিতে পারিয়া গৌরীমা এবং গোলাপমা তৎক্ষণাৎ আনন্দবাজার হইতে নানাবিধ প্রসাদ আনিয়া মাতৃসমীপে উপস্থিত করিলেন। তাহা দেখিয়া আরও কতিপয় ভক্ত প্রসাদ আনিতে গেলেন। ইত্যবসরে মাষ্টার মহাশয়ও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপর্য্যাপ্ত প্রসাদ সংগৃহীত হইল। মাতা স্বহস্তে অন্নপ্রসাদ মঞ্চাকারে স্তূপীকৃত করিতে লাগিলেন, লক্ষ্মীদিদি এবং গৌরীমা তদুপরি ডালব্যঞ্জনাদি ঢালিয়া দিলেন। এমন সময় পাণ্ডাঠাকুর সেইপথে যাইতেছিলেন, তিনি মাতার হস্তে প্রসাদী তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করিলেন। মঞ্চের শীর্ষদেশে এবং স্থানে স্থানে তাহা স্থাপিত হইলে, সমগ্র প্রসাদমঞ্চটি একখানি সুসজ্জিত রথের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

"জয় জগন্নাথজীকী জয়" ধ্বনি-সহকারে মহাপ্রসাদকে প্রণাম করিয়া মাতার নির্দ্দেশে এইবার সকলে প্রসাদের চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে উপবিষ্ট হইলেন। মাতার মনে মহা-আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে, তিনি

বলিলেন,—তোমরা সকলে একটু একটু করিয়া মহাপ্রসাদ আমার মুখে দাও। সকলেই পরম আনন্দিত হইলেন মায়ের মুখে মহাপ্রসাদ অর্পণ করিয়া ; লক্ষ্মীস্বরূপা মাতাঠাকুরাণীও সন্তানদের মুখে প্রসাদ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। অতঃপর পরস্পর পরস্পরের মুখে প্রসাদ অর্পণ করিতে করিতে সকলে আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার অনুগত সেবক স্বামী সত্যকাম জয়রামবাটী হইতে দিদিমা শ্যামাসুন্দরী, মাতুল এবং মাতুলানীগণসহ পুরীতে প্রত্যাগত হইলে, সকলকে লইয়া মাতা পুনরায় একদিন আনন্দবাজারে বসিয়া 'পঁখাল' (পান্তা) প্রসাদ গ্রহণ করেন।

মহাপ্রসাদের এমনই মাহাত্ম্য যে, নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণবিধবাও জগন্নাথ-ক্ষেত্রে একাদশী তিথিতে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। একদিন একাদশীতে ভক্তিমতী কৃষ্ণভাবিনী শশীনিকেতনে সন্ধ্যাধূপের প্রসাদের প্রচুর ব্যবস্থা করিলেন। অন্নব্যঞ্জন, 'ঘীয়-ডারি' (ঘৃতযুক্ত ডাল), অম্বল, খাজা, গজা, লুচি,—নানাবিধ প্রসাদের সমাবেশ হইল।

কৃষ্ণভাবিনী পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। মাতাঠাকুরাণী সর্ব্বপ্রথম কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরে সকলের হাতে দিলেন এবং কেন্দ্রস্থলে উপবিষ্ট হইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এইদিবসও সকলের একত্রে মায়ের সঙ্গে মহাপ্রসাদ গ্রহণে প্রভূত আনন্দ হইয়াছিল।

একদিন মাতাঠাকুরাণী গুণ্ডিচামন্দিরে গেলেন। রথযাত্রাকালে জগন্নাথদেব যেখানে যাইয়া অবস্থান করেন, তাহা দর্শনান্তে সকলে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নান করিলেন। আর একদিন চন্দনপুকুরে। একদিন আঠারনালায় যাওয়া হয়। আঠারনালার কাহিনী বিবৃত করিয়া মা বলিয়াছিলেন, সকল মহৎ কর্ম্মের মূলেই ত্যাগ। প্রজার কল্যাণে রাজাকে কত-না ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে এই স্থানটিতে!

হরিদাস ঠাকুরের সমাজবাটীতে মাতাঠাকুরাণীর একদিন ভাবাবেশ হয়। সমাধিস্থানের পার্শ্বে বসিয়া হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণের কথা

বলিতে বলিতে সহসা তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। কিয়ৎকাল পরে আবার বলিতে লাগিলেন,—কী ভক্তিভালবাসা! গৌরাঙ্গদেবের বিরহব্যথা সহ্য করিতে পারিবেন না জানিয়া তাহার পূর্ব্বেই নিজে দেহ-ত্যাগ করিলেন। ভক্তগণ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে হরিদাস ঠাকুরের তপস্যাপূত দেহ স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়া এই—এইস্থানে ভূগর্ভে সমাহিত করিলেন। ভক্তবরের সমাধিতে বালুকা প্রদান করেন সর্ব্বাগ্রে গৌরাঙ্গদেব।...এই বলিয়াই মাতাঠাকুরাণী কৃতাঞ্জলিপুটে বালুকাদানের ভঙ্গিতে হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া একেবারে নিস্পন্দ! সকলেই রুদ্ধশ্বাসে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মাষ্টার মহাশয় বলেন,—মা-ঠাকরুণের আজ গৌরাঙ্গভাব হয়েছে, আসুন আমরা গৌরহরি কীর্ত্তন করি।

মাষ্টার মহাশয়, রামলালদাদা এবং আরও কেহ কেহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ধীরে ধীরে মায়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল।

আর একদিন মহাপ্রভুর লীলাস্থান 'গম্ভীরা' হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সিদ্ধবকুলকে লক্ষ্য করিয়া মা বলেন,

"যত্নে তৃণকাষ্ঠখান রহে যুগ পরিমাণ,
যত্নে দেহ ক্ষণেক না রয়।"*

আহা, মহাপ্রভুর ইচ্ছায় কত যুগ পূর্ব্বের সেই বৃক্ষটি এখনও বাঁচিয়া আছে! এইস্থানে তিনি কতবার পদধূলি দিয়াছেন, তোমরা এইস্থানের পবিত্র ধূলিকণা মস্তকে ধারণ কর। সকলে তাহাই করিলেন।

ক্ষেত্রবাসীর বাটীতে অবস্থানকালে মাতাঠাকুরাণীর পায়ে একটি ফোড়া হয়, যন্ত্রণায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছিল। অস্ত্রপ্রয়োগে মাতা অসম্মত হইবেন মনে করিয়া স্বামী প্রেমানন্দ জনৈক চিকিৎসকের

---

* কথিত আছে, গৌরাঙ্গদেবের স্বহস্তপ্রোথিত একটি দন্তকাষ্ঠ হইতে এই বকুল বৃক্ষের উৎপত্তি হয়।

সহিত গোপনে পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে মাতার নিকট পাঠাইয়া দেন। চিকিৎসক ভক্তসন্তানের বেশে আসিয়া মাতাকে প্রণাম করিবার ছলে নিমেষমধ্যে ফোড়ায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়াই সরিয়া পড়িলেন। অবস্থাটা বুঝিতে পারিয়া মাতা প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই যন্ত্রণার লাঘব হইল। স্বামী সত্যকাম প্রত্যহ ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া তাহাতে ঔষধ প্রয়োগ করিতেন। তাঁহার সেবাযত্নে প্রসন্ন হইয়া মা তাঁহাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

একদা অপরাহ্নে মাতাঠাকুরাণী শশীনিকেতনে বসিয়া আছেন, ছোট ছোট বালিকাগণ খেলা করিতেছিল। গৌরীমা আসিয়া বলিলেন, —ঢের হয়েছে খেলা, এবার তোমাদের একটা পরীক্ষা হবে। তোমরা মা-ঠাকরুণের কাছে আসন ক'রে বসো। কেউ নড়বে না, কথা বলবে না, চোখ খুলবে না। গোলাপমা বলেন,—আমি তোমাদের পাহারায় রইলুম। যখন ওঠবার সময় হবে, আমি বলবো।

গৌরীমা এবং গোলাপমা উভয়কেই তাহারা ভয় করে। সকলে আসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ তাহারা নিয়ম রক্ষা করিয়া রহিল, তাহার পর কাহারও দেহে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়, কেহ-বা মুহূর্ত্তের জন্য চক্ষু মেলিয়া অপরের অবস্থা বুঝিয়া লয়। মাতা-ঠাকুরাণী হাসেন তাহাদের আচরণে। গোলাপমার দৃষ্টি এড়ানো কঠিন। তিনি বলিয়া উঠেন,—এ···ই···ই খবরদার! চোখ খুলবে না কেউ।

চক্ষু পুনরায় মুদ্রিত হয়। আবার একের পর এক তাহাদের দেহে এবং চক্ষে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। গোলাপমা পুনরায় সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, কিন্তু বালিকাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সতর্কবাণীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চক্ষু মেলিয়া হাসিয়া ফেলে; মা এবং গোলাপমাও হাসিতে থাকেন।

একটি বালিকার অসামান্য ধৈর্য্য। তাহার দেহে এতক্ষণ কোন-প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় নাই, নিশ্চল বসিয়া ছিল। গোলাপমা

তাহাকে পরীক্ষায় প্রথম স্থান দিলেন। মাতা তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া আদর করিলেন, আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মধ্যে মধ্যে মা সমুদ্রতীরে যাইতেন। ভক্তমহিলাগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিতেন। কৌতূহলী দুই-চারিজন অপরিচিত নর-নারীও তাঁহার উপদেশশ্রবণের উদ্দেশ্যে নিকটে আসিয়া বসিতেন।

সমুদ্রতীরে তাঁহাকে দুই ভিন্নরূপে দেখিয়াছি ; এক—আনন্দোচ্ছলা, অন্য—ভাবগম্ভীরা।

পায়ের ক্ষত তখনও সম্পূর্ণ সারে নাই, একদিন মা বসুপরিবারের গাড়ীতে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন। জনৈক সন্তানের সহায়তায় ধীরে ধীরে গিয়া বালকবালিকাদিগের বালুকানির্ম্মিত বেদীতে উপবেশন করিয়া মা তাহাদিগকে অনুমতি দিলেন,—আজ তোমরা খেলা কর, আনন্দ কর। আমি তোমাদের খেলা দেখবো।

উপস্থিত-সকলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন,—শিশুদের আনন্দ ভগবানের আনন্দস্বরূপ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র! এজন্যেই ঠাকুর বলতেন, শিশুর ন্যায় সরল পবিত্র হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায়।

সমুদ্রগর্জ্জনে উত্ত্যক্ত হইয়া রামলালদাদার পত্নী বলেন,—সব সময় শুধু শুধু হাউ হাউ ক'রে চেঁচাচ্ছে, শুনতে শুনতে কান দুটো ঝালা-পালা হ'য়ে গেল। কেন, ও একটু সময় কি চুপচাপ থাকতে জানে না!

অভিযোগশ্রবণে মাতাঠাকুরাণী সহাস্য দৃষ্টিপাত করেন তাঁহার দিকে, পরমুহূর্ত্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন সম্মুখে দিগন্তবিস্তৃত মহাসমুদ্রের প্রতি। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া করুণকণ্ঠে বলেন,—ওর কি কম দুঃখু বৌমা? ব্যথায় ওর বুকটা-যে চৌচির হ'য়ে যাচ্ছে। দেবতা আর অসুরে মিলে যে যা'র লভ্যগণ্ডার জন্যে সমুদ্দুরকে বন্ধন করলে, মন্থন করলে ; ওর অতলগর্ভে লুকিয়ে-রাখা ধনরত্ন, অমৃত, চন্দ্র, সূয্যি, কত-কি লুটে নিলে ; শেষে কি-না ওর প্রাণাধিক কন্যা কমলাকেও কেড়ে নিলে! পিতার এ বুক-চেরা দুঃখু কি কম গা? মেয়েকে একবারটি ফিরিয়ে পাবার জন্যে সমুদ্দুরের এত চীৎকার।

সমুদ্রমন্থনের পুরাতন কাহিনী কে না জানে? কিন্তু কন্যার জন্য সমুদ্রেরও যে এইপ্রকার ব্যাকুলতা এবং আর্ত্তনাদ থাকিতে পারে, তাহা যেন এতকাল এইভাবে ভাবিয়া দেখিবার কাহারও অবসর হয় নাই। সেইদিন মাতাঠাকুরাণী বেলাভূমিতে বসিয়া সূর্য্যাস্তকালে ব্যথার সুরে যে ভাবে ইহার প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা করিলেন, তাহাতে সমুদ্রের আর্ত্তনাদে যেন সকলেরই হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠিল, এমন-কি সেই মহিলারও।

আর একদিন সমুদ্রতীরে মাতার সহিত বলরাম বসুর শাশুড়ী এবং অপর এক মহিলার জপের প্রসঙ্গ উঠিল। মাতা বলিলেন,—খুব জপ করবে। সংসারের কাজের শেষ নেই, কাজ করতে করতে জপ করবে। 'জপাৎ সিদ্ধি', জপ হ'তেই সিদ্ধি আসে। ভগবানের নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলির অনিষ্টশক্তিও নষ্ট হ'য়ে যায়। জপের এমনি শক্তি যে, অবিরাম জপের গুণে কোন কোন সাধকের রিপুর জাগরণই হয় না।

•

মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছা হইল, 'তোটা গোপীনাথ'* দর্শন করিবেন। একদিন মহা-উৎসাহে সকলকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজেই চলিলেন। তিনি বলিতেন, দেবতা, সাধু, গুরু, গঙ্গা এইসকল দর্শনে পদব্রজেই যাওয়া উচিত, প্রতি পদক্ষেপে পুণ্য হয়। এইসময় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতে নাই।

কিন্তু গোপীনাথের মন্দির অনেক দূরের পথ। মায়ের পায়ে ছিল ব্যথা, সন্তানগণ ঘোরতর আপত্তি জানাইলেন, মিনতি করিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি পথিমধ্যে একটি শকটে আরোহণ করেন।

পথে একস্থানে বিরাট বালুকাস্তূপ এখনও বর্ত্তমান, তাহাকে চটক পর্ব্বত বলে। চটকের সমীপবর্ত্তী হইলে একজন বলিয়া উঠিলেন, —ঐ-যে চটক পর্ব্বত। মাতাঠাকুরাণীর ইহা কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি শকট হইতে অবতরণ করিয়া দ্রুত চলিতে লাগিলেন উন্মাদিনীর ন্যায়। কিয়দ্দূর যাইয়া তাঁহার গতিবেগ স্থগিত হইল, অপলকদৃষ্টিতে চাহিয়া

* উদ্যানমধ্যস্থ গোপীনাথ। তোটা বা টোটা শব্দের অর্থ উদ্যান

রহিলেন চটক পর্ব্বতের দিকে। এমতাবস্থায় নারীভক্তগণ অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে শকটে আরোহণ করাইলেন। সেইদিবস আর তোটায় যাওয়া হইল না।

পরদিবস গোপীনাথের দর্শন হইল।—কৃষ্ণ-মূর্ত্তি, আসনোপরি উপবিষ্ট, অপরূপ তাঁহার রূপ। অপরিসীম আনন্দ পাইলেন মাতাঠাকুরাণী সেই মূর্ত্তিদর্শনে। কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন,—ভক্ত যদি ভগবানের জন্য আকুল হ'য়ে কাঁদে, ভগবান তা'র জন্যে কী না করেন? অক্ষম বৃদ্ধ পূজারীর সেবা নেবেন ব'লে, দাঁড়ানো ঠাকুর রাতারাতি ব'সে পড়লেন।

এই বিগ্রহ গদাধর পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত। কথিত আছে, গোপীনাথজী পূর্ব্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। যে-পূজারী মন্দিরে সেবাকার্য্য করিতেন, তিনি বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে, দেহের বক্রতাহেতু মূর্ত্তির উর্দ্ধাংশের শৃঙ্গারাদি যথারীতি করিতে পারিতেন না। দেবতার সেবায় বঞ্চিত হইয়া জীবন কিভাবে অতিবাহিত করিবেন, এই দুর্ভাবনায় তিনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন।

অবশেষে দেবসেবা হইতে তাঁহার অবসর গ্রহণের দিন উপস্থিত হইল। রাত্রিকালীন সেবা সমাপ্ত করিয়া পূজারী গোপীনাথের চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, প্রভু, এতকাল তোমার চরণ দুইখানি সেবা করিবার যে সৌভাগ্য দিয়াছিলে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি আর জীবনধারণ করিতে অভিলাষী নহি। তুমি চরণে স্থান দাও আমায়।

পাষাণদেবতার চরণ ধৌত হয় ভক্তের নয়নধারায়। পাষাণমূর্ত্তির মধ্যে যে-দেবতা নিদ্রিত থাকেন, ভক্তের প্রাণবন্ত পূজা পাইয়া যিনি জাগ্রত হইয়া উঠেন, সেই ভক্তবৎসল দেবতার হৃদয় বিগলিত হইল ভক্তের কাতরতায়। বলেন,—তোর সেবাপূজায় আমি প্রসন্ন! এই ছাখ, তোর জন্যে আমি ব'সে পড়লুম, তোর সেবায় আর কিছু অসুবিধে হবে না।

পরদিবস চতুর্দ্দিক হইতে অগণিত নরনারী আসিয়া দেখে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য,—পূর্ব্বদিনের দণ্ডায়মান বিগ্রহ অদ্য দিব্য বসিয়া আছেন!

গোপীনাথের উরুদেশে একটি রেখাচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জনশ্রুতি এই যে, গৌরাঙ্গদেব ঐ রেখাপথে গোপীনাথের দেহে লীন হইয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণী সেই স্থানটি স্বয়ং স্পর্শ করিয়া সন্তানগণের মস্তকে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন —ভক্তিলাভ হোক।

মন্দিরের পুরোহিত মাতাকে প্রসাদ পাইতে অনুরোধ জানাইলেন। ভোগরাগের আড়ম্বর ছিল না ; অন্ন, ডাল, ডাঁটার চচ্চড়ি, শাক ও পরমান্ন—সেদিনকার ব্যবস্থা, কিন্তু সে প্রসাদ অমৃততুল্য।

এইস্থানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, তৎকালে গোপীনাথের মন্দিরে বসুপরিবারের সেবাব্যবস্থা ছিল। মাতাঠাকুরাণীর ইচ্ছানুযায়ী বলরাম বসুর পত্নী অন্য একদিন গোপীনাথের বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা করিলেন।

একদিন সাক্ষিগোপাল যাওয়া হইল। ষ্টেশনে মাতাঠাকুরাণীর জন্য একখানি শিবিকা এবং নারীভক্তদিগের জন্য গোশকট পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিল। সংবাদ পাইয়া স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি মাতাকে দর্শন করিতে আসিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "বঙ্গদেশরে ইহাঙ্কু ভগবতী কুহন্তি।" সকলেই তাঁহার চরণধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাতা আপত্তি জানান, —তোমরা মহাপ্রভুর দেশের লোক, আমায় আর প্রণাম কেন বাবা।

সাক্ষিগোপাল স্থানটি যেমন মনোরম—পল্লীশ্রীতে মণ্ডিত, বিগ্রহও তেমনই প্রিয়দর্শন। সকলের প্রণামদণ্ডবৎ হইয়া গেল, মাতাঠাকুরাণী তখনও দণ্ডায়মান থাকিয়া একান্তমনে গোপালের মুখচন্দ্র দর্শন করিতেছিলেন ; হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—এ-কি বৃন্দাবন ?

তাঁহার ভাববিহ্বলতা উপলব্ধি করিয়া জনৈক সেবক উচ্চৈঃস্বরে বলেন,—মা, এটা সাক্ষিগোপাল, বৃন্দাবন নয়। আপনি আজ পুরী থেকে সাক্ষিগোপাল-দর্শনে এসেছেন। চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া মা বলেন,—কৈ ? গোপালকে মালা দাও, ভোগ দাও। মুড়কী, লাড্ডু নিয়ে এসো।

অতঃপর সকলে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে গেলেন।

মায়ের নির্দ্দেশানুযায়ী ব্যবস্থা হইল।

পুষ্পমাল্য ক্রয় করা হইয়াছিল অতিসাধারণ ; মা প্রসন্ন হইতে পারিলেন না। একজন সেবক তাহা বুঝিতে পারিয়া উৎকৃষ্ট তুইটি সুগন্ধমাল্য পুনরায় ক্রয় করিয়া আনিলেন। এইবার হৃষ্ট হইয়া মা বলিলেন,—চমৎকার হয়েছে। যাও, পূজারীর হাতে দিয়ে এসো গে।

গোলাপমা সেবককে পরামর্শ দিলেন,—একগাছি মালা সাক্ষি-গোপালকে দিয়ে এসো, অন্যটি মা-ঠাকরুণকে দাও।

সঙ্গের অনেকেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

মাতার প্রসন্ন বদনমণ্ডল নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার আশঙ্কা হইল, এইবার সকলে একমত হইয়া এমন সুন্দর মালাটি তাঁহার গলাতেই বুঝি পরাইয়া দিবে, তাঁহার নিষেধ কেহ শুনিবে না। তিনি মিনতির সুরে বলিলেন,—এমন সুন্দর মালাগাছি এনেছো বাবা, যাও এই মালা গোপালকে আর রাধারাণীকে দিয়ে এসো। সুন্দর মানাবে তাঁদের। মাতার অন্তরের ব্যাকুলতা বুঝিয়া সেবক মন্দিরে গেলেন।

মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি তমালবৃক্ষ আছে। তাহার নিকট আসিয়া মাতা বলেন,—একে দেখে সেই বৃন্দাবন আর শ্রীকৃষ্ণের কথাই মনে পড়ছে। মাতা বৃক্ষটিকে স্পর্শ করিলেন। সকলেই তাহাকে প্রণাম করিলেন।

মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া মাতা পুনরায় দেবদর্শনে গেলেন, তখন পুষ্পমাল্যে সুশোভিত হইয়া গোপাল এবং শ্রীমতী ভোজ্য গ্রহণ করিতেছিলেন, দেখিয়া মা প্রীত হইলেন। অল্পক্ষণ পরেই পূজারী গোপালের কণ্ঠমালাটি খুলিয়া আনিয়া মাতাঠাকুরাণীর কণ্ঠে দোলাইয়া দিয়া বলিলেন, "প্রভুঙ্কর এ মালি আপনঙ্কর উপযুক্ত।" ইহাতে সকলে সমবেতকণ্ঠে করতালিসহ সহর্ষ জয়ধ্বনি দিলেন। মাতাও বালিকার ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন। অতঃপর সকলে সেইস্থানে পরমানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল ষ্টেশনে প্রত্যাগত হইয়া। সকলে যখন সাক্ষিগোপালের মন্দিরে আনন্দে মগ্ন, ইত্যবসরে রেলগাড়ী যথাসময়ে

আসিয়া পুরী চলিয়া গিয়াছে। আবালবৃদ্ধবনিতা এতগুলি মানুষকে ষ্টেশনেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে, ইত্যাদি দুশ্চিন্তা এবং ভয় সকলের মন আচ্ছন্ন করিল। এমন অবস্থায় কি করা যায় ?—

বিলম্বে হইলেও, অপ্রত্যাশিতভাবে বিরাটকায় একটা মালগাড়ী শম্বুকগতিতে আসিয়া ষ্টেশনে থামিল। মালটানা-গাড়ীতে যে মানুষও যাতায়াত করিতে পারে, পূর্ব্বে তাহা জানা ছিল না। স্থানীয় রেল-কর্ত্তৃপক্ষের সহৃদয়তায় দুশ্চিন্তার অবসান হইল, পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়া গেল।

সাক্ষিগোপালের পর ভুবনেশ্বর।

ভুবনেশ্বর ষ্টেশনে ঈশ্বর বড়ু নামে জনৈক ব্রাহ্মণ মাতাঠাকুরাণীর পাণ্ডা হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সন্তানগণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু পাণ্ডাজী মিনতি জানাইলেন,—আপনার কাছে আমি অর্থের প্রত্যাশী নই মা। আপনাকে বাবা ভুবনেশ্বর দর্শন করাইব, এই সৌভাগ্য আমায় দিন। ঈশ্বর বড়ুর কাতরতায় মাতা তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

অতি সাধারণ তাঁহার গৃহ। সম্মুখে প্রশস্ত একটি প্রাঙ্গণ, মন্দির অতি সন্নিকট। মাতা এই সরল ব্রাহ্মণের কুটীরে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "এতক্ষণে প্রাণ যেন হায় ক'রে জুড়োলো।" পাণ্ডার আন্তরিকতায় মাতা প্রসন্ন হইলেন।

বিন্দুসরোবরে স্নানান্তে দেবদর্শনে যাওয়া হইল। বাবা ভুবনেশ্বরকে স্পর্শ করিয়া মাতাঠাকুরাণী জপ করিলেন ; তাঁহার নির্দ্দেশে অন্য সকলেও সেইভাবে জপ করিলেন। অনাদিলিঙ্গের গাত্রে অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, ভুবনেশ্বর—হরিহর। এই অর্দ্ধাংশ হরি—জগন্নাথ, অপরার্দ্ধ হর—মহেশ্বর। পুষ্পপত্র, অক্ষত, চন্দনাদি বিবিধ উপচারে মাতা হরিহরের পূজা ও আরতি সম্পন্ন করিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুনঃ পুনঃ মৃদুভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

পূজান্তে গৌরীকুণ্ডে যাইয়া পুনরায় সকলে স্নান করিলাম। পাণ্ডাজীর গৃহে প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল; তিনি কোন কার্পণ্য করেন নাই, পরিতোষ-সহকারে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর বড়ুর পরম আনন্দ, তিনি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছেন—সাক্ষাৎ জগজ্জননী তাঁহার পর্ণকুটীরে শুভাগমন করিয়াছেন।

পরদিবস গোশকটে অদূরবর্ত্তী উদয়গিরি ও খণ্ডগিরিতে যাইয়া তথাকার পার্ব্বত্য গুহাবলীদর্শনে এবং সেইস্থানে সুদূর অতীতে কত সাধক কতকাল ধরিয়া যে তপস্যা করিয়াছেন, সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এইসকল কথাশ্রবণে সকলের মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। মাতাঠাকুরাণী একটি গহ্বরে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎকাল জপ করিলেন। সেইস্থানের গাম্ভীর্য্য এবং সুন্দর পরিবেশ সত্যই তপস্যার অনুকূল।

এইভাবে শ্রীক্ষেত্রে মাতাঠাকুরাণীর সান্নিধ্যে এবং পুণ্য আবেষ্টনীর মধ্যে দীর্ঘকাল আনন্দে অতিবাহিত হইল। এইবার কলিকাতায় ফিরিবার পালা; কিন্তু মাতা বলেন,—কে যেন আমায় টেনে ধরেছে, যেতে দিচ্ছে না। কোন সন্তান, কোন দীক্ষার্থী হয়তো শীগ্যিরই আসবে; আরো দু-চারটে দিন অপেক্ষা করতে হবে এখানে।

এমন সময় সত্যই একদিন কয়েক ব্যক্তি ব্যাকুলভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন মাতার বাসস্থানে। সংবাদ পাইয়া তিনিও অন্তর্বাটী হইতে ব্যাকুলভাবে আসিয়া স্নেহকোমলকণ্ঠে বলেন,—এই-যে বাবা, তোমরা এসেছো! তোমাদের জন্যে আমি কলকাতা ফিরতে পারছি নে।

মনে হইল, নবাগত ব্যক্তিগণ যেন মাতার কতকালের পরিচিত এবং তাঁহাদিগকে ইষ্টনাম দানের ব্যবস্থা যেন পূর্ব্ব হইতেই স্থির করা ছিল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। বিভিন্নস্থান হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন; কেহ উৎকলবাসী, কেহ উৎকলপ্রবাসী।

মাতাঠাকুরাণী তাঁহাদিগের আহার এবং বাসের ব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। পরদিবস প্রত্যূষে ক্ষেত্রবাসীর বাটীতে তাঁহাদিগকে দীক্ষাদান

করিয়া মন্দিরে গিয়া মা স্বয়ং দেবদর্শন করাইয়া আনিলেন। ভক্তিনত-অন্তরে মাতার চরণবন্দনা করিয়া তাঁহারা বলিলেন, ক্ষেত্রধামেই যে মাতাঠাকুরাণীর দর্শন পাইবেন এবং এত সহজে তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, পূর্ব্বে তাঁহারা এতদূর আশা করিতে পারেন নাই।

মাতাঠাকুরাণী তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—যে-নাম পেলে, নিয়মমত জপ করবে। জগন্নাথক্ষেত্রে তোমাদের দীক্ষা হলো, তোমাদের ভাগ্যি ভাল।

পূর্ব্বে আরও একবার মাতাঠাকুরাণীর সহিত রথযাত্রাকালে লেখিকার জগন্নাথদেবের দর্শন লাভ হইয়াছিল, সম্ভবতঃ ১৩০৮ সালে*। মায়ের সঙ্গে রথের উপর উঠিয়া মহাপ্রভুকে স্পর্শ করিবার এবং তাঁহার সহিত রথরজ্জু টানিবার সৌভাগ্যও ঘটিয়াছিল। সে এক আনন্দদায়ক স্মৃতি!

ইতঃপূর্ব্বেই স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশে ভারতীয় ভাবধারা প্রচার করিয়া সকলের বরণীয় হইয়াছিলেন; উৎকল দেশেও তাঁহার গৌরব প্রচারিত হইয়াছিল। ঐবার মাতাঠাকুরাণী শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিলে 'বিবেকানন্দজীর গুরুমাতা' আসিয়াছেন বলিয়া উৎকলবাসীর মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। পাণ্ডা গোবিন্দ শৃঙ্গারী, বলরাম মিশ্র এবং কোন কোন পদস্থ ব্যক্তি মাতাঠাকুরাণীর দেবদর্শনাদি কার্য্যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

---

* ১৩০৮ (১৯০১) সালে মেদিনীপুর হইতে চারুহাসিনী দেবী মাতাঠাকুরাণীর জনৈকা শিষ্যাকে এক পত্রে লিখিয়াছেন,—

"* * আমি মাতাঠাকুরাণীর সহিত স্নানপূর্ণিমাতে জগন্নাথদেবের দরশন জন্য গিয়াছিলাম * *

মাতৃপূজা

শ্রীক্ষেত্র হইতে মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন ১৩১১ সালের মাঘ মাসে। এইসময় মা একদিন বলেন,—চলো, আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণকে আজ একবার দেখে আসি।

মায়ের সহিত কোনস্থানে যাইতে হইবে, ইহাতেই প্রচুর আনন্দ; সুতরাং কোনপ্রকার প্রশ্ন না করিয়া তাঁহার সঙ্গে শিবিকায় আরোহণ করিলাম। শিবিকা গিয়া উপস্থিত হইল ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে, বোসপাড়া লেনে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে। ভগিনী নিবেদিতা এবং জনৈকা শিক্ষয়িত্রী (পুষ্পমালা দেবী) মাতাঠাকুরাণীকে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানাইলেন; প্রণাম ও সম্ভাষণের পর মাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

এতক্ষণে সঠিক বুঝিতে পারিলাম, এই শাশুড়ী-ঠাকুরাণী অন্য কেহই নহেন,—সেই গোপালের মা।

তিনি তখন অতিবৃদ্ধা এবং চলচ্ছক্তিহীনা। তাঁহার সেবার অসুবিধা হইতেছিল জানিতে পারিয়া ভগিনী নিবেদিতা বৃদ্ধাকে নিজগৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। অত্যন্ত যত্নের সহিত তিনি তাঁহার সেবা করিতেন এবং তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। গোপালের মা সেইসময় শয্যাগত; তথাপি দেখিয়াই মনে হইল, অতিসাধারণ একখানি শয্যার উপর যেন সৌন্দর্য্যের এক প্রতিমা পড়িয়া রহিয়াছে,—প্রেম, সরলতা ও পবিত্রতার জীবন্ত বিগ্রহ!

মাতাঠাকুরাণীর কণ্ঠস্বর শ্রবণমাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে ও? আমার মা কি এলে? বৌমা এসেছো?

মা উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ মা, আমি এসেছি। কয়েকটি ফল মা সঙ্গে আনিয়াছিলেন, ফলকয়টি গোপালের মায়ের হাতে দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া বৃদ্ধা আদর করিলেন। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও বৌমা, আমার গোপাল কেমন আছে?

তিনি তো ভালই আছেন, মা উত্তরে বলিলেন।

তুমি সময়মত আমার কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিও মা। আমি গোপালের কাছে যাবো।

তিনি তো আপনার কাছেই রয়েছেন মা। মাতার নয়নযুগল বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

এই সাক্ষাতের বৎসরাধিক কাল পরেই গোপালের মা সাধনোচিত ধামে গমন করেন। শেষসময়ে ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সেবা করিয়া যে হৃদয়বত্তা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কৃতজ্ঞ-অন্তরে আমরা স্মরণ রাখিব।

ভক্তিমতী মায়েরা একদিন মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমুখ হইতে ঠাকুরের কথা শুনিতেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন,—ঠাকুর বলতেন, "দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী, কালীঘাটের কালী, আর খড়দার শ্যামসুন্দর—এঁরা জ্যান্ত। হেঁটে চ'লে বেড়ান, কথা কন, ভক্তের কাছে খেতে চান।" সকলে আবেদন জানাইলেন, মায়ের সঙ্গে তাঁহারা কালীঘাটে মা-কালী দর্শনে যাইবেন। মা তাহাতে সম্মত হইয়া গৌরীমাকে একদিন কালীদর্শনের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

গৌরীমা সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। রামলালদাদা, শিবরাম-দাদা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী নির্ম্মলানন্দ, অন্নপূর্ণার মা, সপত্নীক মাষ্টার মহাশয়-প্রমুখ অনেক পুরুষ ও নারীভক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনে কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে গিয়া মাতাঠাকুরাণীর সহিত মিলিত হইলেন। মাতাঠাকুরাণীর সহিত সকলে মা-কালীর চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন।

গৌরীমা ছিলেন স্বতন্ত্র এক ঘরে ভোগরন্ধনে ব্যাপৃত, মন্দির হইতে বাহির হইয়া সকলে সেইস্থানে গেলেন। বিরাট আয়োজন দেখিয়া সবিস্ময়ে মাতাঠাকুরাণী বলিয়া উঠিলেন,—ও গৌরমণি, এ-কি কাণ্ড! এত কি ক'রে সামলাবে তুমি!

তোমার কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে মা, গৌরীমা উত্তরে বল্লেন।

অবশ্য, গিরিবালা দেবীর বাটীর কন্যাগণও ভোগরন্ধনে গৌরীমাকে সাহায্য করিতেছিলেন। গিরিবালার পুত্র অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা বিপিনকালী দেবী গলবস্ত্র হইয়া তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য মায়ের নিকট নিবেদন জানাইলেন। গৃহ নিকটে নহে, গাড়ীতে করিয়া তাঁহারা তথায় গেলেন। বৃদ্ধা গিরিবালা গৃহদ্বারে প্রতীক্ষায় ছিলেন, সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইলেন। পূর্ব্বে ঠাকুর এই গৃহে পদার্পণ করিয়া যে-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, ভক্তগণ তথায় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

মা-কালীর ভোগ নিবেদন হয় অনেক বেলায়, সুতরাং গৃহকর্ত্রী বিবিধ ফলমিষ্টান্ন দিয়া অভ্যাগতগণের জলযোগের ব্যবস্থা করিলেন। গৃহের বালকবালিকাগণ স্তবপাঠ এবং গিরিবালা-রচিত মাতৃসঙ্গীত গাহিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইলেন।

প্রসাদ আসিতে অপরাহ্ণ হইল। গৌরীমা ভোগের জন্য নিরামিষ ব্যবস্থাই করিতেন। একে মা-কালীর প্রসাদ, তদুপরি বহুবিধ প্রসাদের সমাবেশ এবং গৌরীমার পরিবেশন, মাতাঠাকুরাণী এবং সাঙ্গোপাঙ্গগণ পরিতোষ-সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

সন্ধ্যাকালে বিদায়ের পালা। পরিবারের সকলে একে একে মাতা-ঠাকুরাণীর শ্রীপাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বৃদ্ধা গিরিবালার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া মা আবেগভরে বলিলেন,—আজ খুব আনন্দ পেয়ে গেলুম।

সকলে পুনরায় মন্দিরে গিয়া মা-কালীর সন্ধ্যারতি দর্শনান্তে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে আরও তিন-চারি দিন কালীঘাটে যাইবার সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তন্মধ্যে এক দিনের পূজা, ভোগ ও সকলের যাতায়াত ইত্যাদির যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ বসু। মায়ের সহিত যোগেনমা, রাজলক্ষ্মী এবং বসুপরিবারের অনেকে গিয়াছিলেন। দেবীমন্দিরে মাতাঠাকুরাণীর সান্নিধ্যে এইদিনও সকলে প্রভূত আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

আর একদিন খড়দহে শ্যামসুন্দর-দর্শনে যাওয়া হইল।

নির্দ্ধারিত দিবসে সকলে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীর বাসভবনে মিলিত হইলেন। দুইখানি নৌকার ব্যবস্থা হইল; স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং আরও কয়েকজন সন্তান সঙ্গে রহিলেন। গঙ্গাবক্ষে দুইখানি নৌকা চলিল খড়দহের দিকে। গঙ্গার শোভা, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ এবং কীর্ত্তনাদিতে পথিমধ্যেই সকলের অন্তর আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

শ্যামসুন্দরের মন্দিরের সমীপবর্ত্তী ঘাটে নৌকা গিয়া ভিড়িল। মাতাঠাকুরাণীকে পুরোভাগে রাখিয়া সকলে মন্দিরে গেলেন। মায়ের ইচ্ছানুসারে সুগন্ধি পুষ্পের মাল্য, মুকুট এবং প্রচুর ভোজ্যদ্রব্য নিবেদিত হইল দেবতার সেবায়। নববেশে সজ্জিত শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ-দর্শনে সকলেই মোহিত হইলেন। অতঃপর মাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা নাটমন্দিরে উপবেশন করিলেন। অনেক নবাগত আসিয়াও তথায় মিলিত হইল। স্থানটি উৎসবমুখর হইয়া উঠিল স্তবকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানে।

শ্যামসুন্দরের ভোগরাগের পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইল। গৌরীমা পরিবেশন করিতেছেন, এমন সময় লক্ষ্মীদিদি একখানি সুমধুর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনখানি সময়োপযোগী, বিষয়বস্তু ছিল—বৃন্দাবনে রাখাল বালকবৃন্দের সঙ্গে বনের মধ্যে মিলিত হইয়া নন্দ-দুলালের ভোজনানন্দোৎসব। পরম আনন্দে অতিবাহিত হইল দিনটি।

এইভাবে কয়েকমাস কলিকাতায় ভক্তসঙ্গে আনন্দে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ ১৩১২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মাতাঠাকুরাণী পল্লীভবনে গিয়া জননী শ্যামাসুন্দরীর সহিত মিলিত হইলেন। *

জননী ও কন্যার মধ্যে আজীবন এক অসাধারণ সম্বন্ধ বিদ্যমান ছিল। কন্যা জননীর কেবল সর্ব্বাধিক স্নেহাস্পদই ছিলেন না, কন্যাকে তিনি

(পত্রাবলীতে যে তারিখ দেওয়া হইল, তাহা ডাকঘরের শীলমোহরের তারিখ)

* মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ বাগবাজার, ১৪ মে, ১৯০৫

আমাদের দেশে যাওয়া বোধ হয় জ্যৈষ্ঠ মাসের আধা আধি নাগাদ হইবে।,

পরামর্শদায়িনী এবং অভিভাবিকারূপেও দেখিতেন, অন্তরে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন। বিশেষতঃ, রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর, প্রত্যেক জটিল ব্যাপারে কন্যার মতামতই জননীর নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হইত। পুত্রগণের নিকট শ্যামাসুন্দরী কোন দাবী বা প্রত্যাশা করিতেন না। অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া কন্যাকে বলিতেন,—সারু, মেয়ে হ'য়েও তুই-ই আমার বড় ছেলে। কন্যার উপর তাঁহার এতই ভরসা ছিল যে, সমগ্র সংসারের দায়িত্ব তাঁহারই উপর ন্যস্ত করিয়া দেহত্যাগের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—আমি ম'রে গেলেও এদের দেখিস মা, নইলে এরা ভেসে যাবে।

পিতা রামচন্দ্রও কন্যার নিকট কোন কোন বিষয়ে দাবী করিতেন, তাঁহার কথার মধ্যে একটা জোর ছিল। কিন্তু শ্যামাসুন্দরীর ভাবটি অন্যরকম; তিনি বলিতেন,—তুই যখন আমার মেয়ে হ'য়ে এসেছিস, আমার আবদার তুই ছাড়া আর কে পূরণ করবে মা? তাঁহার এই নির্ভরভাব-দর্শনে কন্যা অনেকসময় স্থির থাকিতে পারিতেন না।

জননীর প্রতি কন্যার ভালবাসা এবং ভক্তি ছিল সত্যই অপরিসীম। কন্যা তাঁহার সন্তোষবিধানে সতত সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার তীর্থ-দর্শনাদি বৃহৎ অনুষ্ঠানে যেমন, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও তেমনই দেখা গিয়াছে যে, জননীর প্রতি কন্যার মমতা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান কত গভীর। একটি উৎকৃষ্ট দ্রব্য কখনও হস্তগত হইলে, জননীর কথা তাঁহার স্মরণ হইত। একবার এক ভক্তিমতী নারী একখানি উত্তম নামাবলী মাকে প্রদান করিলে, মা অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—বড় সুন্দর নামাবলী, এখানি আমার মা পেলে বড় খুশী হবেন।

এইবার ৪ঠা পৌষ তাঁহার স্নেহময়ী জননী মাত্র একদিনের ব্যাধিতে ভুগিয়া কন্যার মুখচন্দ্র দর্শন করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করেন।[১]

---

১. মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ আমুড়, ২৯ মার্চ্চ, ১৯০৬

আমার মাতাঠাকুরাণির কুশল আর কি লিখিব তিনি স্বর্গারোহন গত

জননী শ্যামাসুন্দরী ইহলোক ত্যাগ করিলেন, আমাদিগের জন্য রাখিয়া গেলেন তাঁহার নয়নমণি দেবী সারদামণিকে। জগদ্ধাত্রীকে কন্যারূপে পাইবার জন্য তিনি জন্মজন্মান্তরে কত কঠোর তপশ্চর্য্যাই-না করিয়াছিলেন! সার্থক তাঁহার সেই তপস্যা!

জননি শ্যামাসুন্দরি, তোমার সুকুমারী কন্যা যে কেবল তোমাদিগের "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা" করিয়াছেন, তাহা নহে, তাঁহার চরণস্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্র হইয়াছে, জগদ্বাসী কৃতার্থ হইয়াছে। জগতে তোমার এই অপূর্ব্ব অবদানের নিমিত্ত, হে সুভগে, হে মহীয়সি জননি! কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে পুনঃপুনঃ আমাদিগের প্রণতি জানাইতেছি।

শ্যামাসুন্দরীর পারলৌকিক কার্য্য অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। স্বামী সারদানন্দ এই উপলক্ষে প্রচুর দ্রব্যসম্ভার কলিকাতা হইতে জয়রামবাটীতে পাঠাইয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের পরলোকগমনে সংসারের সকল দায়িত্ব শ্যামাসুন্দরীকেই গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। শক্তিমতী এবং বুদ্ধিমতী শ্যামাসুন্দরী যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিয়া সন্তানদিগকে লালনপালন করিতেন; কন্যাও মধ্যে মধ্যে জয়রামবাটীতে আসিয়া নানাভাবে জননীকে সহায়তা করিতেন। এখন জননীর অভাবে ভ্রাতাদের সংসার পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহারই

পৌষ ৪ রোজ ৺ প্রাপ্তি হইয়াছেন উহার শ্রাদ্ধাদি উত্তমরূপ হইয়াছে কিন্তু অর্থাদি বিস্তার ব্যায় হইয়াছে সামান্য দেনা রহিয়াছে বাকী সকল ভাল আছি

২. পোঃ আন্দুড়, ১০ নভেম্বর, ১৯০৬

তোমার ভক্তিযুক্ত একখানী পত্র পাইয়া সন্তোষ হইলাম * * আমার মাতাঠাকুরাণির আগামি মাহার ২২।২৪ নাগাদ সংবৎসরিকের শ্রাদ্ধ হইবেক

(দ্বিতীয় পত্রখানি কার্ত্তিক মাসে লিখিত, সুতরাং আগামী মাস বলিতে অগ্রহায়ণ মাস বুঝায়। জ্যোতিষগণের মতে, ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৪ঠা পৌষ, ইংরাজি ১৯. ১২. ১৯০৫, মৃত্যু হইলে তাঁহার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধাদি কার্য্য ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৩শে অগ্রহায়ণ, ইং ৯. ১২. ১৯০৬, তারিখেই অনুষ্ঠেয়।)

উপর আসিয়া পড়িল। ভ্রাতারা সাবালক হইয়াও বুদ্ধিপরামর্শের জন্য মাতৃসমা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর উপরই আজীবন নির্ভর করিয়াছেন। অধিকন্তু, কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়া অপ্রকৃতিস্থ। তাঁহার কন্যা রাধারাণীর লালনপালনের সম্পূর্ণ ভারও মাতাঠাকুরাণীই লইয়াছিলেন। সুতরাং এইসময় হইতে পরিবারের প্রতি তাঁহার কর্ত্তব্যভারের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেকের অভাব, অভিযোগ এবং ভালমন্দের প্রতিবিধান তাঁহাকেই করিতে হইত; তিনিই সকলের অভিভাবিকা এবং সংসারের প্রধান পরিচালিকা হইলেন।

মাতাঠাকুরাণীর পারিবারিক কর্ত্তব্য কেবল গৃহকর্ম্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহাকে চাষ-আবাদের তত্ত্বাবধানও করিতে হইয়াছে।* কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল, এবং তাহাতে যে-সকল মুনিষ-মজুর নিযুক্ত থাকিত, তাহাদের প্রতি তাঁহার অন্তর স্নেহপূর্ণ ছিল। স্বহস্তে পাতা পাতিয়া অতিযত্নে মা তাহাদিগকে পরিবেশন করিতেন, তাহাদিগকে উত্তম খাদ্য ভোজন করাইতে পারিলে তিনি তৃপ্ত হইতেন।

লেখিকা প্রথমবার যখন জয়রামবাটী গিয়াছিলেন, বালকবালিকা এবং মুনিষদিগের সন্তুষ্টির জন্য মা একদিন 'চড়ুই ভাতির' আয়োজন করিয়াছিলেন। মামা এবং মাতুলানীগণও তাহাতে যোগদান করেন। রন্ধনাদির ভার মামীদের হাতে ছিল। মা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মুনিষদিগকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন,—

"একবার জয়রামবাটীতে দিনমজুর খাটিতেছে, তাহাদের মধ্যে মুসলমানও আছে। মা মুড়ি দিতে বলিলেন, মুড়ি খাইয়া বিশ্রাম করিবে,

* মাতাঠাকুরাণীর পত্র—

পরে মা তোমার পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম আর আমার জাইবার কথা লিখিয়াছ এখন কিছুতেই জাও হইবেক নাই কারন এখানে চাস উপস্থিত এ ভার কেহউ বহন করিতে স্বক্ষম হইবেক নাই তজন্য আমাকে থাকিতে হইল পরে জখন জাও হইবেক সংবাদ লিখিব

পরে স্নান করিয়া খিচুড়ি খাইবে। যাহাকে মুড়ি দিতে বলিয়াছিলেন, সে স্পর্শদোষের ভয়ে দূর হইতে তাচ্ছিল্য করিয়া দিতেছিল ; ইহাতে মা আপত্তি করিয়া স্বয়ং তাহাদিগকে বসাইয়া খাওয়াইলেন। পরে তাহারা স্নানান্তে যার যার পাত্র লইয়া আহারে বসিল। মা হাতায় করিয়া তাহাদিগকে খিচুড়ি পরিবেশন করিলেন। খিচুড়ি অত্যন্ত গরম ছিল বলিয়া মা খিচুড়ির পাত্রটী রাখিয়া নিজে খিচুড়িতে বাতাস করিতে লাগিলেন। দিনমজুরগণ আহার করিয়া তৃপ্তি পাইল, মায়ের আদর-যত্নে মুগ্ধ হইল। এইকারণে লোকেরা 'মা' বলিতে অজ্ঞান হইত।"

পল্লীভূমির প্রতি মাতাঠাকুরাণীর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কোলাহল-ময় শহর অপেক্ষা শান্ত পল্লীকেই মা অধিক প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। এইহেতু অবসর বা সুযোগ উপস্থিত হইলেই তিনি পল্লীভবনে চলিয়া যাইতেন, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং নানাবিধ অসুবিধাসত্ত্বেও তথায় বাস করিতেন। পল্লীবাসিগণও তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় থাকিত। তিনি অভাবগ্রস্তকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন, তাহারাও মাতাকে অভিভাবিকার মতই শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত।

কেবল আত্মীয়পরিজন এবং পল্লীবাসী নহে, যে-সকল সন্তান মাতৃ-চরণ দর্শনে জয়রামবাটীতে যাইত, তথায় তাহারা মাতাকে অতি সহজ এবং আপনভাবে পাইত। তাহাতে তাহাদের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হইত ; এমন অবাধভাবে মাকে পাওয়া কিন্তু কলিকাতায় সম্ভব হইত না। তাহাদিগের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য স্নেহময়ী মাতা কত ক্লেশ স্বীকার করিতেন। পূজনীয়া মাতা এবং গুরু হইয়াও তিনি শিষ্য এবং অভ্যাগতদিগের জন্য সদা সন্তুষ্টচিত্তে সকল ব্যবস্থা করিতেন ; অনেকসময় তাহাদিগের জন্য নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য স্বয়ং রন্ধন করিতেন, তাহাদিগকে স্বয়ং পরিবেশন করিতেন। এমন-কি কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার সেবাশুশ্রূষাও স্বহস্তে করিয়াছেন। জয়রামবাটীতে তিনি একান্তভাবে সকলেরই নিকট ছিলেন অতি সহজ এবং ঘরের মা।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল জয়রামবাটীতে মাতাঠাকুরাণীর সরল পল্লী-জীবন এবং স্নেহবাৎসল্যের একটি সুন্দর বিবরণ লিখিয়াছেন,—

"সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, মা তখন তাঁহার ঘরের ভিতর তক্তপোষের উপরে বসিয়া আছেন এবং ঘরের ভিতর কয়েকটি গ্রাম্য বালকবালিকা রহিয়াছে, আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কোথায় বসিব ইতস্ততঃ করিতেছি, কারণ শহুরে শিক্ষার প্রভাবে একদম মাটিতে বসিতে দ্বিধা-বোধ হইতেছিল, অথচ ঘরের মাটির মেজেতে কোনরকম আসনও ছিল না। শেষে অনেকটা হতভম্ব হইয়া মাকে বলিলাম, 'মা, আমি আপনার কাছে বসতে পারি এখানে?' মা বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ বাবা, বোসো, বোসো।' আমি গিয়া তক্তপোষের উপর মার নিকটে বসিলাম। এ কাণ্ড-জ্ঞান তখনও হয় নাই যে, মায়ের সঙ্গে সম আসনে বসিতে নাই। মা ঐসব গ্রাম্য বালকবালিকাদিগকে তাহাদের আত্মীয়স্বজন কে কেমন আছে, ক্ষেতে কি পরিমাণ ধান জন্মিয়াছে, এইসব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। তাহার ভিতর কোন কোন বালক চারিটি পয়সা মায়ের পাদপদ্মতলে রাখিয়া, কেহ কেহ হয়তো কিছু কম বা বেশী রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মা, এরা সব কে?' মা উত্তর করিলেন, 'এইসব আশেপাশের গ্রামের।' দেখিলাম, যখন ঐসব ছেলেমেয়েদের কেহ কেহ প্রণাম করিয়া পাদপদ্ম-তলে পয়সা রাখিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, তখন কাহাকেও কাহাকেও মা বলিতেছিলেন, 'তোদের আবার একি, পয়সা দেওয়া কেন?' উঠিয়া যাইবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রসাদ লইয়া যাইতেছিল।"

ইহার পর ভোজনের ব্যবস্থা।

"মা স্বহস্তে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আমাদের খাওয়াই-লেন। * * * একটি বাটির ভিতর ভাত, দাল, তরকারি সব একত্রিত করিয়া উহাকে ভক্তের জন্য প্রসাদে পরিণত করিয়া, আমরা যেখানে খাইতেছিলাম, সেখানে লইয়া আসিলেন এবং বাটি হইতে কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের প্রত্যেকের পাতে পরিবেশণ করিলেন। আমার

আজও, এই সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হওয়া সত্ত্বেও, অতি সুস্পষ্ট-ভাবে মনে আছে যে, সেদিন জয়রামবাটীতে খাইতে বসিয়া মায়ের হাতের রান্না পায়েস যেমন খাইয়াছিলাম, অমন সুস্বাদু পায়েস ইহজীবনে আর কোথাও খাই নাই। * * *

"বিকালবেলা রওনা হইবার প্রাক্কালে মাকে একান্তে বলিলাম, 'মা, আপনার একটু প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই কলকাতায়।' অমনি মা বোঁদে প্রসাদ করিয়া দিলেন,—অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। তা'ছাড়া সঙ্গে আরও মিষ্টি দিয়া দিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সেই প্রসাদের কিয়দংশ আচার্য্য স্বামী সারদানন্দকে এবং ভক্তকুল-চূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দিয়াছিলাম।

"শ্রীশ্রীমায়ের যে মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি, তাহা স্মরণপথে উদিত হইলেই, মনে আসে আচার্য্য স্বামী প্রেমানন্দের কথা, 'রাজরাজেশ্বরী ঘর নিকুচ্ছেন, ছেলেদের এঁটো পাড়ছেন।' আমার দেখা মা হচ্ছেন মা-ই, সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণকামনায় ব্যাপৃতা।"

"আজ মনে হয়, তখন অবশ্য বয়সের অল্পতার দরুণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই, মহাশক্তিস্বরূপিণী হইয়াও নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া রাখিয়া কি ভাবে সাধারণ পল্লীবধূরূপে তুচ্ছাদপিতুচ্ছ দৈনন্দিন কর্ম্ম করিতে হয়, তাহার তুলনারহিত, উপমারহিত দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে, ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র শক্তিমদমত্ত নরনারীর সম্মুখে তিনি রাখিয়া গিয়াছেন; আর রাখিয়া গিয়াছেন—অপার করুণার, অসীম কৃপার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।"

অতঃপর দিনের শেষে যাত্রাকালে—

"বিকালবেলা আমরা যখন কলিকাতা আসিবার জন্য রওনা হইলাম, তখন মা বাড়ীর বাহিরে একটুখানি দূর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আমি পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, মা তখনও দাঁড়াইয়াই আছেন, আমাদের দিকে চাহিয়া। করুণাময়ী, অপার তোমার করুণা! যে যত অযোগ্য, যে যত অধম, তাহারই প্রতি তোমার তত অধিক করুণা।"

১৩১৩ সালের বৈশাখ মাসে, মাতাঠাকুরাণী যখন জয়রামবাটীতে, তখন তাঁহার জন্মভূমিতে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লেখিকার উপস্থিত হয়। সৌভাগ্যই বটে! কারণ, কলিকাতা হইতে যাত্রাকালে জয়রামবাটীতে যাইবার কোন উদ্দেশ্য ছিল না, গন্তব্য ছিল তারকেশ্বর। বাবা তারকনাথের দর্শনপূজা সমাপনান্তে, গৌরীমার মনে এক সংকল্পের উদয় হইল, বলিলেন,—জয়রামবাটী যাবি মা-ঠাকরুণের কাছে? পায়ে হেঁটে যাওয়া, বেশ হবে, পারবি?

মাতাঠাকুরাণীর দর্শন এবং এইভাবে গিয়া তাঁহার পল্লীভবনে সহসা উপস্থিত হইতে পারিলে, তাহাতে অভিনবত্ব এবং আনন্দ দুইই হইবে; সুতরাং গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপ এবং পথশ্রম অগ্রাহ্য করিয়া মাতৃচরণ বন্দনামানসে দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে আমরা যাত্রা করিলাম।

আমি পথক্লেশে একেবারেই অনভ্যস্ত, অল্পদূর অগ্রসর হইতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। এক পুষ্করিণীর ছায়াশীতল তীরে বিশ্রাম করিতে হইল। পল্লীর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের অবস্থাদর্শনে ডাব, তালশাস, খেজুর ইত্যাদি সহজলভ্য ফল সংগ্রহ করিয়া আনিলেন, ইহাদ্বারা গৌরীমা তাঁহার নারায়ণশিলা দামোদরজীর ভোগ সমাপন করিলেন। দেহের ক্লান্তি দূর হইল, ক্ষুৎপিপাসারও নিবৃত্তি হইল। কিন্তু তখনও বার-তের ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ আমাদিগকে সেই দিবস অগ্রসর হইতে দিলেন না, তাঁহার গৃহেই আমরা রাত্রিযাপন করিলাম।

পরদিবস চলিতে চলিতে খানাকুল-কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। সহৃদয় পল্লীবাসিগণ সাগ্রহে দামোদরজীর পূজাভোগের আয়োজন করিয়া দিলেন। সেইস্থান হইতে পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল। গৌরীমা উৎসাহ দিতেন,—কষ্ট করলে তবে তো কেষ্ট পাওয়া যায়। পায়ে হেঁটে যাচ্ছ, মা-ঠাকরুণ তোমায় কত আদর করবেন, দেখবে'খন। তাঁহার কথায় দেহে এবং মনে শক্তিসঞ্চার হইত।

এইভাবে পথ চলিয়া চতুর্থ দিবসে আমরা মাতৃসকাশে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, অকস্মাৎ আমাদিগকে দেখিতে

পাইয়া মা বিস্মিত এবং আনন্দিত হইলেন। তারকেশ্বর হইতে পদব্রজে জয়রামবাটীতে গিয়াছি জানিতে পারিয়া মা অনেক আদর করিলেন এবং গৌরীমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"যা'রে ঘুমালে চিয়াতে নারি, করলে বিধি দণ্ডধারী!"

নলিনীদিদি, সুশীলা, রাধারাণী প্রভৃতি ভগিনীদের সহিত পুনরায় মিলিত হইলাম। মাতুলানীগণ আমাদের যথেষ্ট আদরযত্ন করিতেন। মাতাঠাকুরাণী সিংহবাহিনীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী বাঁড়ুয্যেদের পুকুরে প্রত্যহ স্নান করিতে সঙ্গে লইয়া যাইতেন, নিকটে বসাইয়া স্বহস্তে প্রসাদ দিতেন, এক শয্যায় স্থান দিতেন। মাতার স্নেহকরুণার অন্ত নাই!

অল্পবয়স্ক বালকবালিকাগণ মায়ের সান্নিধ্য কামনা করিত। কেবল নিজ পরিবারের নহে, পল্লীর বালকবালিকারাও তাঁহার মুখে নানারকমের ছড়া ও কাহিনী শুনিতে সমবেত হইত। তাহাদের সঙ্গে মাতাও যেন শিশুর মতই হইয়া যাইতেন, তাহাদের আবদার রক্ষা করিতেন।

একদিন সন্ধ্যাবেলা রাধারাণী মাকে আবদার জানায়, তাহাকে গান শুনাইতে হইবে। মা সুর করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

'বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে,'......

—এটা শুনেছি, নতুন একটা বল।

—'ঝিকিমিকি তারা, বনকে বাহ্‌রা'......

রাধারাণী ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল,—পিসিমা, তুমি একটা গান গাও। অগত্যা মা গান আরম্ভ করিলেন,—

'কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জকাননচারী।
মাধব মনোমোহন, মোহন মুরলীধারী॥......
হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল মন আমার॥'

একদিন মা শিহড়ের শান্তিনাথ শিব দর্শন করাইলেন। শিহড়ে মায়ের মাতুলালয় এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাটীও দেখিয়া আসিলাম। তাজপুরে বিশালাক্ষী-তলায়ও মা লইয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরও দর্শন হইল।

দেবী সিংহবাহিনীর প্রসঙ্গে মা বলিয়াছেন,—এদেশের সিংহবাহিনী জাগ্রত দেবী, তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে অভীপ্সিত মিলে। এই দেবী আমায় কতভাবে যে দয়া করেছেন, তা' বলতে পারিনে। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাবার জন্যে যখন আমার মন ব্যাকুল হয়েছিলো, তখন এই দেবীর শরণ নি। ইনি আমার দক্ষিণেশ্বর যাবার উপায় ক'রে দেন।

—তুমি যাও মা, সিংহবাহিনীকে তোমার প্রার্থনা জানিয়ে এসো। মাতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সিংহবাহিনীর মন্দিরে গিয়া অন্তরের প্রার্থনা নিবেদন করিয়া আসিলাম।

জয়রামবাটীর জনৈকা বৃদ্ধা বলিয়াছেন,—এক বছর জল হয়নি, সিংহবাহিনীকে মা বললেন জল দিতে,—ছেলেরা কাঁদবেক, পিসিমা, ধান হলোনি ব'লে। মা পূজা করতে বসতেই গুড়গুড় ক'রে কি জল এসলো, খুব ধান হলো, মার খুব সন্তোষ!

এইবার জয়রামবাটীতে মায়ের নিকট কতিপয় বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালী সন্তান,—কেহ দীক্ষার্থী, কেহ সন্ন্যাসপ্রার্থী হইয়া, আবার কেহ-বা দুঃখ দৈন্য জানাইতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একদা সন্তানগণকে নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে মা বলিলেন। প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগের করণীয় কার্য্যের দিন স্থির করিয়া দিলেন।

কাহাকেও সান্ত্বনার কথা বলিয়া, কাহারও জটিল তত্ত্বের সহজ কথায় মীমাংসা করিয়া, কাহাকেও অভীপ্সিত বস্তু দান করিয়া সকলকেই মা কৃতার্থ করিতেন।

এক স্থূলোদর ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, অত্যন্ত সংশয়চিত্ত। পুরুষগুরুতে তাঁহার অবিশ্বাস; নারীগুরু সম্বন্ধেও ধারণা উচ্চ নহে,—নারী আবার সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের কি বোঝে? বস্তুতঃ এই ব্যক্তি দীক্ষার্থী হইয়া আসেন নাই, লোকমুখে মাতাঠাকুরাণীর গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার আচরণ এবং গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই যেন তিনি আসিয়াছিলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে মাতা বলিলেন,—বাইরের ঘরে মোটামতন

ছেলেটিকে ব'লে এসো, আমি তা'কে ডাকছি। মায়ের আদেশ তাঁহাকে গিয়া জানাইলাম। তিনি উপস্থিত হইলে মা গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—মায়ের শক্তি নেই তো জগৎটা কা'র শক্তিতে চলছে? মা নইলে সন্তানের কি গতি হয়, কে তা'কে রক্ষে করে, বলতো বাবা?

মায়ের সান্নিধ্যে বসিয়া, তাঁহার ভাব দেখিয়া, তাঁহার কথা শুনিয়া সেই সন্তানের আশ্চর্য্য ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তিনি মায়ের চরণ-যুগল স্পর্শ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—মাগো, আমি মহা-অবিশ্বাসী, মহা-অপরাধী, কি গতি হবে মা, আমার?

স্নেহার্দ্রকণ্ঠে মা তখন বলিলেন,—ভয় কি বাবা, ভালই হবে। ঠাকুর বলতেন, "পানী পীনা ছান্‌কে, গুরু লেনা জান্‌কে।' গুরুকেও বাজিয়ে নেওয়া ভাল।" কাল সকালে চান ক'রে কাচাকাপড়ে এসো, তোমায় নাম দেবো। সকল অবিশ্বাস ঘুচে যাবে তোমার।

পরদিবস এই সন্তানটিরও দীক্ষা হইয়া গেল। সেইদিন হইতেই তাঁহার আচরণে মনে হইল, মাতৃকৃপায় তাঁহার সংশয় দূর হইয়া অন্তরে ভক্তিবিশ্বাসের উদয় হইয়াছে।

ছোটমামীর পিতা এইসময় ছোটমামী এবং রাধারাণীর অলঙ্কার ও দুইশত টাকা হস্তগত করিয়া তাহা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করেন। ইহাতে ছোটমামীর মনের অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং মাতা-ঠাকুরাণীকেও উত্যক্ত করিতে থাকেন। অলঙ্কারাদি ফিরাইয়া দিবার জন্য ছোটমামীর পিতাকে মাতাঠাকুরাণী স্বয়ং অনেক অনুরোধ জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই তিনি তাহা ফিরাইয়া দিলেন না। [১]

১. জনৈক উকিলকে লিখিত মাতাঠাকুরাণীর পত্র—

পোঃ আনুড়, ২৯ জানুয়ারী, ১৯০৭

পরমশুভাশির্ব্বাদ বিজ্ঞাপনঞ্চাদৌ বিশেষ পরে বাবাজীবন আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি এই ছোটো বৌউ গঙ্গাস্নান করিব বলিয়া পিত্রালয়ে সমস্ত গহনা ও ২০০৲ টাকা এবং রাদুর গহনাও সমস্ত হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে এবং এখন

অগত্যা এই বিষয় মাতা কলিকাতায় কয়েকজন সন্তানকে লিখিয়া জানাইলেন। তাঁহার অশান্তির কারণ জানিতে পারিয়া শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় এবং ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে জয়রামবাটীতে চলিয়া আসিলেন। ললিতমোহন উৎসাহী এবং চতুর ব্যক্তি, সাহেবের পোষাকে সজ্জিত হইয়া পালকীতে চড়িয়া তিনি ছোটমামীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পোষাকে এবং কথায় তাঁহাকে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী মনে করিয়া সেই ব্রাহ্মণ সন্ত্রস্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে তাঁহার সহিত জয়রামবাটীতে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট অলঙ্কার প্রত্যর্পণ করিলেন। [২]

শ্যামাসুন্দরীর স্বর্গারোহণের বৎসরকাল পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ রামপ্রিয়া দেবীও পরলোকগমন করেন। [৩] প্রসন্নমামা পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মাতাঠাকুরাণীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, —দিদি, তুমি অনুমতি না দিলে একাজ কিছুতেই হবে না। তবে, ভেবে দেখো, আমার মেয়েদের কে দেখবে ? অসময়ে কে আমার সেবা করবে ? তুমি অনুমতি দাও, তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

বলে ও গহনা কাহাকে দিইব নেই ভাবনায় ছোটো বৌউ ভয়ানক পাগল হইয়া গিয়াছে আমিও ভয়ানক কষ্টে পড়িয়াছি জানিবেন ইহার উপায় কি করা হয় সত্বর সংবাদ লিখিবেন আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি।'

২. পোঃ আনুড়, ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭

পরে বাবাজীবন তোমার আজ পত্র পাইয়া আমি সন্তোষ হইলাম আর রাতুর গহনা সব পাওয়া গিয়াছেন অনেক কষ্টের উপর কেবল ললিতবাবু এবং মাষ্টার মহাশয় আসিয়াছিলেন বলিয়া পাওয়া গেল নচেৎ পাইবার আর আসা ছিল না কেবল ঠাকুরের কৃপায় আদায় হইল নচেৎ আর উপায় ছিল নাই।

৩. পোঃ আনুড়, ৪ এপ্রিল, ১৯০৭

আমাদের ভয়ানক বিপদ হইয়া গিয়াছে তাহার কারন আমাদের বড় বৌউ ২২ ফাল্গুন স্নান আহার করিয়া পেটে একটা বেদনা ধরিয়া দুই একবার ভেদ ও বমি করিয়া রাত্রি ৯টার সময় মারা পড়িলেন সেই জন্য বড়ই মনের কষ্টে কালযাপন করিতেছি সকলই তার ইচ্ছা

মা বলিলেন,—বিয়ে একবার। ছাখ দেখি, মেয়েরা কেমন থাকে। আমি রয়েছি, তোর সেবার ভাবনা কি? বিয়ে করার ইচ্ছে হ'লেই ছেলেরা বলে, অসময়ে কে আমায় দেখবে, শেষে হাসপাতালে মরতে হবে।

কিছুদিন যায়, মামা পুনরায় বিবাহের অনুমতির জন্য সহোদরাকে বুঝাইতে লাগিলেন। উত্তরে মা তাঁহাকে বলেন,—বিয়ে করবি তো কর, নিজের ইচ্ছেয় কর। তুই আমাকে জড়াচ্ছিস কেন? শাস্ত্রে নিয়ম আছে বটে, তবু গেরো। একদিকে মেয়েরা তোকে শত্রু ভাববে, আর একদিকে যে আসবে সে নিতান্ত ভালমানুষটি না হ'লে, তোর তুই মেয়েকে শত্রু ভাববে। তোরই অশান্তি বাড়বে। আমি আর কি বলবো বল? ঠাকুর তোর ভাল করুন।

অবশেষে ১৩১৪ সালের বৈশাখ মাসে বড়মামার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল শিহড়ের সুবাসিনী দেবীর সহিত। খুবই সুন্দরী ছিলেন এই মামী—গৌরবর্ণা, সুগঠনা এবং স্বাস্থ্যবতী।

জয়রামবাটী হইতে দীর্ঘকাল পরে ১৩১৪ সালের আশ্বিন মাসে মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় ফিরিয়া বলরাম-ভবনে কয়েকদিবস অবস্থান করেন।* গিরিশচন্দ্র ঘোষ দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়া মায়ের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, মা-ঠাকরুণ যদি পূজার দিনে তাঁহার বাটীতে পদার্পণ করেন, তবেই তাঁহার পূজা সার্থক হইবে।

অসুস্থতানিবন্ধন পূজামণ্ডপে মা উপস্থিত হইতে পারিবেন না, সকলের এইরূপ ধারণা হইয়াছিল। বীরভক্ত গিরিশচন্দ্রের প্রাণ তথাপি 'মা, মা,'

---

* মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ বাগবাজার, ১০ অক্টোবর, ১৯০৭

আমার দেশে জ্বর হওয়ায় ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটে বলরাম বাবুর বাটীতে আজ ৭ দিন হইল আসিয়া আছি। কালীপূজা পর্য্যন্ত এখানে থাকিবার ইচ্ছা আছে। এখানেও আমার শরীর ভাল থাকছে না। তোমার মামি, লক্ষ্মীদিদি, রাধু সব ভাল আছে। এখানে মাকুর জ্বর হয়েছে। গিরীশবাবুর বাটীতে দুর্গাপূজা হইলে বিশেষ সেইজন্য আমার এখানে আসা জানিবে।

করিয়া কাঁদিতেছিল। মহাষ্টমীর সন্ধ্যাকালে তিনি মায়ের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন; কিন্তু যখন সংবাদ আসিল যে, মায়ের উপস্থিতি সম্ভব নহে, নৈরাশ্যে তিনি অন্তর্বাটীতে গিয়া বসিয়া রহিলেন। দুঃখে ও অভিমানে পূজামণ্ডপে আর গেলেন না। তাঁহার মনে হইল, মায়ের অনুপস্থিতিতে পূজার অনুষ্ঠান সকলই নিরর্থক,—প্রাণহীন। চিন্ময়ী মাতার দর্শনই যদি না হইল, কি হইবে মৃন্ময়ী প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া!

তাঁহার আর্ত্তি যাইয়া স্পর্শ করে মায়ের অন্তর, রাত্রিতে মা অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন,—আমার মন টানছে, গিরিশ যে আমায় বড্ডো ডাকছে।

উৎসাহ দেন গৌরীমা,—ভক্তের প্রাণের টান, চল-না মা, একবার।

তবে চল, আর দেরী নয়। এই বলিয়া যেমন ছিলেন সেই বেশেই একখানা উত্তরীয়ে দেহ আবৃত করিয়া বলরাম-ভবনের পশ্চাদ্দ্বার দিয়া মা পদব্রজে গিরিশচন্দ্রের বাটীতে চলিলেন। গৌরীমা, গোলাপমা এবং আরও কয়েকজন ভক্তমহিলা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

ভক্তের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া মা বলেন,—দোর খোল, আমি এসেছি। আনন্দদায়িনী মাতা সত্যই আসিয়াছেন, দেখিয়া সকলে বিস্ময়-বিহ্বল হইল। 'মা এসেছেন, মা এসেছেন,' এই আনন্দধ্বনি পলকের মধ্যে পুলক সঞ্চার করে সমগ্র গৃহময়। মা আসিয়াছেন, নৈরাশ্যের মধ্যে এই আশাতীত সংবাদ গিরিশচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইবামাত্র আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন পূজামণ্ডপে।

সাক্ষাৎ জগজ্জননীর আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহার মন্দিরে! 'মা, মা, মা,' বলিয়া তিনি মাতাঠাকুরাণীর শ্রীচরণে জবাপদ্ম-বিল্বপত্র অঞ্জলি দিলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে এবং ভক্তিগদগদকণ্ঠে বলিলেন,—আজ গিরিশের পূজা সার্থক, গিরিশের জীবন ধন্য!

দশভুজার প্রতিমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মাতা চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান,—নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। সমাগত ভক্তমণ্ডলী সকলেই শারদীয়া মহাষ্টমীর শুভতিথিতে সর্ব্বার্থসাধিকা মাতার চরণে মহানন্দে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতে পারিয়া ধন্য হইলেন।

বলরাম-ভবনে এক সাধুর কাহিনী।

একদিন রাধারাণী, বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি চারিজন কুমারী কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে বলরাম-ভবনে একতলার একটি কক্ষে প্রবেশ করে। এক সাধু তথায় জপ করিতেছিলেন। কুমারীদিগকে দর্শনমাত্র তিনি যুক্তকরে প্রণাম জানাইয়া কহিলেন,—মায়েরা আমার উপর প্রসন্ন আছো তো?

কুমারীগণ তথায় সাধুকে দর্শন করিয়া অপ্রতিভ হইয়াছিল, এখন এইরূপ প্রশ্নে হতভম্ব হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কোন উত্তর না পাইয়া সাধু তাহাদের একজনের হাত ধরিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—আমার ওপর তোমরা প্রসন্ন কি-না, এর উত্তর না দিলে, ছাড়বো না।

অবশিষ্ট তিনজন পলায়ন করিল এবং মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া ঘটনা জানাইল। অল্পকাল পরেই সেই কন্যাও আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিবরণ শুনিয়া মা বলিলেন,—এর ভেতর একটা রহস্য আছে।

উপস্থিত একজন মহিলা কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধুর আবার কি রহস্য মা?

মা তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—যা'রা শক্তিসাধনা করে, তা'দের সাধনায় প্রসন্ন হ'লে জগদম্বা নানারূপে পরীক্ষা করেন, ছলনাও করেন। এই সাধুর জীবনে তেমন অবস্থা একবার এসেছিলো, কিন্তু মাকে তিনি চিনতে পারেন নি, হেলায় হারিয়েছেন। তাই এখন মাতৃরূপ দেখলেই তাঁর আশা হয়, আশঙ্কাও হয়,—মা কি এলেন! তাঁর জপের সময়ে কুমারী মেয়েরা সামনে গেছে, তিনি ভেবেছেন,—কুমারীমূর্ত্তিতে জগদম্বা যদি এসে থাকেন, তাই কুমারীদের প্রসন্নতা ভিক্ষে কচ্ছিলেন।

সাধুটির শক্তি-উপাসনা। সাধনাদ্বারা জগদম্বাকে প্রসন্ন করবেন, প্রত্যক্ষ করবেন, এই ছিল তাঁর সংকল্প। অনেক জপতপও করেছেন, কিন্তু মায়ের দর্শন হয় না। মনে তাঁর ভারী দুঃখু।

একবার পাহাড়ের দেশে নদীতে চান কচ্ছিলেন, আর মনে মনে ঐ কথাই তোলপাড় হচ্ছিল,—মায়ের দয়া হলো না। কোথা হ'তে পঞ্চদশী এক কন্যা এসে তাঁর পাশেই কাপড় কাচতে আরম্ভ করলেন। খুব চঞ্চল,

বেশ হাসিখুশী। সাধুর মনে রাগ হয়,—ডাগর মেয়ে, আর জায়গা পেলে না! আমি চান কচ্ছি, আর ও জল ছিটোচ্ছে!

পর-পর দু'দিন চললো এরকম। সাধুর মনে রাগ জমছিলো। তৃতীয় দিনেও কন্যা বেণী দুলিয়ে, আহ্লাদীভঙ্গীতে এসে কাপড় কাচতে লাগলেন। এবার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে সাধুর, বলেন,—হেই ছুঁড়ী, আক্কেল নেই তোর? সাধুমানুষ চান কচ্ছেন, তুই রোজ রোজ এখানেই এসে কাপড় কাচছিস? কেন, আর জায়গা পেলিনে তুই?

অনুযোগ শুনে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিলেন কন্যা তাঁর কাপড়চোপড়। সাধুর দিকে একবার তাকালেন, তারপর হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে সাধু ভাবছিলেন নিজের জীবনের কথা,—বৃথাই ব'য়ে গেল জীবনটা, কিছুই হলো না। এত ক'রেও মা'র দয়া পেলুম না,—বেটী পাষাণী!

গভীর নিশীথে স্বপ্নে দর্শন করেন এক দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! সেই পঞ্চদশী কন্যা এসে অভিমানের সুরে বলছেন,—দয়া ক'রে তো গিয়েছিলুম তোর কাছে। তুই আমায় ব'কে তাড়িয়ে দিলি কেন?

বেদনায় স্বপ্ন ভেঙ্গে যায় সাধুর, করাঘাত করেন নিজের শিরে। ছুটে যান সেই ঘাটে, পাগলের মত ছুটোছুটি করেন চারিদিকে। আহা, যদি আর একবার,···একটিবারমাত্র দর্শন পান! মায়ের চরণে প'ড়ে অপরাধের মার্জ্জনা চাইবেন। কিন্তু আর ফিরে আসেন না সেই দেবীমূর্ত্তি।

মাতাঠাকুরাণী বলিলেন,—সাধু সময়ান্তরে এসে এর জন্যে আমার কাছে কত-না আক্ষেপ করলেন! কী তাঁর বুকফাটা কান্না! গভীর অনুশোচনায় আমায় বললেন,—দর্শন পেয়েও চিনতে পারলুম না। দর্শন পেয়ে কোথায় তাঁর স্তুতি করবো, না, তুই-তোকারি ক'রে মাকে তাড়িয়ে দিলুম। এ অনুতাপ, এ অপরাধের কি শেষ আছে মা?

ঘটনাটি শেষ করিয়া মাতা কহিলেন,—আমার এই সাধুছেলের মেজাজটা বড্ডো কড়া কি-না, তাই মা তাঁকে সইতে পারলেন না, এসেও ফিরে গেলেন। মাতৃসাধনা যেমন সহজ, আবার তেমনি কঠিন।

কোন নারীর প্রতি অন্যায় আচরণ করতে নেই, কোন নারীকে তাচ্ছিল্য করতে নেই, বিশেষতঃ কুমারী কন্যাদের। কে জানে, মা কখন কোন্ মূর্ত্তিতে এসে ছলনা করবেন ?

জগদ্ধাত্রীপূজার সময় প্রায় প্রতি বৎসরই মাতাঠাকুরাণী পল্লীভবনে যাইতেন এবং সমারোহের সহিত পূজা উদ্‌যাপন করিতেন। জগদ্ধাত্রী-পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের উদ্দেশ্যে কয়েক বিঘা ধানজমি মাতা উৎসর্গ করেন।* কলিকাতা হইতে ভক্তগণও পূজার উপকরণ পাঠাইয়া দিতেন। মাতা স্বয়ং অতিশয় আগ্রহের সহিত দেবীপূজার আয়োজন ও তত্ত্বাবধান করিতেন, সকলের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখিতেন। সমগ্র পল্লী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

মাতা পল্লীভবনে উপস্থিত থাকিলেই ইদানীং তাহা উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইত, তদুপরি জগদ্ধাত্রীপূজার অনুষ্ঠান। মায়ের বাটীতে দেবী জগদ্ধাত্রীর অলৌকিক আবির্ভাবের কাহিনী ঐ অঞ্চলে সুবিদিত। সুতরাং এই উপলক্ষে কেবল জয়রামবাটীর নহে, চতুষ্পার্শ্বস্থ পল্লী হইতেও আমন্ত্রিত আত্মীয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং অনিমন্ত্রিত অনেকেও আসিয়া উপস্থিত হইতেন। দূরদেশ হইতেও ভক্তসমাগম হইত। ভক্তগণ জীবন্ত দেবীর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলিদানে কৃতার্থ হইতেন।

এইবারও গিরিশচন্দ্রের পূজার পরেই মা দেশে গেলেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতেও জগৎমোহিনী দেবী, শুভারাণী বরাট, রবি গুপ্ত, রাকেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ভক্তগণ আসিয়া তথায় মিলিত হইলেন।

---

* ২৫শে মার্চ্চ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জয়রামবাটী হইতে স্বামী সারদানন্দ শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়কে পত্রযোগে জানান,—৺জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য নিষ্কর জমি কেনা হবে। মঠে বা অন্য কারু কাছে প্রকাশ করবেন না। সান্যাল জানিল কেবল। পত্রপাঠ পাঠাবেন, মা'র হুকুম।

সপ্তাহকালমধ্যেই মাষ্টার মহাশয় ৩২০৲ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

হুগলীনিবাসী জ—মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পত্নীও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মাতার নিকট যাতায়াত করিতেন। সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁহাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট। কত দেবদেবীর মানত করিয়া, পূজা নিবেদন করিয়াও কিছু ফল হইল না। অবশেষে পতি একবার সংকল্প করিলেন যে, সস্ত্রীক মাতার নিকট যাইয়া প্রার্থনা জানাইবেন।

তাঁহারা উভয়েই জয়রামবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাতা তাঁহাদের আগমনের কারণ শ্রবণ করিয়া বধূকে বলিলেন,—বেশ তো, সিংহবাহিনীর কাছে যাও-না। তিনি জাগ্রতদেবী, তোমাদের মনের প্রার্থনা তাঁকে জানিয়ে এসো।

ভগবানের কাছে মানুষ শুদ্ধা ভক্তি প্রার্থনা করুক, ইহাই ছিল মায়ের অন্তরের নির্দ্দেশ। তথাপি অনেক বিষয়াসক্ত সংসারীকে মা উপদেশ দিতেন,—সকাম হোক, নিষ্কাম হোক, যে-উপলক্ষেই হোক ভগবানকে স্মরণ মনন করা ভাল। একেবারে না ডাকার চেয়ে, তাঁকে কোন কামনা নিয়ে ডাকাও ভাল।

বধূটির তখনও মন্ত্রদীক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু দেবতার নিকট সকাম প্রার্থনা সম্বন্ধে মায়ের মতামত তিনি জানিতেন। সুতরাং কামনা লইয়া সিংহবাহিনীর নিকট যাইতে তাঁহার মন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কিন্তু কি করিবেন? একে সন্তান না হওয়ায় পতির মনের ক্ষোভ, আত্মীয়পরিজনের অসন্তোষ; এদিকে মাতাঠাকুরাণীর নির্দ্দেশ। অবশেষে তিনি গেলেন সিংহবাহিনীর মন্দিরে, কিন্তু সন্তানকামনা জানাইলেন না, বলিলেন,—মা সিংহবাহিনি, তুমি আমায় কৃপা কর, দয়া কর। মন্দির হইতে মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিলে মা সকল বিষয় অবগত হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গড়বেতা হইতেও জনৈকা বধূ আসিয়াছিলেন, মায়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিতে। তাঁহাকে মা বলিলেন,—বৌমা, তোমার এখনো সময় হয়নি। শুভকার্য্যটি এবার হবে না, আবার এসো।

মর্ম্মাহত হইয়া বধূ কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং মায়ের চরণ ধরিয়া বলিলেন,—তুমি আমায় পায়ে ঠেলো না মা। অনেক কষ্ট ক'রে এসেছি।

ভক্তের আন্তরিক ব্যাকুলতায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। বধূর আর্ত্তিতে করুণাময়ী মাতার প্রাণ বিগলিত হইল। তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, দেখা যাবে'খন, তুমি স্থির হও।

পরদিবস অতি প্রত্যূষে মাতা তাঁহাকে নির্দ্দেশ দিলেন,—যাও মা, নদীতে চান ক'রে এসো। তারপর তিন রাত ব'সে একান্তমনে ঠাকুরের নাম জপ কর। তোমার যা' কিছু বাধাবিঘ্ন আছে ঠাকুরের নামে কেটে যাক, তাঁর আশীর্ব্বাদ তোমার ওপর আসুক।

মায়ের নির্দ্দেশানুসারে বধূ তিনরাত্রি বসিয়া বসিয়া জপ করিলেন, চতুর্থ দিবসে তাঁহার দীক্ষালাভ হইল।

স্বামী নির্ম্মলানন্দ, দীন-মহারাজ এবং মাষ্টার মহাশয়ের পত্নীও এই সময় জয়রামবাটী আসিয়াছিলেন। মাতার এইরূপ আচরণে নির্ম্মলানন্দজীর কৌতূহল বৃদ্ধি পায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, এ-ও তো আপনার এক খেলা। আপনি ইচ্ছে করলে, এর দীক্ষা সেদিনই হ'য়ে যেতো, সবই তো আপনার ইচ্ছাধীন।

মাতাঠাকুরাণী মৃদুহাস্যে বলিলেন,—বাবা, এ কি আমার খেলা, এ সবই ঠাকুরের ইচ্ছে। ওর ভেতরে অনেক জট ছিল, এই ক'দিন ঠাকুরের নাম ক'রে ক'রে কেটে গেল।

এইবার মাতার জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে যাঁহারা মাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল অন্যতম। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—

"১৩১৫ সনের কথা। চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, হেমন্তের এক কুহেলী প্রভাতে গোমো-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে তিনটী বন্ধুসহ রওনা হইয়াছিলাম বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ, পুণ্যতম তীর্থদ্বয়—কামারপুকুর ও জয়রামবাটী—দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন আজ

রামকৃষ্ণ-প্রচারসঙ্ঘের প্রাচীন সন্ন্যাসী—স্বামী রাঘবানন্দ এবং স্বামী মাধবানন্দ ; আর একজন শ্রীবিনয়েন্দ্র প্রসাদ বাকচি, বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল।

"শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতেই জয়রামবাটীতে যাইলে থাকিতেন। আমরা সেই বাড়ীতেই গেলাম। হাতমুখ ধুইবার পর আমি বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দলের মধ্যে আমিই ছিলাম বয়সে কনিষ্ঠ। বন্ধুরা তখন বহির্বাটীতে বসিয়া মামাদের ও পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন। আমি যে কখন হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে গিয়া বসিয়াছি তাহা তাঁহারা লক্ষ্যই করেন নাই। ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন যে ঘরে থাকিতেন, তাহারই বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আমি প্রণাম করিবার পর তিনি বসিতে বলিলে আমি বসিলাম। কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাবা, তোমার বে' হয়েছে ?' আমি বলিলাম, 'না।'

"তাহার পর বলিলেন, 'বাবা, মহীন্দর বই পাঠিয়ে দিয়েছে, আমি ত কাজে কর্ম্মে পড়বার সময়ই পাই না, তুমি একটু শোনাও ত।' এই বলিয়া ঘরের ভিতর তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ, বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। * * * আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম,—'প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের বাটী।' তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষদিকে যেখানে আছে 'ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাক কল্ কল্ করে।' সেই জায়গাটি যখন পড়ি, তখন মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, 'ঠাকুর ঐ কথাটি খুব বলতেন। কাঁচা লুচি পড়লে আবার পাকা ঘি ছ্যাঁক কল্ কল্ করে। * * *"

পরদিবস করুণাময়ী মাতা কিরূপে অযাচিতভাবে তাঁহাকে কৃপাধন্য করিয়াছিলেন, সেই কথায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমি ভোরে উঠিয়াই বাড়ীর ভিতরে গেলাম। গিয়া দেখি, মা তাহারও আগে উঠিয়াছেন। এইবার তাঁহাকে পাইলাম যে ঘরে তিনি শুইতেন, তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী অন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরের ভিতর। তিনি তখন দাঁড়াইয়া, আমিও দাঁড়াইয়া। হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাবা, তোমাকে এই নাম দিলাম।' এইখানে বলা বাহুল্য, কি নাম দিলেন, তাহা বলিয়া দিলেন। ব্যাপারটি যেন এক মুহূর্ত্তে ঘটিয়া গেল। কি যে হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এতই বোকা ছিলাম যে, আমি কিছুক্ষণ পরেই বাহিরের ঘরে আসিয়া বন্ধুবর নির্ম্মলকে (অধুনা যিনি রামকৃষ্ণ-প্রচারসঙ্ঘের স্বামী মাধবানন্দ নামে খ্যাত) বলিতে উদ্যত হইলাম, 'ছাখ নির্ম্মল, আজ এই ভোরে মা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন, 'ছাখো বাবা, তোমাকে এই নাম'—কথাটি এই পর্য্যন্ত বলা হইলেই নির্ম্মল আসল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ওরে চুপ, চুপ, ওকথা কাউকেও বলতে নেই, বলতে নেই।' আমি আরও হতভম্ব হইয়া গেলাম। জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ দিনটিতে অতি প্রত্যূষ হইতেই একের পর এক কারণে আমার হতভম্ব হইবার পালা চলিতেছিল। পরবর্ত্তী কালে পুস্তকে পড়িয়াছি, মা একবার বিষ্ণুপুর রেলওয়ে স্টেসনের প্লাটফরমে একটি হিন্দুস্থানী কুলীকে দাঁড়াইয়া মন্ত্র দান করিয়াছিলেন।"

পরবর্ত্তী জগদ্ধাত্রীপূজা-দিবসে শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দীক্ষালাভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"দেশ থেকে কলকাতায় এসে ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের বাড়ীতে উঠেছিলাম। দুই তিন দিনের মধ্যেই তাঁরা আমার জয়রামবাটী যাবার ব্যবস্থা করলেন, তখন জয়রামবাটীতে মায়ের বাড়ীতে ৺জগদ্ধাত্রী পূজা হবে। ঠিক সময়েই পৌঁছুতে হবে। যাবার সময় ভক্তবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি বড় ঝুড়ি-বোঝাই রকমারি ফল, মিষ্টি, তরিতরকারী আমার সঙ্গে দিলেন মায়ের পূজার জন্যে, জয়রামবাটী নিয়ে যেতে হবে।

"আর ঐ সঙ্গে বোম্বাইয়ের 'রামকৃষ্ণ মিল্সে'র মালিক বরেন ঘোষ তাঁর মিলে-তৈরী প্রথম কাপড় (সরু লালপাড়) মায়ের জন্য দিয়েছিলেন। হাওড়া স্টেশনে ডাক্তার কাঞ্জিলাল এসে আমায় গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন। বিষ্ণুপুর হয়ে জয়রামবাটীর রাস্তায় বিষ্ণুপুরের ৺মৃন্ময়ীদেবী-দর্শন ও তথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে প্রসাদ পেয়ে তাঁর বন্দোবস্তমত গাড়ীতে রওনা হলাম। আমি যাবার পরই ডাক্তার কাঞ্জিলালও পর কি তৃতীয় দিবসে জয়রামবাটী যান।

"জয়রামবাটীতে এসে পৌঁছেছি। মায়ের বাড়ীতে আছি। সেই সুদূর পল্লীগ্রামেও আমাদের কখন কোন জিনিষের অভাব হয়নি। সেই কোন ভোরে উঠে জগজ্জননী মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, প্রাতঃভোগ দেওয়া সেরে আমাদের জন্য প্রসাদাদি ঠিক করে রাখতেন। আমরা সকালে উঠে মুখহাত ধুয়েই জপাদি সেরে জগজ্জননী মায়ের চরণামৃত পেতাম, তারপর জলযোগ করতাম।

"ভাল ভাল খাবার মা পাতে পরিবেশন করতেন, অবাক হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করতাম,—'মা, এ তো সূয্যিমামার দেশে এসেছি, আশেপাশে চোদ্দ ক্রোশের মধ্যে কোন রেল নেই। এত ভাল ভাল খাবার জিনিষ কোথা থেকে তুমি যোগাড় করলে, মা? মনে হচ্ছে, যেন আমরা কলকাতা সহরেই বসে খাচ্ছি। মা, তোমার যে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, কোন অভাব নেই।

মা একটু হাসলেন, কিছু বললেন না।

"মায়ের বাড়ীতে যেতেই মায়ের এক সাধুসেবক * * * আমায় জিজ্ঞাসা করলেন,—কি হে ছোকরা, কি মনে করে এসেছ?

আমি তখন যুবক। দেহ ও মন তেজে পূর্ণ। প্রথম সম্ভাষণে একটু বিস্মিত হলাম। বললাম,—মায়ের কাছে দীক্ষা নিতে এসেছি।

—এই ভীড়ে, পূজার মধ্যে দীক্ষা হয়? মায়ের কত কাজ!

—আপনি মাকে একটু বলুন। অনেক আশা করে এসেছি।

সাধু মায়ের কাছে গেলেন, একটু পরে এসে বললেন,—ছোকরা,

"তোমার অদেষ্ট খুব ভাল, মা তোমায় কাল ৺জগদ্ধাত্রী পূজার প্রথমেই দীক্ষা দেবেন।

"আমার মনে আনন্দের সীমা রইল না। পরদিনই জগদ্ধাত্রী পূজা। ১৩১৫ সনের ১৭ই কার্ত্তিক (২রা নভেম্বর, ১৯০৮ সাল) সেই দিন পূজার আগেই আমার দীক্ষা হোল, মা আমাকে জপের প্রণালী দেখিয়ে দিলেন—'এইভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ করবে, ইষ্টকে স্মরণ করবে, এইভাবে ধ্যান করবে,' সব বলে দিলেন। মাকে বললাম, 'মা শিলংএ ১৯০১ হতে—ঠাকুরের কেমন একটু কৃপার উত্তেজনা পাই, তখন হতেই নিজের মনে তাঁর নাম জপ করতাম। পরে বৃদ্ধি হয়ে গীতা, চণ্ডী পাঠান্তে ঠাকুরের নাম জপ করতাম। সে জপ কি করব?

মা বললেন যে, তাও ১০বার করবে।

—বেশী করব না? বলায় তিনি একটু চুপ করে বললেন, ১০বার জপলেই হবে ও ইষ্টমন্ত্র নিয়মিত জপবে। * * *"

মায়ের বাটীতে পূজার সমাপ্তি হইলে মা সন্তানদিগকে ঠাকুরের বাটীতে যাইয়া পূজা দিতে বলিলেন। সেই পুণ্যতীর্থে গিয়া তাঁহারা একরাত্রি যাপন করেন। কামারপুকুর-যাত্রায় পূর্ব্বোক্ত সাধুর সহিত অমূল্যচন্দ্রের ঠাকুরসেবায় আচারনিষ্ঠার কথা লইয়া তর্ক হয়। ইহা জানিতে পারিয়া মা তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,—

"গ্যাখো বাবা, সাধুটীর কথায় দুঃখ কোরো না। ও ওই রকম। কিন্তু সাধুর সঙ্গে বচসা করা উচিত নয়। অকল্যাণ হতে পারে। * * * তিনটী জিনিষ থেকে খুব সাবধান হবে বাবা। প্রথম সাপ, দ্বিতীয় নদী, তৃতীয় সাধু। সাপ যে কোন মুহূর্ত্তে এসে কামড়াতে পারে। নদী যদি ঘরের পাশে থাকে, কখন জল বেড়ে স্রোতের ধাক্কায় বাড়ী ভেঙ্গে দিতে পারে। আর সাধুর মনে অসন্তোষ হলে বা দুঃখ হলে গৃহীর অকল্যাণ হয়।" * *

"তারপর দুদিন থাকার পর মাকে বললাম,—মা, এবার আমি ফিরব বর্দ্ধমান হয়ে। মা বললেন,—এসো বাবা। মা লোক দিয়ে গাড়ী

আনিয়ে দিলেন। গাড়ীতে উঠেছি মাকে প্রণাম করে, মা (একটি কন্যাকে) বলছেন, শুনতে পেলাম,—ছেলেমানুষ, বউ মারা গেছে, আহা!

যতদূর পর্য্যন্ত দেখা গেল, মুখ ফিরিয়ে দেখি, মা তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

* * * কলকাতায় ফিরে শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেছি, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—মাঠাকরুণের কাছে যখন বিদায় নিলেন, তখন মা কি ফিরে চেয়েছিলেন?

এই ব'লে মাষ্টারমশাই একটী গানের পদ গাইলেন,—

'(ও সে) সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যদি ফিরে চায়।"

১৩১৫ সালে রামলালদাদা এবং মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছি 'যোগোদ্যান মঠের' অধ্যক্ষ স্বামী যোগবিনোদের উদ্যোগে কামারপুকুরে ঠাকুরের আবির্ভাবতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মাতাঠাকুরাণী এইসময় জয়রামবাটীতে, তাঁহার নিকট রামলালদাদা এই উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত আবেদন জানাইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মা একটি ফোড়ায় এবং বাতের বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন বলিয়া প্রথমতঃ যাইতে ভরসা পাইলেন না। কয়েকদিবস পরে যাইয়া রামলালদাদা মাকে লইয়া কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন।

এই উপলক্ষে মাতা কামারপুকুরে কিছুদিন বাস করেন। রামলাল-দাদা ও লক্ষ্মীদিদি মায়ের সেবাযত্ন করিতেন। একদিন কৃষ্ণময়ীদিদি কিছু সুষনিশাক সংগ্রহ করিয়া আনেন। এই শাক মায়ের প্রিয়, মা সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—তুই অতগুলি সুষনিশাক কোথা থেকে পেলি? আমি তো কোথাও দেখতে পাই না।

উৎসবদিবসের পূর্ব্বেই স্বামী যোগবিনোদ, বেলুড়মঠের কতিপয় সাধু এবং অনেক ভক্ত পূজাসামগ্রীসহ কামারপুকুরে সমাগত হইলেন। ফাল্গুন মাসের প্রথমার্দ্ধে শুক্লা দ্বিতীয়ার শুভ তিথিতে পুণ্যতীর্থ কামারপুকুর

আনন্দমুখর হইয়া উঠিল। ঠাকুরের স্তবস্তুতি ও কীর্ত্তনাদি দিবস ব্যাপিয়া চলিতে থাকে। দূরদূরান্তরের নরনারীও উৎসবে যোগদান করিয়া এবং ঠাকুরের প্রসাদলাভে ধন্য হইল।

কৃষ্ণময়ীদিদি বলিয়াছেন,—নিতাই সূত্রধর নামক জনৈক কীর্ত্তনীয়া এইদিবস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন এমনই ভাবমধুর হইয়াছিল যে, শুনিতে শুনিতে মাতাঠাকুরাণীর ভাবাবেশ হয়।
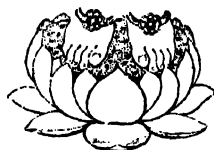
মাতৃভবনে

মায়ের কৃপায় কাহার যে কখন কিভাবে সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহা অনুমান করা যায় না। বাগবাজার-পল্লীবাসী জনৈক সন্তান মাতা-ঠাকুরাণীর কৃপাপ্রসাদে ধন্য হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম কেদারনাথ দাস। তিনি খড়ের ব্যবসায়ী, ভক্তসংঘে 'খোড়ো কেদার' নামে পরিচিত। মাতার গঙ্গাস্নানে যাতায়াত উপলক্ষে তিনি মায়ের দর্শন পাইতেন। এইভাবে কেদারনাথের অন্তরে মায়ের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়, এবং ধীরে ধীরে তাহা ভক্তিতে পরিণত হয়।

একবার ব্যবসায়ে কেদারনাথের আশাতীত অর্থাগম হয়। সেই অর্থদ্বারা একখানি গৃহনির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে তিনি ১৩০৭ সালে উত্তর-কলিকাতায় ১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। ইহার পরে তাঁহার অন্তরে অনুপ্রেরণা আসে, কিছু সৎকর্ম্ম করিতে হইবে। একদিন মাতৃসকাশে নিবেদন জানাইলেন,—মা-ঠাকরুণ, জগতে কত লোক বিদ্যা, বুদ্ধি অথবা ধনবলে কত কীর্ত্তি রেখে যায়, আমার সে যোগ্যতা নেই; আমার ইচ্ছে হয়েছে, আপনার শ্রীচরণে সামান্য এক খণ্ড ভূমি দান করতে। সেই ভূমিতে আপনি স্থিতু হবেন, এই আমার অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।

অবশেষে ভাগ্যবান কেদারনাথের উক্ত ভূমিখণ্ডে একদিন পদার্পণ করিয়া মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে কৃতার্থ করিলেন। মাতার মতানুসারে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সভাপতির (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) নামে ১৩১৩ সালের শ্রাবণ মাসে (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) ভূমির দানপত্র সম্পাদিত হয়। ভূমির পরিমাণ তিন কাঠা চারি ছটাক।

কেদারনাথের দৃষ্টান্ত অনেকের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চার করিল। অনেকেই ভাবিতে লাগিলেন, এই ভূমির উপর অবিলম্বে মাতাঠাকুরাণীর নিজস্ব বাসগৃহ নির্ম্মাণ হওয়া আবশ্যক। মায়ের একান্ত অনুগত স্ত্রীভক্তগণ

সানন্দে এই শুভানুষ্ঠানে ব্রতী হইলেন ; সাধ্যানুসারে কেহ অর্থ, কেহ-বা স্বর্ণালঙ্কারাদি প্রদান করিলেন। মাতৃপীঠনির্ম্মাণে মাতৃজাতির শ্রদ্ধাঞ্জলিই ছিল প্রধান ; অবশ্য, পুরুষভক্তগণের দানও নগণ্য নহে।

সর্ব্বোপরি মাতৃগতপ্রাণ স্বামী সারদানন্দের অক্লান্ত এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল, যাহাতে মায়ের বাসভবনখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়! কেবল অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নহে, নারীভক্তগণের মতামতও তিনি বিবেচনা করিতেন, যাহাতে সকলের সহযোগিতা এবং শুভেচ্ছায় কার্য্যটি ত্রুটিহীন হয়।

গৃহনির্ম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৩১৪-১৫ সালে সংঘের প্রকাশনী-বিভাগ 'উদ্বোধন কার্য্যালয়' গোপালচন্দ্র নিয়োগী লেনে (বর্ত্তমানে ১নং উদ্বোধন লেন) স্থানান্তরিত হইয়া আসে। এই সময় সারদানন্দজীর প্রার্থনায়, অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই মাতাঠাকুরাণী দুই-একবার নূতন বাটীতে কয়েকদিবস বাস করিয়া যান। অবশেষে গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হইলে সুদীর্ঘকালের একটি অভাব পূর্ণ হইল। সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া মাতাঠাকুরাণী আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্ম্মিত ভবনে আসিয়া প্রবেশ করিলেন ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। তাঁহার পদধূলিপূত এবং পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত এই দেবীপীঠ আজিও তাঁহার কথাই সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

নাতিবৃহৎ এই মাতৃভবন। গঙ্গার সন্নিকটে, বাগবাজার অঞ্চলে অবস্থিত। ত্রিতল গৃহ,—একতলে তিনখানি, দ্বিতলে তিনখানি এবং ত্রিতলে একখানি কক্ষ। গৃহের উত্তরদিকে রাস্তা, সেইদিকেই প্রবেশপথ। প্রবেশ করিয়াই পূর্ব্বদিকে একখানি কক্ষ ; মাতাঠাকুরাণীর 'দ্বারিরূপে' সারদানন্দজী এই কক্ষে থাকিতেন, আগন্তুকগণের সহিত সাক্ষাৎ-আলাপ করিতেন। পশ্চিমপার্শ্বে দুইখানি কক্ষ মায়ের সেবকবৃন্দের এবং উদ্বোধন-কার্য্যালয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। দক্ষিণদিকে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি। সম্মুখে অল্পপরিসর স্থান, মায়ের ভাণ্ডাররূপে ব্যবহৃত হইত। প্রবেশপথ

হইতে সোপান পর্য্যন্ত যাতায়াতের জন্য একটি অপ্রশস্ত অলিন্দ আছে। সোপানের দক্ষিণে রন্ধনশালা। তথায় ভাঁড়ার ও রন্ধনাদির জন্য তিনখানি অপ্রশস্ত কুঠরী। গৃহের পশ্চাৎ দিকে একটি খিড়কীদরজা, কোন কোন মহিলা সেই পথেও অপ্রকাশ্যে যাতায়াত করিতেন। দ্বিতলে উঠিয়াই সিঁড়ির পার্শ্বে অল্পপরিসর স্থান, এইস্থানে বসিয়া মা পান সাজিতেন। সিঁড়ির দক্ষিণদিকে একটি কক্ষ, সেখানে সাধারণতঃ সন্তানগণ প্রসাদ পাইতেন। সেই কক্ষে মা-ও মধ্যে মধ্যে কন্যাদের লইয়া ঠাকুরের কথা বলিতেন। দ্বিতলে অলিন্দের পশ্চিমপার্শ্বে একটি কক্ষ, মা ও কন্যাদের প্রসাদ পাইবার জন্য ব্যবহৃত হইত, এবং কোন নারীভক্ত রাত্রিকালে মায়ের আশ্রয়ে থাকিবার অনুমতি পাইলে এইস্থানে রাত্রি-যাপন করিতেন। উত্তরদিকে পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একখানি কক্ষ; উহার পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে সংলগ্ন সিংহাসনের উপরে ঠাকুরের পট, মাতাঠাকুরাণী পূর্ব্বাস্য হইয়া তাঁহার নিত্যপূজা করিতেন। অপর অর্দ্ধাংশে একখানি চৌকীতে তিনি রাত্রিকালে শয়ন করিতেন; দিবাভাগে সাধারণতঃ মেঝেতে মাদুর বিছাইয়াই কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিতেন। এই কক্ষের উত্তরদিকে একটি ক্ষুদ্র বারান্দা আছে। সেখানে যাইয়া মা কখন কখনও দাঁড়াইতেন; সেই অবস্থায় সন্তানগণ রাস্তা এবং মাঠ হইতেও মায়ের দর্শন লাভ করিতেন।

কয়েকবৎসর পরে এই বাটীর সংলগ্ন আর একখণ্ড ভূমি যোগেনমার শ্রদ্ধাঞ্জলিতে ক্রয় করা হয়। ইহাতে বাটীর আয়তন বৃদ্ধি পায়।

ছোটমামী এবং রাধারাণী মায়ের সঙ্গেই বসবাস করিতেন। নূতন বাটী হইবার পর তাঁহারাও আসিলেন। প্রসন্নমামার কন্যা নলিনীদিদি ও সুশীলা (মাকু) মধ্যে মধ্যে আসিয়া পিসিমার সহিত বাস করিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং লক্ষ্মীদিদিও আসিতেন, রামলালদাদার কন্যাগণও কদাচিৎ আসিয়া মাতৃভবনে বাস করিতেন। রামলালদাদা এবং শিবরামদাদা খুড়ীমার সংবাদ লইতে আসিতেন। তাঁহারা আসিলে

মাতা আদরযত্ন করিতেন, সম্মুখে বসিয়া ভোজন করাইতেন। শিবরামদাদার কথায় মাতা বলিতেন,—শিবু আমার 'ভিক্ষেপুত্তুর'।

মাতৃভবন নির্ম্মিত হইবার পর হইতে গোলাপমা মায়ের সঙ্গেই স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন। যোগেনমা প্রায় প্রতিদিন মায়ের বাটীতে আসিতেন এবং গৃহস্থালির তত্ত্বাবধান করিতেন। কালা-বৌ নামে এক কায়স্থ গৃহিণীও মায়ের এবং ঠাকুরের সেবাদি কার্য্যের জন্য থাকিতেন। এতদ্ব্যতীত গৌরীমা, অন্নপূর্ণার মা, ভবমা, নিকুঞ্জ দেবী-প্রমুখ মহিলাগণ, লেখিকা এবং আরও দুই-চারিজন কুমারী, সধবা ও বিধবার মায়ের নিকট আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য হইত।

সুশীলা এবং রাধারাণী নিকটস্থ একটি মিশনারী বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিত। রাধারাণী উচ্চ প্রাইমারী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সে মায়ের পত্রাদি লিখিয়া দিত এবং তাঁহার নির্দ্দেশমত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াও শুনাইত।

স্বামী সারদানন্দ রাধারাণীকে খুব ভালবাসিতেন, বিশেষ করিয়া তাহার সরলতার জন্য। মধ্যে মধ্যে বিনা প্রয়োজনেও তিনি 'রাধি, রাধি গো' বলিয়া ডাকিতেন, আর রাধারাণীও বালিকাসুলভ কোমলকণ্ঠে 'কেনে গো' বলিয়া উত্তর দিত। স্নেহাস্পদ বালিকার মধুরকণ্ঠে এই 'কেনে গো' গ্রাম্য কথাটি শুনিয়া সারদানন্দজী আমোদ পাইতেন। রাধারাণী বাল্যকালে চঞ্চল ছিল, কিন্তু তাহার অন্তঃকরণ ছিল স্নেহপূর্ণ। আপন পর সকলকেই সে ভালবাসিত।

একটি কন্যা সমস্ত দিন রাধারাণীর সঙ্গেই মায়ের বাটীতে থাকিত; সে উমা,—জয়রামবাটী অঞ্চলের এক বালবিধবা। কলিকাতায় মায়ের বাটীর নিকটেই মাতামহীর সহিত সে বাস করিত। রাধারাণীর সহিত সমান যত্নে, অন্নবস্ত্রে মা তাহাকেও পালন করিয়াছেন। মা উভয়কে স্বহস্তে তৈল মাখাইয়া দিতেন, স্নান করাইয়া দিতেন, খাইতে দিতেন। জনৈকা মহিলা একদিন মন্তব্য করেন,—আচ্ছা মা, উমা তিলির মেয়ে,

আর রাধু বামুনের মেয়ে, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী ; তুমি কি ক'রে ওকে রাধুর মর্য্যাদা দিচ্ছ ? এতে উমার অপরাধ হচ্ছে, ওরই ভবিষ্যৎ খারাপ হবে।

মা স্নেহার্দ্র কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—ওর জন্যে বড় ভাবনা হয়, অতটুকু মেয়ে,—বিধবা ! ঠাকুর যেন ওর মান-ইজ্জত রক্ষে করেন।

মহিলা পুনরায় প্রশ্ন করেন,—নিষ্পাপ বালিকা, আবার বিয়ে দিলে কি দোষ মা ?

মাতাঠাকুরাণী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন,—ছিঃ ছিঃ ! কি বলছো তুমি ! মেয়ের বিয়ে দুবার হয় না। কপালে সুখ থাকলে প্রথমেই হতো।

অন্য একজন মন্তব্য করেন,—হ্যাঁ মা, আপনি তো ওকে খুবই আদরযত্ন কচ্ছেন, বড় হ'লে ও যদি আপনার কথা না মেনে চলে ?

ঈষৎ হাসিয়া মা বলিলেন,—আমার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ বিলিয়ে যাচ্ছি ; তারপর যা'র যেমন ভাগ্যি, আর ঠাকুরের ইচ্ছে !

ভানুপিসীও জয়রামবাটীর জনৈক সদ্‌গোপের কন্যা, তিনি বিধবা। মাতাঠাকুরাণীও তাঁহাকে 'পিসি' বলিয়া ডাকিতেন। ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল। ভক্তদিগের সহিত তিনি সময় সময় রঙ্গরসের কথা বলিতেন, অনেক গান ও ছড়া শুনাইতেন।

ঠাকুর-ঠাকুরাণীর অনেক কথা ভানুপিসী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। তিনি বলিতেন,—ছ্যাখো, মাথাটা আমার মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। তোমাদের মাকে আগে আমি মনে মনে খতাতুম, ভাবতুম—আমাদের গাঁয়েরই তো মেয়ে। অতি সাধারণ মনে করতুম তাঁকে। আবার মাঝে মাঝে মনে হতো,—না, সাধারণ মোটেই নয়। সারদা—মোক্ষদা। একদিন ঠাকুর দর্শন দিলেন, তাঁর মধ্যে চিন্ময় মাধবের দর্শন পেলুম। আর একদিন, কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিলুম, ঠাকুর-ঠাকরুণকে দেখলুম—হর-পার্ব্বতী, প্রসন্নমনে ব'সে আছেন।

ভানুপিসী বার্দ্ধক্যে কিছু বেশী কথা বলিতেন, কিন্তু মা তাঁহার পক্ষ লইয়া বলিতেন,—আহা গো, বুড়ো হ'য়ে গেছে কি-না, তাই এক কথা বারবার বলে। বুড়ো হ'লে সবাই ঐরকম বলে।

ভানুপিসীর প্রয়োজন এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মা দৃষ্টি রাখিতেন। একবার একাধিক চক্ষুচিকিৎসকদ্বারা ভানুপিসীর চক্ষু পরীক্ষা করাইয়া চশমা কিনিয়া দিয়াছিলেন। মাতৃভবনের সকলকেই মা বলিয়া রাখিতেন, ভানুপিসীকে তোমরা একটু যত্ন-আত্তি করো। ওরা দেশ থেকে আসে, আমার ওপর ভরসা রাখে। ওরা জানে, আমি যেখানে আছি, সেখানে ওদের সকল উপায় হবে।

হরির মা মন্তব্য করেন,—সেটা শুধু ওরাই জানবে কেন মা? পৃথিবী শুদ্ধ সব্বাই জানে। তুমি হাল ধরলে, সবারই উপায় হয়। হ্যাঁ মা, আমার উপায় কবে হবে?

মা হাসিয়া বলেন,—উপায় হবে মা, হবে, ভাবনা কি?

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রক্ষকরূপে সারদানন্দজী মাতৃভবনে থাকিতেন। উদ্বোধন কার্য্যালয়ের পরিচালনা-ব্যপদেশে কয়েকজন সাধুব্রহ্মচারীও একতলায় বাস করিতেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ-প্রমুখ ঠাকুরের সন্তানগণও সময় সময় মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিবার জন্য আসিতেন। এতদ্ভিন্ন সংঘের বিভিন্ন শাখা হইতে আগত সন্ন্যাসিগণও মাতৃদর্শনোদ্দেশ্যে এখানে সমাগত হইতেন।

মা স্থায়িভাবে নূতন বাটীতে আসিয়াছেন, সকলেরই পরম আনন্দ। সারদানন্দজী সকলের আনন্দবিধানেই মনোযোগী, বিশেষতঃ মায়ের কখন কি প্রয়োজন, কোন্ বিষয়ে কিরূপ অভিরুচি তাহা জানিতে এবং ব্যবস্থা করিতে তিনি সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে একটি উৎসবের কথা আলোচনা চলিতেছে, এমন সময়ে এক দৈব প্রতিকূলতা উপস্থিত হইয়া সকলকে বিমর্ষ এবং চিন্তাকুল করিয়া তুলিল। গৃহ-প্রবেশের কয়েকদিবসের মধ্যেই মা বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলেন।

গৌরীমারও ঐ রোগ হইল। তাঁহাদের একই সময়ে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইবার একটি অলৌকিক ঘটনা বিবৃত করিতেছি।—

"১৩১৬ সালে (জ্যৈষ্ঠ মাসে) কলিকাতার অন্তর্গত শান্তিনাথতলায়

বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরীর বাড়ীতে গৌরীমা কিছুদিনের জন্য বাস করিতেছিলেন। একদিন দুপুর বেলা ঐ বাড়ীর বারান্দায় বসিয়া তিনি একখানা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ চাহিয়া দেখেন, শ্রীশ্রীমা আসিতেছেন। আজ তাঁহার পরিধানে একখানি গেরুয়া বসন, মাথার কেশ আলুলায়িত, চলন অতি দ্রুত,—সবই অস্বাভাবিক রকমের!

"ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, 'ওমা গৌরি, তুমি এখানে থাক? আমি তোমার কাছেই এলুম।' তাঁহাকে এমন অসময়ে একা এই বেশে আসিতে দেখিয়া গৌরীমা বিস্মিতচিত্তে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া বলিলেন, 'ওমা, কি ভাগ্যি, তুমি এসেছ। এখানে বসো মা।' তাহার পর ডাকিলেন, 'ও আশু! ও কেনা! তোরা কোথা গেলি সব, শীগ্‌গির আয়; মা-ঠাকরুণ যে এসেছেন।'

"শ্রীশ্রীমা বাধা দিয়া বলিলেন, 'কারুকে ডেকো না, ঘরে চল।' এই বলিয়া তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন, গৌরীমাও নির্ব্বাক হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। ঘরে আসিয়াই তিনি গৌরীমাকে মাটীতে শোয়াইয়া দিলেন এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দুই হাতে ঝাড়িতে লাগিলেন। গৌরীমা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শ্রীশ্রীমায়ের মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীমা ঝাড়া শেষ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'মা, তুমি ভেবো না, আমিও চারটিখানি নিয়ে চললুম।' তিনি ফিরিয়া চলিলেন। গৌরীমা তাঁহার পশ্চাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িলেন।

"ঘরে জনৈকা বালিকা লেখাপড়া করিতেছিল। সে গৌরীমার যাওয়া এবং আসা দেখিল, কিন্তু ইতোমধ্যে কি-যে ঘটিল, তাহার কিছুই বুঝিল না। গৌরীমা সেদিন একটা আবেশের মধ্যে রহিলেন, কাহারও সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারিলেন না। সেই দিনই তাঁহার প্রবল জ্বর হইল এবং পরের দিন সারাদেহে বসন্তের গুটিকা প্রকাশ পাইল। রোগ এমন ভীষণ অবস্থা ধারণ করিল যে, চিকিৎসকগণ গৌরীমার জীবনসম্বন্ধে নিরাশ হইলেন।

"* * * ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল গৌরীমাকে দেখিতে আসিয়া বলিলেন, 'মায়ে ঝিয়ে ভাগাভাগি ক'রে রোগভোগ নিয়েছেন, আমরা তার কি করব !" (৬)

চিকিৎসা উভয়েরই দেশীয় মতে হইত, ডাক্তার কাঞ্জিলাল, ডাক্তার প্রিয়নাথ-প্রমুখ সন্তানগণ তাঁহাদিগের সেবাশুশ্রূষা করিতেন।

রোগশয্যা হইতে মাতাঠাকুরাণী গৌরীমার সংবাদ লইতেন, এবং উভয়েই চিন্তিত হইলেন ঐ বালিকার জন্য। গৌরীমা তাহাকে বুঝাইতেন, আমি ম'রে গেলে তুই কিছুতেই বাড়ী ফিরে যাবিনি, মা-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে থাকবি। ওদিকে মাতাঠাকুরাণী সারদানন্দজীর প্রতি নির্দ্দেশ দিলেন, বালিকাকে মায়ের বাটীতে আনিয়া রাখিতে।

গৌরীমার দামোদরশিলার দৈনিক পূজাভোগের নিমিত্ত বালিকার পক্ষে অবিলম্বে মাতৃভবনে গিয়া বাস করা সম্ভব হইল না ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে তথায় গেলে মা রোগশয্যায় থাকিয়াই তাহাকে বুঝাইতেন, উৎসাহ দিতেন,—তোমার বাবা, মামা, দাদা যে-ই নিতে আসুক, তুমি তাদের সঙ্গে বাড়ী ফিরে যেয়োনি কিন্তু! তোমার কোন ভাবনা নেই মা, আমার কাছে তুমি থাকবে। তোমার কত শিষ্যসন্তান হবে, তা'দের মা হ'য়ে থাকবে তুমি। যদি সংসারে ফিরে যাও, কে তা'দের দেখবে ?

মাতাঠাকুরাণী অনতিবিলম্বে আরোগ্যলাভ করিলেন, গৌরীমাতার অধিক সময় লাগিল।* গৌরীমাতা রোগমুক্ত হইবার পর তিনি ও লেখিকা প্রায় আড়াই মাস মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া বাস করেন।

গৌরীমার অসুস্থতার সময় যাঁহারা সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মাতাঠাকুরাণীর অন্যতম কুমারভক্ত আশুতোষ চৌধুরীর গর্ভধারিণী

* গৌরীমাতার পত্র— পোঃ সিমলা, ২২ জুন, ১৯০৯

তুমি কোন ভাবনা করিও না শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতাঠাকুরাণী ভাল আছেন আমি ক্রমে ২ সারিয়া উঠিতেছি কোন ভয় নাই তবে এখনও শয্যাশায়ী আছি * * শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণির সহিত কোনমতে সাক্ষাৎ হইবে না কারণ এক্ষণে তাঁহার

যেরূপ অকুণ্ঠচিত্তে এবং অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছিলেন, তাহাতে মাতা-ঠাকুরাণী তাঁহাকে অনেক আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার মেয়ের যা' সেবা করলে মা, এ জন্মেই মুক্ত হ'য়ে যাবে।"

গৌরীমা স্বভাবতঃ আনন্দময়ী এবং কৌতুকপ্রিয়া ছিলেন। একদিন বালিকাসুলভ কৌতূহলবশতঃ মা তাঁহাকে বলেন,—সময় সময় তুমি যেমন পুরুষবেশে ঘুরে বেড়াতে, সে-রকম বেশ একদিন করো, যা'তে আমরা কেউ না চিনতে পারি।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। অকস্মাৎ গৌরীমা একদিন কোথায় চলিয়া গেলেন। সেইদিনই অপরাহ্নে পশ্চিমদেশীয় এক সাধু মাতৃভবনে উপস্থিত হইলেন, পরিধানে আলখাল্লা ও পাগড়ি। সেবকগণ এই আগন্তুককে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহার একটি লাঠির প্রয়োজন ছিল; একজন সেবককে বলিলেন,—Where is my stick? Where is my stick? কণ্ঠস্বর হইতে সেবক বুঝিতে পারিলেন, আগন্তুক কে; লাঠি আনিবার ছলে, তিনি দ্রুতপদে গিয়া মাকে বলিয়া দিলেন,—গৌরমা পুরুষসাধুর বেশে এসেছেন। মায়ের নিকট ঐ বেশে উপস্থিত হইলে মা বলিয়া উঠিলেন,—চমৎকার, চমৎকার হয়েছে! উপস্থিত সকলেই আনন্দকোলাহল করিতে লাগিলেন।

এত শীঘ্র এবং সহজেই সকলে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছেন, ইহাতে সেই সেবকের উপর গৌরীমার সন্দেহ হইল, বলিলেন,—এই ছোঁড়া, তোরই এ কম্ম! তুই কেন এসে আগে থেকেই সব ব'লে দিলি? তৎপর মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—আচ্ছা, আর একদিন হবে'খন।

নিকট কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইবে না। তিনি ভাল আছেন অন্ন পথ্য করিয়াছেন তাহার জন্য কোন ভাবনা নাই।

মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ বাগবাজার, ১৪ অক্টোবর, ১৯০৯

গৌরদাসী এখানেই আছে। ভাল আছে। আমি ভাল আছি।

গড়পার অঞ্চলে শীতলামাতার এক পূজারী ব্রাহ্মণ গৌরীমাকে অতিশয় ভক্তিবিশ্বাস করিতেন। মায়ের পূজারী হইলেও তিনি ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। একদিন গৌরীমার নিকট প্রস্তাব করিলেন,—মাগো, বৃন্দাবনধামে গিয়ে ব্রজেশ্বরী রাধারাণীকে দর্শন করবার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে। তোমার সঙ্গে একবার গিয়ে দেখবো।

গৌরীমা উত্তর দিলেন,—তা' আর এমন কি? আচ্ছা, তোমায় একদিন জ্যান্ত রাধারাণী দেখিয়ে আনবো।

পূজারী ইঙ্গিতটা বুঝিলেন না, প্রতীক্ষায় থাকেন সেই সুদিনের।

গৌরীমা আসিয়া মাকে বলিলেন,—শেতলার বামুনকে ব'লে এসেছি মা, সে একদিন জ্যান্ত রাধারাণীকে দেখতে আসবে।

মা প্রতিবাদ করেন,—ছিঃ, অমন কথা কি বলতে আছে গৌরদাসী? রাধা যে চিন্ময়ী।

আর তুমি কে? তুমিও তো চিন্ময়ী, মায়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া গৌরীমা ঈষৎ-হাস্যে বলেন।

আরও কয়েকদিন অতীত হইল। গৌরীমা উক্ত স্থানে শীতলামাতার পূজা দিতে গিয়াছেন, পূজারী তাঁহার পুরাতন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন,—তুমি-যে বলেছিলে মা, আমায় রাধারাণী দেখাবে। গৌরীমা সেইদিনই ব্রাহ্মণকে লইয়া মায়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মাকে দেখাইয়া বলিলেন,—এঁকে ভাল ক'রে দেখ, স্বাভীষ্ট দেখতে পাবে।

ইনি তো মানুষ! সংশয়ে দোদুল্যমান-চিত্তে ব্রাহ্মণ মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিলেন, প্রণামান্তে তাঁহার মুখদর্শন করিতে মাথা তুলিলেন। বিস্ময়বিহ্বলদৃষ্টিতে দর্শন করিতে লাগিলেন মাতার মুখারবিন্দ, দর্শন আর শেষ হয় না। অবশেষে, পুনরায় চরণবন্দনা করিয়া ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, "বন্দে রাধাং আনন্দরূপিণীং, রাধাং আনন্দরূপিণীং, রাধাং আনন্দরূপিণীং।"

তদবধি এই ব্রাহ্মণ মায়ের পরম ভক্ত হইলেন।

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কালীপদকে একদিন গৌরীমা বলেন,—চল কালী, আসল কালীর কাছে তোকে নিয়ে যাবো আজ। কালীপদ তখনও ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, সেই আসল কালী কোথায় ?

গৌরীমা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মায়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া মাকে বলিলেন,—মা, তোমার এই ছেলেকে এনেছি, একে কৃপা কর।

দর্শনমাত্রই মা বুঝিলেন, কালীপদ ধর্ম্মলক্ষণযুক্ত সন্তান। গৌরীমার প্রদর্শিত আসল কালীর স্নেহস্পর্শ লাভ করিয়া কালীপদর হৃদয়ও এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

সেইদিনই তাঁহার দীক্ষা হইয়া গেল।

তাঁহার প্রতি মা অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। এক মহাষ্টমী তিথিতে তিনি কতকগুলি সুন্দর পদ্ম ও জবাফুল লইয়া মায়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উপস্থিতির কথা জানিতে পারিয়া মা তাঁহাকে কাছে ডাকাইলেন। ফুলগুলি দেখিয়া মায়ের কী আনন্দ! কালীপদ সমস্ত ফুল মাকে দিতে চাহিলে, মা আপত্তি করিয়া বলিলেন,—না, না, সব দিও না বাবা। কিছু আমায় দাও, আমি ঠাকুরের পূজো করবো। বাকী রাখ, তুমি পূজো করবে।

সেই শুভতিথিতে ভাগ্যবান কালীপদ মায়েরই আদেশে অবশিষ্ট পুষ্পসমূহ তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

মাতাঠাকুরাণীর শরণাগত জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বালবিধবা এক পৌত্রী ছিল, নাম পঞ্চাননী। বিধবা পৌত্রীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একদিন তিনি পঞ্চাননীসহ মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন জানাইলেন, —মা, তোমার কাছে সবাই আসে পরমার্থের সন্ধানে, আর আমি সংসারের জ্বালায় ঝল্সে গিয়ে আমার মৃতপুত্রের এই কন্যাকে তোমার চরণ স্পর্শ করাতে এনেছি, যা'তে এর ভবিষ্যৎ রক্ষে পায়।

পঞ্চাননী তখনও বালিকা, পরমা সুন্দরী। মা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—মা আমার নামেও পঞ্চাননী, রূপেও পঞ্চাননী।

কিন্তু মা, ভাগ্যে ও আর পঞ্চাননী হলো না, দুঃখ করেন তাহার বৃদ্ধ পিতামহ।

পঞ্চাননীকে মা কত আদর করিলেন. একখানি সন্দেশ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিলেন। বৃদ্ধ সন্তানকে সান্ত্বনাচ্ছলে মা বলিলেন,—বাবা, ভেবো না তুমি। দেখেই আমি বুঝেছি, এ অসঙ্গা; কোন ভয় নেই। অল্পকাল সাধনভজনেই এর অনেক উন্নতি হবে।

বৃদ্ধ গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—মা, এই কচি বয়েস। সারাজীবন ধর্ম্ম-রক্ষা করতে পারবে তো?

—তা' পারবে। কিন্তু একে দিয়ে তোমার আরো দুঃখু আছে। এ যতদিন বেঁচে থাকবে, যা'র কাছে থাকবে, যা'র খাবে, তা'র কল্যাণ হবে; তবে, মেয়ে অল্পায়ু। শীগ্গির তোমাদের কাঁদিয়ে মা পালায়। যে-ছেলেটি একে বিয়ে করেছিলো, তা'র ভাগ্যে ছিল না বিদ্যাশক্তির সঙ্গে বাস করা। দেবী অংশে এর জন্ম।

মাতাঠাকুরাণী পঞ্চাননীকে দীক্ষাদান করিলেন। মায়ের নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া সে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করিল। কিন্তু ভবিতব্যতা কে খণ্ডন করিতে পারে? পঞ্চাননী দীর্ঘজীবিনী হইল না।

সত্ত্বগুণের আর এক আধার সরযূ। সে এক শিক্ষিত ও বিত্তশালী পরিবারের কন্যা। তাহার গর্ভধারিণীর আকাঙ্ক্ষা ছিল, কন্যা আধুনিক আদর্শে শিক্ষিতা হইয়া স্বামিপুত্র লইয়া সংসারধর্ম্ম করুক। কিন্তু প্রাক্তন সংস্কার কন্যাকে প্রেরণা দিত ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে। তাহার পিতা ছিলেন এক সন্ন্যাসিনীর শিষ্য। এই সূত্রে সেই সন্ন্যাসিনীর নিকট উপদেশ ও উৎসাহ লাভে তাহার ধর্ম্মপিপাসা দিন দিন তীব্রতর হইয়া উঠে। সরযূ যেদিন প্রথম মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইল, মা তাহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিয়া বলিলেন,—তুই আমার কাছে থাক্।

মাতাপিতা ও সমাজের বিরুদ্ধে গিয়া, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মায়ের চরণে পড়িয়া থাকিবার মত মনের বল সরযূর ছিল না। মায়ের আশ্রয়ে তাহার থাকা হইল না বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকিত মায়ের চরণপ্রান্তে। সুযোগ পাইলেই সে ছুটিত মায়ের দর্শনমানসে।

আরও কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত হইল। একদিন সরযূ আনন্দে আত্মহারা হইয়া আসিয়া বলিল,—এক সন্ন্যাসীর কাছে আমার দীক্ষা হয়েছে। আশ্চর্য্য সে দীক্ষা! যে-নাম তের বছর ধ'রে মনে মনে জপ করেছি, যাঁর শ্রীচরণে তনুমন সমর্পণ করেছি, গুরুদেব সেই শ্রীশ্রীমাকেই আমার ইষ্টদেবী ক'রে দিয়েছেন। গুরুদেব বলেছেন, শ্রীশ্রীমা তাঁকে স্বপ্নে বলেছেন, "সরযূকে আমার নাম দিও।"

প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মোহ, পতির প্রীতিবন্ধন, পুত্রকন্যার স্নেহাকর্ষণ কিছুই সরযূর চিত্তকে সংসারমুখী করিতে পারে নাই। মায়ের নিকট দীক্ষা লাভ হয় নাই বটে, কিন্তু নিত্য মায়ের নাম জপ করিয়া, মাকে ধ্যান করিয়া সরযূর মন এক এক দিন এত উর্দ্ধে উঠিত যে, তাহার মনে হইত, স্বামিপুত্র এসব কিছুই কিছু নয়। কেবল মা-ই সত্য।

•

মাতাঠাকুরাণীর আরোগ্যলাভের পর মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের দুই কন্যা—বিষ্ণুবিলাসিনী ও বিষ্ণুমানিনী আসিয়া তাঁহাকে একদিন নিমন্ত্রণ জানাইলেন, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পদার্পণ এবং প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য। মা বলিলেন,—ঠাকুরের ওপর রামচন্দ্রের কী অটল বিশ্বাস ছিল! সেই সিংহের বাচ্চা তোমরা, যাবো বৈ-কি মা! আমি যাবো তোমাদের ওখানে। বেলুড়ের সন্তানদেরও নিমন্ত্রণ করো, রামলালদের করো, গৌরীমাকে করো।

একবার জন্মাষ্টমী তিথিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে পদার্পণ করিয়াছিলেন। যে-পুষ্করিণীতে ঠাকুর পাদপ্রক্ষালন করেন, গৌরীমা তাহার নামকরণ করিয়াছিলেন 'রামকৃষ্ণকুণ্ড'। ঠাকুরকে লইয়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অদ্যাপি প্রতি বৎসর সেই উৎসব প্রতি-

পালিত হইতেছে। অধিকন্তু, ঠাকুরের মহাসমাধির পর তাঁহার দেহাবশেষ এইস্থানে সমাহিত হওয়ায় যোগোদ্যান মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।

কাঁকুড়গাছি উদ্যানে মা যাইতেছেন, এই সংবাদ জানিতে পারিয়া নির্দ্ধারিত দিবসে অনেক ভক্ত নরনারী ও সাধুসন্ন্যাসীর সমাগম হইল। তথায় উপস্থিত হইয়া মা সকল ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিলেন, যাহাতে কিছু ত্রুটি না হয়। তাহার পর ঠাকুরের প্রতিকৃতির সমক্ষে নাটমন্দিরে ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বিশেষরূপে শোভিত একখানি আসন মাতা গ্রহণ করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে জনৈকা কন্যা শ্রীশ্রীসারদা-স্তোত্রটি আবৃত্তি করিল।* তৎপর গোলাপমা ঠাকুরের পুণ্যকথা আলোচনা করিলেন। লক্ষ্মীদিদি এবং চপলা-নাম্নী এক ভক্তিমতীর সুমধুর কীর্ত্তনে শ্রোতৃমণ্ডলী পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। পূজা ও ভোগরাগের পর মাতাঠাকুরাণী এবং সমবেত মহিলাবৃন্দের মধ্যে গৌরীমা প্রসাদ পরিবেশন করেন। রামচন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের ভক্তি ও আন্তরিকতায় আনন্দের মধ্যে সম্পন্ন হইল এই মাতৃবন্দনা উৎসবটি।

মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাঁহারা প্রায়শঃ যাতায়াত করিতেন, তন্মধ্যে হরির মা অন্যতম। হরির মা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, মাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। তাঁহার আচারনিষ্ঠা ছিল বড়ই কঠোর, মায়ের বাটীতেও তিনি কদাপি

* প্রকৃতিং পরমাং অভয়াং বরদাং নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগত-সেবক-তোষকরীং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

স্বামী অভেদানন্দ এই সুপ্রসিদ্ধ মাতৃস্তোত্রটির রচয়িতা। ইহার প্রসঙ্গে তিনি লেখিকাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি প্রথম যেদিন স্তোত্রটি মাকে শুনাইয়াছিলেন, "রামকৃষ্ণ-গতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াং তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং" এই অংশটি শুনিতে শুনিতে মায়ের নয়নযুগল হইতে বিন্দু বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়ে। সমগ্র স্তোত্রটি আবৃত্তি করা হইলে মাতা অভেদানন্দজীকে অশেষ আশীর্ব্বাদ করেন।

প্রসাদ গ্রহণ করিতেন না। গোলাপমা এবং অন্যান্য ভক্তিমতীদিগের অনুরোধও তাঁহাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। সরলমতি রাধারাণী একদিন বৃদ্ধার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে,—হরির মা, আমাদের ছোঁয়া-ভাত খেলে কি তোমার জাত যাবে? আমরাও তো বামুন, তবে কেন প্রসাদ খাও না এখানে? হরির মা রাধারাণীকে সস্নেহে জড়াইয়া ধরিয়া যেন মিনতির সুরেই বলেন,—দিদি, আমি-যে কেবল স্বপাকে হবিষ্যান্ন খাই। মায়ের কাছে না এসে থাকতে পারিনে, তাই মাকে দেখতে আসি। তোমাদেরও দেখতে আসি। কিন্তু আমি তো কোথাও কিছু খাইনে।

হরির মাকে মাতাঠাকুরাণী প্রসন্নদৃষ্টিতে দেখিতেন। তাঁহাকে কখনও অন্নব্যঞ্জনাদি প্রসাদ গ্রহণ করিতে বলিতেন না, ফলপ্রসাদ দিতেন। নলিনীদিদির অসুখে একবার হরির মা কত স্নেহযত্নে সেবা করিয়াছিলেন। তাহার পর স্বগৃহে ফিরিয়া স্নানান্তে স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া আহার করিতেন। যদিও তিনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে কঠোর নিয়ম পালন করিতেন, হৃদয় ছিল তাহার উদার ও ভালবাসায় পূর্ণ। কেহ তাঁহার আচারবিচারের সমালোচনা করিলে মা বলিতেন,—কারু নিষ্ঠায় হাত দিতে নেই, কারুর উপাসনায় হাত দিতে নেই।

এইসময়ে একদিন মায়ের বাটীতে গোলাপমা, ছোটমামী, ন'দিদি এবং আরও কয়েকজন গৌরীমার আশ্রমের জনৈকা কন্যাকে ঘিরিয়া ধরিলেন,—তুমি কেন মাছ খাবে না? মাছ না খেলে, গৌরমার মত কঠোরতা করলে, তুমি ক'দিন বাঁচবে? তোমায় মাছ খেতেই হবে।

আলোচনার পর তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এই কন্যার মাছ খাইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু গৌরমার ভয়ে খাইতে পারিতেছে না। মাতাঠাকুরাণীর সম্মতি লইয়া ইহাকে মাছ খাওয়াইতে হইবে, তাহা হইলে গৌরমা আপত্তি করিতে পারিবেন না। অদ্য হইতেই এই ব্যবস্থা আরম্ভ করিতে হইবে।

তাঁহাদিগের বক্তব্য মাতাকে জানাইলেন। তিনি কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,—মাছ খেলে দোষ নেই। তোমার ইচ্ছে হ'লে খাবে মা।

গোলাপমা বলিলেন,—গৌরমার শিক্ষায় মেয়ে এভাবে তৈরী হচ্ছে।

গৌরীমা জানাইলেন,—ওর যদি ইচ্ছে থাকে, মা-ঠাকরুণ যদি বলেন, খাবে মাছ। আমি বারণ করবো না।

এইপ্রকার বাদপ্রতিবাদে আপত্তি জানাইয়া যোগেনমা বলেন,—তোমরা অত কথা বললে, ও মতি স্থির করতে পারবে না। মা-ঠাকরুণের হাতে এর ভার ছেড়ে দাও।

মাতাঠাকুরাণী ধীরে ধীরে কন্যাকে বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন,—শোন মা, আমার কথা। তোমার যদি মাছ খেতে ইচ্ছে যায়, কোন দ্বিধাসঙ্কোচ করো না তুমি, মাছ খাবে। আর যদি খাবার প্রবৃত্তি তোমার না থাকে, তা'হলে কারু প্ররোচনায় তুমি খেয়ো না। আমি বললেও খেয়ো না। কেন নিজের অনিচ্ছায় খাবে, তুমি নিজে ভেবে স্থির কর মা, অন্যের কথায় চলো না।

মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া কন্যা বলিল,—কোনদিনই আমার মাছ খেতে ইচ্ছে হয়নি মা। মাছ আমি খাবো না।

উত্তরে মা প্রীত হইলেন, নিকটে টানিয়া কন্যাকে আদর করিলেন।

কয়েকদিবস পরের কথা। মাতাঠাকুরাণী একদিন বাল্মীকির আশ্রমে নির্ব্বাসিতা সীতাদেবীর খেদোক্তিবিষয়ক একখানি গান গাহিতেছিলেন,—

বহু সাধনার গুণে পেয়েছিলাম নবদূর্ব্বাদল শ্যামে,
হারায়েছি বিনা যতনে, ধিক্ রে জীবনে। * *

শ্রুতিমধুর করুণ সঙ্গীতটি সকলে নীরবে শুনিতেছিলেন; লেখিকা মাতার পদসেবা করিতেছিল। অনেকদিন হইতে একটি প্রার্থনা তাহার হৃদয়মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে সে নিবেদন করিল,—মা, আমায় সন্ন্যাস দিন।

মাতাঠাকুরাণী প্রথমতঃ মৃদু হাস্য করিলেন, কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত

করিয়া রহিলেন, তাহার পরে বলিলেন,—হ্যাঁ মা, তোমায় সন্ন্যাস দেবো। শরৎকে ব'লে একটা শুভদিন আগে দেখি।

শুভদিন স্থির হইল। ১৩১৬ সালের রাধাষ্টমী তিথিতে মাতৃভবনে ঠাকুরঘরে পূজাহোমাদির অনুষ্ঠানান্তে সিদ্ধিদায়িনী মাতা কন্যাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করেন। গৈরিক বস্ত্রে কন্যার দেহ আচ্ছাদিত করিয়া মা তাহার শিরে মঙ্গলহস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। যাবতীয় অনুষ্ঠান দুইদিনে সম্পন্ন হয়। মায়ের নির্দ্দেশে স্বামী সারদানন্দ ইহার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

এই বৎসর নবনির্ম্মিত গৃহে শারদীয়া পূজায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে লইয়া বিশেষ আনন্দোৎসব হয়। ভক্তগণের আগমনের বিরাম নাই। মঠ হইতে মহারাজগণও অনেকে আসিয়াছেন। মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দও এইবার মায়ের বাটীতে উপস্থিত। পূজার কয়দিন মায়ের অবসর নাই। ভক্তগণের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ, প্রার্থীদিগকে দীক্ষাদান ইত্যাদিতে সকল সময় চলিয়া যায়।

বসন্তের আক্রমণ হইতে সুস্থ হইয়া অবধি গৌরীমাও মায়ের বাটীতেই বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময় নবম্যাদি-কল্পারম্ভের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তদশ দিবস বিধিমত চণ্ডীপাঠ এবং হোম করিতেন। এইবার মাতৃভবনে মাতাঠাকুরাণীর সমক্ষে প্রতিদিন চণ্ডীপাঠ করিলেন। মহানবমী তিথিতে দক্ষিণান্তে হোমসমাপনের পর মাতাঠাকুরাণীর চরণকমলে অষ্টোত্তরশত রক্তপদ্ম অঞ্জলি প্রদান করিয়া গৌরীমা বলিলেন, "মা, আজ আমার চণ্ডীপাঠের ব্রত উদ্‌যাপন হলো, সর্ব্বার্থসাধিকা চণ্ডীর সামনে চণ্ডী পাঠ ক'রে।"

গৌরীমা   লেখিকা   রাধারাণী   শ্রীশ্রীমা   সুশীলা   কুসুম   হরির মা

(ফটো -- বি. দত্ত)

মৃন্ময়ী দেবী ও রামেশ্বর মহাদেব

নূতন বাটীতে কয়েকমাস বাস করিয়া কালীপূজার পর মাতাঠাকুরাণী জয়রামবাটী চলিয়া গেলেন। অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, জগদ্ধাত্রী-পূজা উপলক্ষেই মাতা পল্লীভবনে যাইতেছেন এবং দুই-তিন মাসের মধ্যেই কলিকাতায় ফিরিবেন। কিন্তু ছয় মাস অতীত হইয়া গেল তথাপি মা ফিরিয়া আসিলেন না।

মাতৃগতপ্রাণ সারদানন্দজী অনেক চেষ্টা করিলেন, মা আসিলেন না। ভক্তগণের প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। এইসময়ে গৌরীমা বারাকপুর আশ্রম হইতে বসিরহাটে গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্যোপলক্ষে। তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় আসিবার জন্য সারদানন্দজী অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তিনি আসিলে সারদানন্দজী অবস্থা জানাইয়া বলিলেন, "মা-ঠাকরুণের জন্যে নতুন বাড়ী তৈরী হলো, কিন্তু তিনি-যে জয়রামবাটী থেকে আর আসতে চাইছেন না। তাঁর দর্শনকাঙ্ক্ষী ভক্তেরা সকলে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। তুমি নিজে গিয়ে যেমন ক'রে হোক মা-ঠাকরুণকে নিয়ে এসো গৌরমা। এ আর কারুর কম্ম নয়।"

সারদানন্দজী এবং ভক্তগণের ব্যাকুলতা বুঝিয়া গৌরীমা জয়রামবাটী যাত্রা করিলেন, সঙ্গে গেলেন লেখিকা। * বিষ্ণুপুর হইতে তাঁহারা গরুর গাড়ীতে কোতলপুর গেলেন, কোতলপুর হইতে জয়রামবাটী। সেখানে মাতার সহিত সাক্ষাতের বিবরণ বড়ই কৌতুকাবহ।

---

* জয়রামবাটী হইতে লেখিকার নিকট প্রেরিত মাতাঠাকুরাণীর এক পত্রের তারিখ দেখিয়া জানা যায় যে, তাঁহারা ১৩১৭ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখের পূর্ব্বে বসিরহাট হইতে বাগবাজারে মাতৃভবনে আসিয়া তথা হইতে জয়রামবাটী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

১. মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ আনুড়, ১৩ জুন, ১৯১০

এখানে গৌরমাতা ও দুর্গা পংছিয়াছেন * * আমাকে উহারা লইয়া জাইব

"সেইদিন জয়রামবাটীতে এক সাধুর আবির্ভাব হইল,—গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ি, হাতে এক লাঠি। সঙ্গে তাঁহার অনুরূপ এক চেলা। সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহারা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমায়ের সহোদর তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দিদিকে গিয়া সংবাদ দিলেন, 'দেখ গো, তোমার এক মাদ্রাজী ভক্ত এসেছে।'

"এদিকে সাধুও বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা না করিয়া একেবারে অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়াকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া সাধু তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। একে অপরিচিত পুরুষমানুষ, তাহাতে অন্তঃপুরের মধ্যে, তাহার উপর অসময়ে ভিক্ষা চাওয়া,—ভ্রাতৃজায়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সাধুকে গালমন্দ আরম্ভ করিলেন, 'আ মরণ, ভিক্ষের আর জায়গা পেলে না? এ ভর-সন্ধ্যেয় গেরস্তের বাড়ীর মধ্যে এসেছ ভিক্ষে চাইতে!'

"সাধু তাহা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া তাঁহার দিকে এক-পা দুই-পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহিলাও ভয়ে ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিলেন, পশ্চাৎ দিকে সরিতে সরিতে একস্থানে ঠেকিয়া পড়িলেন। তখন তিনি একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'ওগো ঠাকুরঝি, শীগ্‌গির এসো, একটা বেটাছেলে অন্দরে ঢুকেছে।'

"চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর সকলে ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীমাও আসিলেন এবং সাধুকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সাধু অগ্রসর হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ইহাতে শ্রীশ্রীমা আরও বিস্মিত হইলেন। সাধু তখন মাথার পাগড়িটা একটানে খুলিয়া ফেলিয়া হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্রীশ্রীমা বিস্ফারিত-

---

বলিয়া বসিয়া আছেন বোধ হয় ১০ রোজ আগামি মাহায় কলিকাতায় জাইব

২. পোঃ আনুড়, ১৫ জুন, ১৯১০

এখানে দুর্গা ও গৌউরমাতা ভাল আছেন বোধ হয় আমি আগামি মাহায় ১০ রোজ উহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মোঃ কলিকাতা রওনা হইব

নেত্রে গালে হাত দিয়া বলিলেন, 'ওমা গৌরদাসী! আমি যে সত্যি চিন্‌তে পারিনি। খুকীকেও চিনলুম না! ধন্যি মেয়ে বাপু, তোমরা!' বাড়ীতে হাসির রোল পড়িয়া গেল। গৌরীমা ছোটমামীকে বলিলেন, 'ভর-সন্ধ্যে বেলা কি এমনি ক'রেই পরদেশী সাধুকে গেরস্তের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হয়, ছোটমামী!" (৬)

এইসময়ে জয়রামবাটীতে পঞ্চানন ব্রহ্মচারী, শৌর্য্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক, পীতাম্বর নাথ, লীলাবতী দেবী, শতদলবাসিনী দেবী প্রভৃতি ভক্তের সমাগম হয়। তাঁহারা নিত্য মায়ের দর্শন ও উপদেশ লাভ এবং সেবা করিয়া পরম আনন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে গৌরীমা লক্ষ্য করিতেন, মাতাঠাকুরাণীর পরিশ্রমের অন্ত নাই। গৃহকর্ম্ম এবং ভক্তদের জন্য রন্ধনাদিও অনেক সময় তাঁহাকেই করিতে হয়। কোনদিন অধিক রাত্রিতে ভক্তসমাগম হইলে, তাঁহাদিগের জন্য মাকেই আহার্য্যাদি প্রস্তুত করিতে হয়।

গৌরীমা ভাবিলেন যে, মামীদের মধ্যে কেহ মায়ের নিকট দীক্ষা লইলে ঠাকুরসেবার সুবিধা হইবে, মায়ের পরিশ্রমেরও লাঘব হইবে। বড়মামার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী সুবাসিনী দেবীর নিকট গৌরীমা দীক্ষার প্রস্তাব করিলেন।

বড়মামার পুত্র শ্রীগণপতি মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছে,—

"আমার গর্ভধারিণীর মুখে শুনেছি,—তিনি এবং আমার বড়মা এবং আমাদের পরিবারের সকলেরই গৌরীমার উপর অতিশয় ভক্তিবিশ্বাস ছিল। আমাদের পিসিমাও গৌরীমার কথা মানতেন। গৌরীমা একদিন আমার মাকে বলেন, আমাদের মা-ঠাকরুণকে তুমি ঠাকুরঝি মনে করো না। তিনি সাক্ষাৎ মা সীতা, ভগবতী। তাঁর কৃপা হলে তোমার ইহকাল পরকালের কল্যাণ হবে। মা-ঠাকরুণের কাছে তুমি দীক্ষা নাও। তাঁর সেবা যত্ন কর। মাকে যেন রান্নাভাঁড়ার নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হতে না হয়, তুমি এসবের ভার নাও। এতেই তোমার ছেলেপুলেরও কল্যাণ হবে।

"আমাদের পরিবারে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কারণে পিসিমা নিজের বংশে কা'কেও দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু গৌরীমার কথায় পিসিমা আমার মাকে দীক্ষা দিলেন।"

বড়মামী যখন নিকটে থাকিতেন, মাতাঠাকুরাণীর যথাসাধ্য সেবাযত্ন করিতেন। তাঁহার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মা বলিয়াছিলেন, "এটিকে গৌরদাসী জুটিয়ে দিয়েছে!"

জয়রামবাটীর জমিদার শম্ভুনাথ রায়ের বাড়ীতে পদ্মফুল সংগ্রহ করিতে গিয়া ইতঃপূর্ব্বেই গৌরীমার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। শম্ভুনাথ অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। গৌরীমা একদিন তাঁহাকে বলেন, "বাবা, তোমার মত ভাগ্যবান কে? তোমার খাসতালুকে মা ব্রহ্মময়ী প্রজা হ'য়ে ব'সে আছেন।" গৌরীমার মুখে ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরাণীর মহিমা শ্রবণ করিয়া তিনি মুগ্ধ হন এবং গৌরীমা তাঁহাকে মায়ের নিকট লইয়া যান। তদবধি শম্ভুনাথ মায়ের পরম ভক্ত।

এইবার গৌরীমার আমন্ত্রণে একদিন তিনি মায়ের বাটীতে আসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

স্বামী সারদানন্দ জনৈক ব্রহ্মচারী সেবককে কিছুদিন মাতাঠাকুরাণীর সান্নিধ্যে থাকিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথম দিনই মা তাঁহাকে প্রশ্ন করেন,—তুমি এ পথে কেন এসেছো বাবা?

মায়ের প্রশ্নের তাৎপর্য্য সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া সেবক বলিলেন,—মা-বাবা কেউ বেঁচে নেই, সংসারে ভাই-বৌদিদের তাঁবে খাটতে হয়। হাটবাজার, ডাক্তার, ওষুদ এই নিয়ে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছিলো। এসব আর ভাল লাগলো না মা, তাই সাধু হয়েছি। এখন আপনার আশ্রয়ে দিব্যি শান্তিতে আছি।

তা'হলে কাজের ভয়ে সাধু হ'তে এসেছো তুমি! এই বলিয়া মা হাসিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন পরে একদিন সেবকটি খাইতে বসিয়াছেন, পরিবেশন করিতেছিল রাধারাণী। বারংবার এটা আনো, ওটা আনো, বলিয়া তিনি রাধারাণীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। সর্ব্বশেষে একটু মিষ্টি চাহিলেন। রাধারাণী একটু গুড় আনিয়া দিল, কিন্তু তাহাতে ছিল কয়েকটা পিঁপড়া। ইহাতে সেবক বিরক্তির সহিত বলিলেন,—দেখে দিতে পারনি? পিঁপড়েসুদ্ধ্ গুড় খাবো কি ক'রে? কোন শিক্ষা হয়নি তোমার।

মাতাঠাকুরাণী নিকটেই উপবিষ্ট ছিলেন, বলিলেন,—বাবা, তুমি সাধু হ'তে এসেছো, পিঁপড়ে-ক'টা তুমিও তো বেছে নিতে পারতে। সাধু হ'তে হ'লে জিভের সংযম চাই।

সেবক নিজের ত্রুটি বুঝিতে পারিয়া অধোবদনে রহিলেন।

এইসময়ে দূরদেশ হইতে জনৈক সন্তান—ন—মানসিক অশান্তিতে জর্জ্জরিত হইয়া শান্তিলাভের আশায় মায়ের নিকট আসিয়াছিলেন। একদিন মায়ের নিকট পারিবারিক অশান্তি এবং স্ত্রীর আচরণের কথা বলিতে বলিতে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলেন,—জানেন মা, একসময় আমার খুন করবার ইচ্ছে হয়েছিলো।

মাতাঠাকুরাণীও উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন,—কেন তুমি খুন করবে? কোন অধিকারে মানুষকে খুন করবে?

এই বলিয়া মাতা স্বীয় দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন,—আমায় ছুঁয়ে বল তো, তুমি কি নিষ্পাপ? এত প্রবল তোমার ক্রোধরিপু! যে জীবন ঈশ্বর দিয়েছেন, তা' কেড়ে নেবার তুমি কে? কখ্খনো মেয়েমানুষের গায়ে হাত দেবে না, ব'লে দিচ্ছি।

শান্তস্বভাবা মাতার এইরূপ কঠোর তিরস্কারে সন্তানটি হতবাক্ হইলেন। তাঁহার চৈতন্যের উদয় হইল। স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মাতার চরণযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

ক্ষমারূপিণী মাতা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলেন এবং অনেক উপদেশ দিলেন অধিকন্তু এইবার তাঁহাকে দীক্ষাদানও করিলেন।

জয়রামবাটী অঞ্চলের কয়েকটি সন্তান সাধুব্রহ্মচারী হইয়া যাওয়ায় কাহারও কাহারও মনে আশঙ্কার উদয় হয় যে, মাতাঠাকুরাণীর প্রভাবে দেশের ছেলেরা সাধু হইয়া যাইবে। দীক্ষিত সন্তানদের পত্নীরা যে মাতাঠাকুরাণীর নিকট আসিয়া প্রণামদণ্ডবৎ করিবে, ধর্ম্মকথা শুনিবে, ইহাতেও অভিভাবকগণ কেহ কেহ আপত্তি করিত, এমন-কি সামাজিক শাসনের ভয়ও দেখাইত। কিন্তু মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কিছু বলিবার মত সাহস তাহাদের ছিল না। কারণ, তিনি জগজ্জননীরূপে সকলকে স্নেহাশিস বিতরণ করেন, অন্নপূর্ণামূর্ত্তিতে সকলকে অসময়ে নানাভাবে সাহায্য করেন। অনেকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি পল্লীবাসীদের পূজনীয়া পিসিমা।

মাতাঠাকুরাণী একদিন কথাপ্রসঙ্গে গৌরীমাকে জানাইলেন,—দেখ মা, এখানকার কেউ কেউ বলে কি-না, ছেলেদের আমি সব সাধুসন্সিসী ক'রে দিচ্ছি, অজাতকে মন্তর দিচ্ছি। আমার কাছে এলে না-কি লোকেদের জাত যাবে!

তাঁহার এইকথা শুনিয়া গৌরীমা বলিলেন,—তোমার কাছে সন্ন্যাস পাওয়া তো মহাভাগ্যের কথা মা। ক'টা লোক সাধুসন্সিসী হ'তে পারে? আর, জাতপাতের যিনি মালিক, তাঁর কাছে এলে জাত যাবে, কে বলে এমন কথা? আচ্ছা, দেখছি আমি। এই বলিয়া মাকে দণ্ডবৎ করিয়া সেই দিনই গৌরীমা তাঁহার দামোদরশিলাকে কণ্ঠে দোলাইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। সমাজপতিদের সঙ্গে অবিলম্বে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। পথেই র— এবং ক—এর সঙ্গে সাক্ষাৎ। র—গৌরীমাকে বলেন,—মা, আমি শ্রীশ্রীমার কাছে দীক্ষা পেয়েছি, অথচ আপনার বৌমাকে কিছুতেই একবার শ্রীশ্রীমায়ের চরণদর্শন করাতে আনতে পারছি না। আমার শ্বশুর শাসাচ্ছেন আমাকে, ভয়ে আমি ছুটোছুটি করছি।

ক—ও তাঁহার নিজের অবস্থার বর্ণনা দিয়া বলেন,—গৌরমা, বাড়ী ছেড়ে যেতে দিচ্ছে না, গ্রামের প্রধানরা আমায় ভয় দেখাচ্ছে। আপনার আশ্রমে আমার স্ত্রীকে কি আশ্রয় দিতে পারেন?

গৌরীমা আশ্বাস দিয়া বলেন,—তোমরা কেন ভাবছো? এক্ষুণি আমি যাচ্ছি মোড়লদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, চলো আমার সঙ্গে।

ঐ অঞ্চলে কোয়ালপাড়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। গৌরীমা তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ অঞ্চলের প্রধানদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সন্ন্যাসিনী মাতার আহ্বানে অনেকেই আসিলেন। গৌরীমা তাঁহাদের নিকট ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর মহিমা ব্যাখ্যান করিলেন। দীক্ষিত-দিগের মধ্যে যাহারা বিবাহিত, তাহাদের পক্ষে যে সস্ত্রীক যাইয়া গুরুমাতার চরণবন্দনা অবশ্য কর্ত্তব্য, একথাও তিনি বুঝাইয়া দিলেন।

গৌরীমা আরও বলিলেন,—তোমাদের মধ্যে কা'রা এমন কথা প্রচার করছ যে, মা-ঠাকরুণের কাছে গেলে জাত যাবে? এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা ব'লে তোমরাই ধর্ম্মের কাছে অপরাধী হ'চ্ছ। নিজের দেশের লোক ব'লে যাঁর স্বরূপ চিনতে পারছ না, তিনি সামান্য নারী নন, তিনি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, জগতের কল্যাণে নারীদেহে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি যা' করছেন, তোমাদের সমাজের কল্যাণের জন্যেই করছেন। যে তাঁকে বুঝবে, সে উদ্ধার পাবে।

তেজোময়ী সন্ন্যাসিনীর কথা শুনিয়া শ্রোতারা সকলে নির্ব্বাক। র—এর শ্বশুর এবং আরও একজন অগ্রসর হইয়া গৌরীমাকে বলিলেন,—মা, আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা মা-ঠাকরুণকে সত্যি বুঝতে পারিনি। কাল সকালে তাঁর চরণে উপস্থিত হ'য়ে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করবো।

পরদিবস বিরুদ্ধ সমালোচকগণ মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইলেন।

কোয়ালপাড়ার ভক্তগণের আহ্বানে গৌরীমা আর একদিন তথায় গিয়া ঠাকুরের বাণী প্রচার করিয়া আসিলেন। তাঁহার উৎসাহবাণীতে চারিদিকে নব উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিল। ইহার পর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম হইতে অধিক সংখ্যায় নরনারী মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে আসিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, "গৌরী যে ঠাকুরের কথায় এদেশ ভাসিয়ে দিলে!"

জয়রামবাটী হইতে মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বামী সারদানন্দ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং গৌরীমাকে দুইখানি পত্র লিখেন। স্বামিজীর ব্যাকুলতাপূর্ণ দ্বিতীয় পত্রখানি পাইবার পর তাঁহারা কলিকাতা' অভিমুখে যাত্রা করেন।

"পথে কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিয়া আহারাদি এবং বিশ্রাম করা হইল। সেখান হইতে বিষ্ণুপুর উপস্থিত হইলে এক ভক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে প্রণাম করিয়া যৎপরোনাস্তি বিনয়সহকারে বলিলেন, 'মা, তোমার অপেক্ষায় আমি কতকাল ব'সে আছি। একবার গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তোমার পায়ের ধূলো দিতে হবে।' কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই অন্যপ্রকার ব্যবস্থা থাকায় তখন ব্রাহ্মণের গৃহে যাওয়া সম্ভবপর হইল না। বিষ্ণুপুরে অন্য এক পরিচিত ভক্তের বাড়ীতে গিয়া তাঁহারা উঠিলেন। সেখানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া সকলে রেল-ষ্টেশন অভিমুখে চলিলেন।

"পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ পুনরায় আসিয়া তাঁহার গৃহে পদার্পণ করিবার জন্য শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। জনৈক সন্তান ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, 'এখন আর কোথাও যাওয়া হ'তে পারে না, সময়ে কুলোবে না।' ব্রাহ্মণের গৃহে গেলে পরবর্ত্তী রেলগাড়ী ধরা যাইবে না, অনেকেরই এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় ঘোড়ার গাড়ী ষ্টেশনের দিকেই চলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ বিফলমনোরথ হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে করুণাময়ী মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ ব্যথিত হইল; অথচ এতগুলি লোক যাইয়া রেলগাড়ী ধরিতে না পারিলে অনেকরকম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি কোন কথা বলিলেন না।

"ব্রাহ্মণ এইবার অভিমানে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় শেপো না, ওদের বল।' তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া গৌরীমা বলিলেন, 'মা, তোমার যদি যাবার ইচ্ছে থাকে, তবে তা' বল। ব্রাহ্মণের বাড়ী হয়েই যাওয়া হোক, ভক্তের চোখের জল পড়ছে।' শ্রীশ্রীমায়ের ইঙ্গিত পাইয়া গৌরীমা গাড়োয়ানকে আদেশ করিলেন, 'গাড়ী ফেরাও।' পূর্ব্বোক্ত সন্তান পুনরায়

সতর্ক করিয়া দিলেন, 'কাজটা কিন্তু ভাল হলো না, গৌরমা, শেষে গাড়ী ফেল হবে।' গৌরীমা গম্ভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'গাড়ী কিছুতেই ফেল হবে না, তুমি দেখে নিও।'

"ভক্ত ব্রাহ্মণের ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। তাঁহার পূজিতা 'মৃন্ময়ী' দেবীর দর্শনে সকলেই আনন্দ লাভ করিলেন। ব্রাহ্মণ ভক্তিসহকারে কতকগুলি ফল আনিয়া শ্রীশ্রীমাকে নিবেদন করিলেন। তিনিও পরম আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন, এবং এই সৌভাগ্যের জন্য গৌরীমার নিকট বারংবার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেইস্থান হইতে ফিরিবার সময় শ্রীশ্রীমা কহিলেন, 'গৌরমণি, এই দেবীকে দর্শন করতে ঠাকুর আমায় বলেছিলেন। কিন্তু কত বছর কেটে গেল দর্শন করা হয় নি। এবার মা, তোমার জন্যে সেটি হলো।'

"ইহারই কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে জয়রামবাটীতে ঠাকুরের কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 'কামারপুকুরে একদিন রঘুবীরের ভোগ হ'য়ে গেলে ঠাকুরকে ডাকতে গিয়ে দেখি, তিনি ঘুমুচ্ছেন। ভাবলুম, ঘুম ভাঙ্গাবো না ; আবার মনে হলো, কিন্তু খেতে যে দেরী হ'য়ে যাবে। পরক্ষণেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জেগে উঠে বললেন, 'দেখ গা, এক দূরদেশে গিছলুম। সেখানকার লোক সব সাদা সাদা। তা'রা পরে আসবে। কিন্তু আমার দেখা পাবে না, তোমায় তা'রা দেখতে আসবে।'

"সেই দিনই ঠাকুর বলেছিলেন, 'বিষ্ণুপুরের মৃন্ময়ীদেবীকে দর্শন করো, আমি দেখেছি, ভারী জাগ্রত।"

"মৃন্ময়ীদেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহারা ষ্টেশনে যাইয়া শুনিলেন, গৌরীমার কথাই সত্য, গাড়ী তখনও আসে নাই। শ্রীশ্রীমা এবং ভক্তগণ ইহাতে খুবই আনন্দিত হইলেন। শ্রীশ্রীমাকে দেখিতে পাইয়া দীনদুঃখী কুলীমজুর অনেকে আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গৌরীমা তাহাদিগকে বলিলেন, 'জানকীমায়ীকে প্রণাম কর।' শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া সেই সরলপ্রাণ ভক্তগণ কেহ কেহ ভাবাবেগে কাঁদিতে

লাগিল। করুণাময়ী তাহাদিগকে নাম-দানে কৃতার্থ করিলেন। নিকটেই ছিল একটা ফুলের গাছ, গৌরীমা কতকগুলি ফুল আনিয়া তাহাদিগের হাতে দিয়া তদ্দ্বারা শ্রীশ্রীমায়ের চরণে অঞ্জলি দিতে বলিলেন। তাহারা ভক্তিভরে তাহাই করিল। শ্রীশ্রীমা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় সকলে সম্মিলিতকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল—'জানকীমায়িকী জয়!" (৬)

রথযাত্রা উপলক্ষে মাতাঠাকুরাণী একদিন শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশে রথ দেখিতে গিয়াছিলেন। মাহেশে জগন্নাথদেবের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত কমলাকান্ত পিপলাই চক্রবর্ত্তী; কিন্তু জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ব্যবস্থা কলিকাতার কৃষ্ণচন্দ্র বসুদের, তাঁহাদেরই আগ্রহে মাতাঠাকুরাণী সেখানে গিয়া আনন্দোৎসবে যোগদান করেন।

যাত্রার প্রাক্কালে লেখিকাকে মা ডাকিয়া পাঠাইলেন। একখানি মোটর গাড়ীতে ছোটমামী, রাধারাণী, নিতাইবাবুর মা এবং লেখিকাকে লইয়া মাতাঠাকুরাণী মাহেশে যাত্রা করেন। গণেন্দ্রনাথ সেবকরূপে গাড়ীর সম্মুখভাগে রহিলেন। মা রথ দেখিতে যাইতেছেন শুনিয়া আরও বহু ভক্ত নরনারী নৌকা, ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি যানে তথায় চলিলেন।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সম্মুখস্থ বসুদের প্রশস্ত বাটীতে মাতার বসিবার ব্যবস্থা হইল। তথায় পৌঁছিয়া মা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। অদূরে জগন্নাথের সুসজ্জিত রথ, চারিদিক হইতে বিপুল জনস্রোত আসিয়া তথায় মিলিত হইয়াছে এবং রথক্ষেত্র যেন আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। ইতোমধ্যে গৌরীমা, যোগেনমা, গোলাপমা, হরির মা প্রভৃতি ভক্তিমতী মায়েরা এবং অনেক গৃহী, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সন্তানও সারদানন্দজীর সঙ্গে নৌকাযোগে আসিয়া সেইস্থানে মিলিত হইলেন।

মাতাঠাকুরাণী কি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রথরজ্জু টানিতে পারিবেন, কর্ত্তৃপক্ষ তখন তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মাতার নির্দ্দেশে মায়েরা জগন্নাথদেবের স্তবপাঠ করিলেন। অতঃপর সন্তানগণ মাতাঠাকুরাণী

এবং নারীভক্তগণকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহত্রয়ের উদ্দেশে প্রণাম এবং ফল নিবেদন করিবার পর রথটানা আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে বিশাল জনতার কণ্ঠনিঃসৃত 'জগন্নাথ মহাপ্রভুকী জয়' ধ্বনির মধ্যে রথ চলিতে আরম্ভ করিল। কিয়দ্দূর রথের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া মা বিশ্রামকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তথায় কিছুক্ষণ ভজনগান হইবার পর প্রসাদের ব্যবস্থা হইল। বসুপরিবারের এবং সেবায়েতদিগের আন্তরিক আদর-আপ্যায়নে সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন।

ইতঃপূর্ব্বে রামকৃষ্ণ বসু এবং তাঁহার গর্ভধারিণী উড়িষ্যায় বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত তাঁহাদের জমিদারি কোঠারে একাধিকবার মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া গিয়াছিলেন। লেখিকারও একবার মায়ের সঙ্গে তথায় গিয়া কিছুকাল বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

১৩১৭ সালে শীতের প্রারম্ভে তাঁহারা পুনরায় মাকে কোঠারে লইয়া গেলেন। রাধারাণী, গোলাপমা, স্বামী ধীরানন্দ, স্বামী সত্যকাম-প্রমুখ নারীপুরুষ কয়েকজন ভক্ত মায়ের সঙ্গী হইলেন। ভদ্রক রেলষ্টেশন হইতে কোঠারের দূরত্ব আট-দশ ক্রোশ, যানবাহনে যাইতে হয়। কোঠারের পল্লীভবনে তাঁহারা প্রায় দুইমাস অবস্থান করেন। পল্লীগ্রামের মধ্যে আসিয়া মায়ের মন প্রফুল্ল হইল, স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইল। রামকৃষ্ণ বসুর উৎসাহে এইবার তথায় সরস্বতী পূজা সমারোহে সম্পন্ন হয়। নৃত্যগীতাভিনয়ের ব্যবস্থাও হইয়াছিল। উৎকলবাসী বালকগণের নৃত্যগীতে মাতা পরম তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কোঠারে যাঁহারা এইবার মায়ের নিকট দীক্ষালাভ করেন, তন্মধ্যে উৎকলনিবাসী ডাক্তার শ্রীব্রজনাথ মিশ্র, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক এবং শিলঙের শ্রীবীরেন্দ্রকুমার মজুমদার অন্যতম।

মাতৃকৃপার বর্ণনায় ব্রজনাথ লিখিয়াছেন,—

"রামকৃষ্ণ-মিশনের কোন কোন সাধুমহারাজের কথা তখন দুই-একজন বন্ধুবান্ধবের নিকট কিছু কিছু শুনিয়াছি মাত্র, তাহার অধিক বিশেষ

কিছু জানিতাম না। তবে, ঐ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম, উৎসাহ পাইতাম। এমন সময়ে একরাত্রে স্বপ্নে এক মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। প্রসন্ন মূর্ত্তি, দর্শনে ভক্তি হয়। কিন্তু, কে এই মা? কোথায় তিনি থাকেন? কিছুই জানি না। জানিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইল।

প্রাণের যখন এইপ্রকার অবস্থা, পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী গৌরীমা এবং দুর্গামা একবার কটকে আসিলেন। গৌরীমার মুখে ঠাকুর এবং মা-ঠাকুরাণীর প্রসঙ্গ শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। তাঁহাদিগের কথা বলিতে বলিতে গৌরীমা একদিন ভাবস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন ঠাকুর নরদেহে নাই, মা-ঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য প্রাণ অধীর হইল।

১৯১১ খৃষ্টাব্দের কথা, মা-ঠাকুরাণী তখন কোঠারে পদার্পণ করিয়াছেন। আমার এক বন্ধু—ভুবনেশ্বরের বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়কের সঙ্গে হঠাৎ কটক ষ্টেশনে দেখা হইল। তিনি মা-ঠাকুরাণীর দর্শনে কোঠার যাইতেছিলেন। আমাকে বলিলেন, 'ভাই ব্রজ, মা-ঠাকুরাণী কোঠারে আসিয়াছেন, মাকে দেখিতে যাবি? চল আমার সঙ্গে।'

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'কোঠারে যাইবার মত খরচ যে আমার কাছে নাই। প্রাণের ইচ্ছা থাকিলেও আমি কি করিয়া যাই এখন?'

বৈকুণ্ঠ বলিলেন, 'ভাড়া আমি দিব। চল, মাকে দর্শন করিয়া আসি।' দুই বন্ধুতে ভারী আনন্দমনে কোঠার গেলাম। যাইয়াই শুনিলাম, পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত মা-ঠাকুরাণী বাহিরে দর্শন এবং দীক্ষা দিয়া সেইমাত্র অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছেন। অল্পক্ষণের জন্য মায়ের দর্শন হইতে বঞ্চিত হইলাম। মনে ভারী দুঃখ হইল। কিন্তু স্বামী ধীরানন্দ বলিলেন, 'বেশ হলো, তোমাদের জন্য আমরা আবার মায়ের দর্শন পাবো। আমাদের লাভই হবে।' ইহাতে বুঝিলাম, মায়ের দর্শন পাইবার আশা আছে। আরও বুঝিলাম, জগতে মা-ধন কত দুর্লভ! সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্র মায়ের আশ্রয়ে থাকিয়াও মায়ের ক্ষণিক দর্শনের জন্য এই সাধুদিগের প্রাণের কি ব্যাকুলতা! কি অধীরভাবে এঁরা মাতৃদর্শনের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন।

"মা-ঠাকুরাণী দয়া করিয়া আমাদের সামনে উপস্থিত হইলেন। মুখের উপর ঘোমটা, চরণযুগল দর্শন এবং স্পর্শে আমরা ধন্য হইলাম। মুখখানি দেখিতে না পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি হইল না। অগত্যা বলিয়াই ফেলিলাম, 'মায়ের শ্রীমুখ দর্শন তো হলো না, যা দেখলে সন্তানের সকল দুঃখ দূরে যায়।'

মায়ের জনৈক সেবক সত্যকাম জোরের সহিত বলিলেন, 'মা কি বাইরের বস্তু? মা অন্তরের বস্তু, মাকে অন্তরে দেখ।'

বলিলাম, 'ঠিকই বলেছেন মহারাজ; কিন্তু একবার বাইরের চোখে না দেখলে, অন্তরে কি করে ভাবব তাঁকে?'

যাহাই হউক, এক সুযোগে মাতৃমুখেরও দর্শন পাইলাম। কোনই সন্দেহ রহিল না যে, ইনিই আমার সেই স্বপ্নদৃষ্ট মাতৃমূর্ত্তি। বিস্মিত এবং পুলকিত হইলাম।

পরের দিন সকালে একজন ফুল তুলিতেছিলেন, পরে জানিলাম, ইনি গোলাপমা; আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোরা কি মন্ত্র নিতে এসেছিস?' বলিলাম, 'মন্ত্র নিতে তো প্রস্তুত হয়ে আসিনি।'

তিনি বলিলেন, 'তোদের যদি ইচ্ছে থাকে, দীক্ষার ব্যবস্থা আমি করে দিতে পারি।' সৌভাগ্যক্রমে তাহাই হইল। মা-ঠাকুরাণী খবর পাঠাইলেন, ইহাদের মধ্যে যে-ছেলেটী ব্রাহ্মণ, তাহাকে ডাক। আমি আগে উপস্থিত হইলাম। গোলাপমার সহৃদয়তায় আমাদের দীক্ষাকার্য্য সম্পূর্ণ হইল। অমূল্য বস্তু পাইলাম। দীক্ষান্তে গুরুদক্ষিণা প্রদান শাস্ত্রের বিধি। আমি তো একেবারে কপর্দ্দকহীন। বৈকুণ্ঠের নিকট হইতে একটি টাকা লইয়া মায়ের চরণে দিলাম।

মা বলিলেন, 'তুমি কোত্থেকে টাকা দেবে? তোমার দক্ষিণা দিতে হবে না, বাবা।' তাঁহার এমন স্নেহপূর্ণ কথায় আমার চোখে জল আসিল। মনে ভাবিলাম, অন্তর্য্যামিনী মা জানেন, আমি তাঁহার কাঙ্গাল ছেলে। এত তাঁহার করুণা! আজিও মনে পড়ে সেই দিনের কথা। সেই অপার করুণার কথা ভুলিতে পারি নাই।

"মায়ের এই অপার্থিব করুণা, অযাচিত স্নেহের আকর্ষণ একবার নয়, দুবার নয়, ছয়বার জয়রামবাটীর দুর্গম পল্লীতে আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কলিকাতার উদ্বোধন-বাটীতেও টানিয়াছে একটিবার। মায়ের কাছে গেলে সংসারকে ভুলিয়া যাইতাম, বিষয়কে বিষ মনে হইত, মা-ছাড়া জগতের সব কিছুই মনে হইত 'আলুনী, অসার। এমন নিঃস্বার্থ স্নেহযত্ন জীবনে আর কোথাও পাই নাই। তাই, যখনই সামর্থ্যে কুলাইত, স্নেহময়ী মায়ের চরণতলে ছুটিয়া যাইতাম। সেখানে যে কি শান্তি, কি আনন্দ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার শক্তি আমার নাই।

আজ জীবনের সায়াহ্ন। চারিদিকে অন্ধকার। মা-ঠাকুরাণীর করুণার সেই স্নিগ্ধ আলোকটিই অতি সন্তর্পণে বুকে করিয়া বসিয়া আছি।

জীর্ণ জীবনের অবলম্বন—গুরুকৃপাহি কেবলম্।"

কোঠারে মাতাঠাকুরাণী জনৈক দেশীয় খৃষ্টানকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণান্তর দীক্ষাদান করেন। তথাকার পোষ্টমাষ্টার এককালে খৃষ্টান হইয়াছিলেন। পরে নানাকারণে কৃতকর্ম্মের জন্য তাঁহার মনে অনুশোচনা আসে। ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ, পিতৃপুরুষদিগের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হইলেন খৃষ্টান। অবশেষে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে প্রত্যাবর্ত্তনে আগ্রহ জন্মিল।

মাকে দর্শন করিবার পর তাঁহার এই আগ্রহ এবং অন্তরের জ্বালা তীব্রতর হয়। সেবকদিগের নিকট অন্তরের আর্ত্তি জানাইলেন, তাঁহারা তাহা নিবেদন করিলেন মায়ের নিকট। এই বিষয়ে বিবেচনা করিয়া মা ইহাই স্থির করিলেন যে, অনুতাপানলে লোকটির শুদ্ধি হইয়া গিয়াছে, সুতরাং চিরকালের জন্য তাঁহাকে বর্জ্জন না করিয়া স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া লওয়াই সঙ্গত।

মুণ্ডিতমস্তক হইয়া রামকৃষ্ণ বসুদের প্রতিষ্ঠিত শ্যামচাঁদের মন্দির-প্রাঙ্গণে সেই খৃষ্টান যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন, অতঃপর ধীরানন্দজী তাঁহাকে যজ্ঞোপবীত এবং গায়ত্রীমন্ত্র গ্রহণ করাইলেন। তদনন্তর মা তাঁহাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন।

কোঠার হইতে মাতাঠাকুরাণী দাক্ষিণাত্যের তীর্থদর্শনে যাত্রা করেন। সেবক স্বামী সত্যকাম এই যাত্রার বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

"প্রাতঃকালে প্রসিদ্ধ চিল্কা হ্রদের ধার দিয়া গাড়ী চলিল। ঐ হ্রদকূলে কোথাও সারিসারি বক সবেমাত্র বাসা হইতে বাহির হইয়া গা ঝাড়িতেছে, কোথাও বা বকের সারি আহারের অন্বেষণে ঘুরিতেছে; আবার অদূর পাহাড় হইতে এক সারি উড়িয়া আসিয়া হ্রদে নামিতেছে। শ্রীমা এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে বালিকার ন্যায় আনন্দিতা হইয়া আমাদের দেখাইলেন। আবার কতকগুলি নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়া হাত যোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। * * পথিমধ্যে অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যনিবাস ওয়ালটেয়ার পড়ে। পাহাড়ের গায়ে সারিসারি অট্টালিকা দেখিয়া শ্রীমার আনন্দ হইল। তিনি বলিলেন, 'দেখ দেখ, ঠিক যেন ছবিখানি।"

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণমঠের অধ্যক্ষ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) স্থানীয় ভক্তসঙ্গে মাদ্রাজ ষ্টেশনে আসিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইয়া গেলেন। "মঠের নিকট ময়লাপুর নামক স্থানে একখানি দ্বিতল বাটী শ্রীমার জন্য ভাড়া লওয়া হয়। * * প্রায় এক মাস এখানে থাকা হয়। যতদিন শ্রীমা রহিলেন, তাঁহার আদেশে শশী মহারাজ তুইবেলা মঠে না খাইয়া এখানেই আমাদের সঙ্গে খাইতেন।

"শ্রীমার অবস্থানকালে নারীবিদ্যালয়ের মহিলারা তামিল ভজন এবং কুমারীরা বেহালাবাদ্য অতি সুললিত সুরে শুনাইলেন।

"প্রায় নিত্য সায়াহ্নে শ্রীমাকে লইয়া সহর ভ্রমণে বাহির হওয়া যাইত। একদিন সমুদ্রতীরে যাওয়া হয়। * * একদিন ট্রিপ্লিকেনের শৈব মন্দির ও আর একদিন ময়লাপুরের পার্থসারথীর মন্দির দর্শন হয়। মাদ্রাজে শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐ তুইটী মন্দিরই প্রসিদ্ধ। একদিন কেল্লা দেখা হয়। এই কেল্লাই ভারতে ইংরাজের প্রথম কেল্লা। * *

"মাদ্রাজে কয়েকটী স্ত্রী ও পুরুষ ভক্ত শ্রীমার নিকট দীক্ষা লয়েন। মাদ্রাজ মঠের ব্রহ্মচারী অমৃতানন্দ নামে জনৈক মার্কিনবাসী সাহেবও দীক্ষা লয়েন। শ্রীমার সহিত এইসব লোকের কথাবার্ত্তার সময় আমাদিগকে

"দ্বিভাষীর কার্য্য করিতে হইত। কিন্তু দীক্ষার সময় মন্ত্র বা করজপ ইত্যাদির বিষয়ে আমাদের কোন সাহায্যের আবশ্যক হইত না। সকলেই শ্রীমার কথা বুঝিতেন। ইহা একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়।"

মাদ্রাজ হইতে মাদুরা যাওয়া হয়। ইতোমধ্যে রামলালদাদা রামেশ্বর-দর্শনমানসে কলিকাতা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণানন্দজীও সঙ্গে চলিলেন। মাদুরায় সকলে স্থানীয় মিউনিসি-পালিটীর চেয়ারম্যান জনৈক মাদ্রাজী ভক্তের অতিথিরূপে রহিলেন।

"ভারতে রেলপথ নির্ম্মাণ হইবার বহুপূর্ব্বে যাত্রীদিগের সুবিধার্থে রাণী অহল্যাবাঈ বঙ্গদেশের মেদিনীপুর হইতে শ্রীক্ষেত্র হইয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত একটী সুবিস্তৃত রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই রাস্তার স্থানে স্থানে সাধুসন্ন্যাসীদের জন্য সত্র বা সদাব্রত আছে। এখনও অনেক সাধুসন্ন্যাসী এই পথে শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দর্শনান্তে জিওড়ে নৃসিংহজী, বেঙ্কটাদ্রি বা শ্রীশৈলে বালাজী, বিষ্ণুকাঞ্চী বা শিবকাঞ্চী, ত্রিচিনপল্লীতে শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, কূর্ম্মক্ষেত্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসকল দর্শন করিতে করিতে রামেশ্বর আসিয়া থাকেন। আবার রামেশ্বর হইতে একটী হাঁটারাস্তা ভারতের পশ্চিমসাগরের উপকূল দিয়া দ্বারকা পর্য্যন্ত গিয়াছে।"

হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী প্রবল ধ্বংসবাহিনী উত্তরভারতে অসংখ্য স্থানে দেব-মন্দির এবং বিগ্রহ নিষ্ঠুরভাবে বিধ্বস্ত এবং কলুষিত করিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে তদ্রূপ করিতে পারে নাই। দক্ষিণভারতের অনেক কারুকলা-শ্রীমণ্ডিত প্রাচীন বিরাট মন্দির আজিও অক্ষতদেহে মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। দেখিলে নয়নের তৃপ্তি হয়, আনন্দে আপ্লুত হয় মন।

মাদুরা ভারতের অতি প্রাচীন এবং বিখ্যাত নগরী। ইহা দক্ষিণাপথের মথুরাপুরী। এইস্থানের মন্দিরের বিরাটত্ব এবং স্থাপত্যকলা অপূর্ব্ব। মন্দিরমধ্যে সুন্দরেশ্বর শিব এবং মীনাক্ষী দেবী বিরাজিত। মাতাঠাকুরাণী শিবগঙ্গা সরোবরে স্নানান্তে মন্দিরে গিয়া দেবদর্শন করেন।

অতঃপর তিনি রামেশ্বরধামে উপনীত হইলেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এই দেবতার নাম রামেশ্বর মহাদেব। রামেশ্বরের

শিরোদেশ স্বর্ণমুকুটে মণ্ডিত। সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত অতি বিপুলকায় একটী নন্দী-বৃষ। রামেশ্বরের মন্দিরও যেমন বিরাট তেমনই সুদৃশ্য। "মন্দির-মধ্যে কয়েকটী মহল আছে এবং সেই সব মহলে কতকগুলি দালানে দেবতার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলা বা উৎসবের স্থান ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ঐরূপে দুই তিন মহল অতিক্রম করিয়া ৺রামেশ্বরজীর মহলে প্রবেশ করিতে হয়। * * পার্শ্বস্থিত পৃথক মহলে পার্ব্বতীদেবীর মূর্ত্তি।"

"বাবার পূজারী সকলেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। বাবার গৃহে কোন যাত্রী প্রবেশ করিতে পায় না। কাহারও পূজা করিতে ইচ্ছা হইলে ঐ পূজারিদিগের হাত দিয়াই পূজা করিতে হয়। এমন কি, দক্ষিণী ব্রাহ্মণীরাও পর্য্যন্ত প্রবেশ করেন, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরও প্রবেশাধিকার নাই। প্রত্যুতঃ শিবমন্দিরে ঐ নিয়ম ভারতে অপর কুত্রাপি নাই। তবে শ্রীমার জন্য ভিন্ন কথা। রামনাদের রাজা স্বামিজীর শিষ্য এবং রামেশ্বরদ্বীপ ঐ রাজ্যান্তর্গত হওয়ায়, রাজা পূর্ব্ব হইতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাঁহার গুরুর গুরু পরম গুরু দর্শনে আসিতেছেন,—তাঁহার জন্য যেন সব সুবন্দোবস্ত হয়। শ্রীমা এবং তাঁহার স্ত্রী ও পুরুষ ভক্তেরা সকলেই একদিন স্বহস্তে গঙ্গোত্তরীর জল ১৷০ তোলা হিসাবে পাণ্ডাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া বাবার মুকুটাবরণ উন্মোচন করাইয়া উক্ত গঙ্গোত্তরীর জল এবং স্বর্ণ বিল্বপত্রে পূজা করেন। শশী মহারাজ শ্রীমার পূজার জন্য ১০৮টী স্বর্ণ বিল্বপত্র পূর্ব্বেই গড়াইয়া রাখিয়াছিলেন।"

"আমরা যথারীতি ত্রিরাত্র রামেশ্বরে বাস এবং সমুদ্রস্নান, বাবার পূজা ও আরাত্রিক দর্শন করিলাম। তৃতীয় দিন শ্রীমা বিশেষভাবে বাবাকে পূজাদি দিলেন এবং পাণ্ডাদিগের পুঁথিতে লিখিত রামেশ্বরের কাহিনী কথকমুখে শ্রবণ করিয়া পাণ্ডাভোজন করাইলেন। প্রত্যেক পাণ্ডাকে একটী করিয়া জলের ঘটী দান করা হইল। শ্রীমা হাতে শুপারি ও পয়সা লইয়া কথা শুনিলেন এবং শ্রবণান্তে ঐগুলি দিয়া প্রণাম করিলেন।"

রামেশ্বর হইতে পুনরায় মাদ্রাজে ফিরিয়া আসা হয়। "মাদ্রাজে

দিনকয়েক থাকিবার পর ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়। উৎসবে মাদ্রাজী কীর্ত্তনের দলের পর দল ঠিক বাঙ্গালার মত মঠে আসিতে থাকে এবং কীর্ত্তন গাইতে থাকে। ঠাকুরের জন্মতিথিপূজার দিন দুইটী ভক্ত শশী মহারাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীমার নিকট দীক্ষা লইলেন। * *

"ঠাকুরের উৎসবান্তে বাঙ্গালোর মঠের তদানীন্তন অধ্যক্ষ স্বামী নির্ম্মলানন্দ (তুলসী মহারাজ) আসিয়া শ্রীমাকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শ্রীমা বাঙ্গালোর যান। বাঙ্গালোরে শ্রীমা মঠের ভিতর ঠাকুরের বর্ত্তমান শয়ন-ঘরটীতে ত্রিরাত্র বাস করেন। * * বাঙ্গালোরে নিত্য বহু ভক্ত দলে দলে শ্রীমাকে প্রণাম করিতে আসিত, তাহাদের আনীত ফুল এক এক সময় স্তূপাকার হইয়া উঠিত। মঠের জমিতে চন্দন বৃক্ষ ও একটী ক্ষুদ্র পাহাড় দেখিয়া শ্রীমা আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ঐ পাহাড়টীর উপর প্রস্তরাসনে পশ্চিমমুখী হইয়া বসিয়া তুলসী মহারাজের অনুরোধে জপ করেন।"

রামকৃষ্ণানন্দজী এবং নির্ম্মলানন্দজীর ভক্তি ও যত্নের প্রশংসা মা অকুণ্ঠভাবে করিয়াছেন। আর বলিয়াছেন দক্ষিণদেশের ভক্তবৃন্দের শ্রদ্ধা ও ব্যাকুলতার কথা। তাঁহারা মাতাঠাকুরাণীর শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিতে আগ্রহান্বিত হইয়া আসিত, কিন্তু তাঁহার ভাষা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার বাণীশ্রবণে এবং পুণ্যদর্শনে নিজেদের কৃতার্থ মনে করিত।

দক্ষিণাপথের কথায় মা বলিয়াছেন, "অনেক লোক আমাকে দেখতে এসেছিল। সেখানকার মেয়েরা খুব লেখাপড়া জানে। আমাকে তারা লেকচার দিতে বললে। আমি বললাম, 'আমি লেকচার দিতে জানি না। যদি গৌরদাসী আসত তবে দিত।" (৪)

দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে মাতাঠাকুরাণী পুরীধামে কয়েক দিবস অবস্থান করেন। তথায়ও তিনি কয়েকজনকে দীক্ষাদান করেন।

উড়িষ্যার বহুগ্রামের শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

"১৯১১ সালে খবর পেলাম, মা ঠাকরুণ দাক্ষিণাত্য ভ্রমণান্তে

পুরীধামে এসেছেন। আমাদের বহুগ্রামের বহু ভক্ত এবং আমি তাঁর দর্শনের আশায় পুরীতে চলে এলুম। মা-ঠাকরুণ তখন সমুদ্রধারে 'শশীনিকেতনে' ছিলেন।

"মায়ের অপার করুণা! যেদিন প্রথম তাঁর দর্শন পেলুম, সেদিনই মা চরণে আশ্রয় দিলেন। 'আমাকেই প্রথম দীক্ষা দিলেন। সেদিন ছিল শ্রীশ্রীবাসন্তী মহাষ্টমী তিথি। দীক্ষার পর তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলির অনুমতি দিলেন। অঞ্জলির পর যৎকিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা দিলাম। আমাদের গ্রামবাসী (বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্‌পেক্‌টর) বৃন্দাবন ঘোষের স্ত্রীর দীক্ষাও সেদিন হয়েছিল।

"পরবর্ত্তী কালে মাঠাকরুণের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আরও ঘটেছে। কিন্তু দীক্ষাদিবসে সাক্ষাৎ জগদম্বার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অন্তরে যে পরম আনন্দলাভ করেছিলুম, তেমনটি জীবনে আর কোনোদিন অনুভব করিনি। সেই আনন্দস্মৃতি, মায়ের সেই কল্যাণীমূর্ত্তি আজও হৃদয়ে জাগ্রত আছে। শশীনিকেতনে দীক্ষাদানের সেই কক্ষটিকে আজও 'পরমতীর্থ'জ্ঞানে প্রণাম করি।"

দক্ষিণাপথে তীর্থপরিক্রমা সম্পূর্ণ করিয়া মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ প্রাচীন ভক্তবৃন্দের পরিচালনায় তাঁহাকে একদিন বেলুড়মঠে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। পূজা, ভোগ স্তবকীর্ত্তনাদির মধ্যে এবং মায়ের সান্নিধ্যে ভক্তবৃন্দের সেই দিনটি পরম আনন্দে অতিবাহিত হয়।

বিবিধ প্রসঙ্গে

দক্ষিণাপথের তীর্থদর্শনান্তে মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় মাসাবধিকাল অবস্থান করিয়া ১৩১৮ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমভাগে জয়রামবাটী গমন করেন। ভ্রাতৃগণ সকলেই তখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, তথাপি জননী শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগের পর হইতে সংসারের সকল দায়িত্বই তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। মাতৃসমা সহোদরার উপর সকল বিষয়েই তাঁহারা নির্ভরশীল ছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রীগণের বিবাহাদি অনুষ্ঠান মাতাঠাকুরাণীর ব্যবস্থানুসারেই সম্পাদিত হইয়াছে। এইবার রাধারাণীর বিবাহ।

রাধু দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার বিবাহ দিতে মায়ের আগ্রহ ছিল না। যদি কুমারী থাকিয়া ঠাকুরের সেবাপূজায় রাধুর জীবন অতিবাহিত হইত, তাহা হইলে মাতা আনন্দিত হইতেন; কিন্তু ছোটমামী তাঁহাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। মা তাঁহাকে বারংবার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন,—বিয়ে হ'লে রাধির কপালে অনেক দুঃখু আছে, ও ঠাকুরকে ভ'জেই থাকুক।

ছোটমামী তাঁহার উপদেশ গ্রাহ্য না করিয়া বলিতেন,—আমি অতশত বুঝি না বাপু; লোকে বলে, তুমি ব্রহ্মময়ী, তোমার কাছে যে যা' চায় তা'ই পায়। আমার মেয়ের জন্যে আমি একটি জামাই চাই। তোমার কত সব শিষ্যসেবক আছে,দাও-না একটি ভাল জামাই জুটিয়ে।

মা প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—আরে রামঃ, অমন কথা বলতে আছে! রাধি-যে ওদের বোন হয় গো। আমি কাউকে বিয়ে করার জন্যে বলতে পারবোনি। রাধির ভাগ্যে যেমন জোটে জুটুক।

অবশেষে তাজপুরের মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র মন্মথনাথের সহিত রাধারাণীর সম্বন্ধ স্থির হয়। এইস্থানেই তিন বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র প্রমথনাথের সহিত সুশীলারও বিবাহ হইয়াছিল। পরিচিত ঘর, তথাপি গৌরীমা জয়রামবাটীতে আসিলে

মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে বলিলেন,—বিয়ের আগে তুমি নিজে একবার রাধির শ্বশুরবাড়ী ঘুরে এসো মা।

মায়ের নির্দ্দেশে গৌরীমা গেলেন তাজপুরে। পথিমধ্যেই মন্মথনাথের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই কিশোর তখন গাছ হইতে আম সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল। মন্মথনাথ এবং তাহার আত্মীয়পরিজনের সহিত গৌরীমা পরিচয় করিয়া আসিলেন। জয়রামবাটীতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি ভাবী জামাতা ও অন্যান্য বিষয়ের অভিজ্ঞতা এবং নিজের মতামত মাতাঠাকুরাণীকে জানাইয়া দিলেন।

মন্মথনাথের আমসংগ্রহ উপলক্ষে গৌরীমা একটি ছড়া বাঁধিয়া রাধারাণীর সহিত পরিহাসচ্ছলে বলিতেন,

রাধা-কান্ত আম পেড়ে আন্ত।···

ছড়া শুনিয়া রাধারাণী লজ্জায় ছুটিয়া পলায়ন করিত।

স্নেহাস্পদা রাধারাণীর বিবাহে মায়ের সন্তানগণ বিবিধ অলঙ্কার এবং দানসামগ্রী উপঢৌকন দিয়াছেন। শ্রীম-মাষ্টার মহাশয় সাত-আট ভরি স্বর্ণালঙ্কার দিলেন। গৌরীমা, বলরামবসুর কন্যা কৃষ্ণময়ী এবং অন্যান্য কন্যাগণও কেহ সোনা, কেহ মুক্তা, কেহ-বা অন্যবিধ অলঙ্কার নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে দান করেন। স্বামী সারদানন্দ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল বিষয়ের সুশৃঙ্খল পরিচালনা করেন; কন্যা সম্প্রদান করেন জ্যেষ্ঠতাত প্রসন্নকুমার।

রাধারাণীর বিবাহোৎসবটি ছিল বৈচিত্র্যময়। একদিকে বিবাহের ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছে, অন্যদিকে প্রভুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাবন্দনা চলিতেছে, মাতাঠাকুরাণী সমাগত সন্তানগণের দণ্ডবৎ গ্রহণ করিতেছেন, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। বিবাহের পর মঙ্গলময়ী পিসিমাতা কল্যাণীয়া রাধারাণীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—রাধি, গয়নাসাড়ী পেয়ে যেন ঠাকুরকে ভুলিসনি। ঠাকুরই সব, আর সবই মিছে।

মাতাঠাকুরাণী এবং সারদানন্দজীর আদর-আপ্যায়নে আত্মীয় অভ্যাগত এবং বরপক্ষ সকলেই পরিতুষ্ট হইলেন। কাঙ্গাল ভিক্ষুকগণও

পরিতৃপ্ত হইল উদরপূর্ত্তি করিয়া। রাধার বিবাহ উপলক্ষে অনেক ভক্তজনও আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন মাতার সান্নিধ্য এবং আশীর্ব্বাদ পাইয়া।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ অসুস্থতাহেতু মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। মাতাঠাকুরাণীর জয়রামবাটীতে অবস্থানকালে তিনি মাতৃভবনে দেহত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণগতপ্রাণ এই সন্তানের লোকান্তর-গমনে মাতা একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন,—দক্ষিণেশ্বরে দেখেছি আসার পালা, আজ ঠাকুরের কাছে রাখাল আসছে, কাল নরেন আসছে, পরশু বাবুরাম; বেশ আনন্দের হাটবাজার। আর এখন সব যাচ্ছে, আজ যোগেন, কাল নরেন, পরশু শশী; এখন যাবার পালা। যোগেন যাবে, গোলাপ যাবে, গৌরদাসী যাবে, আমিও যাবো, এখন ভাঙ্গা হাট।

জয়রামবাটীতে ছয়-সাত মাস বাস করিয়া ১৩১৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে মা কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

মাতাঠাকুরাণী যখন মাতৃভবনে থাকিতেন, তখন আনন্দের পূর্ণ জোয়ার বহিত। সকলেরই আনন্দ। পুরুষ ভক্তগণের পক্ষে মাতৃচরণ-দর্শনের সময় নিয়ন্ত্রিত থাকিলেও, মাতৃভবনে উপস্থিত থাকাই তাঁহারা আনন্দদায়ক মনে করিতেন, প্রাণে উৎসাহ বোধ করিতেন। মাতাও নিজেকে সকলের জন্যই বিলাইয়া দিতেন, সকলকেই দর্শন দিতে ব্যাকুল হইতেন। মহিলাদিগের তো কথাই নাই, তাঁহাদের অবারিত দ্বার, তাঁহারা তখন কোন বিধিনিষেধ গ্রাহ্য করিতেন না, যখনইচ্ছাআসিতেন। তাঁহাদের অবাধ যাতায়াতে মাতাও বিরক্ত হইতেন না।

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসু তাঁহার বাল্যকালের একটি চিত্র দিয়াছেন,—"শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী হয়ে বসে বসে গল্প কচ্ছেন। সকাল বেলায় ঘণ্টা দুই শ্রীশ্রীমার বাড়ী থেকে এলুম। আবার সন্ধ্যায় দু ঘণ্টা শ্রীশ্রীমার বাড়ী থেকে এলুম। শ্রীশ্রীমাকে দেখছি, বেড়াচ্ছি। শ্রীমতী রাধু, শ্রীমতী মাকুর সঙ্গে বেড়াচ্ছি, গল্প কচ্ছি। * *

"আমার যখন ১২ বছর বয়স, একদিন পিসিমার (বলরামবাবুর পত্নী) সঙ্গে গঙ্গাস্নান কোরে শ্রীশ্রীমার বাড়ী গেছি। উষা, ছোট বৌদি ওদের দীক্ষা হয়ে গেছে সেদিন, আমি হঠাৎ পিসিমাকে বললুম আমিও মার কাছে দীক্ষা নেব। পিসিমা শ্রীশ্রীমাকে সে কথা বললেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীমা আমাকে ডাকলেন। ঠাকুরের সামনে রাস্তার ধারের বারাণ্ডার দিকে মা মুখ করে, আমি তাঁর সামনে ভেতরের বারাণ্ডার দিকে মুখ করে। শ্রীশ্রীমা আমায় জপকরা শিখিয়ে ইষ্টমন্ত্র দিলেন। সেদিন থেকে শ্রীশ্রীমাকে যেন আরো আপনার কোরে দেখতে পেলুম।"

এইস্থানে মায়ের দৈনিক কর্ম্মধারার একটি বিবরণ দিতেছি।—

মাতাঠাকুরাণী অতিপ্রত্যুষে ঠাকুরের নাম স্মরণপূর্ব্বক শয্যাত্যাগ করিতেন। প্রাতঃকৃত্যাদির পর জপে বসিতেন। প্রভাত হইলে ঠাকুরের ধূপারতি সমাপনান্তে অতিশয় প্রীতিস্নিগ্ধকণ্ঠে তিনি ডাকিতেন, 'এবার ওঠ, এবার ওঠ।' শয়ন হইতে উঠিলে ঠাকুরকে মিষ্টিভোগ নিবেদন করিয়া তাহার পর সমাগত ভক্তবৃন্দকে দর্শন ও উপদেশ দান করিতেন।

নিত্য গঙ্গাস্নানে মায়ের বিশেষ অনুরাগ ছিল। দেহের অসুস্থতাহেতু কোনদিন যাইতে না পারিলে বাটীতেই স্নান করিতেন। গঙ্গাস্নানে তিনি সাধারণতঃ পদব্রজে, আবার কখনও পালকী অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। ঘাটের ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু দান করা এবং বটগাছের মূলে জল দেওয়া ছিল তাঁহার রীতি; বলিতেন, "যা'র যা' প্রাপ্য তা'কে তা' দিতে হয়।"

স্নানান্তে তিনি ঠাকুরের পূজায় বসিতেন। এইসঙ্গে মা-কালী, শিব এবং গোপালের পূজাও হইত। ফলমিষ্টি ইত্যাদি ভোগ নিবেদন এবং ধূপদীপে পুনরায় আরতি করিতেন। নিজেই চামর ঢুলাইতেন। কোন কোন দিন স্বয়ং অপারক হইলে তাঁহার নির্দ্দেশে রাধারাণী অথবা অন্য কোন কন্যা পূজারতি করিত। দীক্ষার্থী থাকিলে পূজাসমাপ্তির পর ঠাকুরঘরে বসিয়াই মা দীক্ষা দিতেন।

পূজাভোগ হইয়া গেলে মা সন্তানদের জন্য শালপাতায় পৃথক পৃথক ভাবে প্রসাদ ভাগ করিয়া দিতেন। ভাগে পাচক এবং ভৃত্যগণও বঞ্চিত হইত না। কোন কোন সন্তান নিজে আসিয়া প্রসাদ লইয়া যাইতেন, অবশিষ্ট সকলের প্রসাদ মা পাঠাইয়া দিতেন। তিনি প্রত্যহ সর্ব্বাগ্রে জগন্নাথদেবের শুষ্ক মহাপ্রসাদের একটি দানা গ্রহণ করিয়া তাহার পর কন্যাদের সহিত বসিয়া জলযোগ করিতেন। জলযোগের পর পান-সাজা ছিল মায়ের এক দৈনিক কর্ম্ম। ইহাতে উপস্থিত মায়েরাও সাহায্য করিতেন; এইসময়ে দক্ষিণেশ্বরের অথবা অন্য প্রসঙ্গ চলিত।

এইভাবে মধ্যাহ্নভোগের সময় আসিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরকে অন্নভোগ নিবেদন করিয়া মা প্রসাদ পাইতেন। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রামের সময় পাওয়া যাইত; কিন্তু কোনদিন মহিলা ভক্তগণ উপস্থিত হইলে এই অবসর সময়েও তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেন। অপরাহ্নে ঠাকুরকে মিষ্টি ও ফল ভোগ নিবেদন করিয়া পুনরায় জপে বসিতেন।

সায়াহ্নে মা নিজকক্ষে বসিয়াই পুরুষ সন্তানদিগকে দর্শন দিতেন, কাহারও কোন প্রশ্ন থাকিলে তাহার উত্তর দিতেন, কাহারও দুঃখবেদনার কথা সমবেদনার সহিত শুনিয়া সান্ত্বনা দিতেন। রাত্রি নয়টা-দশটা পর্য্যন্ত এইরূপেই প্রায় প্রত্যহ অতিবাহিত হইত। ইতোমধ্যে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি সম্পন্ন হইত। অতঃপর ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিয়া শয়ন দিতেন। অবশেষে নিজে প্রসাদগ্রহণান্তে শয্যাগ্রহণ করিতেন।

মাতাঠাকুরাণী সঙ্গীতানুরাগিণী ছিলেন, নিজেও গাহিতে পারিতেন। তাঁহার কণ্ঠ ছিল অতি মধুর, কিন্তু পাছে কেহ শুনিতে পায় এইজন্য নিম্নকণ্ঠে গাহিতেন। ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার সঙ্গীত শুনিয়া প্রীত হইতেন।

মায়ের সঙ্গীতপ্রীতি ছিল বলিয়া সারদানন্দজী প্রায়শঃ মাতৃভবনের একতলায় সঙ্গীতের অনুষ্ঠান করিতেন। সারদানন্দজী, শ্রীপুলিনচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল এবং আরও অনেকে ইহাতে যোগ দিতেন। কোন কোন দিন সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া মা উপরের বারান্দায় আসিয়া

নিবিষ্টমনে গান শুনিতেন। কখন কখনও উপরে মায়ের ঘরে মহিলা-দিগেরও সঙ্গীতানুষ্ঠান হইত। ইঁহাদের মধ্যে লক্ষ্মীদিদি, ত্রৈলোক্যসুন্দরী, নর্ম্মদা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

যে-সকল সঙ্গীত মায়ের প্রিয় ছিল, তাহার কয়েকটি পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এইস্থানে আরও দুই-তিনটির উল্লে. করিতেছি,—

(১) গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।...
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
কত আসবেন দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥

(২) বিপদবারণ তুমি নারায়ণ,
লোকে বলে তোমায় করুণানিধান।...

(৩) বারে বারে যত দুখ দিয়েছ, দিতেছ তারা।
সে কেবলি দয়া তব, জেনেছি মা দুখহরা॥...

কলিকাতায়, পল্লীভবনে এবং অন্যত্রও দেখা গিয়াছে, তিনি ভিক্ষুক-বৈরাগীদের গান শুনিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতেন, তাহাদিগকে পয়সাও দিতেন। একবার এক ভিখারিণীর গানে মুগ্ধ হইয়া মা তাহাকে একটি টাকা, একখানি বস্ত্র এবং প্রচুর খাদ্য দিয়া বলিয়াছিলেন,—গানের তুল্য কি জিনিষ আছে? গানে ভগবানকে পাওয়া যায়।

মাতাঠাকুরাণী যখন মাতৃভবনে থাকিতেন তখন অপরাহ্ণে প্রায়ই অনেক মহিলা সমবেত হইতেন। ঠাকুরদেবতার প্রসঙ্গ আলোচনা হইত, ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠ হইত, মা উপদেশ দান করিতেন, গল্পও বলিতেন।

একদিন ধর্ম্মালোচনার পর মা একটি রসাল গল্প বলিলেন।—

এক হাবা ছেলে পূজোর পর দিদির বাড়ী যাবে মিষ্টান্ন নিয়ে; দোকানে গিয়ে বললে, আমায় ভাল মেঠাই ক'রে দাও, আমি দিদির বাড়ী নিয়ে যাবো। চতুর দোকানী বুঝতে পারলে, ছেলেটা বোকা। সে চাকা চাকা ক'রে ওল কেটে সেদ্দ ক'রে, গুড়ের রসে ফেলে, নতুন হাঁড়িতে সুন্দর লাল কাপড়ে বেঁধে রাখলে। হাবা এলে পরে সে হাঁড়িটা দিয়ে বললে,—এ নতুন ধরণের মেঠাই, চমৎকার খেতে!

হাবা ভাই মেঠাই নিয়ে বোনের বাড়ী চললো। পথে তা'র ভারী লোভ হলো একখানি চেখে দেখতে। অতি সন্তর্পণে হাঁড়ির মুখটি খুলে সে একখানি চাকতি বের ক'রে একটু চেখে বললে, আঃ, ভারী চমৎকার! রস টপ্ টপ্ করছে! লোভ সামলাতে পারে না, পর পর আরও সে খেতে লাগলো। তখন প্রাণ তা'র যায় আর কি! মুখে লাল কেটে পরিত্রাহি ডাকছে, আর মনে মনে বলছে, এমন উপাদেয় জিনিষ প'ড়ে যাচ্ছে মুখ থেকে। ওরে, কড়ির জিনিষ পড়িসনি, কড়ির জিনিষ যাসনি!

হাবা ভাইয়ের গল্প শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল। মা একটু নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন,—হাবা ছেলে এত-যে কষ্ট পেলে, তবু রসে-ভরা ওল খাবার লোভ ছাড়তে পারলে না। ওল খেয়ে মুখ ফু'লে গেছে, কুটকুট করছে, আবার সেই ওলেরই আস্বাদন করছে। বিষয়াবদ্ধ জীবও এমনি বারবার বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হয়, তবু বিষয়ের আস্বাদন ছাড়তে পারে না।

একদিন জনৈকা শিক্ষিতা মহিলা এক সাধুর নিন্দা করিতেছিলেন; মাতাঠাকুরাণী অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বলেন,—'মহৎ-অপরাধ' কখনো করো না। ভগবানের নিন্দে করলে তিনি সে অপরাধের ক্ষমা করেন, কিন্তু ভক্তদ্বেষীকে তিনি ক্ষমা করেন না।

এই বলিয়া মা একটি উপাখ্যান বলিলেন।—

রাজা অম্বরীষ ছিলেন পরম বিষ্ণুভক্ত। একবার তিনি সারাবছর ধ'রে একটি ব্রত পালন করেন। ব্রত শেষ হ'লে তিন দিন উপবাসী থেকে বহু দানদক্ষিণার পর চতুর্থ দিনে যখন তিনি পারণ করতে বসবেন, এমন সময় দুর্ব্বাসা মুনি এসে তাঁর অতিথি হ'লেন। রাজা তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানিয়ে স্নান-আহ্নিক সেরে আসতে অনুরোধ করলেন। শিষ্যদের নিয়ে মুনি গেলেন নদীতে।

তাঁদের ফিরতে অনেক দেরী হ'তে লাগলো। পারণের সময় চ'লে যায় দেখে, রাজা উপস্থিত মুনিদের পরামর্শে নারায়ণের চরণামৃত এক বিন্দু গ্রহণ করলেন। দুর্ব্বাসা ফিরে এসে যখন জানতে পারলেন যে,

রাজা তাঁকে না খাইয়ে নিজে জল পান করেছেন, তখন রাগে অগ্নিশর্ম্মা হ'য়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন,—এত স্পর্দ্ধা তোমার, আমায় উপেক্ষা ক'রে আগেই জল খেয়েছ? সবংশে নিধন হবে তুমি। সঙ্গে সঙ্গে জটার একগাছি চুল ছিঁড়ে এক রাক্ষসীকে সৃষ্টি করলেন। রাক্ষসী রাজাকে মারতে এলো, রাজা কিন্তু একমনে স্মরণ করতে লাগলেন নারায়ণকে।

ওদিকে বৈকুণ্ঠে মা-কমলা নারায়ণকে বললেন,—প্রভু, আপনার ভক্ত রাজা অম্বরীষ যে সবংশে নিধন হ'তে চললো, ভক্তকে রক্ষে করুন।

তুমি ভেবো না, আমার ভক্তের অনিষ্ট হবে না। এই ব'লে নারায়ণ সুদর্শন চক্র ছাড়লেন ভক্তকে রক্ষে করার জন্যে।

রাজা অম্বরীষকে রাক্ষসী মারতে এলে সুদর্শন এসে আগে তা'কেই বধ করলো, তারপর ছুটলো দুর্ব্বাসার দিকে। প্রবলবিক্রম মুনি তখন প্রাণের ভয়ে ছুটলেন ব্রহ্মলোকে, আর পেছনে ছুটছে সুদর্শন চক্র। ব্রহ্মা সব শুনে বললেন, ভক্তদ্বেষীকে রক্ষে করার সাধ্য আমার নেই। তারপর মুনি গেলেন শিবলোকে; শিব বললেন, আমার শক্তির বাইরে, তুমি নারায়ণের শরণ নাও।

দুর্ব্বাসা গেলেন বৈকুণ্ঠে, পেছনে তখনো সুদর্শন চক্র; আর্ত্ত হ'য়ে তিনি নারায়ণের শরণ নিলেন। নারায়ণ বললেন,—হে মহর্ষি, আমার কাছে অপরাধ করলে তা'র মার্জ্জনা আছে, কিন্তু ভক্তের কাছে অপরাধ করলে তা'র মার্জ্জনা নেই। তুমি আমার ভক্তের প্রাণে আঘাত দিয়েছ, তিনি যদি তোমায় মার্জ্জনা করেন, তবেই তোমার পরিত্রাণ। যাও, অম্বরীষের কাছে গিয়ে মার্জ্জনা চাও।

এইভাবে নিরাশ হ'য়ে অবশেষে দুর্ব্বাসা মুনি ফিরে এলেন রাজা অম্বরীষের কাছেই; তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে তবে প্রাণে বাঁচলেন।

কাহিনী শেষ করিয়া মাতাঠাকুরাণী পুনরায় বলিলেন,—মাগো, মহতের অসম্মান কখনো করো না, তা'তে ভগবানকেই ব্যথা দেওয়া হয়।

কি কলিকাতায়, কি পল্লীভবনে, সর্ব্বত্রই মায়ের দৈনন্দিন জীবন

ছিল অতি সহজ এবং সরলতাপূর্ণ। আহারেও রাজসিকতা একেবারেই ছিল না। সাত্ত্বিক এবং অল্পমশলাযুক্ত খাদ্য ঠাকুরের প্রিয় ছিল, সেইরূপ খাদ্য মায়েরও ছিল প্রিয়। ডাঁটাচচ্চড়ি, থোড়মোচা, পোস্ত, মুগ ও কড়াইয়ের ডাল, কুমড়ার তরকারি; কামরাঙ্গা, আনারস ও পুদিনার চাটনি; পালং ও নটে শাক মায়ের নিকট অধিক রুচিকর ছিল। জলযোগে মুড়ি, মটরভাজা, বেগুনী, ফুলুরি ইত্যাদি মা ভালবাসিতেন। একাদশী তিথিতে তিনি সারাদিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে সামান্য লুচি ও দুধ গ্রহণ করিতেন।

মায়ের রান্না ছিল সাত্ত্বিক। তিনি মশলা খুব কম ব্যবহার করিতেন, কিন্তু যাহাই রাঁধিতেন অতিশয় সুস্বাদু হইত। তাঁহার হাতের পায়স, বিশেষ করিয়া সুজি ও চিড়ার পায়স হইত অমৃততুল্য। নানাবিধ পিষ্টকও তিনি প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

বসনভূষণেও মায়ের কোনপ্রকার আড়ম্বর ছিল না। তিনি সাধারণতঃ কাল নরুনপাড়, অথবা কখন কখনও লাল-কাল মিশ্রিত সরুপাড়ের বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। হাতে থাকিত দুইগাছি হোগলাপাকের বালা, গলায় একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা। জামাসেমিজ তিনি ব্যবহার করিতেন না। সন্তানদিগকে দর্শন দিবার সময় চাদরে সর্ব্বদেহ আবৃত করিয়া থাকিতেন।

মায়ের সংসার ক্রমে বিরাট আকার ধারণ করে। আত্মীয়পরিজন, সেবকসেবিকা এবং মঠের কর্ম্মিগণ ব্যতীত প্রতিদিন বাহিরের ভক্ত নর-নারীও কেহ কেহ মায়ের বাটীতে প্রসাদ পাইতেন। দিনের পর দিন এই বিপুল ব্যয় নির্ব্বাহ করা সহজ ব্যাপার নহে। গুরুদক্ষিণা ও প্রণামীরূপে মায়ের নিকট যাহা আসিত, প্রায় সমস্তই এইকারণে ব্যয়িত হইত। বস্ত্রাদিও যাহা পাইতেন, অধিকাংশই বিলাইয়া দিতেন। যে-সকল অনুগত নরনারী এই বিপুল ব্যয়নির্ব্বাহে অংশগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী বসু, বিপিনচন্দ্র রায়চৌধুরী, খেলাত ঘোষের পত্নী, শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়, ডাক্তার প্রিয়নাথ, কাশীমণি দেবী, মিসেস ওলি বুল প্রভৃতির

নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং নলিনচন্দ্র মিত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ললিতমোহন মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত এবং আজ্ঞাবহ সন্তান। মায়ের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিনি সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। মায়ের কোন প্রয়োজনের কথা বা আদেশ জানিতে পারিলে তাহা পূরণ করিতে কখনও তাঁহার বিলম্ব হইত না। মা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন, তাঁহার সেবা নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার গাড়ীতে করিয়া মা গঙ্গাস্নানে এবং গড়ের মাঠ, যাদুঘর ইত্যাদি অনেক স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। মায়ের মনস্তুষ্টির জন্য গ্রামোফোন আনিয়া তিনি মাকে গান শুনাইতেন। জয়রামবাটীতে গিয়াও পল্লীবাসীদের কলের গান শুনাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার কর্ম্মকুশলতার কথা,—কিভাবে তিনি জয়রামবাটীতে গিয়া ছোটমামী এবং রাধারাণীর হস্তান্তরিত অলঙ্কার উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ললিতমোহনের পত্নী প্রসাদীদেবীও মায়ের বিশেষ কৃপাভাজন ছিলেন। একবার ললিতমোহন রোগে মরণাপন্ন হইলে সাধ্বী আসিয়া মায়ের করুণা ভিক্ষা করেন। মায়ের আশীর্ব্বাদে ললিতমোহন সেই যাত্রায় রক্ষা পাইলে মা বলিয়াছিলেন,—পেসাদীর পুণ্যেই ললিত এবার রক্ষে পেলো, পেসাদীর কান্না আমি সইতে পারি না।

নলিনচন্দ্র মিত্র আড়বেলিয়ার এক সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি গৌরীমাকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন। একবার তাঁহার আশাতিরিক্ত অর্থাগম হইয়াছে, কয়েকশত টাকা প্রণামী দিতে আসিলেন গৌরীমাকে। গৌরীমা প্রশ্ন করিলেন,—তোর এই দান নিঃসর্ত্ত তো ?

নলিনচন্দ্র সরলপ্রকৃতির লোক, সূক্ষ্মবুদ্ধি নহেন। গৌরীমার কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া বলিলেন,—তোমার আশ্রমের সেবায় লাগবে মা, তাই এনেছি।

—আমার ইচ্ছে, এ টাকা তুই ব্রহ্মময়ীর সেবায় দে।

নলিনচন্দ্র বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া রহিলেন তাঁহার দিকে।

গৌরীমা তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন এবং ঠাকুরের পূজাভোগান্তে তাঁহাকে মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত করিয়া বলিলেন,—মায়ের পায়ে টাকা রেখে প্রণাম কর। সার্থক হবি তুই, সার্থক হবে তোর টাকা।

ভক্তের শ্রদ্ধাঞ্জলি, মাতাঠাকুরাণী সাদরে গ্রহণ করিলেন।

নলিনচন্দ্রের অন্তঃকরণ এমনই উদার ছিল যে, কোনস্থানে কিছু দান করিতে হইলে, অল্পে তাঁহার নিজের মনই প্রসন্ন হইত না। গৌরীমার আশ্রমে দ্রব্যসম্ভার অনেকবার দান করিয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীকে এবং বেলুড়মঠেও দিয়াছেন ; গাড়ী অথবা নৌকা বোঝাই করিয়া তিনি দ্রব্যাদি লইয়া আসিতেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে দান করিতেন। তাঁহার শ্রদ্ধা ও সেবায় প্রসন্ন হইয়া মাতাঠাকুরাণী একদিন বলিয়াছিলেন,—ঠাকুরের রসদ্দার ছিল মথুর, আমার মথুর তুমি।

নলিনচন্দ্রের জীবনের একটি ঘটনা।—

মাতাঠাকুরাণীর সেবার জন্য নলিনচন্দ্র একবার প্রচুর দ্রব্যসামগ্রী গরুর গাড়ীতে বোঝাই করিয়া কলিকাতার দিকে আসিতেছিলেন। তিনি ছিলেন স্থূলকায়, অসাবধান থাকায় দৈবাৎ গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হইলেন। মাতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া অভিমানী শিশুর ন্যায় তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দুর্ঘটনার জন্য মাকেই দায়ী করিয়া বলিলেন,—তুমি আমার কেমন মা! কি অপরাধ করেছি আমি তোমার চরণে? আমি মোটা মানুষ, আমায় তুমি গাড়ীর তলায় ফেলে পিষে দিলে মা! এই বলিয়া দেহের স্থানে স্থানে যে ক্ষত এবং রক্তপাত হইয়াছে, তাহা মাকে দেখাইলেন এবং পুনরায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

মা নির্ব্বিকারচিত্তে বলিলেন,—তোমার কর্ম্মফল, গেরো ; আমি তা'র কি করবো?

মাতার এইরূপ ভাষণে অভিমানাহত সন্তানের হৃদয় আরও ব্যথিত হইল। তাঁহার তখনও বিশ্বাস যে, তাঁহার এই দুঃখের মূলে মা, মা ইচ্ছা করিলেই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিতেন।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া মা পুনরায় বলিলেন,—বাবা, তুমি নিজের

দোষেই নিজেকে চাপা দিয়েছ, আমি চাপা দিইনি। কেন তুমি সাবধান থাকলে না? যাক্, অল্পের ওপর দিয়েই তোমার গেরো কেটে গেল। এই বলিয়া মাতা তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার মস্তকে ও বক্ষে হাত বুলাইয়া আদর করিলেন। মাতার স্নেহাশিসে নলিনচন্দ্রের অভিমান দূর হইল, ক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হইল।

শ্রান্ত এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কোন সন্তান অবেলায় আসিয়া মাতৃভবনে উপস্থিত হইলে, সমবেদনায় সন্তানবৎসলা মাতার স্নেহধারা কিভাবে উচ্ছলিত হইয়া উঠিত, তাহার একটি চিত্র দিয়াছেন শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী শ্যামানন্দ।—

"শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে আসিয়াই আমি নীচে জিনিষপত্র রাখিয়া চৌবাচ্চা হইতে মাথায় জল ঢালিয়া স্নান করিতাম। আমার স্নানের জলঢালার আওয়াজ পাইয়া গোলাপমা ত্রিতল হইতে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চগলায় বকিতে বকিতে নামিতেন। তাঁহার কথার উপর কেহই কথা বলিতাম না। কিন্তু তিনি নীচে আসিয়া আমাদের খাবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন।

তাঁহার বকুনীর প্রধান কারণ এই যে, আমরা সকালবেলা কিম্বা রন্ধনের সময় কোন খবর কেন দিই না, যদি সকালবেলা বলা থাকে তাহা হইলে কোনরূপ বন্দোবস্তের গোলমাল হয় না। কিন্তু তিনি এটা বুঝিতেন না যে, আমাদিগের হাটবাজার করিতে কুমারটুলী হইতে হাটখোলা, শোভাবাজার, নূতনবাজার, বড়বাজার, পোস্তা, সময় সময় চাঁদনী, মিউনিসিপাল মার্কেট পর্য্যন্ত যাইতে হইত, এবং আসিবার সময়ে কখন কোথায় নৌকায় মাল তুলিয়া দিতে হইবে এবং জোয়ার-ভাঁটা হিসাবে নৌকা কখন ছাড়িবে তাহার কিছুই ঠিক ছিল না। সেজন্য আমরা গোলাপমার বকুনী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রসাদ সানন্দে খাইতাম।

এরূপ অবস্থায় একদিন আমি একটু বেশী দেরীতে, প্রায় ৩টার পর ৪টার কাছাকাছি গিয়া পড়িয়াছি ও তাড়াতাড়ি মাথায় জল ঢালিতেছি; গোলাপমাও সেদিন একটু বিশেষ চটিয়া তাঁহার স্বাভাবিক মাত্রার উর্দ্ধে

বকুনী দিতে দিতে উপর হইতে নীচে নামিতে লাগিলেন। মা এই সময়, যেই গোলাপমা দোতলায় আসিয়াছেন, নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া গোলাপমাকে বলিলেন,—কেন রোজ রোজ ছেলেদের বকাবকি করো ? বাছা আমার তেতেপুড়ে এসেছে, আগে খেতে দাও।

গোলাপমা জবাবে বলিলেন (যতদূর মনে হয়),—ও বাবা, তুমি যে আবার খুহুর জন্যে ঝগড়া করতে এলে !* ও তো কখনো একদিনও ব'লে যায় না, আর হামেশাই আসে ।

জবাবে মা বলিলেন,—এখন দিন দিন ঠাকুরের সংসার বাড়ছে তো কি করবে ?

গোলাপমা বলিলেন,—সকালবেলা ব'লে গেলেই তো হয় ।

মা একটু বিরক্তভাবে বলিলেন,—তুমি আগে ছেলেকে খেতে দাও তো !

গোলাপমা বলিলেন,—খুহু তোমার কে হয়, তুমি যে তা'র জন্যে ঝগড়া করছ ?

মা বলিলেন,—ওরাই তো আমার সব। আমার শ্বশুর, ভাসুর, ছেলেপুলে সব !"

গোলাপমা স্পষ্টভাষিণী ছিলেন এবং সময় সময় তাঁহার কথা রূঢ় শুনাইত ; কিন্তু বাহিরে কঠোর হইলেও তাঁহার অন্তর ছিল সহৃদয়তায় পূর্ণ। ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যদি কেহ তাঁহাকে অনুযোগ দিত, তদুত্তরে তিনি মধ্যে মধ্যে অভিমানে বলিতেন,—

"যে মোরে করিত দয়া, সে গেছে মথুরা-গয়া।"

এই ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দেশে, অর্থাৎ তিনি বেঁচে থাকলে আমার আদর হতো ; আজ স্বামিজী নেই, তোরা আমার কি বুঝবি !

* স্বামী শ্যামানন্দের বাড়ীর ডাকনাম ছিল খুদিরাম, স্বামী প্রেমানন্দ আদর করিয়া বলিতেন খুদুমণি।

গোলাপমার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্রদ্বয়—শ্যামাকুমার ও শিবকুমার গোলাপমার দৌহিত্র, তাঁহার একমাত্র কন্যা চণ্ডীর পুত্র। মাতামহী গোলাপমার প্রতি তাঁহাদের প্রাণের মমতা ছিল। তাঁহার সেবার নিমিত্ত তাঁহারা মাসিক কিছু অর্থসাহায্যও করিতেন। উক্ত অর্থের একাংশ তিনি ঠাকুরের সেবায় প্রদান করিতেন, অপরাংশ দীনদুঃখীর জন্য এবং নানাবিধ সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন।

মাতৃহীন দৌহিত্রদ্বয়ের আকাঙ্ক্ষা হইত মধ্যে মধ্যে মাতামহীকে নিজেদের নিকট রাখিয়া তাঁহার সেবাযত্ন করেন ; কিন্তু মাতামহীর ইহা মনঃপূত হইত না, তাঁহাদের ঐশ্বর্য্যের সংসারে তিনি যাইতে চাহিতেন না। তাঁহারা এমন প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, তিনি যদি তাঁহাদের সংসারে না থাকেন, তাঁহাদের ঠাকুরবাড়ীতে থাকিবেন। গোলাপমা ইহাতেও স্বীকৃত হইলেন না। তিনি বলিতেন,—রামকেষ্টদেব আমার সব মায়া কাটিয়ে দিয়েছেন, আর আমার কারু ওপর মায়া নেই।

দৌহিত্রদ্বয় মাতাঠাকুরাণীর দর্শনমানসেও আসিতেন এবং সেতার বাজনা শুনাইতেন। মাতাও তাঁহাদিগকে স্নেহ করিতেন। অবশেষে একদিন তাঁহারা মায়ের নিকট বিশেষভাবে আবেদন জানাইলেন, মাতামহী যাহাতে তাঁহাদের নিকট গিয়া কিছুকাল বাস করেন। মা অনুমোদন করিলেন। সারদানন্দজীও বলিলেন, অবশ্য রহস্যের সহিত,—যাও-না গোলাপমা, এখানকার এই তো খাওয়া—পাতলা ডাল আর চচ্চড়ি! রাজা-নাতিদের সেবা কিছুদিন পেয়ে এসোগে ; আর পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে আমাদের জন্যেও কিছু নিয়ে এসো।

গোলাপমা বলিলেন,—মায়ের বাড়ীর শাকভাতই আমার অমর্ত্ত। মায়ের বাড়ী ঝাঁট দিয়ে, মায়ের চরণতলেই পড়ে থাকবো আমি।

নবীন সেবকগণ কেহ কেহ বলেন,—আপনি অনেকদিন থাকুন গিয়ে সেখানে। বেশ হবে।

উত্তরে গোলাপমাও রহস্য করিয়া বলেন,—তোদের এত গরজ কেন রে

ছোঁড়ারা? আমার বকার হাত থেকে বাঁচবি ব'লে তো? সে গুড়ে বালি, আমি যাবো না। ইহাতে সকলেই হাসেন, গোলাপমাও হাসেন।

অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর অবশেষে একদিন তিনি যাইতে বাধ্য হইলেন রাজা-নাতিদের সঙ্গে। কিন্তু গোলাপমার অন্তরের রঙ্ গেরুয়া। মায়ের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া রাজবাটীর ভোগৈশ্বর্য্য অধিককাল তাঁহার সহ্য হইল না। কয়েকদিবস পরেই মায়ের নিকট ফিরিয়া আসিলেন, যেন মহাবিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

তাঁহাকে দেখিবামাত্র পুনরায় হাস্যরোল উঠিল। নবীনগণের মধ্যে কেহ দূর হইতে তাঁহাকে শুনাইয়া মন্তব্য করেন,—এই রেঃ, আমাদের বক্‌তে না পেয়ে গোলাপমার পেট ফু'লে গেছে! আমাদের ছেড়ে আর দূরে থাকতে পারলেন না।

রাজবাটীর সমাদর হইতে তিনি কিভাবে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, আমাদের নিকট সেই কৌতুকাবহ কাহিনী এইরূপে বলিতেন,—ওদের বাড়ীতে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। পেট ফু'লে ম'রে যাই আর কি! দুই-এক দিন পরে গঙ্গা নাইবার ছল ক'রে সেই বন্দুকধারী দারোয়ানদের মাঝখান দিয়ে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাই। দারোয়ান বলে, দিদিমা, আপ কাহা জাতী হ্যায়? তখন ভয়ে মরি, এই বুঝি বন্দুকের খোঁচা দেয়! বললুম, বাবা, গঙ্গায় নাইতে জাতী হ্যায়। ওদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে শরীর যেন জুড়িয়ে গেল, মনে হলো বাঁচলুম। সামনেই দেখলুম ঠাকুরকে, বুঝলুম, ঠাকুরের ইচ্ছে নয় যে, মা-ঠাকরুণকে ছেড়ে থাকি।

স্বামী বিবেকানন্দের উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য দেশের যে-সকল নরনারী প্রাচ্য দেশের ভাবধারা গ্রহণ করিয়া পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ-দর্শনে আসিতেন, তন্মধ্যে অনেকেই মাতাঠাকুরাণীর চরণবন্দনা করিতে আসিয়াছেন এবং কেহ কেহ তাঁহার নিকট দীক্ষালাভও করিয়াছেন। বিদেশীয় এবং অবাঙ্গালীরা মায়ের ভাষা বুঝিতে পারিবেন না মনে করিয়া, সারদানন্দজী কোন কোন সময় ইংরাজি-ভাষাবিদ্ সেবক পাঠাইতেন

দ্বিভাষীর কার্য্য করিবার জন্য। দীক্ষার সময় মা দ্বিভাষী সেবকের সহায়তা গ্রহণ করিতেন না ; বলিতেন, দীক্ষার সময় অপর কেহ উপস্থিত থাকিবে না, গুরুশিষ্যের মধ্যেই কার্য্য চলিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, দ্বিভাষীর সহায়তা ব্যতিরেকেই সংস্কৃত ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মা যাহা বলিয়া দিতেন, বিদেশীয়গণ সহজেই তাহা আয়ত্ত করিতে পারিতেন। সংস্কৃত প্রণামমন্ত্র অল্পাক্ষরী নহে, তাহা কণ্ঠস্থ করা সময়সাপেক্ষ ; মায়ের নির্দ্দেশানুসারে কোন কোন কন্যা তাহা পুনঃ-পুনঃ আবৃত্তি করিয়া বলিয়া দিত এবং তাঁহারাও যথেষ্ট আগ্রহসহকারে শিক্ষা করিতেন।

পাশ্চাত্ত্য দেশের ভক্তনারীদিগের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা, ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা, দেবমাতা এবং ধীরামাতার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, নিবেদিতার স্থান সকলের উচ্চে।

ভগিনী নিবেদিতা একজন আইরিশ ধর্ম্মযাজকের কন্যা। পূর্ব্বের নাম মিস মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। নিবেদিতা নারীরত্ন,—বিদুষী ও প্রতিভাময়ী ; এতদ্ব্যতীত তাঁহার চরিত্রে স্বাধীনতাপ্রীতি ও তেজস্বিতা এবং বিনয় ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার ত্যাগ ও সেবার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেও পাইয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দের আহ্বানে ভারতবর্ষকেই তিনি স্বদেশ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং নিজেকে কায়মনোবাক্যে নিবেদন করেন ভারতের সেবায়। বিদেশিনী হইয়াও তিনি এদেশের বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক সকলকে ভারতের জাতীয় ভাবেরই প্রেরণা দিয়াছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় ভারতীয় সংস্কৃতিবিষয়ক তাঁহার উৎকৃষ্ট প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কেবল প্রতিভার ক্ষেত্রে নহে, কলিকাতা মহানগরী যখন প্লেগ মহামারীতে আতঙ্কিত, অনেকে নগর ত্যাগ করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, বেতনভোগী ঝাড়ুদারগণ প্রাণের মায়ায় কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়াছে, ভগিনী নিবেদিতা স্বয়ং

পথঘাট পরিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। জীব-শিবের সেবায় কোনপ্রকার কর্ম্মই তাঁহার নিকট নীচ বলিয়া মনে হইত না।

তিনি যখন মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে আসিতেন, তখন দেখা যাইত—ধর্ম্মযাজকের ন্যায় শুভ্র আলখাল্লায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা, ভক্তিবিনম্র দৃষ্টিতে করজোড়ে দণ্ডায়মান। পবিত্রমূর্ত্তি তপস্বিনীকে দেখিলে স্বতঃই শ্রদ্ধার উদ্রেক হইত। মায়ের নিকটে আসিয়া তিনি "মাটা ডেবী, মাটা ডেবী" (অর্থাৎ মাতাদেবী) বলিয়া প্রণাম করিতেন, অধিক কথা কহিতেন না।

মা একদিন একটি বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছিলেন,—'মা, তুমি ফুলের মত থেকো।' সেইসময় নিবেদিতা মায়ের জন্য একগুচ্ছ সুন্দর ফুল লইয়া আসিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাটা ডেবী, কেন আপনি বালিকাদের কেবল বলেন,'ফুলের মত থাক।' আমি বালিকাদের বলি, 'তুমি সুখী, তুমি বড় সুখী থাক।" মা হাসিয়া বলিলেন,—সুখের কি মূল্য আছে মা? ফুলের মত পবিত্র থাকলে, ভগবানের পূজোয় লাগবে, তাঁর পায়ের শোভা হবে, জীবন ধন্য হবে।

ফুলের মত পবিত্র জীবনের এইরূপ ব্যাখ্যা শুনিয়া নিবেদিতার আনন্দ হইল। তাঁহারও মনে হইল, ইহা উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা।

ভগিনী নিবেদিতার ভক্তিবিনয়ের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীসারদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা,—

"একদিন মায়ের বাড়ীর সামনে রোয়াকে বসিয়া আছি, এমন সময়ে সিষ্টার নিবেদিতা মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সে-সময়ে একটি কুকুর মায়ের বাড়ীতে ঢোকার সিঁড়ির উপরে শুইয়াছিল। নিবেদিতা কুকুরটিকে একটি মহাভক্তজ্ঞানে হাত জোড় করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'হে ভক্তবর! আমি জগন্মাতার পাদপদ্মে প্রণাম করিতে যাইব, তুমি পথরোধ করিয়া আছ, দয়া করিয়া আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।' তিনি বলিলেন, 'এই কুকুর মহাভক্ত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনে অনেক সুকৃতি ছিল, কিন্তু কোনও কারণে এবার কুকুরদেহ ধারণ করিতে

হইয়াছে। এই সিঁড়িতে বহু ভক্তপদধূলি রহিয়াছে, তদুপরি মায়ের পদধূলি পড়িয়াছে। এজন্যই কুকুরটি এখানে আশ্রয় লইয়াছে এবং এই মহাপুণ্যস্থান ছাড়িতেছে না।' ব্রহ্মচারী তেজনারায়ণ (পরে স্বামী সর্ব্বানন্দ যাঁহার নাম হইয়াছে) ভিতর হইতে আসিয়া বলিলেন, 'সিষ্টার, তাই বটে, ও সরবে না। আপনি একপাশ দিয়ে চলে আসুন।' তারপর সিষ্টার নিবেদিতা একপাশ দিয়া ভিতরে চলিয়া যান এবং উপরে গিয়া মাতৃচরণে প্রণত হন।"

ভগিনী ক্রিশ্চিয়ানা ছিলেন জাতিতে জার্ম্মান। স্বামিজীর আমেরিকান শিষ্যা ধীরামাতার (মিসেস ওলি বুলের) আমন্ত্রণে তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, এবং ভগিনী নিবেদিতার বিদ্যালয়ে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। ভক্তি, প্রীতি ইত্যাদি বৃত্তিসমূহের ঐরূপ বিকাশ যে-কোন দেশের নারীর মধ্যেই দুর্লভ। তিনি একেবারে মাতৃমূর্ত্তি; মাতাঠাকুরাণী আদর করিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণমাতা' বলিয়া ডাকিতেন। নিজেকে তিনি ভারতীয় ভাবিয়া মনে গৌরব বোধ করিতেন এবং বাঙ্গালী নারীর ন্যায় সাড়ী পরিতেন, আবার মধ্যে মধ্যে সিন্দূরের টিপ পরিয়াও আসিতেন। কখনও মায়ের প্রসাদী পানও তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিতেন।

ভগিনী দেবমাতার দেশ আমেরিকায়, তিনি কুমারী। মাতাঠাকুরাণীর নিকট কিছুকাল তিনি বাস করিয়াছিলেন। মাতৃভবনের কোন নিভৃত স্থানে, সাধারণতঃ সিঁড়ির কোণে বসিয়া তিনি বহুক্ষণ ধরিয়া মালা জপ করিতেন। তখন তাঁহাকে তপস্বিনীর ন্যায় দেখাইত। তিনি ঠাকুরের পূজা শিখিতে মায়ের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ঠাকুর-ঘরের ভিতরে বসাইয়া মা স্বয়ং তাঁহাকে পূজাপ্রণালী শিক্ষা দিয়াছিলেন।

একদা মাতাঠাকুরাণীর সহিত দেবমাতা ধর্ম্মালোচনায় মগ্ন। মা বাংলা ভাষায় বুঝাইতেছেন, দেবমাতা বাংলা জানেন না। কিন্তু তাঁহার আনন্দোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইল, বাংলা না জানিলেও মায়ের বক্তব্য তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন। শ্রদ্ধায় এবং ভাবাবেগে তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতেছিল।

এমন সময় কালা-বৌ সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া উভয়ের অবস্থা-দর্শনে মাকে জিজ্ঞাসা করেন,—হ্যাঁ মা, আপনি তো ইংরিজি জানেন না, তবে একে বোঝাচ্ছেন কি ক'রে!

মা হাসিয়া বলিলেন,—প্রাণের একটা আলাদা ভাষা আছে কি-না, তাই প্রাণে প্রাণে সব বোঝা যায়।

দেবমাতার মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতার একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি।—মায়ের বাটীর নিকটস্থ বস্তিতে কয়েকটি স্ত্রীলোক একদিন কলহ করিতেছিল। ক্রমে তাহা তুমুল আকার ধারণ করে এবং একজন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। দ্বিতলের বারান্দা হইতে দেখিতে পাওয়া গেল যে, একজন পুরুষ একটি স্ত্রীলোককে কেশাকর্ষণ করিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিতেছে। দেখিবামাত্র দেবমাতা শিহরিয়া উঠিলেন সেই অসহায়ার দুর্দ্দশায়। তাহাকে দুষ্টের কবল হইতে উদ্ধার করিতে হইবে এবং ঐ পুরুষটির কাপুরুষোচিত আচরণের প্রতিবাদও প্রয়োজন। উত্তেজিতচিত্তে দেবমাতা চলিলেন ঘটনাস্থলে, ইহার প্রতিকার করিতে। একতলার প্রবেশদ্বারে আসিতেই সেবকগণ তাঁহাকে বাধা দিয়া বুঝাইলেন, ইহারা সাধারণ স্ত্রীলোক, এইপ্রকার কলহ ইহাদিগের মধ্যে প্রায়শঃ ঘটিয়া থাকে।

দেবমাতা বলেন, একজন অসহায়া নারী প্রহৃত হইতেছে, তাহাকে দুষ্টের কবল হইতে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য।

সেবকগণ বুঝাইয়া বলেন, ইহার মধ্যে জড়িত হওয়া আপনার উচিত নহে, আপনারও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে।

—কিন্তু, চক্ষের সম্মুখে স্ত্রীলোকের উপর এই অত্যাচার অসহনীয়, এই বলিয়া নিরুপায় হইয়াই দেবমাতা ক্ষুণ্ণমনে ধীরে ধীরে মাতাঠাকুরাণীর নিকট ফিরিয়া আসিলেন। হয়তো সেবকগণের উপদেশের তাৎপর্য্য তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

সমবেদনায় বিগলিতা মাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন,—স্বাধীন দেশের মেয়ে কি-না, তাই এমন তেজস্বিনী।

আমাদের মাতাঠাকুরাণী ছিলেন পরম মমতাময়ী। কি মানুষ, কি পশু, কাহারও শারীরিক বা মানসিক পীড়া দেখিলে তিনি বিচলিত হইতেন, পরের ব্যথায় তাঁহার নিজের অন্তরই ব্যথিত হইত অধিক। তাঁহার হৃদয় অতিশয় কোমল ছিল বলিয়াই যেমন নিজের, তেমনই অপরের সামান্য একটি ফোঁড়া হইলে, অথবা অস্ত্রপ্রয়োগের নাম শুনিলেই তিনি শিহরিয়া উঠিতেন।

শ্রীক্ষেত্রধামে দেখিয়াছি, পায়ের ফোড়ায় অস্ত্রপ্রয়োগ হইবার পরে যখন মা বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার হইয়াছে, তখন তাঁহার যন্ত্রণা এবং ভীতি যেন বৃদ্ধি পাইল।

একবার মাতৃভবনে দাঁতের যন্ত্রণায় তিনি বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। দাঁতটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য স্বামী সারদানন্দ দন্তচিকিৎসককে আহ্বান করিলেন। চিকিৎসকের আগমনবার্ত্তা শুনিয়াই মা যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহাকে পাওয়া গেল না।

গোলাপমা বলিলেন,—এমন যে হবে, শরতের আগেই বোঝা উচিত ছিল, ওষুদপত্র দিয়ে কি দাঁতের কষ্ট সারানো যায় না? প্রথমেই ডাক্তার নিয়ে এসে হাজির! মা-ঠাকরুণ তো আর আমরা নই, আমরা ডাকাবুকো, মা-ঠাকরুণ সুশীলা—কমলামূর্ত্তি; কাটাছেঁড়ার নাম শুনলেই তিনি ভয় পান।

শরৎ মহারাজ বলিলেন,—অভয়া যদি ভয় পান, সে দোষ কি শরতের? ওষুদে সারবে না, কেবল সময় নষ্ট আর কষ্ট।

—মা-ঠাকরুণ যা' চান না, আমরা তা' করবো না, ব্যস্।

শরৎ মহারাজ নিরুপায় হইয়া ডাক্তারকে বলিলেন,—বুঝলে কি হে ব্যাপারটা? মা-ঠাকরুণকে এখন কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সুতরাং তুমি নিজের পথ দেখো। এই বলিয়া ডাক্তারকে সঙ্গে করিয়া শরৎ মহারাজ চলিয়া গেলেন।

অতঃপর পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল, একখানি চাদরে সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া মা তক্তাপোষের নীচে লুক্কায়িত রহিয়াছেন।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, এই ঘটনার পর মায়ের দাঁতের ব্যথা সত্যই আস্তে আস্তে কমিয়া গেল।

মাতৃভবনে গৌরীমার পায়ে একবার অস্ত্রোপচার হইয়াছিল।

তাঁহার বাম পায়ের গাঁটে কঠিন কড়া পড়িয়াছিল। তাহারই পার্শ্বে একটি আব হয়, ক্রমে তাহা অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিলে সারদানন্দজী চিকিৎসক ডাকাইলেন। পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত হইল যে, অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা ইহা সারিবে না।

মাতাঠাকুরাণীর সম্মতিতে তারিখ স্থির হইল। একতলায় গৌরীমার পশ্চাদ্দিকে বসিয়া মা তাঁহার মস্তকে জপ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলাল অস্ত্রপ্রয়োগ করেন, তখন মা এবং গৌরীমা উভয়েরই নয়ন মুদ্রিত। গৌরীমা যন্ত্রণায় শিশুর ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলে মা নয়ন মুদ্রিত অবস্থাতেই তাঁহার মস্তকে আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

নিকুঞ্জবালা দেবী বলিয়াছেন, "বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জ্জীর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে অবস্থানকালে একদিন গৌরীমাকে একটি বৃশ্চিক দংশন করে। সেদিন মাতাঠাকুরাণীর কি ব্যাকুলতা! সারারাত্রি তিনি ঘুমান নাই, গৌরীমার পার্শ্বেই বসিয়া ছিলেন।"

স্বামী শ্যামানন্দ তাঁহার আঙ্গুলহাড়া-পীড়ার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"যখন মঠে যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সেইদিন আমি শ্রীশ্রীমায়ের বাটী (বাগবাজার উদ্বোধন অফিসে) আনীত হই। কিন্তু যন্ত্রণার যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, সমস্ত রাত্র আমি কাতর ক্রন্দন করিতে থাকি। সময় সময় অসাবধানতাবশতঃ অধিক উচ্চ ক্রন্দনশব্দও হইতে থাকে। ঐ রাত্রে শ্রীশ্রীমা উপর হইতে সমস্ত রাত্র আমার জন্য ছট্‌ফট্ করিতে থাকেন,—'আহা, বাছা আমার সারা হোল।' আবার আমি সাবধানে, যাতে শব্দ না হয়, এইরূপে অল্পসময় যাপন করি। কিন্তু যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রমে নিম্নস্বরে 'আহাঃ উহুঃ' করিতে করিতে আবার

যেই শব্দ একটু উচ্চ হইয়াছে, অমনি শ্রীশ্রীমা উপর হইতে বলেন, 'আহা-হা! বাছার আমার কি কষ্ট হচ্ছে! বাছা আমার সারা হোল।' আমিও শ্রীশ্রীমার এবং অপরের নিদ্রার ব্যাঘাতের ভয়ে যতই সাবধান হইতেছি, যন্ত্রণায় সারারাত ছট্‌ফট্ করিয়া, কখনও জলের বালতীতে হাত ডুবাইয়া, কখনও হ্যারিকেন ল্যাম্পের উত্তাপে হাত রাখিয়া যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি এবং ক্রন্দন করিতেছি, যেই শব্দ একটু উচ্চ হইয়াছে, অমনি শ্রীশ্রীমা উপর হইতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

"এইরূপে সারারাত মায়ের এই ভাব আমাকে তাঁহার নিজের সন্তান করিয়াছিল। আমার মনে হোল, আমার নিজের মা-ই।"

আর এক সাধুর কথা মনে পড়ে,—আশ্চর্য্য মনোবলসম্পন্ন স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ)। একবার তাঁহার দেহে দুষ্টব্রণ হয়। আস্তে আস্তে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ভীষণ কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। চিকিৎসকের মতে, অস্ত্রপ্রয়োগ ভিন্ন অন্য কোন উপায় নাই। তুরীয়ানন্দজী বালকের মত উদ্বিগ্ন হইয়া গুরুভ্রাতাদের বলেন,—আমার কি হবে তবে? তোমরা আমার দেহে কাটাছেঁড়া করো না, যা' হবার এমনি হোক। কিন্তু স্থির হইল, মাতৃভবনেই চিকিৎসক আসিয়া অস্ত্রোপচার করিবেন।

ঔষধপ্রয়োগে তুরীয়ানন্দজীকে অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র করা হইবে, তাহারই আয়োজন হইতেছে। তিনি তখন চিকিৎসককে বলিলেন,—দাঁড়াও হে ডাক্তার, আমায় ক্লোরোফরম করতে হবে না। মনটাকে একবার স্থির করতে দাও। এই বলিয়া কিছুক্ষণ তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন এবং বাহ্যবিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া ইষ্টপাদপদ্মে সমাহিত করিলেন; নিজের দেহযাতনা এবং বহির্জগতের আর কোন বোধ তাঁহার রহিল না।

এদিকে মাতাঠাকুরাণী দারুণ উৎকণ্ঠায় দ্বিতলে তাঁহার কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া আছেন, যাহাতে রোগার্ত্তের কাতর চীৎকার তাঁহার কর্ণে প্রবেশ না করে; এবং মনে মনে ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন,—হে ঠাকুর, ছেলের যেন কোন্ কষ্ট না হয়!

চিকিৎসাবিজ্ঞানকে স্তম্ভিত করিয়া তুরীয়ানন্দজীর কঠিন অস্ত্রোপচার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইবার পরও যখন তাঁহার বাহ্যচেতনা ফিরিয়া আসিল না, চিকিৎসকগণও শঙ্কিত হইলেন। মমতাময়ী জননীর প্রাণে সন্তানের জন্য ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইল। তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন, সন্তানের মুখে ঠাকুরের চরণামৃত দিলেন, মস্তকে জপ করিয়া দিলেন। অতীন্দ্রিয় জগৎ হইতে ধীরে ধীরে তুরীয়ানন্দজীর মন নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিল।

যখন জানিতে পারিলেন যে, মাতাঠাকুরাণী তাঁহার জন্য অতিশয় ভাবিত হইয়াছিলেন এবং নীচের ঘরে আসিয়া তাঁহার মস্তকে জপ করিয়া দিয়াছেন, তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ মাতাঠাকুরাণীকে যে কত গভীরভাবে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, তাঁহা ভাষায় বুঝাইবার নহে। মায়ের স্পর্শের তো কথাই নাই, তাঁহার দর্শনমাত্র তাঁহাদিগের অন্তরে ও বাহিরে দিব্যানন্দের পুলক সঞ্চার হইত।

একবার মাতাঠাকুরাণী বলরাম-ভবনে আমন্ত্রিত হইয়াছেন, লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তখন উক্ত বাটীর একতলায় বাস করিতেন; প্রবেশদ্বারে মাকে দেখিয়াই তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বাষ্পগদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "মা-ঠাকরুণ, বরমময়ী, এথিকে, এথিকে।" অবগুণ্ঠিতা মাতা গোলাপমাকে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করেন,—গোলাপ, লাটু বলে কি?

ততক্ষণে লাটু মহারাজ নিকটে আসিয়া মায়ের চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দন বটে, কিন্তু এমন মধুর ক্রন্দন কখনও শুনি নাই!

তাহার পর, ভাবে বিভোর হইয়া গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিতে লাগিলেন,—

তুমি স্বর্গ, তুমি মর্ত্ত্য, তুমি মা পাতাল।
তোমা হ'তে হরি ব্রহ্মা দ্বাদশ গোপাল॥

গাহিতে গাহিতে তিনি নির্ব্বাক ও ভাবস্থ হইলেন। মাতাও ভাবস্থা। ভক্তবৃন্দ কেহ রাজপথে, কেহ-বা বাটীর অভ্যন্তরে দণ্ডায়মান; তাঁহাদের ভাবাবস্থাদর্শনে সকলে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নারীভক্তগণ মাকে ধরিয়া দ্বিতলে লইয়া গেলেন; লাটু মহারাজও 'বরমময়ী, বরমময়ী' বলিতে বলিতে প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, 'বরমময়ী মাথাটা গরম করে দিলে।' সমস্ত দিন তিনি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর রহিলেন।

আর এক কৃপাধন্য সন্ন্যাসীর আত্মকথা হইতে জানা যায়, কিরূপে কেহ কেহ স্বপ্নেও মাতাঠাকুরাণীর দর্শন ও মন্ত্র-লাভ করিয়াছিলেন,—

"তখন আমি কলকাতায় কলেজে পড়ি। গর্ভধারিণীর অসুস্থতার খবর পেয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে বাড়ী রওনা হলুম। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাড়ী পৌঁছে দেখলুম, গর্ভধারিণীর দেহ সৎকার করে আত্মীয়স্বজন সব বাড়ী ফিরেছেন। মাকে শেষসময় দেখতে পেলুম না, মা এভাবে আমায় ছেড়ে চলে গেলেন, এতে প্রাণে বড় আঘাত পেলুম। মনকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছি না।

"গভীর রাত্রি, চারিদিক নীরব। ঘরে একাকী বসে আছি, শোকে দেহমন আচ্ছন্ন। এমন সময় দেখি,—ঘরের ঈশান কোণ হতে চাঁদের মত উজ্জ্বল, আকারে চাঁদ হতেও বড় একটি উজ্জ্বল গোলাকার জ্যোতি ধীরে ধীরে আমার কাছে আসছে। হঠাৎ জ্যোতিটি ফেটে গেল। ভেতরে ঠাকুর মা-ঠাকরুণকে দেখতে পেলুম। উভয়েই বসে। পেছনে গৌরীমা দাঁড়িয়ে। মা-ঠাকরুণ তাঁর হাত দিয়ে আমার গর্ভধারিণীর ডান হাতটি ধরে আছেন। গর্ভধারিণীর পরনে একটি লালপেড়ে শাড়ী। আমার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি প্রসন্ন। এই অবস্থায় মা-ঠাকরুণ আমায় ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই কাঁদছিস কেন? কি হয়েছে তোর? তোর মা তো আমাদের কাছেই আছে।'

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে সব অদৃশ্য হয়ে গেল। * *

"মা-ঠাকরুণ তখন 'উদ্বোধনে' বাস করেন। তাঁর দর্শনের আশায় একদিন উদ্বোধনে উপস্থিত হলুম। দুর্ভাগ্য আমার, তাঁর দর্শন পেলুম না। পর পর তিন দিন বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে এলুম। মনে বড্ড অভিমান হলো, প্রতিজ্ঞা করলুম,—মা-ঠাকরুণ ডেকে দেখা না দিলে আর তাঁর কাছে যাব না।

"শারদীয়া মহাষ্টমী।

কলকাতায় যাদের বাসায় থাকতুম, সেখানকার মায়েরা আমায় ধরে বসলেন, তা'দিগকে সঙ্গে করে উদ্বোধনে মায়ের দর্শনে যেতে হবে। আমি বললুম, 'মায়ের দর্শনে আমি যাব না। আপনাদের মায়ের বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পারি। দোতলায় উঠব না।'

"তাঁরা রাজী হলেন। মায়ের বাড়ী পৌঁছে তাঁরা দোতলায় উঠে গেলেন। আমি নীচের তলায় প্রবেশদরজার ডানপাশের ছোটঘরখানিতে একাকী চুপচাপ বসে রইলুম।

"শ্রীমার প্রসাদ পাবার সময় হলো। তিনি গোলাপ-মাকে বললেন, গোলাপ, একবার ডাকো, নীচে ছেলেরা কেউ প্রণাম করবার বাকী আছে কি-না। গোলাপ-মা ওপর থেকে জোরে ডাকলেন। নীচের তলা হতে কোন সাড়া গেল না। গোলাপ-মা মা-ঠাকরুণকে বললেন, 'না মা, নীচে ছেলেরা কেউ দর্শন করবার বাকী নেই।'

"মা-ঠাকরুণ আবার বললেন,—তুমি একবার নীচে গিয়ে ভাল করে দেখে এসো। গোলাপ-মা নীচে নেবে ঘরে ঘরে খুঁজলেন। আমার ঘরেও এলেন। আমি একটু আড়ালে বসে আছি। আমায় দেখতে পেলেন না।

ফিরে গিয়ে জানালেন,—মা, কোন ঘরে কাউকে দেখতে পেলুম না।

মা-ঠাকরুণ একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন,—গোলাপ, তুমি আরও ভাল করে দেখে এসো। নিশ্চয় কেউ আছে।

"গোলাপ-মা নীচের তলায় আবার তন্ন তন্ন করে দেখতে লাগলেন। এবার আমার গায়ের চাদরটি দেখতে পেয়ে চাদর ধরে টেনে বার করে

নিয়ে এলেন এবং বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'ছোঁড়া ভারী বিটকেল ভক্ত দেখছি, যাও শীগ্গির যাও। মা কতক্ষণ পা ঝুলিয়ে বসে থাকবেন?'

"দোতলায় মায়ের কাছে গেলুম। দেখলুম—মা-আমার পা দুখানি ঝুলিয়ে বসে আছেন। ছুটে গিয়ে মায়ের পা দুখানি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলুম। সে কি কান্না! কিছুতেই কান্না আর থামছে না। মা-ঠাকরুণ আমার মাথাটি তাঁর কোলে টেনে নিলেন, মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে কত আদর করলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না,জীবনে ভুলতেও পারব না। মায়ের সান্ত্বনা পেয়ে শান্ত হলুম। কাছে বসে মা কত স্নেহ করে আমায় প্রসাদ দিলেন। মায়ের প্রসাদ পেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করলুম।

আমার সঙ্গিনী মায়েরা শ্রীমাকে বললেন, 'মা, এ ছেলে আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।'

মা-ঠাকরুণ বললেন, 'হ্যাঁ! একে তোমরা কোথায় পেলে? এ-যে আমার ছেলে!'

"সেদিন অন্তরে পরম তৃপ্তি ও শান্তি নিয়ে বাসায় ফিরলুম। রাত্রিতে বিছানায় বসে বসে মা'র কথা অনেক রাত পর্য্যন্ত ভাবলুম। পড়াশুনায় মন নেই, কেবল মা'র কথা ভাবছি। সেদিন প্রায় সমস্ত রাত কেঁদেছিলুম, চোখের জল আর থামে না। মাঝে মাঝে ভেতর থেকে প্রাণ হা-হুতাশে কেঁদে ওঠে।

"এমন সময় গভীর রাতে আবার তাঁর দর্শন পেলুম। মা-ঠাকরুণ মশারীর পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,···এই মন্ত্র জপ করো, বাবা। বীজটি আমি ভাল করে ধরতে পারলুম না।

"তার দুই একদিন পরে ত্রয়োদশী তিথিতে উদ্বোধনে গিয়ে মাকে প্রণাম করতেই মা বললেন, 'বুঝতে পারনি বুঝি বাবা। এসো তবে, আবার বলে দি', বলে সামনের দরজা ভেজিয়ে দিলেন। পূজার আসনে মা বসলেন, তাঁরই পাশে একটি আসনে আমায় বসতে বললেন। মাথায় কয়েকবার হাত বুলিয়ে বীজমন্ত্রটি বলে দিলেন। আর, কি করে জপ করতে হয়, হাতে দেখিয়ে দিলেন।"

শ্রীসারদারঞ্জন দত্তশর্ম্মাও প্রথমে স্বপ্নে মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করেন এবং পরে তাঁহার নিকট কৃপালাভ করেন। তিনি লিখিয়াছেন,—

"ইংরাজী ১৯১২ সনের ফেব্রুয়ারী কি মার্চ্চ মাসের এক রাত্রিতে আমার খুব মাথা ধরে। আমি নিজ বিছানায় শুইয়া কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়া পড়ি। উক্ত ঘরের অন্যান্য ছেলেরাও কিছু দূরে দূরে নিজ নিজ শয্যায় ঘুমাইয়া ছিল। উক্ত ঘরটি যথেষ্ট বড় ছিল। রাত্রি প্রায় দুটার সময় হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং আমার মনে হয়, যেন একটি মাতৃমূর্ত্তি আমার শিয়রে বসিয়া আমার দিকে নিশ্চলভাবে তাকাইয়া রহিয়াছেন। ঘরে আলো না থাকিলেও রাত্রি বোধ হয় সম্পূর্ণ অন্ধকার ছিল না।

"আমি শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়া ঘরে আমরা চারিজন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ইহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পরদিন বিকালে কলেজ হইতে আসিয়া (ঢাকা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক) ভক্তবর চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে যাই। হাত, পা ও মুখ ধুইয়া তাঁহার ঠাকুরঘরে বসি। * *

"ঠাকুরঘরে বসিয়া দেখিলাম, উহাতে নানা দেবদেবী ও মহাপুরুষদের ছবি সাজানো রহিয়াছে। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ছবি ঠিক মধ্যস্থলে পূজার স্থানে রহিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পূর্ব্বরাত্রে যেই মাতৃমূর্ত্তিটি আমার শিয়রে বসা দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেইরকম একখানা ছবি ঠাকুরের ছবির পার্শ্বেই বসানো রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম।

ইনি কে, জিজ্ঞাসা করাতে ভক্তবর চন্দ্রকান্ত বলিলেন, 'শ্রীমা। ঠাকুর বিয়ে করেছিলেন, জান? এই ফটোখানা সিষ্টার নিবেদিতা তুলিয়েছিলেন, অনেক বছর আগে।'

"ইতিপূর্ব্বে আমি মায়ের এই ফটো বা অন্য কোনও ফটো দেখি নাই। আমার পূর্ব্বরাত্রির অদ্ভুত দর্শনের কথা বলাতে ভক্তবর চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন, এবং তৎপরে বলিলেন, 'দেখ, শ্রীশ্রীমা এখনও দেহে আছেন। এখন তিনি কলকাতায় আছেন। তুমি

তাঁর সঙ্গে দেখা কর। আমার মনে হয়, তুমি মায়ের চিহ্নিত সন্তান এবং তোমার সময় হয়েছে। তিনি তোমায় ডাকছেন।' ইহা শুনিয়া আমি যেন শিহরিয়া উঠিলাম, বলিলাম, 'যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন এসেছ?' তিনি বলিলেন, 'কিছু বলতে হবে না। মা সবই জানেন। তিনিই ত সব করাচ্ছেন।' * *

"ইংরাজী ১৯১২ সনের ২১শে এপ্রিল, রবিবার, বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া আমার দাদা ও আমি প্রথমে নীচের ঘরে অপেক্ষা করিতে থাকি। আরও অনেক ভক্ত মাকে প্রণাম করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত সারদানন্দ স্বামী বলিতেছিলেন, 'মার দেহ এখন বড় খারাপ যাচ্ছে। এখন আর কাকেও দীক্ষা দেন না। দীক্ষা দিয়ে দিয়েই মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দেখো, তোমরা যেন কেউ মাকে এখন দীক্ষাটিক্ষার কথা ব'লে কষ্ট দিও না।'

"যথাসময়ে উপর হইতে ভক্তদের ডাকা হইল, মাকে প্রণাম করিয়া আসার জন্য। আমার দাদা ও আমি উপরে গিয়া মায়ের পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলাম। মা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া পা দুখানা নীচে রাখিয়া খাটের উপর বসিয়া আছেন। তিনি সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মাকে কিছু বলিতে উদ্যত হওয়ামাত্র সন্ন্যাসীব্রহ্মচারীরা বলিয়া উঠিলেন, 'বাইরে আসুন, বাইরে আসুন, আরও অনেকের প্রণাম করতে হবে যে।' সুতরাং আমরা দুই ভাই বাহিরে বারান্দায় আসিয়া একপার্শ্বে হাত জোড় করিয়া মায়ের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম।

"একে একে অন্যান্য ভক্তগণ নীচে নামিয়া গেলেন। আমরা দুইজন ঐভাবে দাঁড়াইয়াই রহিলাম। গোলাপ-মা আসিয়া আমার দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা কে গা?' দাদা বলিলেন, 'আমরা দুটি ভাই।' গোলাপ-মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাও? মাকে প্রণাম করেছ ত?' আমাদের মুখের দিকে তাকাইয়াই গোলাপ-মা ভিতরে গিয়া মাকে বলিলেন, 'মা, বাইরে দুটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, তারা দু ভাই। তোমার কাছে এসেছে।' উত্তরে মা যাহা বলিলেন,

তাহা শুনিয়া গোলাপ-মা আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, আমরাও শুনিলাম যে, মা বলিলেন, 'পরশু মঙ্গলবার অক্ষয়তৃতীয়া—ভাল দিন। ছেলে দুটিকে বল, সেদিন প্রাতে যেন গঙ্গাস্নান করে এখানে আমার কাছে আসে।' * *

"ইংরাজী ১৯১২ সনের ২৩শে এপ্রিল, বাংলা ১৩১৯ সনের ১০ই বৈশাখ, মঙ্গলবার, অক্ষয়তৃতীয়া দিন প্রাতঃকালে বাগবাজার মঠে অর্থাৎ মায়ের বাড়ীতে শ্রীশ্রীমা আমাদের দুই ভাইকে দীক্ষাদান করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দেন। দীক্ষাদানপ্রসঙ্গে যাহা যাহা বলিয়াছেন এবং দেখাইয়া দিয়াছেন, তাহার মধুর স্মৃতি চিরকাল মনে থাকিবে। সেদিন দ্বিপ্রহরে সেখানেই আমরা প্রসাদ পাই। মা প্রথমেই নিজের প্রসাদ আমাদিগকে দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

"মা বলিয়াছিলেন, 'রোজ সকালে ও সন্ধ্যায় ইষ্টমন্ত্র জপ করবে।' আমি বলিয়াছিলাম, 'মধ্যাহ্নে করব না মা ? ত্রি-সন্ধ্যায় ?' মা উত্তর দিলেন, 'বাবা, তোমরা ছাত্র, কলেজে যেতে হবে। দুপুর বেলাতে কি আর সম্ভব হবে ? তোমরা সকালসন্ধ্যায় করবে, আর তাছাড়া যখন সময় পাও তখনই জপ করবে।"

১৩১৯ সালে শারদীয়া পূজার পর মাতাঠাকুরাণী পুনরায় বারাণসী-ধামে গমন করেন।* তিনি কলিকাতার হরিপদ দত্তদের 'লক্ষ্মীনিবাসে' বাস করিতেন। ঐ সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাশীতে ছিলেন। মাষ্টার মহাশয় ও তাঁহার পত্নী, গোলাপমা, ভানুপিসী প্রভৃতি ভক্তগণও মায়ের সঙ্গে বারাণসী গিয়াছিলেন। নিবেদিতা-বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী সুধীরা বসুও কতিপয় সঙ্গিনীসহ কয়েকদিবসের জন্য গিয়াছিলেন।

লেখিকাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে মা ইচ্ছাপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু

---

*মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ বাগবাজার, ৩ নভেম্বর, ১৯১২

আমরা ১৯শে কার্ত্তিক ৺কাশীধাম রওনা হইব।

গৌরীমা তৎকালে কলিকাতার বাহিরে থাকায় এবং লেখিকার উপর আশ্রমের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকায়, মায়ের সঙ্গে তাহার যাওয়া সম্ভব হয় নাই। কয়েকদিবস পরে গৌরীমা কলিকাতায় ফিরিয়া তাহার বারাণসীধামে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

মাতাঠাকুরাণী প্রায়ই মাতা অন্নপূর্ণা এবং বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইতেন। গঙ্গার তীর, বিশেষতঃ কেদারঘাট তাঁহার প্রিয়স্থান ছিল।

এইবার মা ছুইটি প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করেন। একটি বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ, অন্যটি শ্রীরামকৃষ্ণসংঘ-পরিচালিত সেবাশ্রম। উভয় স্থান দর্শন করিয়াই মা সন্তোষ প্রকাশ করেন। সারনাথে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যজ্ঞানের উৎকৃষ্ট নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়, মা ইহার প্রশংসা করেন।

একদিন গঙ্গাস্নানান্তে মা বাসস্থানে ফিরিলে পর তিন-চারিজন মহিলা আসিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হ্যাঁগা, আপনাদের মধ্যে কোনজন মা-ঠাকরুণ? কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গোলাপমাকে মা-ঠাকরুণ মনে করিয়া তাঁহার চরণে তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হইলেন।

গোলাপমা বিরক্তিসহকারে বলিলেন,—আমাকে দেখে তোমাদের মা-ঠাকরুণ বলতে ইচ্ছে হলো! ঐ মুখখানি, ঐ পা ছুখানি একবার চেয়ে দেখ, ও কি মানুষের? ধন্যি বাছা, তোমাদের বিবেচনা! ঐ-যে মা দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে প্রণাম কর।

অতঃপর তাঁহারা লজ্জিতমনে মায়ের চরণে দণ্ডবৎ হইলেন।

আর একটি ঘটনা। একদিন এক ব্যক্তি মাতার দর্শনমানসে উপস্থিত হইলেন। কথাবার্তায় মনে হইল, লোকটি বিকৃতমস্তিষ্ক। তিনি বলেন,—মাতাঠাকুরাণী অন্নপূর্ণা, তাঁহার কাছে সবই আছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই সব দিতে পারেন। ক্রমান্বয়ে তিন দিন তিনি যাতায়াত করিলেন, কিন্তু সেবকগণ তাঁহাকে মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলেন না। অবশেষে তিনি নিরুপায় হইয়া মায়ের বাসস্থানের সম্মুখে রাস্তায় পাদচারণ করিতে লাগিলেন এবং স্পষ্টভাষায় জানাইয়া দিলেন, মায়ের সহিত একবার

সাক্ষাৎ না করিয়া তিনি কিছুতেই যাইবেন না। কিন্তু একটিবার মায়ের দর্শন পাইলে তিনি এইস্থানে আর আসিবেন না। দেবীর দর্শন একবার পাইলেই যথেষ্ট।

একদিন মা গঙ্গাস্নানে বাহির হইয়াছেন, অকস্মাৎ সেই ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া মায়ের চরণযুগল জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—মাগো, তুমি অন্নপূর্ণা, মহেশ্বরের ভিক্ষার ঝুলি তুমি পূর্ণ ক'রে দিয়েছ। আমি কাঙ্গাল, আমায় তুমি পূর্ণ করে দাও মা। এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি একটি বৈদিক মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

তাঁহার আচরণে মা বিস্মিত হইলেন; আর বুঝা গেল, লোকটি বিদ্বান। মাতৃহৃদয়ে করুণার উদয় হইল, তাঁহার মস্তকে জপ করিয়া মা বলিলেন,—বাবা, এবার ওঠ, তোমার হয়ে গেছে। এখন তুমি যেখানে যাবে জয়ী হবে। কোন ভাবনা নেই তোমার।

তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে, অন্নপূর্ণামাতার চরণে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। সেই যে গেলেন, আর তাঁহাকে কোনদিন দেখা যায় নাই।

বংশবাটী-নিবাসিনী এক সাধিকা—নাম প্রিয়তমা, গৃহস্থবধূ হইয়াও ছিলেন অভিষিক্তা। আত্মীয়স্বজনকে তিনি নিজেই দীক্ষা দান করিতেন। মাতাঠাকুরাণীর কাশীবাসকালে তিনিও বিশ্বনাথদর্শনে আসিয়াছিলেন, একদিন লক্ষ্মীনিবাসে গিয়া মাকে দর্শন করিলেন।

প্রণাম করিয়া উঠিলে মা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াই বলিলেন,—মাগো, তুমি তো সামান্য নও, তুমি যে গুপ্তসিদ্ধ।

প্রিয়তমা হাসিয়া বলেন,—আর, আপনি যে আমার গুরুর গুরু,—মহাগুরু। আমি যাঁর নাম জপি, সে তো মা আপনি। আপনার আশীর্ব্বাদে সব সার্থক হয়।

উভয়ের মধ্যে সাধনভজন বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল, উভয়েই আনন্দলাভ করিলেন। সময়ান্তরে প্রিয়তমাকে প্রশ্ন করা হইল,—আমাদের মাকে কেমন লাগলো ?

তিনি উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন,—পূর্ব্বজন্মে কত সুকৃতি ছিল, তাই আজ কাশীধামে দেববাঞ্ছিত ঐ পাদস্পর্শ পেলাম।

আর একদিন মায়ের দর্শনে একটি বধূ আসিলেন। তাঁহার পতি নিরুদ্দেশ হওয়ায় শাশুড়ী তাঁহারই উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু শিশুপুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইতে দেন নাই। তাঁহার দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া, পুত্রের জন্য নারীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়া, মায়ের কোমল প্রাণ বিগলিত হইল। তিনি বলিলেন,—কাঁদিসনি মা,তোকে এই বীজ দিলুম। একাগ্রমনে সাতদিন জপ কর দেখি। স্বামিপুত্র ফিরে পাবি। কাঁদিসনি, অন্নপূর্ণার কাশীতে কাঁদতে নেই।

আশ্চর্য্য ব্যাপার,মাতাঠাকুরাণীর কাশীতে অবস্থানকালেই সেই সাধ্বী পুত্রসহ আসিয়া মায়ের চরণে ভূমিষ্ঠ হইয়া কৃতজ্ঞ-অন্তরে জানাইলেন, তাঁহার নিরুদ্দেশ স্বামীও ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কাশীধামের মাহাত্ম্যবর্ণনায় মা একটি সুন্দর কাহিনী বলিতেন,—এক গুরু তাঁর শিষ্যকে এক ডেলা মাটি আনতে আদেশ করেন। শিষ্য সাধনায় এতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন যে, সারা কাশী খুঁজে তিনি কোথাও মাটি দেখতে পেলেন না। দিনান্তে দুঃখিত মনে ফিরে এসে গুরুকে বললেন,—গুরুদেব, আমি হতভাগ্য আপনার আদেশ রক্ষে করতে পারিনি। কোথাও একটু মাটি দেখতে পেলুম না।

—এ কী-রকম তোমার অসম্ভব কথা ! সারা কাশী খুঁজে এক ডেলা মাটি পেলে না তুমি ? রাগ ক'রে বলেন গুরুদেব।

বিনয়ের সঙ্গে শিষ্য আবার বলেন,—না গুরুদেব, অন্নপূর্ণার সোনার কাশী ; এখানে মাটি নেই, সবই সোনা।

এতক্ষণে গুরুদেব বুঝতে পারেন, তাঁরই শিষ্য তাঁকে ছাড়িয়ে ভাব-রাজ্যে কত উঁচুতে উঠে গেছে।

প্রায় আড়াই মাস পরে মাতাঠাকুরাণী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন মাঘের প্রথমে এবং ইহার কিছুকাল পরেই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে স্বামী অখণ্ডানন্দের নির্দ্দেশমত কয়েকটি ভক্ত যুবক—শ্রীসতীন্দ্রমোহন বসু, দ্বারকানাথ মজুমদার এবং হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—মাতৃসন্দর্শনের উদ্দেশ্যে বহরমপুর হইতে জয়রামবাটী আগমন করেন। এইবার যাঁহাদের দীক্ষা হয়, তন্মধ্যে সতীন্দ্রমোহন অন্যতম। মাতৃকৃপার প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—

* * "স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে শ্রীশ্রীমা বলিলেন, 'তোমরা কি জন্য আসিয়াছ, বুঝিতে পারিয়াছি। স্নানান্তে নয়-দশটার সময় এই ঘরে আমার কাছে এসো।' যথাসময়ে আমরা ৺পূজার ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঘরটি পুষ্পচন্দনের গন্ধে ভরপূর। থালাভরা পুষ্প ও অন্যান্য পূজার উপকরণ সাজানো। অচিরেই কৃপাপ্রাপ্ত হইলাম। প্রথমেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি শাক্ত তো?' আমি বলিলাম, 'হ্যাঁ'। তখন তিনি আমার কর্ণে শক্তিমন্ত্র দিলেন। মন্ত্রটি যখন কর্ণে প্রবেশ করিল তখন মনে হইল যেন উহা তেজোভাবপূর্ণ। সারাদেহ যেন শির শির করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঠাকুরের মন্ত্রও দিলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। নাম জপ করিতে করিতে অলৌকিক আনন্দানুভূতি হইল, উহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে মন্ত্রজপ সম্বন্ধে ও আনুষ্ঠানিক অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। যতদূর মনে আছে,তাহার সারমর্ম্ম—'রাত্রিশেষে জপের প্রশস্ত সময়, ঐ সময় মন স্থির থাকে। মনকে চাঞ্চল্যরহিত করিয়া জপ করিবে। ১০৮ বারের কম যেন জপ না হয়।' * * শ্রীশ্রীমা আমাকে সংসারের কর্ত্তব্যপালনের সহিত বিধিমতে ও সময়মত ধ্যানধারণা, জপ ইত্যাদির দিকে সম্যক লক্ষ্য রাখিতে বলিলেন। * *

"পরে আহারের সময় আমরা ভিতরে গেলাম। প্রচুর আয়োজন, যাহা খাই তাহাই যেন অমৃত। শ্রীশ্রীমা পার্শ্বে উপবিষ্টা। তাঁহার নির্দ্দেশমত পরিবেশন হইতেছে।

"অপরাহ্নেও আমরা শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শন ও উপদেশামৃত পান করিবার সুযোগ পাইলাম। তাঁহার স্নেহকরুণ দৃষ্টি, সরল অথচ তেজোগর্ভ বাণী আমাদিগকে মুগ্ধ করিল।"

দ্বারকানাথ পূর্ব্বেই মাতাঠাকুরাণীর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। জয়রামবাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। মাতার এই স্নেহাস্পদ সন্তানটি সাধনপথে যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা সতীন্দ্রমোহনের নিম্নোক্ত বিবরণ হইতেই বুঝা যাইবে।

"মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তে আমরা কোয়ালপাড়ার দিকে যাত্রা করিলাম। সেখানে সেইদিন বিশ্রাম করিয়া কলিকাতা ফিরিবার কথা। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব, সেই রাত্র হইতেই দ্বারিকের শরীর অবসন্ন। পরদিন সকাল হইতে তাহার রক্তামাশয় রোগের লক্ষণ দেখা দিল; ক্রমশঃ রোগ ভীষণাকার ধারণ করিল। মঠাধ্যক্ষ কেদারদা প্রধান বৈদ্যকে সংবাদ দিলেন। জনৈক ব্রহ্মচারী অক্লান্ত সেবা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তাতিসার দেখা দিল। পূর্ব্বে কেহই, এমনকি কবিরাজ মহাশয়ও রোগ যে মারাত্মক তাহা বুঝিতে পারেন নাই। অবস্থা বুঝিয়া দ্বারিকের মাসতুতো ভাই হরলাল মজুমদারকে সংবাদ দিলাম।

"রোগের সপ্তম দিন সকালবেলায় দ্বারিক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, 'আজ আমার শেষদিন। আমি ঠাকুরের নাম করিতেছি, তোমরা সকলে যোগ দাও।' আমরা অবাক হইয়া তাহার নির্দ্দেশমত তাহার সঙ্গে সঙ্গে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় দয়াময় রামকৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলাম। দুই ঘণ্টা পরে আমাদের স্বর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। এইরূপে তিন-চার ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। হঠাৎ দ্বারিকের কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার হাতে নামজপ চলিল। ক্রমে দেহ শীতল হইয়া উঠিল, কিন্তু চক্ষে তাহার দীপ্তি, মুখে তাহার আনন্দ। মৃত্যু ঘনাইয়া আসিলেও তাহার হাতে নামজপ চলিল। সেই অবস্থাতেই তাহার দেহের অবসান হইল।

"শোকে অধীর হইয়া আমরা দুইজনে কোনমতে রাত্রি কাটাইলাম। মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারিতেছি না। জয়রামবাটী উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীশ্রীমাতাকে সংবাদ দিলাম ও তাঁহার শ্রীচরণের সমীপে উপস্থিত হইয়া অশ্রুদ্বারাই ভাব ব্যক্ত করিলাম। শ্রীশ্রীমাও যেন একটু অধীর হইলেন। তিনি বলিলেন, 'আমি সব জানি, দ্বারিক আমারই নিকটে রহিল। তোমরা অধীর হইও না। ঠাকুরকে ডাকো, মন স্থির হবে।' এইরূপে খানিকক্ষণ পরে শোকের আবেগ মন্দীভূত হইলে শ্রীশ্রীমা আমাদিগকে স্নেহার্দ্রস্বরে ব্যাকুল না হইতে এবং মন স্থির করিয়া সংসারপথে চলিতে উপদেশ দিলেন।"

১৩২০ সালে মাতাঠাকুরাণী পল্লীভবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হইবার পর তাঁহার নিকট শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত দীক্ষা লাভ করেন। তিনি মায়ের বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"একদিন (উদ্বোধনে) সাধনসম্বন্ধে সামান্য কিছু জিজ্ঞাসা করাতে তিনি শুধু বলিলেন, 'স্মরণ রেখো।' কথা দু'টি এমতভাবে বলিলেন যাহাতে বুঝিলাম যে, শ্রীশ্রীমাকেই স্মরণ রাখিতে বলিতেছেন। বুঝিলাম সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বা কৃপা করিয়া তাঁহার স্বরূপ আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

"আর একদিন শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আছি (শ্রীশ্রীমা পা ঝুলাইয়া তাঁহার খাটের উপর বসিয়াছিলেন), এমত সময়ে শ্রীশ্রীমা হঠাৎ (উদ্বোধনে) শ্রীশ্রীঠাকুরের যে ফটো তিনি পূজা করিতেন, সেই দিকে তাকাইয়া এবং পরে দেয়ালে টাঙ্গান শ্রীশ্রীকালীর পটের দিকে তাকাইয়া বলিলেন যে, 'ইনি (অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর) আর ইনি (অর্থাৎ শ্রীশ্রীকালী) এক।' 'এক' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ একটা jerk দিয়া (খট্ করিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া) তাঁহার সমস্ত শরীর (পায়ের অঙ্গুলী হইতে উপরের সমস্ত শরীর) একেবারে শক্ত হইয়া গেল। বামদিক হইতে ডানদিকে তাঁহার শরীর ঈষৎ কাতভাবে রহিল। এইভাবে পলকহীন দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীকালীর পটের দিকে

তাকাইয়া রহিলেন। এইভাবে কতক্ষণ থাকিবার পরে তাঁহার শরীর আবার শিথিল হইয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। আমিও ততক্ষণ অবাক হইয়া শ্রীশ্রীমার এই সমাধি-মূর্ত্তি দর্শন করিতেছিলাম। আর মনে হইতেছিল, সমাধি অবস্থা শ্রীশ্রীমার পক্ষে কত সহজ। তিনি মুখে যাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই সত্যকে যে তিনি তখনই প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

"শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম যে, 'শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে ভাব এবং মহাভাবের অদ্ভুত প্রকাশ দেখিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। শ্রীশ্রীমার মধ্যেও এইসমস্ত ভাব এবং মহাভাব সর্ব্বদাই বিরাজ করিতেছে, কিন্তু এ কি মহাশক্তি যে সেই সমস্ত ভাব এবং মহাভাব সর্ব্বদাই লুকাইয়া রাখিয়াছেন। বাহ্যিক বড় একটা প্রকাশ হইতে দেন না।' ** এই কথার সত্যতা আমি সেইদিন কিছু উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

"** আমি যেদিন প্রথম দীক্ষালাভ করি সেইদিন একবার শ্রীশ্রীমার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম। সেইদিন শ্রীশ্রীমার যে করুণাব্যঞ্জক স্নিগ্ধ, শান্তদৃষ্টিসম্পন্ন অতি সুন্দর চক্ষু দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনও মানুষে সম্ভবে না, ইহা আমার তৎক্ষণাৎ মনে হইয়াছিল।"

মা ছিলেন যথার্থই দেবীপ্রতিমা। তাঁহার পাদযুগল দর্শনমাত্রই মনে হইত, কেন 'পাদপদ্ম' শব্দটির সৃষ্টি হইয়াছে। পাদযুগল আকারে ছোট ছোট, ভূমির সহিত মিশিয়া থাকিত। মায়ের সুকুমার দেহ, সুঠাম গঠন। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ন'বতে যিনি থাকেন, তাঁর বুকের গড়ন মা জগদ্ধাত্রীর মত, দোমেটে ক'রে গড়া।" মায়ের বর্ণ শ্যাম হইলেও দ্যুতিতে পূর্ণ, মুখশ্রী অনুপম। আয়ত প্রশান্ত নয়নদ্বয় হইতে যেন অবিরাম করুণাধারা ঝরিয়া পড়িত। ভ্রূযুগলের মধ্যভাগে একটি উল্কি এমনভাবে অঙ্কিত ছিল, দেখিয়া মনে হইত যেন তৃতীয় নয়ন। কুঞ্চিত কেশদামের শোভাই-বা কত! মায়ের এই রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া সন্তানগণের মনে স্বতঃই অনুভূতি জাগিত—সারদাজননী করুণার খনি।

মায়ের দর্শন এবং স্পর্শন কিভাবে সন্তানের দেহমনে দিব্যানুভূতি জাগাইত, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের প্রাচীন কুমারভক্ত শ্রীকুমুদবন্ধু সেন নিজের বাল্যকালের অনুভূতি হইতে লিখিয়াছেন,—

প্রথম দর্শনের দিন "দেখলাম * * মা দাঁড়িয়ে আছেন, একটী শুভ্র চাদরে সমস্ত শরীর আবৃত। শুধু তাঁর দুটী পাদপদ্ম অনাবৃত ছিল। আমি আবেগ-কম্পিতভাবে মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ভক্তিভরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলাম। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ। * * আমি প্রণাম করে উঠবার সময় মা তাঁর শ্রীহস্তটী আমার শিরোদেশে স্থাপন করলেন। * * দিব্যস্পর্শের তাড়িতপ্রবাহ তড়িদ্‌বেগে আমার হৃদয়মনে প্রবাহিত হয়েছিল, তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। সেই মৌন, মূক নিস্তব্ধতা আমার হৃদয়ে, আমার অন্তরকে অতীন্দ্রিয় চেতনার রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল এবং অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করে দিয়েছিল, তা অনুভব করলাম। * * মার সামনে আমি কম্পিত-কলেবরে যুক্তকরে দাঁড়াতেই মা কয়েক মিনিট নিশ্চল প্রতিমার মত অবস্থান করে ধীরে ধীরে চলে গেলেন। * *

"আমি প্রায় প্রতিদিনই গঙ্গাস্নান করে ফুল নিয়ে মাকে দর্শন ও তাঁর পাদপদ্মে অঞ্জলি দিতাম। * * মানুষ যেমন প্রতিমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, আমিও সেইরকম পুষ্পাঞ্জলি দিতাম। কিন্তু ঐ জড় প্রতিমা নয়, জীবন্ত প্রতিমা। কোন কথা বা ভাষা নাই, শুধু নীরবে স্তব্ধভাবে মার পাদপদ্ম দর্শন আর পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা শুধু মূক বা মৌন নহে, এ এক অপূর্ব্ব ভাষা। * * সেই ভাষা সেই বাণী আমার অন্তরকে দিব্যভাবে উদ্ভাসিত করতো। * * হৃদয়ের অন্তস্তল স্পর্শ করে শক্তি ও প্রেরণা দান করতো * * তখন মনে হোত, মা যেমন তাঁর শ্রীঅঙ্গ আবরণ করে রাখতেন, যে শ্রীঅঙ্গে মার অপার অগাধ বাৎসল্যের নির্ঝর বয়ে যেতো, যে শ্রীঅঙ্গে তাঁর দিব্য জ্যোতি এবং করুণার অমৃতধারা খেলতো, তেমনি এই বিশ্বে সেই ভূমার সেই অব্যক্ত মহান পুরুষের প্রেমকরুণা লোকচক্ষুর সম্মুখে মায়াবরণে আবৃত রয়েছে। অথচ সেই জগৎকারণের দিব্য প্রেমজ্যোতি জগতের

প্রতি বস্তুতে, অণুপরমাণুতে উদ্ভাসিত হচ্ছে। যে মায়ের কৃপায় সেই দিব্য চক্ষু পেয়েছে, সে-ই অন্তর্লোকে সেই প্রেমকরুণাপূর্ণ দিব্যমূর্ত্তি দেখতে পায়। সহজ চক্ষে তা ধরা পড়ে না।”

ঠাকুর যেমন স্বীয় দেহে কোন কোন ভক্তকে স্বাভীষ্ট দর্শন করাইয়াছেন, মাতাঠাকুরাণীরও তদনুরূপ ঐশী শক্তি আছে কি-না ঐরূপ সন্দেহদোলায় আন্দোলিত হইতেছিল দেবেন্দ্রনাথ বসুর চিত্ত। দেবেন্দ্রনাথ সরকারী কর্ম্মচারী, বিভিন্ন স্থানে কর্ম্মোপলক্ষে যাইতে হইত তাঁহাকে। একবার কলিকাতায় আসিয়া তিনি মাতাঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মা একখানি উত্তরীয়ে সমস্ত দেহ আবৃত করিয়া, শুধু পাদপদ্ম এবং মুখারবিন্দ উন্মুক্ত রাখিয়া চৌকীর উপর উপবিষ্ট ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মায়ের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া দৃষ্টি উর্দ্ধে তুলিতেই দেখিতে পাইলেন,—মায়ের অর্দ্ধাঙ্গ মহাকালী এবং অপরার্দ্ধ মা-সারদা। মায়ের এই অপূর্ব্ব রূপদর্শনে দেবেন্দ্রনাথ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিবার পর অনুশোচনার সহিত বলিলেন,—মাগো, আমি কত বড় অধম, ব্রহ্মময়ীর শক্তিসম্বন্ধে সন্দিহান হয়েছিলাম। আজ আপনার অহেতুক কৃপায় আমার সকল সন্দেহের নিরসন হ’য়ে গেল।

মাতৃভবনে একজন সন্তান আসিতেন, নাম প্র—। তিনি প্রিয়দর্শন, ধীমান ও মিষ্টভাষী। সমাগত ভক্তবৃন্দের কথাবার্ত্তা শুনিবার, সকলের সঙ্গে মিশিবার এবং মহিলাদের সান্নিধ্যে যাইবার একটা চেষ্টাও সর্ব্বদা তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত। তিনি মস্তক এমনভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতেন যে, অনেকসময় তাঁহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রম হইত। তাঁহার এই আচরণ এবং কথাবার্ত্তায় অনেকেরই মনে সন্দেহ হইত যে, তিনি সরকারের গুপ্তচর।

এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। রাধারাণী মনের কৌতূহল আর দমন রাখিতে পারে না; একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—দাদা,

তুমি তো পিসিমার কাছে যেয়ে বস না, দাদাদের কারু সঙ্গেও মন খুলে কথাবার্ত্তা কও না, এমনিভাবে একলাটি মেয়েমানুষের মত চুপচাপ কেন ব'সে থাকো, বলতো আমায় সত্যি ক'রে। বালিকার সরল প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর তিনি দিতে পারেন না, বড়ই বিব্রত বোধ করেন মনে মনে। তাঁহার নিজের মনও হয়তো আন্দোলিত হয় এইরূপ প্রশ্নে।

কয়েকদিবস তাঁহার দেখা নাই, তাহার পর একদিন হঠাৎ আসিয়া আবার উপস্থিত হইলেন, সটান উঠিয়া গেলেন মায়ের ঘরে। মায়ের চরণ ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলেন,—মা, আমি মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে অনেকদিন যাবৎ এখানে যাতায়াত করছি। আপনাকে নিত্য দেখে দেখে আমার মনে পরিবর্ত্তন এসে গেছে, এখন ভেতরটা অনুতাপে জ্বলে যাচ্ছে। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন মা, আমায় আপনি আশ্রয় দিন।

শরণার্থী সন্তানের কাতরতা দেখিয়া মাতাঠাকুরাণী তাঁহার চিবুক স্পর্শ করিয়া আদর জানাইলেন এবং বলিলেন,—ভালই হলো বাবা, মন্দ জিনিষ খুঁজতে এসেছিলে, মন্দ কিছু পেলে না এখানে, ভাল জিনিষই নিয়ে গেলে।

সন্তানটির দীক্ষা হইয়া গেল।

মাতাঠাকুরাণী পল্লীভবনে যাতায়াতকালে পথিমধ্যে জয়রামবাটীর অদূরবর্ত্তী কোয়ালপাড়া আশ্রমে বিশ্রাম করিতেন। তিনি বলিতেন, কোয়ালপাড়া আমার বৈঠকখানা।

এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ কেদারনাথ দত্ত (স্বামী কেশবানন্দ) মায়ের প্রসন্নতাবিধানে সতত সচেষ্ট থাকিতেন। তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল, কোয়ালপাড়ায় মায়ের বাসোপযোগী একটি বাটী নির্ম্মিত হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় পৈতৃক ভিটাতে কয়েকখানি ঘর নির্ম্মাণ করেন এবং ১৩২২ সালে মায়ের দেশে গমনকালে মাকে তথায় অভ্যর্থনা করেন। ইহার নাম জগদম্বা আশ্রম। অতঃপর কলিকাতা যাতায়াতের পথে মা এই বাটীতে বিশ্রাম করিতেন এবং কয়েকবার এখানে বাসও করিয়াছেন।

কেদারনাথের গর্ভধারিণীও ঠাকুর এবং মায়ের ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, কেদারনাথ যখন তাঁহার গর্ভে তখন তিনি ঠাকুরের দর্শন এবং চরণস্পর্শে ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, এইকারণেই ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরাণীর উপর তাঁহার পুত্রের এত ভক্তি।

•

এইসময় ইংরাজ-সরকার বিশ্বসংগ্রামে লিপ্ত থাকায় দেশের স্বাধীনতাকামী যুবকবৃন্দের উপর বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন, অনেককে কারাগারে অথবা বিভিন্ন স্থানে অন্তরীণেও আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের উদ্দীপনাময়ী বাণী তাঁহাদের অনেককেই আত্মত্যাগ এবং দেশসেবার পথে অনুপ্রেরণা দান করিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করা তাঁহাদের ভাগ্যে হয় নাই, এমন-কি স্বামিজীকেও অনেকে প্রত্যক্ষ করেন নাই; এইকারণে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতার দর্শন, উপদেশ ও আশীর্ব্বাদলাভ অনেকেই অন্তরে কামনা করিতেন। যাঁহারা অন্তরীণে ছিলেন, তাঁহাদের কেহ কেহ পুলিশের অনুমতি লইয়া, কেহ-বা তাহাদিগের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়াও গোপনে মায়ের নিকট আসিতেন, কেহ কেহ দীক্ষালাভও করিয়াছেন। মা তাঁহাদের ত্যাগ ও কষ্টবরণের সুখ্যাতি করিয়া বলিতেন,—আহা, কি-সব চাঁদের মত ছেলে, দেশের জন্যে কতই-না দুঃখলাঞ্ছনা ভোগ কচ্ছে!

মায়ের নিকট বিপ্লবিগণ যাতায়াত করে সন্দেহ করিয়া সরকারী গুপ্তচরগণ এইদিকে দৃষ্টি রাখিত, পুলিশের লোক আসিয়া কদাচিৎ অনুসন্ধানও করিয়া যাইত। পুলিশের গতাগতি মা প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না, ভয় প্রকাশও করিতেন না। কাহারও সম্পর্কে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিলে তিনি বলিতেন,—কে স্বদেশী, আর কে বিদেশী, তা' আমি কি জানি! সবাই আমার কাছে সমান, সবাই আমার ছেলে। মা ব'লে কাছে এসে দাঁড়ালে সব্বাইকে আমি আশীর্ব্বাদ করি।

জয়রামবাটী আসিলে এতাবৎকাল মা তাঁহার পিতৃগৃহেই প্রসন্নমামার

অংশের একখানি ঘরে থাকিতেন। এইবার ভক্তগণের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে এবং স্বামী সারদানন্দের প্রচেষ্টায় মায়ের পিতৃগৃহের পার্শ্বে পুণ্যপুকুরের ধারে তাঁহার বাসের জন্য পৃথক গৃহ নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রাথমিক কার্য্যে মায়ের অনুগত সন্তান ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় বিশেষ অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। ১৩২৩ সালে মা এই নবনির্ম্মিত গৃহে শুভপ্রবেশ করেন।

গৃহপ্রবেশের অল্প কিছুদিন পরেই স্বামী সারদানন্দের সহিত মা আষাঢ় মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

এই বৎসর বেলুড়মঠে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশেষ আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে মায়ের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। পূজার কয়েকদিন মঠে অনবরত দর্শনার্থী ভক্তের সমাগম হয়। অষ্টমী পূজার দিন এত ভীড় হইয়াছিল যে, পূজামণ্ডপে তিলধারণের স্থান ছিল না; ততোধিক ভীড় হইয়াছিল মায়ের বাটীতে। তাঁহার বাসভবনের সম্মুখে গঙ্গায় অগণিতযাত্রিপূর্ণ নৌকার ভীড় লাগিয়াই থাকিত। সাঙ্গোপাঙ্গ এবং ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মা বসিয়া থাকিতেন, উপদেশ দিতেন, সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। চারিদিকে এক আনন্দময় পরিবেশ। এইবার পূজা-উপলক্ষে মঠে দ্বাদশটি কুমারীর পূজা হয়। মাতাঠাকুরাণীর নির্দ্দেশে তাহাদিগকে উত্তম ভোজ্য এবং বস্ত্রাদিদানে তুষ্ট করা হয়।

১৩২৩ সালের অপর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মাতাঠাকুরাণীর জন্মোৎসব। ইতঃপূর্ব্বে মায়ের জন্মতিথি উৎসব অতি অনাড়ম্বরভাবে অন্তরঙ্গগণের মধ্যেই সম্পন্ন হইত। পূর্ব্ববৎসর এইদিনে মা দেশে থাকায় ভক্তগণ সেই অনাড়ম্বর উৎসব হইতেও বঞ্চিত ছিলেন। সুতরাং এইবার সকলের আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ সমারোহ করিয়া উৎসবটি সম্পন্ন করেন। সেদিন প্রাতঃকাল হইতে কন্যাগণ চন্দন, মাল্য এবং বস্ত্রে মাতাঠাকুরাণীকে ভূষিত করেন। ভক্তগণ নানাবিধ দ্রব্য মাতৃচরণে নিবেদন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। সারাদিনব্যাপী বহুভক্তের সমাগম, প্রসাদবিতরণ ও কীর্ত্তনাদিতে মাতাঠাকুরাণীর শুভ জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়।

শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী মাতা ও আশ্রম

"আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চট্‌কা"—ঠাকুরের এই অর্থপূর্ণ নির্দ্দেশ এবং "ঠাকুর ব'লে গেছেন, 'তোমার জীবন জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবায় লাগবে,"—মাতাঠাকুরানীর এই উৎসাহবাণীতে উদ্বুদ্ধ হইয়া গৌরীমা ১৩০১ সালে বারাকপুরে শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, এই কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

আশ্রমের প্রতি মাতার অন্তর কত প্রসন্ন, আশ্রমকে তিনি কতভাবে কৃপাধন্য করিয়াছেন, কন্যাদের কত আশীর্ব্বাদ ও উৎসাহ দান করিয়াছেন এবং তাহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি কিরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন, এই অধ্যায়ে তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

বারাকপুরের আশ্রম ছিল তপোবনের ন্যায় মনোরম। তরুলতা-সমাচ্ছন্ন স্থানটি, সম্মুখে পূতসলিলা ভাগীরথী। ভূমির মধ্যভাগে অশ্বত্থ, বট, বিল্ব প্রভৃতি বৃক্ষ মিলিত হইয়া একটি পঞ্চবটী রচনা করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার মূলে এক পঞ্চানন শিব পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পল্লীবধূগণ প্রত্যহ স্নানান্তে গঙ্গাজলে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন, গৌরীমার দামোদরজীকেও প্রণাম করিয়া যাইতেন।

নিতান্ত ক্ষুদ্র আকারে আশ্রমের আরম্ভ। একখানি মাত্র পর্ণকুটীর। দেবতার পূজা-আরাধনা সমাপ্ত হইলে, এই অঞ্চলে 'যোগিনীমা' নামে পরিচিতা গৌরীমার উপদেশলাভার্থ নিকটবর্ত্তী ও দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আসিয়া নরনারীগণ সমবেত হইতেন।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার কিছুকাল পরে গৌরীমার আমন্ত্রণে মাতাঠাকুরাণী একদিন বারাকপুর আশ্রমে শুভ পদার্পণ করেন। দীন কুটীর হইলেও মঙ্গলঘট, পত্রপুষ্প, আলিপনা, ভোগারতি ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হয়। গৌরীমা পরম ভক্তিসহকারে মাতৃপূজা করিলেন,

স্বরচিত একখানি কীর্ত্তন শুনাইলেন।* গঙ্গাতীরবর্ত্তী আশ্রমের আবেষ্টনদর্শনে মাতা সারদেশ্বরী প্রসন্না হইলেন।

ধীরে ধীরে কর্ম্মক্ষেত্রের পরিধি প্রসার লাভ করে। কতিপয় কুমারী, সধবা ও বিধবা শিক্ষার্থিনীরূপে আশ্রমবাসিনী হইলেন। গৌরীমার নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা জপধ্যান করিতেন, পাঠাভ্যাস ও গৃহকর্ম্ম করিতেন। দ্বিপ্রহরে পল্লীর বালিকাবৃন্দও আসিয়া পাঠাভ্যাস করিত। তরুচ্ছায়ায় বসিয়া বিদ্যাচর্চ্চা চলিত। গৌরীমা নিজেই সকলকে সস্নেহে শিক্ষাদান করিতেন, অবকাশ সময়ে তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক করিতেন। তিনিই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া আশ্রমবাসিনী-দিগের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেন, আবার হয়তো কোন দুঃস্থা নারীর গৃহে গিয়া সেই ভিক্ষার কিয়দংশ দান করিয়াও আসিতেন।

আশ্রম বারাকপুরে অবস্থিত হইলেও আশ্রমসম্পর্কে কোনপ্রকার সমস্যা উদিত হইলে অথবা পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হইলে, গৌরীমা মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতেন। মধ্যে মধ্যে আশ্রমকন্যাদের লইয়াও আসিতেন।

একদিন নৌকাযোগে কয়েকজন আশ্রমবাসিনীকে লইয়া গৌরীমা মায়ের দর্শনে কলিকাতায় আসিলেন, মা তখন বলরাম বসুর বাটীতে। তাঁহারা যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখনই সবেমাত্র মায়ের প্রসাদ-গ্রহণ সমাপ্ত হইয়াছে। কন্যাদিগকে গৌরীমা বলিলেন,—ওরে, আজ তোদের সৌভাগ্য, মা ব্রহ্মময়ীর ভোগ শেষ হয়েছে, তোরা শীগ্যির ক'রে এঁটো পরিষ্কার ক'রে জায়গা ধুয়েমুছে দে। আর যদি এক-আধ কণা প্রসাদ মাটিতে প'ড়ে থাকে, ভক্তি ক'রে মুখে দে। কন্যাগণ সানন্দে তাহাই করিতে লাগিলেন।

মাতাঠাকুরাণী কন্যাদিগের সুবুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—ঝাঁট দাও, তা' বেশ। ঠাকুর বলতেন, 'পথঘাট দেবালয় ঝাঁট দেওয়া ভাল। কত

---

* জয় সারদা-বল্লভ, দেহি পদপল্লব, দীনজন-বান্ধব দীন জনে।
অশরণ-শরণ, লক্ষ্যহীন-[illegible], কে আছে ভুবনে তোমা বিনে॥ * *

সাধুভক্তের পায়ের ধূলো প'ড়ে থাকে, ত'ার স্পর্শে নিজের মনের ধূলোমলা ঘুচে যায়।' কিন্তু মেয়েরা, তোমরা এখানে পেসাদ পেয়ে তবে যাবে। বলরাম বসুর পত্নী সকলের প্রসাদের ব্যবস্থা করিলেন।

ঐদিন গৌরীমা যাঁহাদিগকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মায়ের মতামত জানিতে চাহিলেন। দুইজন সধবাকে লক্ষ্য করিয়া মা বলেন,—এরাও বেশ, সতী সাধ্বী। বিমলানাম্নী জনৈকা বালবিধবার সম্বন্ধে বলেন,—এর-যে যোগিনীলক্ষণ রয়েছে গো! এ সন্নিসী হবে।

মায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার অভিমতে গৌরীমা এই কন্যাকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

গৌরীমার এক পাঞ্জাবী শিষ্যের দুই কন্যা আশ্রমে থাকিতেন। এক-দিন মায়ের দর্শনে আসিলে, তিনি কন্যাদ্বয়কে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, —ও গৌরমণি, এদের কোত্থেকে পেলে তুমি? এ-যে জয়া-বিজয়া! ক'জন্ম এদের সংসার হয়নি, এমনি ক্ষেত্র!

মায়ের উক্তি এই পাঞ্জাবী কন্যাদ্বয়ের জীবনেও সার্থক হইয়াছিল। তাঁহারাও সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

আশ্রম বারাকপুরে থাকাকালে এবং পরবর্ত্তী কালেও মাতাঠাকুরাণীর নিকট আশ্রম-ছাত্রীদিগের মধ্যে কেহ কেহ দীক্ষা লাভ করিয়াছেন।

আশ্রমপ্রতিষ্ঠার পর গৌরীমা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এমন কয়েকজন বালিকা গঠন করিতে হইবে, যাহারা নারীর কল্যাণে এবং আশ্রমের সেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করিবে। কুমারীপূজার জন্য এবং আশ্রমে অন্তেবাসিনীরূপে তিনি যাহাদিগকে গ্রহণ করিতেন, তাহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ বালিকা ত্যাগের পথে থাকিয়া ভবিষ্যতে আশ্রমসেবার ব্রত গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারিবে, তাহা তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। এইরূপ যে তিন-চারিটি বালিকাকে তিনি উত্তম আধারের বলিয়া মনে করিতেন, তন্মধ্যে একটিকে মাতাঠাকুরাণীর উপদেশ অনুসারে বিশেষভাবে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। গৌরীমার কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে পারিবে বলিয়া মা এই কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দও এই কন্যাকে স্নেহ করিতেন। তিনি তাঁহার সম্বন্ধেই গৌরীমাকে বলিয়াছিলেন,—গৌরমা, এ মেয়েকে কেবল সংস্কৃত শেখালে চলবে না। এ মেয়েকে ইংরিজি লেখাপড়াও শেখাও, দেশের কাজ করবে।

গৌরীমা বলিতেন, ইংরিজি চিত্তকে বহির্মুখী করে; সংস্কৃত দেবভাষা, চিত্তকে শান্ত করে, অন্তর্মুখী করে। ত্যাগী ব্রহ্মচারী হ'য়ে যা'রা থাকবে, শাস্ত্র আলোচনা করবে, তা'দের সংস্কৃতে জ্ঞান থাকা চাই। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি এই কন্যার ইংরাজি-শিক্ষায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার শিক্ষায় সমন্বয় ঘটাইলেন স্বয়ং মা। একদিন কথা-প্রসঙ্গে তিনি গৌরীমাকে বলেন,—আমার মেয়ে কিন্তু ইংরিজি পড়বে।

মায়ের কথার উপর আর কোন কথা নাই। গৌরীমা স্বমতের পক্ষে বা ইংরাজি-শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি বাক্যও উচ্চারণ করিলেন না, নতমস্তকে মায়ের নির্দ্দেশ গ্রাহ্য করিয়া বলিলেন,—তোমার যা' ইচ্ছে, তাই হবে মা।

কি আশ্রম পরিচালনায়, কি ধর্ম্ম বিষয়ে, কি অন্যবিধ ব্যাপারে মাতাঠাকুরাণীর অভিমতকে গৌরীমা বেদবাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তিনি মায়ের অভিমতকে কেবল মান্যই করিতেন না, দ্বিধাহীন ও প্রসন্নচিত্তে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতেন; তাহাতেই শুভ হইবে বলিয়া তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন।

বারাকপুরের গঙ্গাতীর আশ্রমের পক্ষে উপযুক্ত স্থান; কিন্তু শক্তি-ময়ী গৌরীমার পক্ষে কলিকাতা মহানগরীর মত বিশাল ক্ষেত্রই অধিকতর উপযোগী, অনেকে এইরূপ অনুভব করিতেছিলেন। "এই টাউনে ব'সে কাজ করতে হবে,"—ঠাকুরের এই নির্দ্দেশও তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিত। বস্তুতঃ মনের গোপন কথা ইহাই যে, মাতৃভবনের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিয়া থাকিবার নিমিত্ত তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইত। আশ্রমের কার্য্যোপলক্ষে মায়ের সঙ্গে প্রায়শঃ দেখাসাক্ষাতের প্রয়োজনও তিনি অনুভব করিতেন।

গৌরীমা
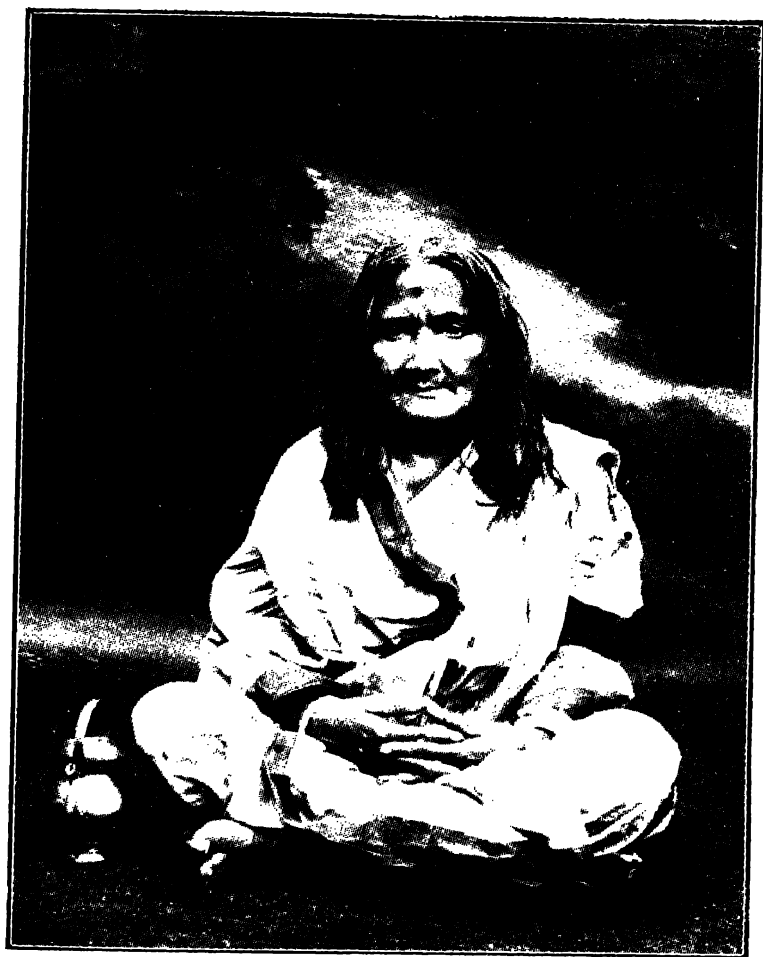
অবশেষে ১৩১৮ সালের প্রথমভাগে বারাকপুর হইতে আশ্রম উত্তর-কলিকাতায় গোয়াবাগানে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। আশ্রমে পূর্ব্ব হইতেই ঠাকুর এবং মাতাঠাকুরাণীর পট ও পদচিহ্ন পূজা করা হইত। গোয়াবাগান আশ্রমে মা যেদিন প্রথম পদার্পণ করেন, সেদিনই তিনি নিজের একখানি প্রতিকৃতি আশ্রমে স্বহস্তে প্রতিষ্ঠা এবং পূজা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি আশ্রমমন্দিরে সেই পটখানির নিয়মিত পূজার্চ্চনা হইতেছে।

আশ্রম কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার পর হইতে গৌরীমা প্রায় প্রতিদিন দামোদরজীর প্রসাদ লইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট যাইতেন। মায়ের রুচি-অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া তিনি লইয়া যাইতেন। মাতাঠাকুরাণীও গৌরীমার সযত্নে প্রস্তুত প্রসাদ পাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন। আশ্রমকুমারীগণও মধ্যে মধ্যে প্রসাদ বহন করিয়া লইয়া যাইত এবং সেই সুযোগে মাতার দর্শন পাইত।

আশ্রমকুমারীগণ মাতৃদর্শনে যাইলে কোন কোন দিন মা তাহাদের মুখে স্তব ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন, তাহাদের কুশলপ্রশ্নাদি এবং পড়াশুনার কথাও জিজ্ঞাসা করিতেন।

মাতাঠাকুরাণী কৃপা করিয়া অনেকবার আশ্রমে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি যেদিন আশ্রমে শুভাগমন করিতেন, সেদিন আশ্রম নবশ্রী ধারণ করিত, আলিপনাদি দ্বারা গৃহ সজ্জিত করা হইত। আনন্দদায়িনীর আগমনে আশ্রমবাসিনীদের হৃদয়ও অপার্থিব আনন্দে পরিপ্লুত হইত, স্তব-সঙ্গীতাদি এবং আরতি দ্বারা আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে তাহারা অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিত। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং অন্তরঙ্গগণও কেহ কেহ মায়ের সঙ্গে আসিতেন। গৌরীমা স্বয়ং সকলকে প্রসাদ পরিবেশন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন।

আশ্রমবাসিনীদিগের বিস্ময় ও আনন্দের সীমা থাকিত না, যেদিন মা কোনস্থানে যাতায়াতের পথে অকস্মাৎ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। গৌরীমার অনুপস্থিতিতেও তাঁহার এইরূপ শুভাগমন ঘটিয়াছে। কন্যাগণ

নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে মায়ের বন্দনা করিত। তাহাদের স্বতঃস্ফূর্ত্ত শ্রদ্ধাভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া মা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন,যাহাতে ধর্ম্মপথে তাহাদের জীবন সার্থক হয়।

আশ্রম যখন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ছিল, তখন কোন কোন সময় মা আশ্রমে আসিয়া দুই-তিন দিবস বাসও করিয়াছেন। যে-কয়েকদিন মা আশ্রমে থাকিতেন, যেন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ধারা বহিত। অল্প-বয়স্কা কন্যাদের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া মা তাহাদের মাথায় তেল মাখাইয়া, চুল আঁচড়াইয়া দিতেন, কত আদরযত্ন করিতেন। কন্যারাও মা, মা, করিয়া কয়েকদিন মায়ের স্নেহে মগ্ন হইয়া থাকিত।

এইসময় গৌরীমা রন্ধন করিতেন, ভোগ তুলিয়া দিতেন; পূজা-কার্য্য এবং ভোগ নিবেদন করিতেন মা স্বয়ং। গৌরীমা নিকটে বসিয়া মাকে ভোজন করাইতেন; আশ্রমকন্যাগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বসিত, কেহ বাতাস করিত, কেহ স্তবকীর্ত্তন করিত।

আশ্রমের অন্তেবাসিনীদিগকে মা নানাবিষয়ে উপদেশ দিতেন। পাঠাভ্যাসে উত্তম ছাত্রীদিগকে তিনি উৎসাহ দিতেন, প্রশংসা করিতেন। সময় সময় কোন কোন কন্যাকে পারিতোষিকও দিয়াছেন। শিক্ষার প্রসঙ্গে মা বলিতেন,—মেয়েরা পড়াশুনো করবে, বিদ্যালাভ করবে; কিন্তু মেয়েমানুষের ছুঁচের মত বুদ্ধি ভাল নয়। তা'রা ঠকে সেও ভাল, জিতে দরকার নেই। তা'রা সরল হবে, পবিত্র থাকবে।

আশ্রমের ব্রতধারিণী কন্যাদিগের সাধনভজন প্রসঙ্গে বলিতেন,—তোমরা মালাও জপবে। এতে সহজে চিত্তস্থির হয়।

আশ্রমে মায়ের উপস্থিতির সংবাদ পাইয়া নানাস্থান হইতে পরিচিত অপরিচিত মহিলাগণও আসিয়া সমবেত হইতেন। অসীমের মা, কৃষ্ণভাবিনী, নগেন্দ্রবালা-প্রমুখ মায়েরা আসিতেন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা হইত। পুরুষভক্তগণও মাকে দর্শন করিতে আসিতেন।

কলিকাতায় আসিবার প্রায় তিন বৎসরের মধ্যেই গোয়াবাগান হইতে আশ্রম মাতৃভবনের সন্নিকটে শ্যামবাজার অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়

ইহাতে আশ্রমকন্যাদিগকে মায়ের নিকট লইয়া যাওয়া অধিকতর সুবিধাজনক হইল।

একদিন একটি আশ্রমবাসিনী বালিকাকে মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন,—এই মেয়েটি নিষ্কাম। নিজেও পীড়া পাবে না, অপরকেও পীড়া দেবে না। মায়ের ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয় নাই। প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ এই কন্যা আশ্রমে রহিয়াছেন, স্বভাব এখনও সরল বালিকার ন্যায়।

মাতাঠাকুরাণী যে-সকল কুমারীকে স্নেহাশিসদানে কৃতার্থ করিয়াছেন, ত্যাগ ও সেবার পথ বরণ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ মায়ের আশীর্ব্বাদে পরহিতে আত্মোৎসর্গ করিয়া এবং কেহ কেহ সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করিয়া অদ্যাবধি আশ্রমের সেবায় নিরত রহিয়াছেন। মা তাঁহার অনেক শিষ্যশিষ্যাকে তাঁহাদিগের কন্যাদিগকে এই আশ্রমে রাখিয়া সৎশিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহ দিয়াছেন।* তাঁহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ সন্ন্যাসিনী হইয়া আশ্রমসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

আশ্রম কলিকাতায় আসিবার পর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের যাতায়াতের জন্য একখানি ঘোড়ার গাড়ী রাখা হইয়াছিল। মাতাঠাকুরাণীকে এই গাড়ীতে করিয়া গৌরীমা মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানে এবং বিভিন্ন স্থানে বেড়াইতে লইয়া যাইতেন। গৌরীমা ঘোড়াটির নাম রাখিয়াছিলেন 'সারদেশ্বরীদাস'। ঘোড়াটি ছিল দুরন্ত, একদিন গাড়ী উল্টাইয়া ফেলিবার উপক্রম করে। তাহা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী ঐ ঘোড়াটিকে বিদায় করিয়া একটি ভাল ঘোড়া ক্রয়ের পরামর্শ দিলেন। গৌরীমা অবিলম্বে ইহাকে বিদায় দিলেন। আশ্রমের তখন অর্থাভাব, ঘোড়াটাকে বিক্রয়

মাতাঠাকুরাণীর পত্র— পোঃ বাগবাজার, ১৯ জানুয়ারী, ১৯১২

তোমার পত্র হস্তগত হইয়াছে এবং ইহা পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইলাম। * * তোমার কন্যাকে শ্রীমতি গৌরদাসীর নিকট রাখিয়াছ, জানিয়া সুখী হইলাম, তাহার মঙ্গল হইবে। অধিক আর কি লিখিব, আমার শুভাশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে জানিবে। ইতি—শ্রীশ্রী৺সন্নিধানে সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষিণি তোমার মা

করিলে বিনিময়ে কিছু অর্থলাভ হইত। কিন্তু 'সারদেশ্বরীদাস'কে গৌরীমা বিক্রয় করিলেন না, 'পিঁজরাপোলে' পাঠাইয়া দিলেন। অনতিবিলম্বে কাঁটাপুকুর সেন-পরিবারের দানে আর একটি ঘোড়া ক্রয় করা হইল। নূতনঘোড়ার গাড়ীটি সর্ব্বপ্রথম মাতাঠাকুরাণীর ব্যবহারের জন্য লইয়া যাওয়া হইল। গাড়ীতে আরোহণকালে মা ঘোড়াটিকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ইহার নাম রাখিলেন 'রামদাস'। এই ঘোড়াটি ছিল শান্ত এবং সে দীর্ঘকাল আশ্রমের সেবা করিয়াছিল।

পূর্ব্বে আশ্রমের এইপ্রকার নিয়ম ছিল যে, পূজা এবং গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে আশ্রমবাসিনীগণ নিজ নিজ গৃহে যাইতে পাইত। গোয়াবাগান আশ্রমে আসিয়া মাতাঠাকুরাণী একদিন আশ্রমের বিধিনিয়মের প্রসঙ্গে বলেন,—এই-যে একবার ক'রে আমড়ার অম্বল চাখ্‌তে বাড়ী যাওয়া, এতে আশ্রমে থাকায় যেটুকু লাভ হয়, তা' উবে যায়, এ ভাল নয়। মেয়েরা একাদিক্রমে তিন বছর বা পাঁচ বছর আশ্রমে থেকে শিক্ষা লাভ করবে, তারপর যা'র বাড়ী যাবার ইচ্ছে সে যাবে। আর যা'রা ব্রহ্মচারী সন্ন্যিসী হ'য়ে থাকবে, তা'রা ঠাকুরের চরণ ধ'রে আশ্রমেই প'ড়ে থাকবে।

মা এইরূপ বিধান দিবার পর হইতে আশ্রমে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল যে, অন্তেবাসিনীদিগকে একাদিক্রমে অন্ততঃ তিন বৎসর আশ্রমবাস করিতে হইবে এবং ইতোমধ্যে আর নিজগৃহে যাওয়া চলিবে না।

আশ্রমের তখন আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না, প্রয়োজন কোনপ্রকারে মিটিয়া যাইত। অনেকদিন এমন গিয়াছে যে, গৌরীমার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য লইয়া ফিরিতে অপরাহ্ণ হইয়াছে; তাহার পর রন্ধন এবং ভোগ নিবেদিত হইয়া কন্যাগণের প্রসাদ পাইতে অত্যন্ত বিলম্ব ঘটিয়াছে। এমন সময়ে একদিন মাতাঠাকুরাণী গৌরীমাকে বলেন,—তুমি ঠাকুরের কাছে টাকার কথা বল-না কেন? তুমি চাইলেই তিনি সব অভাব দূর ক'রে দেবেন।

গৌরীমা নীরব রহিলেন।

মা পুনরায় ঐ কথা বলিলে গৌরীমা উত্তর করিলেন,—আমি-যে ঠাকুরের পায়ে লিখে দিয়েছি মা, টাকাপয়সা কিছু চাইবো না।

—না চাইলে চলবে কেন গো? ঠাকুর যখন তোমায় জ্যান্ত জগদম্বার সেবায় নাবিয়েছেন, তুমি চাইলেই তিনি দেবেন।

—কিন্তু মা, আমি-যে তাঁর পায়ে লিখে দিয়েছি, শুদ্ধাভক্তি ছাড়া আর কিছুই আমি চাইবো না। তোমাদের ইচ্ছে হ'লে তোমরাই আশ্রমকে দেবে, আমি চাইবো কেন?

ঈষৎ হাসিয়া মা জনৈকা আশ্রমবাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—গৌরদাসী যখন চাইবে না, আমিই তোমাদের ভোজ্য পাঠাবো, সকলকে ভাগ ক'রে দিও। কাল খাবে, পরশু খাবে ব'লে ভবিষ্যতের জন্যে সঞ্চয় ক'রে রেখো না।

আশ্রমের অর্থাভাবের সময় জনৈক সন্তান গৌরীমাকে বলিয়াছিলেন,—কাদা চট্‌কাতে চট্‌কাতে দেহটা যে ক্ষয় ক'রে ফেললেন মা, আপনার ঠাকুর এখন কোথায়? তাঁর জল-ঢালা কি ফুরিয়ে গেছে?

গৌরীমা ক্ষুব্ধ হইয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—তোদের মন ভারী অবিশ্বাসী! আশ্রম যে চলছে এসব কি তোরা ক'রে দিলি? না, আমি করলুম? সবই ঠাকুর-মাঠাকরুণ করাচ্ছেন।

গৌরীমার বিশ্বাস ছিল অটল, অভাব-অভিযোগ দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁহার মনে কদাচ নৈরাশ্যের অবসাদ আসিতে পারে নাই। ঠাকুর তাঁহাকে জ্যান্ত জগদম্বার সেবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন, মা-সারদা দিতেছেন প্রেরণা, তাঁহারাই দিবেন কার্য্যে শক্তি এবং সিদ্ধি। গৌরীমা ভবিষ্যতের চিন্তা করিতেন না, জানিতেন, তাঁহার ঠাকুর জল ঢালিবেনই।

ঠাকুরের কৃপা এবং লক্ষ্মীস্বরূপিণী মা-সারদার আশীর্ব্বাদে আশ্রমের অন্নবস্ত্রের সংস্থান যে-ভাবেই হউক হইয়া গিয়াছে এবং আজও হইতেছে। সহৃদয় দেশবাসী নরনারীর হাত দিয়া তাঁহারাই করুণা করিয়া আশ্রমের অভাব ও প্রয়োজন মিটাইয়া দিতেছেন।

"শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে অবস্থানকালে আশ্রমের হিতৈষিগণ আশ্রমের স্থায়ী ভবনের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করিবার সংকল্প করেন। উদ্দেশ্য—তাহার উপর যে-কোন উপায়ে অতি সাধারণ রকমের একটি বাড়ী তুলিতে পারিলে বাড়ীভাড়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। ইহা ভাবিয়া মাতাজীও জমি-ক্রয়ে সম্মত হইলেন। * *

"শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীও আশ্রমের জন্য একখানি বাড়ী অথবা কিছু জমি ক্রয় করিবার জন্য গৌরীমাকে উৎসাহ দিতেন। প্রত্যুত্তরে গৌরীমা বলিতেন, 'মা ব্রহ্মময়ী যখন আশ্রমের জন্যে ভাবছেন, তখন আর ভাবনা কি ?"

জমির জন্য গৌরীমা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থের সংস্থান না থাকিলেও একমাত্র ঠাকুরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। টালা, উল্টাডাঙ্গা, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মাণিকতলা প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে জমির সংবাদ আসিতে লাগিল এবং দেখাও হইল। দানবীর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মাণিকতলা অঞ্চলে এগার কাঠা জমি আশ্রমকে দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু কোনটাই গৌরীমার মনোমত হইল না।

"তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা ছিল, মাতাঠাকুরাণীর বাসভবন এবং গঙ্গার সমীপবর্ত্তী কোন স্থানে আশ্রমের জমি ক্রয় করা হয়। কিন্তু সেরূপ কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে একদিন পণ্ডিত দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ মহাশয় আসিয়া শ্যামবাজারে একটি জমির সন্ধান দিলেন এবং নিজেই একদিন আগ্রহ করিয়া গৌরীমাকে তাহা দেখাইয়া আনিলেন। জমি দেখিয়া তাঁহার মন প্রসন্ন হইল এবং শ্রীশ্রীমাও এই জমিই ক্রয় করিতে বলিলেন।

"জমি ক্রীত হইলে গৌরীমা তাহা দেখাইতে মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া আসিলেন। তিনি জমিতে পদার্পণ করিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'খাসা জমি, বেশ বাড়ী হবে। মেয়েরা সুখে থাকবে।' তাঁহার এইরূপ আশীর্ব্বাদে গৌরীমার মনে উৎসাহ বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল।" (৬)

সেইদিবস মাতাঠাকুরাণী পঞ্চরত্ন ও পঞ্চশস্যসহ একটি রৌপ্যাধার স্বহস্তে ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া আপনিই আপনার পূজামন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। গৌরীমা তাঁহাকে সেইস্থানেই মিষ্টিমুখ করাইয়া বলিলেন,—এই তো আশ্রমের বাস্তুপূজা আর দেবীর অধিবাস হ'য়ে গেল।

•

আশ্রমের উত্তরোত্তর কর্ম্মপ্রসার এবং গৌরীমার উচ্চশক্তির কথা বলিয়া মাতাঠাকুরাণী আনন্দ অনুভব করিতেন। বলিতেন, "যে বড় হয় সে একটিই হয়, তার সঙ্গে অন্যের তুলনা হয় না। যেমন গৌরদাসী।" আরও বলিতেন, "গৌরদাসী কি মেয়ে? ও ত পুরুষ। ওর মত কটা পুরুষ আছে? এই স্কুল, গাড়ী, ঘোড়া সব করে ফেললে। ঠাকুর বলতেন, 'মেয়ে যদি সন্ন্যাসী হয়, সে কখনও মেয়ে নয়'—সেই ত পুরুষ। গৌরদাসীকে বলতেন, 'আমি জল ঢালছি, তুই কাদা মাখ।" (৪)

মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে যাঁহারা যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন নরনারীকে তিনি গৌরীমার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহারা গৌরীমার নিকট সাধনভজনের উপদেশ লাভ করিতেন। কেহ কেহ তাঁহার আশ্রমের সেবাও করিয়াছেন। মা বলিয়াছেন, "গৌরদাসীর আশ্রমের সল্‌তেটি পর্য্যন্ত যে উস্‌কে দেবে, তা'র কেনা বৈকুণ্ঠ।"

একদা সৌম্যদর্শনা এক মহিলা গোয়াবাগান আশ্রমে আগমন করেন। বেশভূষায় কোনই আড়ম্বর নাই, পরিধানে সাধারণ একখানি সাড়ী, হাতে দুইগাছি শাখা, সীমন্তে সিন্দূররেখা। তিনি আসিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীমা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমার এক মেয়ে আছে, নাম গৌরীপুরী। গোয়াবাগানে তার আশ্রম, তুমি সেখানে যেও, মা। তার সঙ্গে কথা ক'য়ে প্রাণে শান্তি পাবে।"

ইনি আসাম-গৌরীপুরের ভক্তিমতী রাণী সরোজবালা দেবী। তাঁহার প্রদত্ত অর্থকে সম্বল করিয়াই কলিকাতায় আশ্রমভবনের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। সুতরাং দেখা যায়, এই শুভ আরম্ভের মূলেও ছিল সিদ্ধিদায়িনী মাতাঠাকুরাণীরই শুভ প্রেরণা।

লীলাময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের করুণাধারা সেচনে সমাজের কঙ্করময় ক্ষেত্রে মাতৃপূজার যে পুণ্যপীঠ গৌরীমা রচনা করেন, তাহাতে তিনি মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরীকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবীই সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল নিত্য অন্নপূর্ণা-রূপে অন্ন বিতরণ করিতেছেন, সারদারূপে জ্ঞান দান করিতেছেন, আর জগদ্ধাত্রীরূপে সর্ব্ববিঘ্ন হইতে আশ্রমকে সতত রক্ষা করিতেছেন।

পরমকল্যাণময়ী মাতার স্নেহাশিসে উদ্বুদ্ধ হইয়া আশ্রমকন্যাগণ যুগ যুগ ধরিয়া যেন পরহিতব্রতধারিণী তপস্বিনী গৌরীমাতার মহান ব্রত সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন করিতে পারে, এবং শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণের মহিমা প্রচার ও "জ্যান্ত জগদম্বাদের সেবা" করিয়া তাহাদের জীবন যেন সার্থক হয়,—ইহাই তাঁহাদের শ্রীচরণে অন্তরের একান্ত প্রার্থনা।
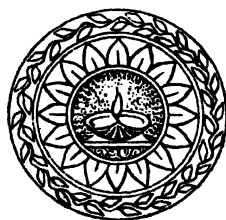
পথের নির্দ্দেশ

নারীর সুশিক্ষা ব্যতীত কখনও কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে না, নারীই জাতির জননী। শিশুরূপে ভবিষ্যৎ জাতি এই জননীর ক্রোড়েই জন্মগ্রহণ করে, জননীর স্নেহধারায় পুষ্ট হয়, জননীর শিক্ষার উপরেই তাহার চরিত্রের বিকাশ নির্ভর করে। বস্তুতঃ, মাতৃজাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ দ্বারাই জাতির সভ্যতা এবং শিক্ষাদীক্ষার মান নিরূপিত হইতে পারে। স্নেহ, সেবা, আত্মসংযম, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি মধুর গুণাবলীর মিলনক্ষেত্র বলিয়াই নারী 'দেবী' আখ্যা পাইয়াছেন।

আর, নারীর মুকুটমণি আমাদের মাতা শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী। তাঁহাকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিলে, তাঁহার নির্দ্দেশ যথাযথ পালন করিলে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ ও শান্তিময় হইবে। তিনি সকলকে, বিশেষ করিয়া নারীজাতিকে জীবনপথে চলিবার কি নির্দ্দেশ দিয়াছেন, সমাজের বিভিন্ন নরনারীর বিবিধ সমস্যার কিভাবে সমাধান করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেও প্রসঙ্গক্রমে কিছু উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান অধ্যায়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

নারীর সম্পর্কে মাতাঠাকুরাণী বলিতেন,—পিতৃগৃহ, পতিগৃহ বা যেখানেই থাক-না কেন, সেবাই মেয়েমানুষের প্রধান কাজ। কন্যারূপে, পত্নীরূপে, মাতৃরূপে, সকলরূপে সেবা করাই নারীর ধর্ম্ম। ঠাকুর বলতেন,—মায়েরা একখানা কাপড়ের খুঁট গায়ে দিয়ে শীতগ্রীষ্ম সবই কাটিয়ে দেয়, ভাল কাপড়চোপড় বিছানা ছেলেদের দিয়ে দেয়। এক মুঠো মুড়ি খেয়ে নিজেরা রাত কাটিয়ে দেয়, মণ্ডামেঠাই যা' থাকে ভাই ও ছেলেকে খাইয়ে তৃপ্তি পায়। কি ত্যাগ! আত্মভোগের এতটুকু ইচ্ছে নেই!

—আমি ছোটবেলায় একটু-কিছু খাবার পেলে, মুড়কী হোক, কদমা হোক, ভাইদের মুখে দিতুম। পাড়াপড়শী ছেলেমেয়েদেরও দিয়েছি। অন্যদের খাইয়ে বড় সুখ। মেয়েদের ভেতর এই ভাবটা থাকা ভাল।

—মেয়েরা খাই খাই করলে মা-লক্ষ্মী সেখানে অন্নবস্ত্র দেন না। এজন্যে দ্রৌপদী সবার শেষে খেতেন। বাড়ীর যিনি কর্ত্রী, তিনি নিজের আহারাদি বিষয়ে নিস্পৃহ থাকবেন। সবার খাওয়া হ'য়ে গেলেও তাঁর ভাগটা দিয়েই অতিথ-অভ্যাগতের সেবা হবে।

—অনেক মেয়ে স্বামীকে বলে,—আমার নামে অত টাকা ক'রে দাও, অত বিষয়সম্পত্তি লেখাপড়া ক'রে দাও; তা'তে কি শান্তি আছে? বরং ভালবাসা ক'মে যায়। বাপভাই আত্মীয় এদের যে ভালবাসা, তা'র কাছে টাকা অতি তুচ্ছ জিনিষ। বাপ আর স্বামীই যদি ম'রে গেল, তাদের টাকা নিয়ে কি বেশী সুখ বাড়বে, বল দেখি?

গোলাপমা বলেন,—ও-কথা বলো না মা-ঠাকরুণ, গান্ধারীর শত-পুত্র ম'রে গেল, তবু তা'কে খেতে হয়েছিলো।

—না, গোলাপ, নিজের পাওনাগণ্ডা নিয়ে যে মাথা ঘামায় না, ঠাকুরই তা'র ব্যবস্থা ক'রে দেন।

মা আরও বলিতেন,—পুরুষদের চাইতে মেয়েদের সহ্যগুণ, দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে থাকার বুদ্ধি বেশী থাকা দরকার। মেয়েমানুষ লক্ষ্মী, সবাইকে ধ'রে থাকবে। কেবল নিজের ছেলেমেয়েটিকে নিয়েই নয়, দশ-পাঁচজন আত্মীয়কুটুম্বকে নিয়েও প্রীতির সঙ্গে থাকবে, যত্ন-আত্তি করবে। নিজের পেটের ছেলেটিই আপন, আর ভাইপো-ভাগনেরা পর, তা'দের অভাবের সময় দেখবে না, এ ভাব মেয়েমানুষের ভাল নয়। কমবেশী ভালমন্দ যা' জোটে ভাগাভাগি ক'রে সবার সঙ্গে খাবে পরবে; এতে মা-লক্ষ্মী প্রসন্ন হ'ন। এমন-কি সতীনটিও যদি এসে জোটে, তা'কেও বোন ব'লেই তুলে নিতে হবে, হিংসে করবে না, স্বামীর সংসারে অশান্তি বাড়াবে না।

মায়ের এক আশ্রিত সন্তানের দুই পত্নী; দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভধারিণী একদিন মাকে অনুরোধ করিলেন, মা যেন তাঁহার শিষ্যকে আদেশ করেন, যাহাতে প্রথমা পত্নীর সহিত তিনি কোন সম্পর্ক না রাখেন।

সবিস্ময়ে মা বলিলেন,—সে কি গো! বড় সতী মেয়ে সে। অমন সতীলক্ষ্মী মেয়ে, তা'কে ত্যাগ করতে বলবো কি ক'রে?

সন্তানটি নিজের গর্ভধারিণীর অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে পড়িয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রথমা পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্য তিনি বিস্মৃত হ'ন নাই, তাঁহার প্রতিও তিনি প্রসন্ন ছিলেন।

শাশুড়ী পুনরায় একদিন আসিয়া মাকে বলেন,—মা, আপনি কিছু না ব'লে দিলে ভবিষ্যতে আমার মেয়ের কি উপায় হবে? সতীন এসে যদি চেপে বসে, আমার মেয়ে-যে ভেসে যাবে।

মা বলিলেন,—কেন? তোমার মেয়ে তো দিব্যি সুখেই আছে। আর, ভেসে যাবার কথা বলছো, জীবনমৃত্যু ভাগ্যের কথা কে বলতে পারে? বড় বৌমা তো আমার কাছে এসে কোনদিন দুঃখের কথা কিছু বলে না, কোন নালিশ করে না। প্রণাম করে, চ'লে যায়। তা'কেও তো আমার ছেলে একদিন ধর্ম্ম সাক্ষী রেখে বিয়ে করেছিলো। বলতে যদি বল মা, আমি এই বলতে পারি,—দু'জনকেই সে অন্নবস্ত্র দেবে, দু'জনকেই আদরযত্ন করবে। দু'জনেরই ভরণপোষণ আর সতীত্ব রক্ষার জন্যে দায়ী স্বামী। বিয়ে যখন দুটো হয়েছে, স্বামীর অশান্তি না বাড়িয়ে দুই বোনে মিলেমিশে থাকুক।

আর এক ক্ষেত্রে মাতাঠাকুরাণী দুই সপত্নীর বিরোধের মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন।—

বিপিনবিহারী শিয়ালদহে রেলের কর্ম্মচারী। প্রথম পক্ষের পত্নীর কোন সন্তানাদি না হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। ফলে, যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে, সপত্নীদ্বয়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাবে পরিবারে অশান্তির অবধি ছিল না। দুই পত্নীর স্বার্থের সংঘর্ষে নিরীহ পতি সময় সময় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেন, মনে মনে প্রার্থনা জানাইতেন,—জগদম্বা, তুমি এর একটা বিহিত কর। আর-যে পারা যায় না!

জনৈকা ভক্তিমতীর নিকট মাতাঠাকুরাণীর সন্ধান পাইয়া একদিন

বিপিনবিহারী শান্তিলাভের আশায় মায়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। মায়ের চরণে প্রণত হইলে, এবং কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, মা দক্ষিণপদের অঙ্গুলিদ্বারা তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্রস্থান চাপিয়া দিয়া বলিলেন,—ঠাকুর তোমায় দয়া করবেন। অতঃপর তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া মা সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—বাবা, যদি তোমার বৌ-রা দেখে যে, তুমি ধর্ম্মে মন দিয়েছ, উদাসী হ'য়ে যাচ্ছ, তবেই দুই সতীনের ঝগড়া ক'মে যাবে।

মাতার এই উপদেশ বিপিনের যুক্তিযুক্ত মনে হইল, তিনি যেন অন্ধকারের মধ্যে আলোক দেখিতে পাইলেন। ইহার পরে প্রায়ই তিনি মায়ের নিকট যাতায়াত করিতেন এবং জপধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। মনও ক্রমশঃ শান্ত হইয়া আসিল। স্বামীর এই ধর্ম্মানুরাগ-দর্শনে পত্নীদ্বয় চিন্তিত হইলেন,—হয়তো-বা স্বামী সাধু হইয়া যাইবেন!

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিমতী একদিন তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে সপত্নীদ্বয় উদ্বিগ্নচিত্তে জানাইলেন,—কি হবে মা, ওঁর তো সংসারে আর মতি নেই। ভক্তিমতী পরামর্শ দিলেন,—যে-মায়ের কাছে বিপিন গিয়ে পড়েছে, তাঁর কাছে তোরাও যা, একটা উপায় মিলে যাবে।

স্বামীর সংসারবৈরাগ্যে উভয় সপত্নীর মন বিচলিত, তাঁহারা মিলিত হইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া একদিন উপস্থিত হইলেন। মা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিলেন, যেন কতকালের পরিচিত, কত আপনার লোক। মায়ের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারা অকপটে সকল বক্তব্য নিবেদন করিলেন, তাহা শুনিয়া মা গম্ভীরভাবে বলিলেন,—মা, খুব বুঝেসুঝে চলতে হয় সংসারে। বিপিনই যদি স'রে পড়ে, তবে তোমাদের ঝগড়াই-বা কি, আর কি-ই-বা কি? সে-ই তোমাদের অবলম্বন। তা'র মনের সন্তোষ তোমাদেরই হাতে।

ইহার পর তাঁহাদের চরিত্রে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই স্বামীর সুখশান্তির প্রতি অবহিত হইলেন, উভয়েই সম্প্রীতির সহিত সংসারব্রত পালন করিতে লাগিলেন। সকলেই মায়ের অনুগত হইলেন, সকলের অশান্তিও দূর হইল।

এক পত্নী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ মাতাঠাকুরাণী সমর্থন করিতেন না, এমন-কি বিপত্নীকেরও দ্বিতীয়বার বিবাহ তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সমর্থন করেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার সহোদরের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে মা আপত্তিই জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "একনারী সদাব্রতী, একাহারী সদাযতি।"

এক ধনী পরিবারের তরুণী বধূর কথা।

সুশীলা এবং পরমা সুন্দরী এই বধূ। শ্বশুরবাড়ীর সকলেই তাঁহার প্রতি স্নেহশীল; কিন্তু পতির ছিল সন্দেহবাতিক, পত্নীকে তিনি মধ্যে মধ্যে বড়ই কটু কথা বলিতেন। এইজন্য পতিপত্নীতে সদ্ভাব ছিল না, সংসারেও শান্তি ছিল না। অবশেষে লাঞ্ছনার মাত্রা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিলে একদিন বধূটি অসহিষ্ণু হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন।

পিতৃকুল বিপুল সম্পদের অধিকারী, অন্নবস্ত্রের কোনই অভাব নাই। তাঁহারা স্থির করিলেন, কন্যাকে আর লাঞ্ছনা সহিতে পতিগৃহে পাঠাইবেন না। কন্যাও অনেক মনস্তাপ পাইয়া স্থির করিয়াছেন, পতির নিকট আর ফিরিয়া যাইবেন না। এইভাবে উভয় পরিবারের মধ্যে ঘনাইয়া উঠে মনোমালিন্য এবং বিদ্বেষ। কন্যার পতি এবং শাশুড়ীর মানসিক অবস্থাও তখন এতই উত্তেজিত যে, তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, বধূ যত ধনী পরিবারের কন্যাই হউক না কেন, তাহাকে আর গ্রহণ করিবেন না।

কন্যার শাশুড়ী এবং পিতামহী উভয়েই মাতাঠাকুরাণীর পরিচিত। কন্যা নিজেও ছিলেন মায়ের দীক্ষিতা, মা তাঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার দুঃখে মায়ের প্রাণ বিচলিত হইল, তিনি কন্যাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

কন্যা মাকে দর্শন করিতে আসিলে মা তাঁহাকে আদর করিয়া বলিলেন,—রাজার মেয়ে হ'য়েও গৌরী মহাদেবের সংসার করেন, সিদ্ধি ঘোঁটেন, স্বামীর ঘরে থাকতে তিনি আপত্তি করেন না। বাপ রাজা হ'লেও পতিই সতীর সর্ব্বস্ব। মাগো, তুমি স্বামীর কাছে ফিরে যাও।

সব দুঃখু স'য়ে প'ড়ে থাকো সেখানে। সৎসন্তান আসুক, মহতের বংশরক্ষে হোক, সাধুসেবা হবে। আমি প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি মা, তোমার শেষ ভাল হবে।

কন্যা পূর্ব্বের সংকল্প ত্যাগ করিলেন গুরুর নির্দ্দেশে; পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পুনরায় গিয়া পতিসেবায় আত্মনিয়োগ করাই তিনি স্থির করিলেন। সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, মান-অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া ধনীর কন্যা স্বেচ্ছায় পতিগৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। পতিও তাঁহাকে এইবার সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং পূর্ব্বের আচরণ পরিত্যাগ করিলেন। মায়ের সুপরামর্শে দুই পরিবারে শান্তি ও সম্প্রীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

একবার এক কন্যা আর্ত্ত হইয়া মাতাঠাকুরাণীর নিকট করুণা ভিক্ষা করিতে আসেন। তাঁহার পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র, রুক্ষ কেশ, আর দুই চক্ষে জলধারা। তাঁহাকে শান্ত করিয়া মা তাঁহার দুঃখের কথা জানিতে চাহিলেন। কন্যা নিঃসঙ্কোচে মায়ের নিকটে অন্তরের সঞ্চিত ব্যথা নিবেদন করিয়া বলেন যে, তিনি বিবাহিতা, কিন্তু পতির অবহেলা ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া সধবার সকল চিহ্ন ত্যাগ করিয়াছেন। মাতা সকল কথা শুনিয়া কন্যার ব্যথায় ব্যথিত হইয়াও বলিলেন,—গুরু আর স্বামী, এ তো হিন্দুর মেয়ে হ'য়ে ত্যাগ করা যায় না। এখন উত্তেজনায় বুঝতে পারছ না মা। মনকে ঠাণ্ডা করো, ঠাকুরকে ডাকো। বিবাহিতা মেয়ের শত দুঃখ স'য়েও স্বামিসেবা করাই ধর্ম্ম।

মাতাঠাকুরাণী কন্যাটিকে নূতন সাড়ী, শাঁখা, সিন্দূর ইত্যাদি দিলেন, এবং সধবার বেশ ধারণ করিয়া পতিগৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহার সুবুদ্ধির উদয় হইল, মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পতির গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

জনৈকা মহিলা একদিন অভিযোগ করিয়াছিলেন,—মা, রাধি তোমায় ভালবাসে না। তুমি-যে ওকে এত দিলেথুলে, এত ভালবাসলে কি হলো

তবে? অন্য একজন মন্তব্য করেন, রাধু যদি মাকে ভাল না বাসে, তবে আর কা'কে ভালবাসবে? আলোচনায় স্থির হইল, রাধারাণী তাহার স্বামীর প্রতি অধিক অনুরক্ত।

মাতাঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন,—রাধি তা'র স্বামীকে ভালবাসবে, এই তো আমিও চাই। এঁতে দোষের কি আছে? স্ত্রীর স্বামীই দেবতা, স্বামীই সব। সতী স্ত্রী তো স্বামীকেই বেশী ভালবাসবে।

মায়ের নিকট এক বধূ আসিতেন, নাম তাঁহার সরলা। বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিতা, পতিব্রতা সতী; কিন্তু তাঁহার পতি বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত।

মায়ের নিকট তিনি অভিযোগ জানাইলেন,—মা, স্বামী আমায় শান্তি দিচ্ছেন না, কেবল গয়নাই দিচ্ছেন। অত অত গয়না আমার গায়ে যেন দিনরাত শেলের মত ফুটছে।

মা বলিলেন,—মাগো, হিন্দু স্ত্রী পতিপরায়ণা। মা, পতি, গুরু, এঁদের কোন দোষ জিভ দিয়ে উচ্চারণ করতে নেই। পতিকে ভজনা ক'রে তুমি প'ড়ে থাকো, দেখবে, একদিন রুগ্ন ভগ্ন খঞ্জ হ'য়ে তোমার সেবার কাঙ্গাল হবে। তখন পরিবর্ত্তন দেখা দেবে।

মহিলা কাঁদিতে লাগিলেন,—কখনো ফিরবে মা?

—ফিরবে বৈ-কি মা। জগন্নাথের চাকা সদাই ঘুরছে।

—মা, আপনি অন্তর্য্যামী, আপনি সব বুঝছেন। পতির সন্দেহবিষে আমি জর্জ্জরিত।

—তা' বুঝি; সন্তানদের অনেককেই তো দেখি, নিজেদের ভুলত্রুটি অপরাধের ইয়ত্তা নেই, তবু তা'রা চায়, বউঝিরা তা'দের কাছে নত হ'য়ে থাকুক। এই অন্যায়ের ফলে সামনে যে দিন আসছে, মেয়েরা পৃথিবীর মত আর অত সইবে না। কিন্তু তা'তেও মেয়েদেরই ক্ষতি হবে। ঠাকুর বলতেন, "যে সয়, সে মহাশয়; যে না সয়, সে নাশ হয়।" তুমি স'য়ে প'ড়ে থাকো, বিশ্বনাথ একদিন মুখ তু'লে অবশ্যই চাইবেন।

কিছুকাল পরে মহিলা আবার আসিয়া বলেন,—মা, আমার ভাগ্যে শান্তি নেই। স্বামীর সন্দেহের হাত থেকে আমি কি নিস্তার পাবো না?

আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া মা এইবার বলিলেন,—তুমি এক কাজ কর। তুমি স্পষ্ট ব'লে দাও, তুমি পিত্রালয়ে, নয় তীর্থে গিয়ে বাস করবে। সে নিজে উদ্যোগী হ'য়ে পছন্দমত একটি পাত্রী দেখে বিয়ে করুক।

মায়ের নির্দ্দেশে মহিলা অতঃপর পিতামাতার ব্যবস্থামত শ্রীক্ষেত্রে গিয়া সাধনভজনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে পতির ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তিনি পত্নীর আদরযত্ন পাইবার জন্য অধীর হইলেন। পত্নীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু পতির সংসারে তাঁহার আর আসা হইল না, অচিরে শ্রীক্ষেত্রধামেই তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

সাধ্বী পত্নীর অকালে দেহত্যাগের পর পতি তাঁহার অনেক গুণকীর্ত্তন করিতেন, আত্ম-অপরাধের জন্য অনেক অনুশোচনা করিতেন। ইহা শুনিয়া মা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—'জ্যান্তে দিলে না ভাত-কাপড়, ম'লে করবে দানসাগর!' কতকগুলি গয়নাকাপড় পেলেই কি মেয়েরা সুখী হয়? সময় থাকতে মেয়েটি যদি স্বামীর একটু স্নেহযত্ন পেতো, এভাবে শুকিয়ে যেতো না।

জনৈক দেশপ্রেমিকের পত্নী ম— ছিলেন মাতাঠাকুরাণীর শিষ্যা। মধ্যে মধ্যে আসিয়া তিনি মায়ের নিকট অভিযোগ করিতেন, তাঁহার স্বামী সাধনভজনে মনোযোগী হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা, আদর্শ পত্নীরূপে পতির সেবা করিয়া তিনি জীবন সার্থক করেন।

মা তাঁহাকে বুঝাইতেন, পতির চিত্ত যদি সত্যই ভগবানের অভিমুখী হইয়া থাকে, তবে সাধ্বী পত্নীর কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই পথেই উৎসাহ দান করা এবং সেই পথেই নিজের জীবনকেও চালিত করা। ইহাতে দুইজনেরই কল্যাণ হইবে।

কিন্তু শিষ্যা অন্তরের সহিত ইহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না; পুনরায় একদিন তিনি মাতৃসকাশে আসিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইলেন,—মা, আপনি আমার স্বামীকে পাইয়ে দিন।

উত্তরে মা বলিলেন,—ভগবানের পথে যে যেতে চায়, তা'কে আমি বাধা দেবো কি ক'রে ?

ইহাতেও শিষ্যা নিরস্ত না হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন ; তখন মা বলিলেন,—সে কি গো, কাঁদছো কেনে ? শাক লয়, মাছ লয়, ডাল লয়, ভাত লয় যে, না হ'লে আর প্রাণে বাঁচবে না। স্বামী যদি ত্যাগের পথে যেতে চায়, তুমি তা'র সাধ্বী স্ত্রী হ'য়ে তা' পারবে না কেন মা ? তুমিও সেই পথেই চল।

রাখাল নামে জনৈক যুবক সংকল্প করিয়াছিলেন, ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন করিবেন। মাতাঠাকুরাণীর নিকট তিনি বহুদিন যাতায়াত করেন ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসলাভের আশায়। প্রথম হইতেই মায়ের মনে তাঁহার সম্বন্ধে একটা দ্বিধার ভাব দেখা যায়। মায়ের নিকট তাঁহার দীক্ষা হইল, কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস মা কিছুতেই দেন না। এইভাবে কিছুদিন যায়। সন্তানের ধৈর্য্য আর থাকে না, অবশেষে মা একদিন বলিলেন,—বেলুড়ে যাও, মহারাজদের কাছ থেকে ব্রহ্মচর্য্য সন্ন্যাস নাও গে।

এমন সময় একদিন একটি সুন্দরী বধূ আসিয়া মায়ের নিকট উপস্থিত। স্বামীর বিবরণ জানাইয়া তিনি আকুলভাবে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এরকম কেহ এখানে থাকেন কি ?

সে তোমার কে হয় ? মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন।

তিনি আমার স্বামী। আপনার কাছে তিনি থাকেন, শুনতে পেয়ে বহুকষ্টে খুজতে খুঁজতে এখানে এসেছি, বলেন বধূটি।

মা বলিলেন,—হ্যাঁ মা, রাখাল নামে একটি ছেলে এখানে আসা-যাওয়া করে। বেলুড়ে থাকে, আজ এসেছে আমায় দেখতে। তুমি বসো, আমি তা'কে ডেকে পাঠাচ্ছি।

সংবাদ পাইয়া রাখাল অধোবদনে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—কেন তুমি ফাঁকি দিয়েছ ? তুমি যে বিবাহিত, তা' তো এতদিন বলনি। এমন আগুনের খাপড়া বউ, কে একে আগলাবে

এখন ? একে নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যাও। স্বামীর ভালমন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন স্ত্রীর কর্ত্তব্য, তেমনি স্ত্রীর ধর্ম্মরক্ষাও স্বামীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

মাতাঠাকুরাণীর নির্দ্দেশে রাখালকে সপত্নীক দেশাভিমুখেই যাত্রা করিতে হইল। বধূটি এমন আশা লইয়া আসেন নাই যে, সংঘমাতা এত শীঘ্র তাঁহার অনুকূলেই অভিমত প্রকাশ করিবেন এবং পতিকে ফিরিয়া পাওয়া এত সহজসাধ্য হইবে। সুতরাং মাতাঠাকুরাণীর এইরূপ নির্দ্দেশে বধূর অন্তর কৃতজ্ঞতায় এবং ভক্তিতে গলিয়া গেল।

মা বলিতেন,—মেয়েমানুষের পবিত্র থাকা, একি কম জিনিষ! সতী মেয়েমানুষের সামনে মুনিঋষি দেবতাগন্ধর্ব্ব হাত জোড় ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। মেয়েদের বিদ্যেসাদ্দি বড় কথা নয়, রূপগুণও বড় কথা নয়, মেয়েরা মঙ্গলঘট—পবিত্রতায়।

—জামাসেমিজ সাজসজ্জায় কিছু শুচিতা রক্ষে হয় না। নারী শুদ্ধ থাকে যদি তা'র দেহমন শুদ্ধ থাকে। সারাটি জীবন যদি শুদ্ধ থাকে, তবেই তো তা'কে বলি সতী। 'পুড়বে মেয়ে উড়বে ছাই, তবেই মেয়ের গুণ গাই।'

অন্তরের ঐশ্বর্য্যই নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং আসল রূপ।

বহুদূরদেশ হইতে এক কন্যা আসিয়াছিলেন, নাম—জয়মতী, সম্ভবতঃ দক্ষিণদেশীয়া। জয়মতী দেখিতে স্থূলকায়া এবং কৃষ্ণবর্ণা। যদিও তাঁহার বাহির কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অন্তর ছিল অনুরাগে পূর্ণ। মাতাঠাকুরাণীকে দর্শনমাত্র তিনি তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। ভাবের আতিশয্যে তাঁহার বক্তব্য কিছুই বলা হইল না, কেবল নয়নযুগল হইতে অবিরল অশ্রুপাত হইতে লাগিল। মা করুণায় এতই বিগলিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অশ্রু স্বীয় বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইয়া দিলেন এবং 'জয়মতীর জয় হোক' বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। জয়মতী আসিয়াছিলেন দীক্ষালাভের আশায়, মা সানন্দে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। আশাতীত লাভে জয়মতীর আনন্দের সীমা রহিল না।

মায়ের নিকট সেইসময় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে একজন এই বিদেশিনী নারীর স্থূলতা এবং কৃষ্ণ বর্ণের উল্লেখ করিয়া বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেন। নিম্নকণ্ঠে বলিলেও মায়ের তাহা শ্রুতিগোচর হইয়াছিল।

জয়মতী বিদায় গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোক্ত সন্তানকে মা ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ক্ষুব্ধভাবে বলিলেন,—অত্যন্ত গর্হিত কাজ করেছো তুমি। বাংলাভাষা জানে না ব'লেই ওর সামনে নিন্দে করতে সাহস পেয়েছো। সাধু হ'য়ে যা'রা থাকবে, স্ত্রীলোকের রূপের আলোচনা করা তা'দের মহাপাপ। ঐ মেয়েটির বা'রটাই তুমি কেবল দেখলে, ওর ভেতরটা যে কত সুন্দর, তা' তো দেখতে পেলে না।

গোলাপমাও তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন,—ওর মত মন কি কখনো তোমার হবে? ভক্তিতে কাঁদতে পারবে তুমি?

সংসারজীবনে প্রবেশ করিয়াও এমন দুই-একটি কন্যা মায়ের নিকট আসিতেন—যেন অনাঘ্রাত পুষ্প। মা তাঁহাদিগকে নিজ নিজ আধার অনুযায়ী কল্যাণের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। একদিন মনোরমা নামে এক কিশোরী বহুবাজার হইতে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত মাতাঠাকুরাণীর দর্শনে আসিলেন। মনোরমা নবপরিণীতা, বহুবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিতা।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি মনে ক'রে এসেছো মা?

—লোকে বলে, আপনি ভগবতী, তাই দর্শন করতে এসেছি। অতঃপর মায়ের চরণ ধরিয়া কন্যা বলেন,—আমায় ভক্তি দিন মা।

তাঁহার সহিত কথা বলিয়া মা প্রসন্ন হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—এ মেয়ে শুদ্ধমতি, বড় সরল। এরকম ক্বচিৎ দেখা যায়।

ইহাতে অন্য একজন মন্তব্য করিলেন,—মা, তোমার যা'কে ইচ্ছে হবে, তা'কেই তুমি ঝুড়ি ঝুড়ি দেবে। এই মেয়েটা এত সেজেগুজে এসেছে, আর তুমি বলছো, এরকম মেয়ে হয় না!

—তা' নয় গো, একরকম মেয়ে আছে, মন তা'র সদাই ভোগে

আবদ্ধ; আবার একরকম আছে, শত সেজেগুজে থাকুক, সে যেন আলগা সাজ, মনের আসক্তি তা'তে নেই। এ মেয়ে সে জাতের।

কন্যা তখনও মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছেন। মা তাঁহাকে স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিলেন,—শান্ত হও মা। তোমার ভক্তি হবে। সংসারে থেকেই স্বামিপরিজনের সেবা কর। ভগবানকেও ডাক, সংসারও কর।

মায়ের উপদেশ পালন করিয়া এই কন্যা সংসারে সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মজীবনেও উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

বরাহনগরের এক বৈশ্যবংশীয়া কন্যা বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মানুরাগিণী। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং তিনি আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকিবার সংকল্প করেন। কিন্তু আত্মীয় পরিজন তাহা গ্রাহ্য করিবেন কেন? তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহারা বিবাহ স্থির করেন। নিরুপায় হইয়া কন্যা বিবাহদিবসে সম্প্রদানের পূর্ব্বেই অন্যের অলক্ষ্যে দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গেলেন এবং ঠাকুরের ব্যবহৃত তক্তাপোষখানি স্পর্শ করিয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—হে ত্যাগের ঠাকুর, তুমি দয়া কর, তোমায় ভজেই যেন আমি থাকতে পারি।

ঠাকুরের ঘরে তখন শিবরামদাদা ছিলেন, তিনি বলিলেন,—ভজ ভজ, ঠাকুরকে খুব ভজ। গৌরীমাও উপস্থিত ছিলেন, উৎসাহ দিয়া বলেন,—মা-ঠাকরুণের কাছে গিয়ে শরণ নে। তিনি তোকে রক্ষে করবেন।

কন্যা তদনুসারে মাতৃসকাশে আসিয়া প্রার্থনা জানাইলেন,—মাগো, আপনি আমার উপায় ক'রে দিন, আমি যেন ঠাকুরকে ভ'জেই সারাজীবন থাকতে পারি। মা আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—ঠাকুরতো তোমায় গ্রহণ করেইছেন, তোমার ভয় কি মা?

বিবাহের বিরুদ্ধে কন্যার চিত্ত এতই উত্তেজিত হইয়াছিল যে, কৌমার্য্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে আত্মহত্যা করিবেন বলিয়া তিনি সঙ্গে একটি ছোরা লুকাইয়া রাখিতেন। ইহাতে মা বলিয়াছিলেন,—নিজের যেটা আসল জিনিষ—ব্রত, তা' একেবারে শক্ত ক'রে ধ'রে থাকতে হবে।

কারু কোন অনুনয়, পরামর্শ বা তিরস্কারে নিজের আদর্শ ছাড়লে চলবে না। শক্ত হ'তে হবে, 'শক্ত তিন কুল মুক্ত'। তাহার পর মা তাঁহাকে সান্ত্বনা, উপদেশ এবং প্রসাদ দিয়া স্বগৃহে পাঠাইয়া দিলেন।

এই কন্যা মায়ের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কৌমারব্রতও রক্ষা পাইয়াছিল। তাঁহার প্রসঙ্গেই মা বলিয়াছিলেন,—মেয়েদের ত্যাগবুদ্ধি আসতে সময় লাগে। সংসারে এদের আকর্ষণ বেশী; শৈশবে মা বাপ ভাই, যৌবনে স্বামী আর পুত্রকন্যা; কিন্তু একবার যদি মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়, তা'হলে শন্ শন্ ক'রে এগিয়ে যায়।

মায়ের জনৈকা মন্ত্রশিষ্যা একদিন মাকে বলিলেন,—মাগো, সংসারের এই বিষয়ভোগ আর সহ্য হয় না। ঠাকুর বলতেন, দু' একটি সন্তান হ'লে পতিপত্নী ভ্রাতাভগ্নীর মত থাকবে, আর ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে জীবন কাটাবে। কিন্তু সংসারে সেরূপ হ'বার কোন সম্ভাবনা দেখছি না মা। আপনি বলুন, আমার কি উপায় হবে? আমার ভক্তিলাভ কি ক'রে হবে? এই বলিয়া শিষ্যা কাঁদিতে লাগিলেন।

মাকে নীরব দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন,—মা, কৃপা করুন, আপনার কৃপা হ'লে সব হবে। সেইদিন মা তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলেন না, কেবল শুনিয়া গেলেন।

কয়েকমাস পরের কথা।

মায়ের নিকট আসিয়া শিষ্যা দুঃখ করিয়া বলেন,—মা, মেয়েটার বিয়ের বয়স হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই বিয়ে করবে না। তা'কে অনেক বুঝিয়েছি, ভয়ও দেখিয়েছি। ভারী একগুঁয়ে মেয়ে সে। আমায় বলে কি জানেন,—নিজে তো বিয়ে ক'রে ভাজাভাজা চচ্চড়ি হচ্ছো, আবার আমায় নিয়ে টানাটানি কেন? আমি বললাম,—কেন, আমি চচ্চড়ি হচ্ছি, তুই ডালনা হবি! আপনি যদি মা, একবার ব'লে দেন ওকে, তবে আর বিয়েতে আপত্তি করবে না!

তাঁহার কথা শুনিয়া মা বলিলেন,—সেদিন বললে ত্যাগের কথা, আজ আবার মেয়ের বিয়ের জন্যে অস্থির হয়েছ। কেন, মেয়ে তো ঠিক কথাই বলেছে, তুমি নিজে চচ্চড়ি হচ্ছো, বিয়ে ক'রে মেয়ে কী আর এমন রসাল ডালনা হবে? তুমিই বল। সবাই কি শুধু বিয়ে আর সংসার নিয়েই থাকবে? আধার যদি ভাল হয়, ছেলেরা যেমন সাধু-সন্নিসি হ'য়ে ত্যাগের পথে থাকে, মেয়েরাও তেমনি থাকবে। মেয়ে যদি ভগবানকে ভ'জে থাকতে চায়, তুমি যেন তা'র হন্তা হয়ো না মা।

মাতাঠাকুরাণীর আশীর্ব্বাদপ্রাপ্ত এই কন্যা কৌমারব্রত পালন করিয়া অদ্যাবধি তাঁহার প্রদর্শিত পথেই জীবন যাপন করিতেছেন।

এইরূপ অনেক দেখা গিয়াছে, মাতাঠাকুরাণী বিভিন্ন ব্যক্তির আধার লক্ষ্য করিয়া কোন কোন ত্যাগপন্থী সন্তানকেও নির্দ্দেশ দিয়াছেন সংসারজীবনে ফিরিয়া যাইতে, সন্ন্যাসপ্রার্থীকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দান করেন নাই ; আবার কোন কোন জননীকে উৎসাহ দিয়াছেন নিজ পুত্রকে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর পথে প্রেরণ করিতে, কন্যাকেও বলিয়াছেন ভগবানকে ভজিয়া থাকিতে।

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার ভিন্নমুখী দৃষ্টান্ত দ্বারা মায়ের করুণার্দ্র-চিত্তের চিত্র এবং বিভিন্ন ব্যক্তির আধার এবং প্রয়োজন বুঝিয়া মা কি ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতেন, তাহা সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।—

"মায়ের কাছে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিতেন। এইভাবে মা তাঁহাদের সন্তাপ গ্রহণ করিতেন এবং সান্ত্বনা দিয়া শীতল করিতেন। তাঁহার ভালবাসা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহাকে যেন নব নব ভাবে বিভাবিত করিত। একজনের একটিমাত্র সন্তান সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে,তিনি মায়ের নিকট অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে মনের দুঃখ বলিতেছেন, 'মা, আমার একটিমাত্র ছেলে, বিধবা হবার পর সেই ছেলেকে বুকে ক'রে কত দুঃখে মানুষ করেছি, তাকে নিয়েই আমার সংসার,আর সেই ছেলে গেল সংসার ত্যাগ করে।' মায়েরও চোখে জল ;

মা বলিতেছেন, 'আহা! তাইতো। একটিমাত্র সন্তান, প্রাণের ধন, সে এমন করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলে মা কি করে প্রাণ ধরে, বল দেখি!'

"আবার অপর একদিন অন্য এক মহিলা, যাঁহার দুটি ছেলে ছিল, দুটিই সন্ন্যাসী হইবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছে, ইহা মায়ের কাছে জানাইয়া বলিতেছেন, 'মা, ওরা দুই ভাই-ই গেল ঘর খালি করে, আমি শূন্যঘরে পড়ে রইলুম। তাই ভাবি, সন্তানের কল্যাণ যাতে হয়, তাই তো মায়ের কামনা। কি আছে সংসারে? ছেলে যদি পরমকল্যাণের পথ আশ্রয়ের জন্য সংসার ত্যাগ করে, মা তার জন্য দুঃখ পেলেও ছেলের কল্যাণেই তো মায়ের আনন্দ; এই ভেবে মনকে শান্ত করি।' মা শুনিয়া সহর্ষে বলিলেন, 'ঠিক বলেছ মা। সন্তান যদি পরমকল্যাণকে আশ্রয় করে, তবে তার চেয়ে মায়ের আর বেশী কি কামনার আছে?'

"এই যে বিভিন্ন স্থানে দুটি মায়ের কাছে মায়ের বিভিন্ন ভাবের উক্তি, ইহার প্রত্যেকটিতেই তাঁহার সমানভাবে আন্তরিকতা। একটিতে সন্তানহারা জননীর দুঃখে তিনি সমদুঃখভাগিনী, আবার অপরটিতে মা যে সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের কথা বুঝিয়া আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া তিনি আনন্দিতা।"

"মায়ের চরিত্র অপার সমুদ্রস্বরূপ। * * তিনি বলেছেন, 'সংসারীকে তো সংসার করতেই হবে, তবে নিরাসক্ত হয়ে প্রেমের সংসারে সংসারী হবে, আসক্তিতে যেন জড়িয়ে না পড়।" *

"তিনি বলেছেন, 'যে ভালবাসায় আসক্তির ছোঁয়াচ লাগে না, সেই ভালবাসাই ভগবানের পূজার নৈবেদ্য।"

---

* মাতাঠাকুরাণীর পত্রাবলীতে উপদেশ—

(১) সংসারে নানা অশান্তির কারণ আছে যতটা মনকে তাঁর উপর রেখে থাকতে পার ততই শান্তি ও প্রাণে সুখ।

(২) সাংসারিক লোক প্রায় নানান রকম ঝঞ্ঝাটে লিপ্ত থাকে সময় পাইলে ঈশ্বর-চিন্তা করে অতএব তুমিও সেইরূপ করিবে।

(৩) যে কয়েকদিন সংসারে থাক্ কেবল ভগবানকে ডাক।

হুগলীর জনৈক উকীলের পত্নী জগৎমোহিনী,রূপে যেন দেবীপ্রতিমা ; লোকে তাঁহাকে 'ঘরশোভা' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার একমাত্র কৃতী পুত্র হরিচরণ মাতাপিতার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া একদিন অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হইল। পরমস্নেহাস্পদ সন্তান, তদুপরি ভবিষ্যতের অবলম্বন, তাহার কোনই সংবাদ নাই, মনস্তাপে ঘরশোভা উদভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

ঘরশোভা ও তাঁহার আত্মীয়গণ মাতাঠাকুরাণীর নিকট পূর্ব্ব হইতেই যাতায়াত করিতেন। এই দুর্ঘটনার পর একদিন তিনি মায়ের নিকট আসিয়া মাতৃহৃদয়ের সন্তাপ জানাইয়া বলিলেন,—মা, আমার খোকাকে আপনি পাইয়ে দিন।

মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—আহা গো, মায়ের প্রাণে কত কষ্ট! তা,' তুমি কেঁদোনি বাছা, তোমার খোকা ভাল আছে। যেখানেই থাকুক-না কেন, প্রাণে বেঁচে থাকলেই হলো।

এইরূপ আশ্বাসবাক্যে পুত্রহারা জননীর আর্ত্তির উপশম হয় না, তিনি পুনরায় ব্যাকুলভাবে জানাইলেন,—মা, আমি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারবো না। আপনি মুখ দিয়ে একবারটি বলুন যে, আমার খোকা ফিরে আসবে।

ইহাতে জনৈকা ভক্তিমতী বলিলেন,—কাছে থাকলেই কি সব ছেলে মাকে সুখী করতে চায়, না, করতে পারে? তোমার ছেলে সাধুসন্ন্যসীর দলে ভিড়ে পড়েছে। মা তো বললেন, সে ভালই আছে। এতেই তুমি সন্তোষ পাও, ছেলেকে শান্তিতে থাকতে দাও।

মা সান্ত্বনা দিয়া পুনরায় বলিলেন,—সাধুর আশ্রয়ে গিয়ে যে পড়ে, তা'র কল্যাণই হয়। তোমার ছেলে সাচ্চা, তুমি ভেবো না মা। সে বেঁচে থাক, ধর্ম্মের পথেই এগিয়ে যাক, মা হ'য়ে তুমিও তা'কে এই আশীর্ব্বাদই কর।

এইরূপ উপদেশ দিয়াও মাতাঠাকুরাণীর প্রাণ পুত্রহারার দুঃখে কাঁদিত। তিনি সান্ত্বনা দিয়া পত্রও লিখিতেন, "শ্রীমান হরিচরণের জন্য কোনও চিন্তা করিবে না। ঠাকুরের ইচ্ছা হইলে সে আপনিই আসিবে।"

মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত জনৈক সন্তান, প্রাণটি তাঁহার অতি সরল, মনটিও উদার, এবং সংসারে থাকিয়াও সংসার বিষয়ে অনভিজ্ঞ। কিন্তু তাঁহার স্বভাবটি এইরূপ,—সংসারের তাপে যাহারা সন্তপ্ত, তাহাদের দুর্ব্বলতার বিষয় বিশেষ বাকপটুতার সহিত মাতাঠাকুরাণীর সমক্ষেও সমালোচনা করিতেন ; বলিতেন,—অমুক ছেলে সংসার সংসার করেই দিনরাত ব্যস্ত ; অমুক মায়ের দীক্ষিত সন্তান হ'য়েও ছেলে মরেছে ব'লে কাঁদছে, মনে জোর একদম নেই, ইত্যাদি।

মাতাঠাকুরাণী তাঁহার স্বভাব জানিতেন, শান্তভাবে তাঁহার কথা শুনিয়া যাইতেন, আর মৃদু মৃদু হাসিতেন।

কিছুকাল পরে একদিন উক্ত সন্তান নিরতিশয় কাতর হইয়া মায়ের চরণে আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ! আজ তাঁহার মুখে কোন কথা নাই, দৃষ্টি উদভ্রান্ত, প্রাণে এক অব্যক্ত যাতনা। কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া তিনি একখানি মাতৃসঙ্গীত আরম্ভ করিলেন,—

"হের হর-মনোমোহিনী, কে বলে রে কাল মেয়ে।

মায়ের রূপে ভুবন আলো, চোখ থাকে তো দেখনা চেয়ে॥"... আর, অন্তর মথিত করিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

সন্তানের বুকভাঙ্গা দুঃখে করুণাময়ী মায়েরও চিত্ত দ্রবীভূত হয়, জিজ্ঞাসা করেন,—কি দুঃখে তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে বাবা ?

বেদনাহতকণ্ঠে সন্তান বলিলেন,—মা, আমার ছেলেটি মারা গেছে। আমি আর সইতে পারছি না এত কষ্ট। পুত্রশোকে পাগল হ'য়ে যাচ্ছি।

সান্ত্বনা দিয়া মা তাঁহাকে বলিলেন,—যাঁর নাম নিত্য জপছো, যিনি প্রাণের সবচেয়ে আপন, তাঁকেই ছেলে মনে কর বাবা। তিনি ছেলে, মেয়ে, মা, বাপ, বন্ধু—সবই তিনি। তাঁকে ধারণা করতে পারলে আর শোক থাকে না।

মানুষের সত্যকার আপন কে ?

জনৈক বালক ভক্ত এক বৎসরের মধ্যে মাতাপিতা উভয়কেই হারাইয়াছে জানিতে পারিয়া মাতাঠাকুরাণী সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"আহা বাছা, কি দুঃখ! এর জন্য মনে দুঃখ করো না। ঠাকুর দেখছেন তোমাকে। সংসারের সম্বন্ধই এইরকম; আজ আছে, কাল নেই। যেটা আমরা ভাবি নিত্য—চিরস্থায়ী, সেটা অনিত্য—দুদিনের জন্য। মনে রেখো, আসল সম্বন্ধ তোমার ঠাকুরের সঙ্গে—ভগবানের সঙ্গে। সে সম্বন্ধ চিরকালের—নিত্য সম্বন্ধ। তোমার সত্যিকার বাপমা—ভগবান—ঠাকুর।"*

কিন্তু মানুষের পক্ষে ভগবানকে আপন করিয়া লওয়া, ভালবাসা, ষোল-আনা বিশ্বাস করা সহজসাধ্য নয়। নিত্য অভ্যাসযোগ প্রয়োজন। মা বলিয়াছেন,—ভালবাসাতেই ভক্তি হয়। ভালবাসা আসে, সেই জিনিষকে নাড়াচাড়া করতে করতে। কালোকুচ্ছিৎ একটা ছেলেকেও নাড়তেচাড়তে আরম্ভ করলে আস্তে আস্তে তা'র ওপর টান আসে, ভালবাসা আসে। সেইরকম ভগবানকে ভাবতে হয়, ডাকতে হয়। তাঁকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়, তবেই তাঁর ওপর ভক্তি হয়। মূলে বিশ্বাস আর ভালবাসা।

মানুষ কুমারীপূজা করে। এই বিশ্বাসে করে যে, শুদ্ধস্বভাবা কুমারীর মধ্যে জগদম্বার বিশেষ প্রকাশ, পূজকের পূজায় প্রসন্ন হইয়া তিনি তাহাকে অভীষ্ট দান করিবেন। মায়ের জনৈকা আশ্রিতা মহিলা কুমারীপূজার অভিলাষী হইয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলে মা বলিয়াছিলেন,— কুমারীপূজোর ওপর কি আর কোন কাজ আছে মা? রাণী রাসমণিকে দিয়ে ঠাকুর কুমারীপূজো করিয়েছিলেন। জগদম্বাকে পূজো করতে যেমন ফুলচন্দন,ভোজ্যবস্ত্র লাগে,তেমনি ক'রে কুমারীকেও ঠিক ঠিক দেবীবোধে সমস্ত দিয়ে আত্মনিবেদন ক'রে পূজো করতে হয়।

* স্বীয় ভ্রাতৃবধূর মৃত্যুর পর মাতাঠাকুরাণী জনৈকা শিষ্যাকে লিখিয়াছেন,—

আমাদের যা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে এখন আর কি করিব সকলই তার ইচ্ছা তিনি যাহা করিবেন তার আর অন্যথা নাই তবে এখন আর কি করা যায় এই বলিয়া বাড়ির সকলকে বুঝান যাইতেছে এবং আর বলিতেছি সংসারের কেহ কাহারও নয়।

মায়ের উপস্থিতিতে মহাষ্টমী দিবসে সেই মহিলা এক কুমারীকে পূজা করিতে বসিলেন। কুমারীটি ছিল অল্পবয়স্কা এবং চঞ্চলপ্রকৃতি। মহিলা তাহাকে নানারূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন,—ভাল হ'য়ে বোস্, মাথা নাড়িসনিকো, খাবারের দিকে তাকাতে নেই, ইত্যাদি। ইহাতে মা আপত্তি করিয়া বলিলেন,—ইষ্টদেবীবোধে যাঁকে পূজো করছো, তাঁর আচরণের কোন সমালোচনা করতে নেই। পূজোর সময়ে তাঁকে শাসন করতে নেই, তাঁকে সর্ব্বপ্রকারে প্রসন্ন করাই আসল কাজ। কুমারীপূজায় আগে দরকার পূজারীর শিক্ষা।

মায়ের বাটীতে একদিন অপরিচিত একটি সন্তান আসিলেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইল—পাগল,—রুক্ষ কেশ, দীন বেশ; কিন্তু চক্ষু দুইটি ভাবমগ্ন, মুখমণ্ডল প্রশান্তির আভায় মণ্ডিত।

মাকে দণ্ডবৎ করিয়া তিনি বলিলেন,—মা, আমি সন্ন্যাস চাই। তাঁহার পবিত্র মুখমণ্ডল হইতেই অন্তর্য্যামিনী মাতা তাঁহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইলেন। সেই মুহূর্ত্তে মা তাঁহার প্রার্থনায় স্বীকৃত হইলেন এবং গঙ্গাস্নান করিয়া নববস্ত্রপরিহিত হইয়া আসিবার জন্য নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই, সিক্তবসনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে উপস্থিত হইলেন। এমন সময় একজন তাঁহাকে একখানি নববস্ত্র দান করিলেন। সেইদিনই তাঁহার দীক্ষাকার্য্য এবং সন্ন্যাস-গ্রহণও হইয়া গেল।

এই প্রসঙ্গে মা বলিয়াছিলেন,—ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়। এই রকমেই পেয়ে যাবে; চাও, প্রভু দেবেন।

মিসেস্ চ্যাটার্জি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কুলবধূ। শ্বশুর প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী এবং নিষ্ঠাবান হিন্দু, কিন্তু তাঁহার স্বামী কুলধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিধর্ম্মী পুত্রকে পিতা ত্যাগ করিলেন; কিন্তু পতি অত্যাজ্য, সুতরাং আত্মীয়স্বজনের হিতোপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এবং বিষয়সম্পত্তির মমতা ত্যাগ করিয়া মিসেস্

চ্যাটার্জি নবধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণান্তর পতির সহিত গিয়া মিলিত হইলেন। পদমর্য্যাদা বা বৈষয়িক স্বার্থের লোভে তাঁহারা পরধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, পতিপত্নী উভয়েই নৈষ্ঠিক খৃষ্টানের জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তৎপরে একদিন যীশুখৃষ্টের নাম স্মরণ করিতে করিতে মিঃ চ্যাটার্জি ইহলোক ত্যাগ করেন।

পতিবিয়োগের পর এক শুভক্ষণে মিসেস্ চ্যাটার্জি মাতাঠাকুরাণীর দর্শন পাইলেন। মায়ের দর্শন এবং স্পর্শনে তিনি এক অভিনব অনুভূতি লাভ করেন। পতির সহিত মিলিত হইবার জন্য ধর্ম্মান্তরিত হইলেও অন্তরে তিনি ব্রাহ্মণকন্যাই ছিলেন। সজলনয়নে সকল ব্যথা মাতৃচরণে নিবেদন করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিলেন।

মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—আহা, তুমি দুঃখ করো না মা। অনুতাপে তোমার সব ধুয়েমুছে গেছে। তুমি কাশীতে গিয়ে বাবা বিশ্বনাথের চরণ ধ'রে প'ড়ে থাকো, তিনিই উপায় ক'রে দেবেন। সেখানেই তুমি সব পাবে।

বিবেকের দ্বন্দ্ব এবং অনুশোচনা যখন তাঁহার অন্তরকে নিপীড়িত করিতেছিল, সেইসময় মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে এইভাবে কল্যাণপথের নির্দ্দেশ দিলেন।

আরম্ভ হইল তাঁহার নূতন জীবনব্রত। ভোগবিলাসের পথ পরিত্যাগ করিয়া ত্যাগতপস্যার কঠোর জীবন তিনি বরণ করিয়া লইলেন। চলিয়া গেলেন কাশীধামে। বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণাকে নিত্য দর্শন করেন, অধিকাংশ সময় মন্দিরপ্রাঙ্গণেই পড়িয়া থাকেন, তাঁহাদের নামগুণ গান করেন।

অবশেষে একদিন এক সন্ন্যাসীর নিকট তিনি দীক্ষা ও সন্ন্যাস লাভ করেন। শেষবার যখন আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ,—মিসেস্ চ্যাটার্জি গৈরিকবসনা, ত্রিশূলধারিণী, মহাতপস্বিনী। তাঁহার পরবর্ত্তী কালের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া মাতাঠাকুরাণী আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিলেন তাঁহার উদ্দেশে। দীর্ঘকাল কাশীধামে কঠোর সাধনা করিয়া এই মহিলা স্বাভীষ্টধামে গমন করেন।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্"—

স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অবিনাশচন্দ্র চাকুরী করিতেন এক সাহেব-কোম্পানীতে। কর্ম্মপটুতা এবং সাধুতার গুণে তিনি সাহেবের বিশেষ বিশ্বাসভাজন ছিলেন। একবার কোম্পানীসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে অসাধুপথে সাহেব তাঁহার সহযোগিতা কামনা করেন। অবিনাশচন্দ্র ইহাতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে মর্য্যাদাহানিবোধে সাহেবের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটে ; তিনি ভয় দেখাইলেন, নির্দ্দেশ পালন না করিলে চাকুরী যাইবে। অবিনাশচন্দ্র শঙ্কিত হইলেন, কিন্তু সত্যপথে অটল রহিলেন। সাহেবের মনোগত অভিপ্রায় ছিল না ঐরূপ বিশ্বস্ত ও পুরাতন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা। সুতরাং তাঁহাকে ঐ প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করিতে সময় দিলেন এবং আর্থিক উন্নতিরও আশা দিলেন।

এই বিষয় বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন সকলেরই গোচরে আসিল। সকলেই পরামর্শ দিলেন, সামান্য একটা মিথ্যাকথা বলিলে যদি সাহেব সন্তুষ্ট হয়, চাকুরীর উন্নতি হয়, তবে তাহা দোষের নয়। অবিনাশচন্দ্রের বিবেক কিন্তু তাহাতে সম্মতি দেয় না।

মাতাঠাকুরাণীর নিকট তাঁহাদের যাতায়াত ছিল। অবশেষে অবিনাশচন্দ্র প্রস্তাব করিলেন, মাতাঠাকুরাণীর নিকট সকল কথা বলা হউক, তাহার পর তিনি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপেই কার্য্য হইবে। তাঁহার মনের দৃঢ় বিশ্বাস, মা কখনও মিথ্যা বলিতে নির্দ্দেশ দিবেন না। পক্ষান্তরে আত্মীয়স্বজন ভাবিলেন, সংসারের ব্যয়নির্ব্বাহ এবং দায়িত্বের কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহাদের পরামর্শই মা অনুমোদন করিবেন।

যথাসময়ে মাতাঠাকুরাণীর নিকট সকল কথা নিবেদন করা হইল ; তিনি বলিলেন,—হাঁ, সংসারের গুরু দায়িত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু বাবা, আজ মিছেকথা ব'লে চাকরীটা বজায় রাখলে, কালই এমনও তো হ'তে পারে যে, তোমার শরীর অনড় হ'য়ে গেল। তা'হলে তোমার ধর্ম্মও গেল, চাকরীও গেল। তা'র চেয়ে ধর্ম্মকে ধ'রে থাকাই তো ভাল। ঠাকুর বলতেন,—সত্যই ধর্ম্ম। ধর্ম্মকে যে আশ্রয় করে, ধর্ম্মই তা'কে রক্ষে করে।

মাতাঠাকুরাণীর এই মন্তব্যে অবিনাশচন্দ্রের মনোবল বৃদ্ধি পাইল, সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়ক্ষতিকে স্বীকার করিতে তিনি দৃঢ়সংকল্প হইলেন; তবু সত্যকে জলাঞ্জলি দিলেন না। তাঁহার সত্য রক্ষা পাইল, কিন্তু চাকুরীটি সত্যই হারাইতে হইল। ইহাতে সাময়িক আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিল বটে, কিন্তু তাঁহার মনে কোন অনুশোচনা হয় নাই।

কিছুকাল অর্থকৃচ্ছ্রের মধ্যে অতিবাহিত হইবার পর, মায়ের আশীর্ব্বাদে তাঁহার অন্য একটি চাকুরী জুটিয়া গেল।

মাতাঠাকুরাণী যুক্তিহীন গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন, কিন্তু প্রচলিত সামাজিক আচারশৃঙ্খলাকে উপেক্ষা করাও তিনি অনুমোদন করিতেন না।

একদিন জনৈকা ব্রাহ্মণমহিলা অনেক কথার অবতারণার পর মাকে বলেন যে, তাঁহার কন্যাকে তিনি এক মাহিষ্যের সহিত বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়াছেন। পাত্রটি সর্ব্বরকমে উপযুক্ত। এই বিষয়ে মায়ের মতামত জানিতে চাহিলে, মা বলেন,—সে কি গো! বামুনের মেয়েকে মাহিষ্যের হাতে সঁপে দেবে কেন? দেশে কি ভাল বামুন-ছেলে নেই?

উত্তরে মহিলা বলিলেন,—আপনি তো সকলেরই মা। আপনিও কি জাতবিচার মানেন! ঈশ্বরের সন্তান সব্বাই সমান।

মা মৃদুহাস্যে বলিলেন,—সমাজের বিধিনিষেধ মানতে হয় বৈ কি। যা'র-যা'-খুশীমত চললে কি সমাজশৃঙ্খলা থাকে, না সংসারে শান্তি বজায় থাকে? ঠাকুর বলতেন, 'যদ্যপিহ হই ভবসিন্ধু পার, তথাপি না ছাড়ি লোকাচার।' তিনি যে বার-তিথি পর্য্যন্ত মেনে গেছেন গো, আমাকেও মানিয়েছেন। আমি তাঁর কথার অমান্যি কি ক'রে করি?

আর একদিন বিদেশ প্রত্যাগত জনৈক ব্রাহ্মণসন্তান ন—মায়ের নিকট নিবেদন করিলেন যে, তিনি এক বিদেশিনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, বিদেশিনীও তাহাতে সম্মত হইয়াছেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজন বলিতেছেন যে, এই বিষয়ে মাতাঠাকুরাণীর মতামত জানা প্রয়োজন।

এখন মায়ের আশীর্ব্বাদ পাইলেই তিনি সেই মহিলাকে এদেশে আসিতে লিখিয়া দিবেন।

তাঁহার কথা শুনিয়া মা বলিলেন,—এমন ইচ্ছে কেন হলো তোমার?

ও দেশের মেয়েরা বেশী গুণবতী, মেয়ে শিক্ষিত না হ'লে জীবনটা দুঃখের হ'য়ে দাঁড়ায়, উত্তরে সন্তান বলিলেন।

যে দেশের মেয়ে তোমার গর্ভধারিণী, যে দেশের মেয়ে তোমার বোন, যে দেশের মেয়ে তোমার এই আমি মা, সে দেশে তোমার যোগ্য একটি গুণী মেয়ে খুঁজে পেলে না? বলিয়া মা গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

সন্তানটির রুচি বিজাতীয়ভাবাপন্ন হইলেও তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ ছিলেন মায়ের অনুগত। মায়ের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি আর কোন যুক্তি প্রদর্শন বা প্রতিবাদ করিলেন না,নতমস্তকে বসিয়া রহিলেন। মাতাও আর কোন কথা বলিলেন না। কিছুক্ষণ পর মাকে প্রণাম করিয়া সন্তানটি নীরবে চলিয়া গেলেন।

জ্যেষ্ঠ সহোদর নীচেই উপস্থিত ছিলেন, মায়ের কি আদেশ হইল, তাহা তিনি জানিতে চাহিলেন। কনিষ্ঠ নতমস্তকে জানাইলেন যে, এই বিবাহে মায়ের অনিচ্ছা।

তা'হলে এখন কি করবে, নিজেই স্থির কর। মা-ঠাকরুণের কথা যদি তুমি না মানতে চাও, আমায় আর মুখ দেখিও না, জানাইয়া দিলেন জ্যেষ্ঠ সহোদর।

যায় কিছুদিন।

আধুনিক রুচি, সাময়িক উত্তেজনা এবং ভবিষ্যতের শুভাশুভ চিন্তা, অনেক কিছুই সন্তানের চিত্তকে কিছুদিন আলোড়িত করিল। অবশেষে মাতাঠাকুরাণীর নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহার পূর্ব্ব সংকল্প ত্যাগ করিলেন এবং এক শিক্ষিতা ব্রাহ্মণকন্যাকেই বিবাহ করেন। বলা বাহুল্য, স্বজাতির কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিদেশপ্রত্যাগত সন্তানটির জীবন নিরানন্দ হয় নাই, শান্তিময়ই হইয়াছিল। মাতাঠাকুরাণীর অশেষ আশীর্ব্বাদও তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

কতিপয় সন্তান সংকল্প করিয়াছিলেন, অবিবাহিত থাকিয়া আজীবন সমাজসংস্কার এবং দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। একদিন তাঁহারা মায়ের উপদেশ প্রার্থনা করিলে মা বলিয়াছিলেন,—শুধু সমাজসেবা আর দেশসেবা নিয়ে সারাজীবন দেহমন শুদ্ধ রাখা কঠিন। গুরুকে ভালবেসে, ইষ্টকে ভজনা ক'রে কুমার থাকা সহজ। মেয়ে-পুরুষ যে-ই অবিবাহিত থাকবে, ঈশ্বরকে ধ'রে পথ চলতে হবে, তাঁকে ভুলে গেলেই নানান গোলযোগ আসে। আর একটা কথা সর্ব্বক্ষণ মনে রাখবে,—মেয়েমানুষ থেকে ফারাক, আগুন আর বারুদ। সোনার মেয়েমানুষ হ'লেও সেদিকে ফিরে চাইবে না, তবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষে হবে।

নারীপুরুষের পরস্পর দর্শনেই কি দোষ মা? একজন প্রশ্ন করেন।

না, দেখলেই দোষ হয় না; তবে দৃষ্টি শুদ্ধ হওয়া চাই। দৃষ্টি যখন শুদ্ধ হবে, তখন নারীমাত্রে কেবল মাকেই দেখতে পাবে। তখন আর মেয়ে-মানুষ দেখা যায় না, কেবল মা-মানুষকেই দেখা যায়।

মেয়েদেরও মা বলিতেন,—সোনার পুরুষ হ'লেও তা'কে মেয়েদের সুন্দর ব'লে ভাবতে নেই। মানুষকে সহসা প্রত্যয় করো না। মানুষের ভেতর দেবভাব যেমন আছে, পশুভাবও তেমনি।

—'সাতপোড়ে আসল গিল্টি।' যা'রা একেবারে সাঁচ্চা, তা'দের আলাদা কথা,নয়তো অনেক সোনা ঘস্‌তে ঘস্‌তে তারপর গিল্টি বেরিয়ে পড়ে। কথায় বলে, 'সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল, কসিতে পিতল হলো।'

মা একটি গানও বলিতেন,—'যা'র মাথায় কাল চুল, তা'রে চিনতে না জোয়ায় রে, তা'রে চিনতে না জোয়ায়।' অর্থাৎ মানুষকে বুঝিতে অনেক সময় লাগে।

হাটখোলার দত্তগৃহিণী একদিন আসিয়া জানাইলেন, আহীরিটোলার গঙ্গার ধারে এক বয়স্থা নারী হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করে; চারিদিকে মানুষ আসিয়া খুব ভীড় জমায়।

—মা, মেয়েমানুষের নৃত্য করা কি ভাল, পুরুষমানুষের সামনে?

মা বলিলেন,—না মা, নারীর যে-নৃত্য পুরুষের মনে মোহ আনে, সে-নৃত্যে পৃথিবীর অমঙ্গলই হয়। তবে মহাকালী যে নৃত্য করেন পশু-দমনে, তা'তে দোষ নেই; ব্রজের গোপীরা রাধাকৃষ্ণের তৃপ্তির জন্যে যে নৃত্য করেন, তা'তেও দোষ নেই; আর দোষ নেই, ভক্তগণ হরি-সঙ্কীর্ত্তনে যে নৃত্য করেন। এতে দেবতা তুষ্ট হ'ন, পৃথিবীর মঙ্গল হয়।

মা বলিতেন,—সংযমে মানুষ দেবতা হয়। ঠাকুর বলতেন, বার বৎসর যে সংযম পালন করে, তা'র ভেতরে পদ্মফুল ফোটে, গায়ে পদ্মগন্ধ বেরোয়। যে চিরকাল সংযম অভ্যেস করে, তা'র সমস্ত আনন্দ ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে দাঁড়ায়। নিম্নদিকে কোন আনন্দ থাকে না, এইসকল ঊর্দ্ধরেতার কেবল ঊর্দ্ধমুখীন আনন্দ।

—যা'র মনে ত্যাগধর্ম্ম আছে, সে সংসারে অনেক জিনিষ ছেড়ে দিয়ে মনে শান্তি পায়।

—সব চেয়ে মনটা সরল হওয়া দরকার। মন যা'র সংশয়ী, তা'র বড় কষ্ট। 'যা'র যেমন মন, তা'র তেমন ধন।'

—মনের কালি না ঘুচলে, ঈশ্বরলাভ কিছুতেই হয় না। কে কি করেছে, কা'র কি দোষ, অত পরের খোঁজে তোমার কি প্রয়োজন? সকলের দোষ দেখতে দেখতে, শেষে নিজের দোষ বেড়ে যায়। আগে নিজের মন খুঁজে দেখ, তোমার সকল ময়লা ধোয়া হয়েছে কি-না?

মাতাঠাকুরাণী একদিন শ্রীকুমুদবন্ধু সেনকে বলেন,—

"মনের ধর্ম্মই ঐ রকম। চোখ মুখ নাক কাণের মত মনটা একটা ইন্দ্রিয় বই তো নয়! ওদের স্বভাবই চঞ্চল। নিয়মমত অভ্যাস করো সব ঠিক হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়ের চেয়ে ঈশ্বরের নামের শক্তি ঢের বেশী। রীতিমত নিয়ম করে জপধ্যান করলে ইন্দ্রিয় সব স্থির হয়ে যায়, নামে সব শুদ্ধ হয়। দেহ যে জড়, তাও শুদ্ধ হয়ে চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। সব সময় ভাববে যে, ঠাকুর তোমাকে দেখছেন, তিনি তাঁর পাদপদ্মে

আশ্রয় দিয়েছেন। ভাবনা কি, ধূলোকাদা দোষটোষ সব ধুয়েমুছে দেবেন। সরল অন্তরে তাঁকে ডাকবে।”

স্বামী শ্যামানন্দকেও মা বলিয়াছেন,—

“সময়মত মন স্থির করিয়া একটু জপধ্যান করিবার চেষ্টা করিবে এবং উহাতে যেরূপে হউক নিজের মনকে শান্ত করিবে। শুধু জপ, জপেতেই শান্তি; যদি একটু ধ্যান হইল, তাহ ভাল। সর্ব্বদা ‘কিছু হলো না, কিছু হলো না’ করিয়া অসন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। যেটুকু পাইয়াছ, সেটুকুকে অনবরত বাড়াইতে হইবে।”

আর একদিন মনের উচ্চনীচ গতির কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “যেমন চাঁদে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা, গঙ্গায় জোয়ার-ভাঁটা হয়, সেরূপ মনেরও ঊর্দ্ধগতি অধোগতি হয়। যখন ধ্যানজপের বিশেষ ব্যাঘাত হইবে, তখন জোরের সহিত মনকে শাসন করিতে হইবে এবং দেখিবে, মন যত নীচে আসিবে, তাহার পর আবার ততই উপরে উঠিবে; এর জন্য কখনও হতাশ হইবে না। হাত, পা, মন, মুখ, ইন্দ্রিয় এ সবই আপনার ইচ্ছায় ছুটাছুটি করিবার ইচ্ছা করিবে। তোমরা ধ্যানী জাপক সাধু-সন্ন্যাসী, তোমরাই তো ঐ সমস্তকে দমন করিয়া তোমাদের সাধুতা বজায় রাখিবে। একটু আধটুর জন্য হতাশ হইলে কি চলে? ঠাকুরের মাথাটাই অদ্বৈত। তোমাদের ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস, এ-যে জীবনব্যাপী ব্রত।

‘পুড়বে সাধু, উড়বে ছাই, তবেই সাধুর গুণ গাই।’

ঠাকুরের ‘খানদানী’ চাষার কথা ত পড়িয়াছ, তোমাদের সেইরকম হইতে হইবে।”

দীক্ষা, বীজতত্ত্ব, বীজানুশীলন, ইষ্টের স্বরূপ নির্ণয় ইত্যাদি বিষয়ে মা যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি,—

দীক্ষার কি উপকারিতা?

মা বলিলেন,—দীক্ষা নিলে কল্যাণই হয়। ভগবানকে যে-মূর্ত্তিতেই ভাবা যাক্, যে-ভাবে ডাকা হোক্, একদিন-না একদিন তাঁকে পাওয়া

যাবেই। তবে যা'র যেমন আধার সেই আধারের অনুকূল বীজটি যদি পড়ে, তবে বেশী শীগ্গির হয়।

রূপভেদ কেন হয়?

আধারভেদে রূপভেদ হয়। ভগবান এক বটে, কিন্তু দীক্ষার্থীর আধারভেদে ইষ্টদেবতার রূপভেদ হয়। বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণপতি ও সূর্য্য —সর্ব্বপ্রকার উপাসনাই ক্ষেত্রভেদে দেওয়া যায়। ক্ষেত্রভেদে স্বামী হয়তো শাক্ত, স্ত্রী বৈষ্ণব হ'তে পারে।

মা বলিয়াছেন, ষোড়শীপূজার পর বিষ্ণু, শিব, কালী, সীতা, রাম এবং অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি তিনি দেখিতে পাইতেন। কাহারও মুখের উপর, কাহারও মাথায় তিনি বিভিন্ন বীজমন্ত্রও দেখিতে পাইতেন। সেইসকল বীজ তিনি জপ করিতেন। ঠাকুরকে একদিন এই বিষয় জানাইলে, তিনি বলিয়াছিলেন,—পরে হরেক রকমের লোক আসবে, তা'দের ভিতর এইগুলি ছড়িয়ে দেবে। সবাইর মনতর এক নয়।

নারীপুরুষভেদে উপাসনার ভেদ হয়?

যা'রা রজোগুণী সন্তান, তা'দের মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা ভাল; 'মা, মা' ক'রে ডাকতে ডাকতে মনের কালি ঘুচে যায়। মেয়েরা তেমনি নারায়ণকে পতিরূপে ধারণা করলে সহজে সিদ্ধি পাবে।

দীক্ষান্তে মা সন্তানদের বলিতেন,—জপতপ করো, জপতপ করো। জপাৎ সিদ্ধি। ভগবানকে খুব ডাকো, তাঁর নাম জপ করো, জপে চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্ত শুদ্ধ হ'লে ভগবানের কৃপা হয়, ভক্তিলাভ হয়। ভগবানে ভক্তিই শান্তির পথ।

আবার অবস্থাবিশেষে কোন কোন সন্তানকে বলিয়াছেন,—বাবা, তোমাদের খুব বেশী জপ করতে হবে না, তোমাদের হ'য়ে আমিই জপ করবো। কিন্তু তোমরা স্মরণে রেখো।

শিলং-প্রবাসী শশধর মজুমদারকে মা বলিয়াছিলেন, "ভয় কি বাবা? ঠাকুর তো সবই দেখছেন, সবই জানছেন। ঠাকুর আছেন, সব ঠিক ক'রে নেবেন। আর আমি তো বাবা রয়েছিই, এখানেও সেখানেও।

তোমাদের চাকরী করতে হয়, কি কোরে সময় হবে? মন স্থির ক'রে দশবার জপ করলেই লক্ষ জপের কাজ হবে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ধ্যান করবে, জপ করবে।"

জনৈকা শিক্ষিতা মহিলা দর্শনে আসিলে, মা জিজ্ঞাসা করেন,—সেই বৌমা দু'টি অনেকদিন তো আর আসছে না?

মহিলা উত্তর দিলেন,—মা, ওদের ভাবগতিক ভাল নয়। আমায় বলে কি, তোমরা কেবল রামকৃষ্ণকে ভজ, আমাদের অন্য দেবতার মূর্ত্তি ভাল লাগে। আমিও তা'দের খুব শুনিয়ে দিয়েছি,—রামকৃষ্ণকে যা'রা ভজবে না, তা'দের বৃন্দাবন কচুবন হ'য়ে যাবে।

মা জিভ কাটিয়া বলিলেন,—ছিঃ, অমন কথা বলো না। ভাব যদি সাঁচ্চা হয়, কচুবনই বৃন্দাবন হয়। রাম, কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, কি আর সত্যি সব আলাদা আলাদা? সবই এক। ঠাকুরকে না ভজলেও তাঁকেই ভজা হবে, যদি কেউ নিজের ইষ্টকে কায়মনোবাক্যে ভজনা করে।

কায়শুদ্ধির কথা মা বিশেষভাবে বলিতেন। সাধনভজনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সর্ব্বোপরি প্রয়োজন—কায়শুদ্ধি। মা বলিয়াছেন,—যা'রা ত্যাগী থাকবে, তা'রা প্রাণ ছেড়ে দেবে, তবু কায়াকে ছাড়বে না, অর্থাৎ কায়াকে অশুদ্ধ করবে না। চিত্তশুদ্ধি মহাভাগ্যের কথা। জন্মজন্মান্তরের সুকৃতি না থাকলে কায়শুদ্ধি আর চিত্তশুদ্ধি উভয় শুদ্ধি যুক্ত হয় না। 'কায় বাক্য মন, তিন নিয়ে ধন।'

—অনেক সংগ্রামের পর চিত্তশুদ্ধি হয়। তবে যদি দেহশুদ্ধি থাকে, একদিন-না একদিন চিত্তশুদ্ধি হবে, মন্দিরে পাখী এসে বসবে। স্তর হিসাবে কায়শুদ্ধি দ্বিতীয় স্তরের, চিত্তশুদ্ধিই প্রধান। তবু কায়শুদ্ধিকে কম ব'লে মনে করো না। এই-ই তো সাধনা, এই সাধনায় সিদ্ধি পেলেই অন্তরের মণিকোঠায় প্রদীপ জ্ব'লে উঠবে।

জগজ্জননী

অনেককাল পূর্ব্বের কথা।

শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে দেশে দেশে তাঁহার অগণিত সন্তান হইবে এবং দূরদূরান্তর হইতে শ্বেতাঙ্গ সন্তানগণও পরবর্ত্তী কালে তাঁহার নিকট আসিবে।

ঠাকুরের দুইটি কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছে। সকলেই জানেন, ঠাকুরের নিকট যত ভক্তজনের সমাগম হইত, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী ভক্ত ও দর্শনার্থী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট আসিয়াছেন, তাঁহাকে অন্তরের অশেষ শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমাও সকলকেই নির্ব্বিচারে সন্তানভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার স্বতঃ-উৎসারিত স্নেহ ও করুণার ধারা আজীবন অকুণ্ঠভাবে এবং অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইয়াছে। এই বিশ্বমাতৃত্বই তাঁহার শাশ্বত ধর্ম্ম, এবং তাঁহার যথার্থ স্বরূপ ইহাতেই অভিব্যক্ত। জীবনের কোনপ্রকার অবস্থা-বৈচিত্র্যই তাঁহার এই মাতৃধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।

একদিন অপরাহ্ণ উত্তীর্ণ হইয়াছে, মাতৃভবনের একতলায় সিঁড়ির নিকট জনৈক সেবক অবসন্নভাবে বসিয়া আছেন, মুখখানি তাঁহার শুষ্ক। শ্রীশ্রীমা দ্বিতল হইতে তাহা লক্ষ্য করিয়া এক কন্যাকে বলিলেন,—আহা গো! বাছার আমার বুঝি এখনো খাওয়া হয়নি। মা বাপ, ভাই বোন, সব ছেড়ে সাধু হয়েছে, কিন্তু ক্ষিদেটা তো রয়েছে।

সিঁড়িতে নামিয়া আসিয়া মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার মুখখানি এমন শুকনো কেন বাবা? এখনো খাওয়া হয়নি বুঝি?

—না মা, সকালে জলখাবার খেয়েছি।

—এখনো তা'হলে ভাত খাওয়া হয়নি?

পাচক বা অন্য কাহারও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মা নিজেই রন্ধনশালা খুলিয়া কন্যাকে দিয়া পরিবেশন করাইলেন এবং নিকটে বসিয়া

পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। সন্তানের ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শ্রান্তি দূর হইল, আর অন্তর পূর্ণ হইল অপার্থিব মাতৃস্নেহে।

আর একদিনের ঘটনা।

মঠের একজন ব্রহ্মচারী কিছুকাল শ্রীশ্রীমায়ের বাটীতে বাস করিতেন। বিশেষ একটি কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাকে প্রাতঃকালে স্থানান্তরে যাইতে হইত এবং কাজ সারিয়া ফিরিতে অপরাহ্ণ, কোন কোন দিন সায়াহ্নও হইয়া যাইত। পাচক তাঁহার জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি নির্দ্দিষ্টস্থানে রাখিয়া চলিয়া যাইত, তিনি আসিয়া অবেলায় তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতেন; ইহার জন্য কোনদিন কাহারও নিকট অসন্তোষ বা অভিযোগ প্রকাশ করিতেন না।

সকলের যিনি জননী অচিরেই তাঁহার দৃষ্টি এই অব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই সন্তানটির যে অসুবিধা হইতেছে, তাঁহার প্রতি যে অবিচার হইতেছে,—দিনমানে একপ্রকার অনাহারে থাকিয়া অবেলায় আসিয়া তিনি বিকৃত খাদ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছেন, ইহাতে জননীর প্রাণ ব্যথিত হইল। স্নেহময়ী জননী একদিন জনৈকা সেবিকাকে বলিলেন,—ছেলেটি সেই-যে কোন সকালে ভাত না খেয়ে বেরিয়ে যায়, আর ফেরে বিকেল চারটে-পাঁচটায়, ওর খাবার-দাবারগুলো ততক্ষণে শুকিয়ে শক্ত হ'য়ে যায়, পিঁপড়েতে মাছিতে ছেঁকে ধরে। বাছার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। সকাল সকাল যাবার আগেই ওকে চারটি আলুসেদ্ধ ভাত খাইয়ে দিও মা।

সেবিকা অনেক অসুবিধার কথা জানাইয়া বলিলেন,—অত সকালে রান্না হয় না মা।

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন,—কেন? দরকার হ'লে তোমরা তো এভাবে রেঁধে দাও ,—এর জন্যে।

ওর জন্যে হয় ব'লে এর জন্যেও করতে হবে? কিঞ্চিৎ উষ্মা প্রকাশ করিয়া উত্তর দেন সেবিকা।

ডি. গাঙ্গুলীর সৌজন্যে

প্রত্যুত্তরে মা দৃঢ়কণ্ঠে পুনরায় বলেন,—ওদের জন্যে যদি হ'তে পারে, এর কেন পারবে না ? ঠাকুরের কাজের জন্যেই তো এখানে প'ড়ে আছে। এ কি আমার ছেলে নয় ? একবার ভেবে দেখো। আমরা বাড়ীতে রয়েছি, অথচ দিনের পর দিন অখাদ্যিগুলো ছেলেকে গিলতে হচ্ছে। নিজে মুখ ফুটে বলছে না ব'লে কি আমাদের দেখতে হবে না ?

সেবিকা তখনও শান্ত হইতে পারেন নাই, অভিমানে গম্ভীর হইয়াই রহিলেন। এই কার্য্যের ভার লইতে ইচ্ছুক হইলেন না।

মা বলিলেন,—তবে, কাল থেকে আমিই ওর ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

পরদিবস প্রভাতে শ্রীশ্রীমা পাচককে পূর্ব্বোক্ত সেবকের কষ্টের কথা বুঝাইয়া বলিলেন,—বাবা, তুমি সকাল সকাল একটা ভাতে-ভাত সেদ্ধ ক'রে ঐ সাধুজীকে খেতে দিও।

সন্তানটি প্রাতঃকালীন জলযোগ করিতে গিয়া দেখেন,—তাঁহার জন্য অন্ন প্রস্তুত এবং একটি পাত্রে দধি লইয়া দণ্ডায়মানা শ্রীশ্রীমা স্বয়ং। এইরূপ নূতন ব্যবস্থায় সন্তানটি অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিয়া নীরবে আহারে বসিলেন ; কিন্তু অন্ন এতই তপ্ত যে, স্পর্শ করা যায় না।

তাহা বুঝিয়া মা বলিলেন,—ভাত মাখতে পারছো না, খুব গরম বুঝি ? আচ্ছা, দাও আমি মেখে দিচ্ছি।

তাঁহাকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়া মা নিকটে গিয়া বসিলেন, স্বহস্তে ভাত মাখিয়া দিলেন। এই অহেতুক করুণার স্পর্শে এবং কৃতজ্ঞতায় ভাগ্যবান সন্তানের দুই গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে আনন্দের ধারা।

মাতার স্নেহকোমলতার আর একটি উদাহরণ।

সুশীলার শিশু পুত্র, নাম তাহার ন্যাড়া, রাত্রিকালে এমন চীৎকার করিত যে, সকলের নিদ্রার ব্যাঘাত হইত। প্রথমতঃ সুশীলা তাহাকে নানা-উপায়ে শান্ত করিতে প্রয়াস পাইত। তাহার পর শ্রীশ্রীমা স্বয়ং, এবং একে একে অনেকে আসিয়া সেইস্থানে মিলিত হইতেন, কিন্তু কোন উপায়েই ন্যাড়াকে বশীভূত করা যাইত না। শেষে আরম্ভ হইত সুশীলার

শাসন, ফল হইত বিপরীত। পাড়ার লোকেরা পর্য্যন্ত অতিষ্ঠ হইত ন্যাড়ার নিদারুণ চীৎকারে। প্রত্যহ এইভাবে চলে ন্যাড়ার দৌরাত্ম্য।

এক রাত্রিতে সেই অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, জনৈক সেবক ন্যাড়াকে কাঁধে তুলিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন এবং এক নূতন উপায়ে তাহার মনস্তুষ্টি করিলেন; বলিলেন,—দ্যাখ ন্যাড়াভাই, আজ রাত্তিরটা তুই চুপ ক'রে থাক। কাল ভোর হ'লেই তোর মাকে কী মার মারবো, তুই দেখে নিস্। মেরে একেবারে হাড়সুদ্ধু গুঁড়ো ক'রে দেবো।

এই ব্যবস্থা ন্যাড়ার অত্যন্ত মনঃপূত হইল। তাঁহার বজ্রমুষ্টিদর্শনে তাহার বিশ্বাস হয়, এই লোকটা সকলেরই হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে পারে। সে নীরব হইল। সেই হইতে ন্যাড়া সেবকটির বশীভূত হয়। তাঁহার নিকট থাকে,তাঁহার কথা মানে,রাত্রিতে এক শয্যায় শয়ন করে।

রাত্রিকালে অভ্যাসদোষে ন্যাড়া তাঁহার শয্যা নষ্ট করিত। শ্রীশ্রীমা এবং সকলে ন্যাড়ার দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, এই বিবেচনায় তিতিক্ষু সেবকটি নিজের অসুবিধাকে গ্রাহ্য করিতেন না,নিজেই অতিপ্রত্যূষে বিছানা ধুইয়া দিতেন; কিন্তু প্রত্যহ তাহা সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হইত না। শীঘ্রই মা তাহা বুঝিতে পারিলেন।

কয়েকদিবস পরে একদা সেবক তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখেন, তাঁহার শয্যা অদৃশ্য হইয়াছে। নূতন শয্যার উপর 'অয়েল-ক্লথ,' তাহার উপর ন্যাড়ার পৃথক শয্যা, নূতন মশারি ইত্যাদি। তাঁহার পুরাতন শয্যা অনুসন্ধান করিয়াও পাইলেন না। কেন এই পরিবর্ত্তন, নূতন শয্যা কাহার নিমিত্ত, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশ্রীমা উপর হইতে বলিলেন,—ন্যাড়া তোমার বিছানা নষ্ট ক'রে দিয়েছে, নতুন বিছানা আমি তোমার জন্যেই দিয়েছি বাবা।

এখানেই শেষ নহে, অতঃপর প্রত্যহ সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সেবক দেখেন, তাঁহার শয্যা প্রস্তুত। কিন্তু ইহা কাহার কার্য্য বুঝিতে পারেন না। একদিন যথাসময়ের পূর্ব্বেই কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া দেখেন, শ্রীমা স্বয়ং তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন। লজ্জায় এবং মনস্তাপে

ম্রিয়মাণ সন্তানটি মায়ের চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—মাগো, আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াবেন না। আমার বিছানা আমি নিজেই পেতে নেবো। দোহাই আপনার, আমার বিছানা আপনি স্পর্শ করবেন না মা। আমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

স্নেহময়ী মাতা হাসিয়া বলেন,—তা'তে দোষ কি বাবা? আমি কি শুধুই গুরু? আমি-যে তোমাদের মা-ও হই।

শশধর মজুমদার দশ বৎসর বয়সে গর্ভধারিণীকে হারাইয়াছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন, এবং গর্ভধারিণীর মৃত্যুর পর ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপের সময় তাঁহারই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেন। শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শনদিবসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যখন তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, তাঁহার সেই পুণ্যময়ী গর্ভধারিণীই যেন তাঁহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়াছেন। স্থানকাল ভুলিয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন.—মা, ওমা, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?

মা বলিলেন,—এই তো বাবা, আমি রয়েছি, তোমার ভয় কি?

পরবর্ত্তী কালে শশধর একদিন শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আচ্ছা মা, লোকে তোমাকে কত কি বলে, তুমি বলতো কোনটা সত্যি। একটুসময় চুপ করিয়া থাকিয়া মা হাসিয়া বলিলেন,—লোকে যা-ই বলুক-না বাবা, তোমার কি মনে হয়? উত্তরে শশধর বলেন,—আমি তো ওসবের কিছু বুঝি না মা, আমার মনে হয়, তুমি আমার মা। মা তাঁহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিয়াছিলেন, বাবা, তোমার এই বোঝাতেই সব হ'য়ে যাবে,—আমি তোমার মা।

শশধর মজুমদারের পত্নী শ্রীমতী কিরণবালা একদিন তাঁহার পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—তোমার মা কেমন দেখতে? তদুত্তরে তিনি বলেন, "মার কথা কি বলিব! মার কথা মুখে বলা যায় না। মা যে আমার কি ছিলেন, কেমন ছিলেন, তা' কি করিয়া তোমাকে বোঝাব? মার চেহারা ছিল, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি, স্নেহ-মমতায় অন্তর ভরা, হাসিতে

মধু ঝরিত। কথা অমৃত-মাখা। মাকে চক্ষে না দেখিলে কথায় কি বোঝানো যায়? মাকে না দেখিলে, বোঝানো যায় না,—মা আমার কেমন মা ছিলেন। তুমি মাকে ধ্যান কর, খালি ধ্যান কর মাকে; তা'হলে অন্তরেই মাকে দেখিবে, মা দেখা দিবেন। মা কেমন মা,—মা আমার আনন্দময়ী।"

মায়ের প্রসঙ্গে শ্রীমতী সরোজবাসিনী কোলে লিখিয়াছেন,—

প্রথম দর্শনের অনেক বৎসর পরে আমি দ্বিতীয়বার "মাকে আবার বাগবাজারে দেখলুম। বাগবাজারে মাকে দেখতে গেছি, কিন্তু মাকে খুঁজে পাচ্ছি না; কেবলই ঘরের চারিদিকে চাইছি, কিন্তু মাকে দেখতে পাচ্ছি না। খানিক পরে মা একটু এগিয়ে এসে তিনবার বল্লেন,—'এই যে আমি গো মা।' পূজো নেবার মত করে পাদুটি বাড়িয়ে দিলেন, আমি মার পায়ে লুটিয়ে পড়লুম। মনটা যেন ভরে গেল।"

ইহার পর সংঘটিত হয় এক নিদারুণ দুর্ঘটনা। সরোজবাসিনীকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করিলেন বিধাতা। অল্প কয়েকদিবসের মধ্যেই পর পর তিনটি কন্যা এবং বংশধর পুত্রটিও অকালে পরলোকগমন করে। সংসারের যে-কোন গর্ভধারিণীর পক্ষেই ইহা অতিশয় মর্ম্মন্তুদ দুর্ঘটনা,—সহ্যের অতীত। কিন্তু মাতৃকৃপায় শক্তিমতী সাধিকা সরোজবাসিনী বিধাতার এই নির্ম্মম আঘাতে কাতর হইলেও, বিভ্রান্ত হইলেন না। দিনের পর দিন আশ্রমে আসিয়া গৌরীমাতার সিদ্ধশালগ্রাম দামোদরজীর মন্দিরদ্বারে নিঃসাড় পড়িয়া থাকিতেন; কোন অভিযোগ নাই মুখে, কোন প্রার্থনা নাই অন্তরে। কেবল দেবতার চরণতলে পড়িয়া থাকা।

শ্বশুর নফরচন্দ্র কোলে পুত্রবধূকে নিজ কন্যাবৎ স্নেহ করিতেন; আর দেবীজ্ঞানে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন গৌরীমাকে। গৌরীমার নিকট আসিয়া তিনি কাঁদিয়া পড়িলেন,—মা-ঠাকরুণ, বৌমাকে কি ব'লে আমি সান্ত্বনা দেবো, আমার বংশ কি ক'রে রক্ষে হবে মা? আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

কোমলপ্রাণা কঠোরসন্ন্যাসিনী আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলেন তাঁহাকে,—আমি সন্নিসী, আমার কামনা করতে নেই। দামোদরজী বাঞ্ছাকল্পতরু,

তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাও; তোমার বংশরক্ষে হবে, বড় বৌমার গর্ভে সন্তান আসবে। আর জানাও গিয়ে আমার ব্রহ্মময়ী মা'র কাছে, তিনি সবই দিতে পারেন। তাঁকে বলো গিয়ে তুমি।

গৌরীমা'র নিকট আশ্বাস পাইয়া নফরচন্দ্র শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গিয়া সকল কথা জানাইলেন এবং বংশরক্ষা যাহাতে হয়, মায়ের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। মা প্রাণভরিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সরোজবাসিনী লিখিয়াছেন, "সবাইকে লুকিয়ে মার কাছে প্রায় রোজই যাই, মাকে ছেড়ে আসতে মন চায় না। আসার সময় ব্যাকুল হই, আসতে চাই না। মা বুঝিয়ে বলেন, 'বুড়ো শ্বশুর আছেন, ছেলেপুলে আছে, সংসার আছে, কর্ত্তব্য করতে হবে মা, তুমি বাড়ী যাও।' মাকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরি, কিন্তু মনটা পড়ে থাকে মার পায়ে।"

"মার কাছে, গৌরীমার কাছে যা পেয়েছি তা মুখে বলতে পারি না, সে অতুলনীয়; সব কিছু আমার মনের মধ্যে জমা হয়ে আছে, সে-ই আমার অক্ষয় অমূল্য সম্পদ। এঁদের স্নেহে আমি শান্তি পেয়েছি, আনন্দ পেয়েছি, দারুণ শোকও ভুলতে পেরেছি। গৌরীমা আমাকে যেন আপনার চেয়ে আপন করে নিয়েছিলেন।

"সে সব কথা আমি যখন ভাবি তখন আত্মহারা হয়ে যাই। শ্রীশ্রীমার দয়ার তুলনা নেই। মা করুণাময়ী করুণা বিতরণ করতেই এসেছিলেন, তাঁর চরণে বার বার প্রণিপাত—দণ্ডবৎ।"

শ্রীশ্রীমায়ের করুণার কথায় জনৈক সন্ন্যাসী বলিয়াছেন,—

নির্য্যাতিত এক রাজবন্দী বিপ্লবীদের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘে যোগ দেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, এবং তাঁহাকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন। কিন্তু অকালে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়, ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া শেষকালে মায়ের বাটীতেই আশ্রয় পাইলেন। দিনে দিনে ক্ষীণতনু হইয়া যখন মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, আমরা তাঁহার গর্ভধারিণীকে সংবাদ দিয়া আনাইলাম।

অন্তিমকাল আসিয়া যখন উপস্থিত, ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিলেন,—দেখ তো ভাই, মা'র খাওয়া কি হ'য়ে গেছে? তাঁহার গর্ভধারিণীকে ডাকিয়া আনিলাম। কিন্তু তিনি প্রসন্ন হইলেন না, বলিলেন,—এখন আর এই মা নয়, আসল মাকে একটিবার দেখতে চাই।

দেখিয়া আসিয়া বলিলাম,—মা'র এখনো পেসাদ পাওয়া হয়নি, দেরী আছে। শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, নৈরাশ্যে পাংশুবর্ণ মুখখানি আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। বোঝা গেল, বাহিরের নীরবতা যেন ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ, ভিতরে চলিতেছে প্রলয়ের ঘনঘটা। কিছুক্ষণ যায়, আবার চক্ষু মেলিয়া কি যেন দেখিতে চাহেন, মুখ ফুটিয়া কি যেন বলিতে চাহেন। প্রাণটা দেহপিঞ্জর হইতে মুক্তি চাহিতেছে, কিন্তু পাইতেছে না, যেন কিসের অপেক্ষায় আছে।

পুনরায় মায়ের সন্ধানে গিয়া দেখিলাম, মা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, হয়তো মাত্র দুই-এক গ্রাস মুখে দিয়াছেন। এমন সময় বিঘ্ন করিব না, নিঃশব্দে সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছি, মায়ের দৃষ্টি আসিয়া পড়িল আমার উপর। তবু কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া আসিলাম। কিন্তু মায়ের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, আহার বন্ধ হইয়া গেল; তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া চলিয়া আসিলেন রোগীর ঘরে।

মৃত্যুপথের যাত্রীর একাগ্র দৃষ্টি ও মন পড়িয়া ছিল দরজার দিকে,—আর তো সময়ে কুলাইবে না, মা কি দয়া করিয়া একবার আসিবেন?

এমন সময়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বাহির হইল রোগীর হৃৎপঞ্জর ভেদ করিয়া,—ওই-যে, ওই-যে, দয়াময়ী মা সত্যই আসিয়াছেন। আসিয়া তিনি শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। রোগী তাঁহার দুর্ব্বল দক্ষিণ হস্তটি ধীরে ধীরে প্রসারিত করিলেন সেইদিকে।

যাত্রার চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত,—মায়ের একটু চরণধূলি।

শ্রীশ্রীমা একখানি অভয় চরণ অতিসন্তর্পণে স্থাপন করিলেন মাতৃকৃপাপ্রার্থী সন্তানের কম্পিত হস্তের উপর। কিন্তু মনে হয়, তাঁহার আরও কিছু প্রার্থনা আছে, মায়ের চরণখানি আরও নিকটে আকর্ষণ করিতে

চাহেন। মাতা জানিতে পারেন সন্তানের নীরব প্রার্থনা। আরও নিকটে গেলেন তিনি, চরণখানি বাড়াইয়া দিলেন সন্তানের কপালের উপরে।

ইহার অধিক আর তো কিছু প্রার্থনা নাই। মুমূর্ষু মুমুক্ষু সন্তান তাঁহার সমস্ত শক্তি আহরণ করিয়া দুইহস্তে স্বাভীষ্টদাত্রী মাতার কমল-চরণখানি ধরিলেন, ঊর্দ্ধে অপলকনয়নে দেখিতে লাগিলেন তাঁহার মুখচন্দ্র।

শেষবার তাঁহার পাংশুবর্ণ বদনমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল একটি দিব্য হাসি, নয়নদ্বয় হইয়া আসিল স্থির। গর্ভধারিণী এবং গর্ভক্লেশহারিণী উভয় জননীরই মুখ দিয়া যুগপৎ বাহির হইল একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ।

মাতৃভবনের পার্শ্বেই অল্পবয়স্কা এক বধূ একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে শোকে নিরতিশয় কাতর হইয়া দিবারাত্র আর্ত্তনাদ করিতেন। মা তাহা শুনিতে পাইতেন, এবং তাঁহার দুঃখের কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেন। একদিন বধূটি পশ্চাদ্দ্বার দিয়া মায়ের বাটীতে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র মা স্নেহসিক্তকণ্ঠে বলিলেন,—বৌমা তুমি এসেছো, তোমার কথাই ভাবছিলুম। এই বলিয়া তাঁহার নিকট গিয়া সিঁড়ির উপরই বসিয়া পড়িলেন। মৃতশিশুর জন্য মাকে আক্ষেপ করিতে দেখিয়া পুত্রহারা জননীর শোক পুনরায় উথলিয়া উঠিল।

মায়ের নিকট বধূকে সন্তানের জন্য রোদন করিতে দেখিয়া জনৈক সেবক কহিলেন,—এসব নিয়ে মাকে জ্বালাতন করা কেন? তুমি জান না, মা ব্রহ্মময়ী? মার কাছে কেবল শুদ্ধা ভক্তি মেগে নিতে হয়। তুচ্ছ সংসারের সুখদুঃখের কথা বলতে নেই।

শ্রীশ্রীমা ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন,—না, না, ওকথা বলো না, ওকে কাঁদতে দাও। আমার কাছে কাঁদবে না তো কাঁদবে কা'র কাছে? ও মা, একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছে। আহা, কাঁদবে বৈ কি, কেঁদে কেঁদে বুকটাকে হালকা করুক। তুমি তো ত্যাগী সন্তান, তুমিই কি ঈশ্বরের কাছে শুদ্ধা ভক্তির জন্য কাঁদছো? আজ ও ছেলের জন্যে কেঁদে কেঁদে, শেষে সত্যি একদিন ভগবানের জন্যেও কাঁদবে।

এই বলিয়া বধূটিকে মা ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন এবং তাঁহার দেহে সস্নেহে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পুত্রশোকাতুরা বধূ মমতাময়ী জননীর স্নেহস্পর্শ পাইয়া শান্ত হইলেন।

শ্রীমতী থাকমণি দাসী মাতৃস্নেহের সুন্দর একটি বিবরণ দিয়াছেন,—

"বেলুড়ে একতলা বাড়ীতে তখন মা-ঠাকরুণ থাকতেন। একদিন আমরা দুজন (স্বামী—ঠাকুরের ভক্ত কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল সহ), আমার বড় ছেলে গোপীনাথ, বিপিন শা ও তার পরিবার,—আমরা আট দশ জন গঙ্গাপার হয়ে মায়ের বাড়ী গেছি। ফেরবার সময় আকাশ কালো হয়ে এল, কি মেঘ ডাকতে লাগল, মা-গঙ্গার সে কি কলকলানি! আমাদের বাড়ী ফিরে যেতে হবে, বললুম, মা, তবে আসি। মা বললেন, সে কি গো, এই ঝড়তুফান! এর ভেতর এই গঙ্গায় তোমাদের আমি কি ছেড়ে দিতে পারি? তোমরা যেওনি আজ। তোমরা এখানে থেকে যাও। আমার বাপু ভয় করছে। আমরা চুপ করে রইলুম।

"বিপিন শা, সে তো খুব একরোখা, গোঁয়ার। সে মায়ের পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে বললে, এই আপনার পায়ের ধূলো মাথায় নিলুম। আমাদের আর কোনো ভয় নেই। আপনার কৃপায় ঠিক গঙ্গাপার হয়ে যাব। আমরা ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলুম। মাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নীচে এলেন। নৌকা আগে থেকেই ঘাটে বাঁধা ছিল। নৌকায় আমরা চড়ে বসলুম।

"নৌকায় চড়েই পারের দিকে চেয়ে দেখি, মা গলায় আঁচল দিয়ে হাত দুটী জোড় করে ওপর দিকে চেয়ে বলছেন, মা, তুমি দেখো, মা, তুমি এদের দেখো।

"নৌকা ছাড়ল। যতক্ষণ না আমরা গঙ্গাপার হয়ে ওপারে উঠেছি, জল এল না; মাকে দেখা যাচ্ছে, মা ঠিক ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা পারে উঠলে, মা আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ঘরে চলে গেলেন। মা ঘরে ঢুকলে আমরা সকলে বাড়ী চলে গেলাম।"

মায়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহধারা কেবল আত্মীয়, শিষ্য এবং পরিচিত জনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না; অজ্ঞাত, আতুর, যে-কেহ তাঁহার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে, এমন-কি যে মুখ ফুটিয়া কিছু প্রকাশ করে নাই, মা তাহাকেও সস্নেহে কোলে টানিয়া লইয়াছেন, তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়াছেন।

একদিন অজ্ঞাতকুলশীলা জনৈকা বধূ শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন,—স্বামী সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, একমাত্র পুত্রকে লইয়া তিনি অর্থাভাবে বিপন্ন। পুত্রটি যদি মূর্খ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যতের কি উপায় হইবে? এই বলিয়া তিনি মায়ের চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিপন্ন বধূকে সান্ত্বনা দিয়া মা বলিলেন,—তুমি কেঁদো না, তোমার ছেলের পড়ার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো। তুমি ভেবো না মা।

মায়ের ইচ্ছানুযায়ী স্বামী সারদানন্দ ঐ বালকটিকে স্বামী অখণ্ডানন্দের সারগাছির আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন। সেইস্থানে বিনাব্যয়ে তাহার অন্নবস্ত্র এবং পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে সুফল ফলিল উভয়বিধ। দুঃস্থ অবজ্ঞাতের জন্য যে মানুষের প্রাণ কি করিয়া কাঁদিয়া উঠে, মাতাপিতা বর্তমানেও যে তাহাদের সন্তানের কল্যাণের জন্য অনাত্মীয়া মহিলার প্রাণেও কত ভাবনা, কত করুণার সঞ্চার হইতে পারে,—এই চিন্তা একদিন সেই উদাসীন পিতার মনে সুবুদ্ধি জাগরিত করিল। তিনি পুনরায় তাঁহার পত্নী ও পুত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের সহৃদয়তার কথা শুনিতে পাইয়া, আর এক দুঃস্থা বিধবা পুত্রসহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখ জানাইলেন,—মা, আমার ছেলেটি শৈশবেই পিতৃহীন। আপনি যদি দয়া ক'রে এর পড়াশুনোর একটা ব্যবস্থা করে দেন, গরীব বিধবার ভাতকাপড়ের উপায় হ'তে পারে।

—বেটাছেলে হ'য়ে যখন জন্মেছে, লেখাপড়া তো শিখতেই হবে; নইলে তোমাদের ভাতকাপড় কোত্থেকে জুটবে। আচ্ছা, সন্তানদের ব'লে দেখবো মা, কি ব্যবস্থা করা যায়।

বালকটির একটা ব্যবস্থা করিবার জন্য মা শরৎ মহারাজ এবং মাষ্টার মহাশয়ের পরামর্শ চাহিলেন। শরৎ মহারাজ এই বালকটিকেও স্বামী অখণ্ডানন্দের আশ্রমে পাঠাইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু বিধবা নারী তাঁহার স্নেহাস্পদ পুত্রকে চক্ষের অন্তরাল করিতে স্বীকৃত হইলেন না।

মা অগত্যা ললিতমোহনকে ডাকাইয়া বিধবার অবস্থা জানাইলেন। ললিতমোহন বলিলেন,—আপনি এত ভাবছেন কেন মা? এর সমস্ত খরচা আমি মাস মাস পাঠিয়ে দেবো।

—সে হবে না বাবা, ওদের নিত্য অভাবের সংসার, কাঁচা টাকা হাতে এলেই বিধবা খেয়ে ফেলবে। তুমি কোন ইস্কুলে ছেলেটিকে ভর্ত্তি করিয়ে দাও, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও।

ললিতমোহন বিনা প্রতিবাদে মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। বিধবার পুত্রের শিক্ষার উপায় হইল, মা-ও নিশ্চিন্ত হইলেন।

ভবী নামে জনৈকা বিধবা সন্ন্যাসিনীর বেশে থাকিতেন। কেহ কেহ সম্ভ্রম করিয়া তাঁহাকে ভবমা বলিত। মাতৃভবনে আসিয়া তিনি সেবাদি কার্য্যও করিতেন। একদিন মায়ের নিকট তিনি অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন,—বৃন্দাবন তাঁহার ইষ্টধাম, সেখানে যেন তাঁহার দেহান্ত হয়।

ভবমাকে মাতাঠাকুরাণী করুণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন। জনৈকা মহিলা ভবমার উপর অপ্রসন্ন ছিলেন, ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন,—বৃন্দাবনে, না কচুবনে! মাথায় একটা টিকি, পরনে গেরুয়া, মেয়ের ঢং দেখ-না!

মা মমতার সহিত বলিলেন,—আহা, ভবী বড় গরীব। ওর কেউ নেই। গরীবকে ভালবাসতে হয়, মাতৃহীনকে কোল দিতে হয়, তবেই তো তোমাদের 'মা' ব'লে ডাকবে লোকে।

মা এককালীন কিছু অর্থসাহায্য করিয়া ভবমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দিলেন। মাতার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া শরৎ মহারাজ মাসে মাসে কিছু সাহায্য করিতেন। শেষ পর্য্যন্ত ভবমার বৃন্দাবনপ্রাপ্তিই হইল।

স্বামী প্রেমানন্দের স্নেহপুষ্ট একটি সন্তান শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতিক্রমে মাতৃভবনে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন। তিনি থাকিতেন ত্রিতলে; কোন কোন দিন নিদ্রিতাবস্থায় যখন জানালার মধ্য দিয়া রৌদ্র আসিয়া তাঁহার গায়ে পড়িত, মাতা কোন প্রয়োজনে ছাদে গিয়া তাহা দেখিতে পাইলে নিঃশব্দে জানালাটা বন্ধ করিয়া দিতেন, যাহাতে সন্তানের গায়ে তাপ না লাগে।

দরিদ্র এক নারী ঘুঁটে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। সে এক-গণ্ডা, দুই-গণ্ডা করিয়া ঘুঁটে গুনিয়া দিতেছে, একজন বুঝিয়া লইতেছে। এক সময়ে উভয়ের হিসাবে অমিল হয়, বচসা হয়; পুনরায় গণনা আরম্ভ হয়—এক গণ্ডা, দুই গণ্ডা, ইত্যাদি। উপর হইতে মা ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন; ঘুঁটেওয়ালীর প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—বেচারীরা পথে পথে গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দেয়, তারপর অত বড় বোঝাটি মাথায় ক'রে বাড়ী বাড়ী ঘোরে। চারখানি হ'লে এক গণ্ডা, পাঁচ-সাত গণ্ডা হ'লে তবে একটি পয়সা উপায় হয়। এই তো তা'দের রোজগার,এ থেকেই চালনুন কিনে বাড়ী যাবে। গরীব মানুষদের সঙ্গে এত খিচিমিচির কি কাজ বাপু, হলোই-বা দু'চারখানা কম।

মা একটি ঠোঙায় করিয়া ফলমিষ্টি-প্রসাদ এবং দুই আনা পয়সা তাহাকে গোপনে দিয়া আসিবার জন্য জনৈকা কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত শিশিরকণার মত সমুজ্জ্বল।

মায়ের দয়ার কথায় শ্রীসারদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা লিখিয়াছেন,—

"শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে কোনও ভিখারীকে বিমুখ হইয়া যাইতে আমি কখনও দেখি নাই। একদা রাত্রি প্রায় ৯টার সময় আমি সেখানে বসিয়াছিলাম, এমন সময় একটি ভিখারী আসিয়া কাতরভাবে ভিক্ষা চাহে। কিন্তু উপস্থিত সাধুদের মধ্যে একজন তাহাকে রূঢ় কথা বলিয়া তাড়াইয়া দেন। মা উপরে ছিলেন। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া নীচে লোক পাঠাইলেন, ভিখারীটিকে খুঁজিয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য।

তখন তাহাকে খুঁজিয়া ফিরাইয়া আনা হইলে শ্রীশ্রীমা স্বয়ং ভিক্ষা দিয়া উক্ত ভিখারীকে সন্তুষ্ট করিলেন। ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন বা অন্য কিছু খাবার না দিয়া মা ফিরাইয়া দিতেন না। তিনি ছিলেন অন্নপূর্ণা।"

একটি পাগল মধ্যে মধ্যে আসিত, আসিয়া রাস্তায় চুপচাপ বসিয়া থাকিত, কখনও-বা আপনমনে বিড়াবড় করিয়া বকিয়া যাইত। তাহার গতাগতির সময় শ্রীশ্রীমায়ের জানা ছিল, সেইসময় মা লক্ষ্য করিতেন, লোকটা আসিল কি-না, আসিলে যত্ন করিয়া তাহাকে প্রসাদ খাওয়াইতেন। যেদিন আসিত না, মায়ের প্রাণ ব্যাকুল হইত,—কেন সে আসিল না, কেমন আছে, অনাহারে রহিল কি-না। পথের পাগলের তো আপনার বলিতে কেহই নাই, কিন্তু জগজ্জননীর প্রাণে তাহার জন্য দুর্ভাবনার অন্ত নাই।

একদিন তাহাকে বিশেষ করিয়া আসিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু পাগলের খেয়াল থাকে না, সে আসিল না। দিন ফুরাইল, রাত্রি আসিল, মা তাহার জন্য কতবার ঘরবাহির করিলেন ; কেহ আসিলে প্রশ্ন করেন, কাছেই একটা পাগলকে দেখিয়াছে কি-না। কিন্তু পাগলের সন্ধান দিয়া কেহই মায়ের প্রাণ শান্ত করিতে পারিল না।

নিজের দুঃখদৈন্যই যে বোঝে না, পরের মায়ের প্রাণের ব্যাকুলতার সংবাদ সে কি করিয়া জানিবে ? রাত্রি গভীর হইয়া গেল, সে আর আসিল না। মা তাহার জন্য কত ভাবিবেন, জনৈক সন্তানকে অনুনয়ের সুরে বলিলেন,—কাশীমিত্তিরের ঘাটের শ্মশানে একটা পাগল থাকে, তা'কে এই পেসাদটুকু তুমি যদি কষ্ট ক'রে খাইয়ে এসো বাবা ; হয়তো বেচারী সারাদিন কিছুই খেতে পায়নি। পাগলের আকৃতিপ্রকৃতিও বুঝাইয়া দিলেন তাঁহাকে। সন্তান আসিয়া পাগলের প্রসাদপ্রাপ্তির সুসংবাদটি জানাইলে মাতার সমস্তদিনের দুর্ভাবনার অন্ত হইল।

একবার ঘাটাল হইতে কয়েকটি সন্তান পদব্রজে মাতৃদর্শনে আসে। অতি দীনহীন বেশ, অমার্জ্জিত রুক্ষ কেশ ; মনে হয়, কিছুই সম্বল

নাই। লোকমুখে জগজ্জননীর নাম শুনিয়া তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু কি ভাগ্যবিড়ম্বনা! আসিয়া দেখে মাতৃভবনের প্রবেশপথ রুদ্ধ।

এদিকে মা কি-প্রয়োজনে দ্বিতলের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। দেখেন—সম্মুখস্থ মুক্তমাঠে বহুলোক তাঁহারই দ্বিতলের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। মাকে দেখিয়াই তাহারা বলিয়া উঠিল,—আজ্ঞে মা, আমরা বহুদূরদেশ থেকে এসেছি, জগজ্জননীর দর্শন কি মিলবে?

শ্রীশ্রীমা জনৈক সেবককে বলিলেন,—ওদের নিয়ে এসো। আহা, ওরা কতদূর থেকে এসে ব'সে আছে।

সেবকটি সঙ্কুচিতচিত্তে বলেন,—মা, ওরা-যে এক পঙ্গপাল, আর ভারী নোংরা! আপনি ওদের ভেতরে আসতে বলছেন?

ব্যথিত হইয়া মা বলিলেন,—পৃথিবীর সবাইকে আমি দেখা দিচ্ছি, আর কত কষ্ট ক'রে ওরা এসেছে, ওদের দেখা দেবো না! নিয়ে এসো ওদের। বাইরে নোংরা হ'লে কি হ'বে বাবা, ওদের ভেতরটা পরিষ্কার।

মায়ের নিকট যাইবার অনুমতি পাইয়া সেইসকল সরল পল্লীবাসীদের মনের আনন্দ আর ধরে না; তাহাদের শ্রান্ত ধূলিমলিন মুখগুলি আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহাদের কী শ্রদ্ধা ও ভক্তি, যেন হৃদয়ের দরজা খুলিয়া উজাড় করিয়া দিল মায়ের চরণে।

রামকৃষ্ণ বসুর জননী ভোগের জন্য সেইদিবস প্রচুর পানতুয়া ও শিঙ্গাড়া পাঠাইয়াছিলেন। মাতা তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া এই সন্তানদিগের মধ্যে বিলাইয়া দিলেন। মাতার স্নেহ ও করুণার স্পর্শ পাইয়া তাহারা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল যে, ইনি সত্যই দীনদুঃখীর মা, তাহাদের করুণাময়ী জননী। সার্থক হইল তাহাদের তীর্থযাত্রা।

রাধারাণী একদিন একটি বিড়ালকে দ্বিতল হইতে নীচে ফেলিয়া দেয়। সে 'মিউ মিউ' করিয়া ডাকিতে লাগিল, অসহায়ের আর্ত্তনাদ শুনিয়া মায়ের প্রাণ অধীর হইয়া উঠিল। তিনি রাধারাণীকে ভর্ৎসনা করিয়া

বলিলেন,—করলি কি রাধি! করলি কি! জীবের মধ্যে যে শিব রয়েছেন, তা'কে তুই এমন নিষ্ঠুরের মত আঘাত দিলি! এই বলিয়া মা চলিলেন বিড়ালকে তুলিয়া আনিবার জন্য। মায়ের কথা শুনিতে পাইয়া ইতোমধ্যে জনৈক সেবক বিড়ালটিকে তাড়াতাড়ি উপরে লইয়া আসিলেন। বিড়ালের প্রাণ সহজে যায় না, তথাপি আহত বিড়ালটিকে অতিস্নেহভরে আপন কোলে লইয়া মা তাহার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া আদর করিতে লাগিলেন, দুধ গরম করিয়া তাহাকে নিজহাতে খাওয়াইলেন। করুণাময়ীর স্নেহ-স্পর্শে বিড়াল আস্তে আস্তে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিল।

জয়রামবাটীতে মায়ের এক পোষা বিড়াল ছিল। তাহার উৎপাতে বিরক্ত হইয়া কেহ অভিযোগ করিলে মা বলিতেন,—ও থাকে আমার বাড়ীতে, খেতে যাবে কোথায়? আর, চুরি ক'রে খাওয়া, সে তো ওদের স্বভাব। একদিন তাহার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হইয়া সকলে মাকেই দায়ী করিয়া বলিলেন, মায়ের প্রশ্রয়েই দিন দিন তাহার সাহস বাড়িতেছে। মা তখন একটা লাঠি তুলিয়া বিড়ালকে মারিতে উদ্যত হইলেন। সে কিন্তু পলায়ন না করিয়া মায়ের পায়ের কাছেই গিয়া আশ্রয় লইল। ইহাতে উপস্থিত সকলেই হাসিয়া ফেলিলেন; মা বলিলেন,—এমন ক'রে আশ্রয় নিয়েছে, ওকে এখন মারি কি ক'রে, বলো?

গৃহপালিত পক্ষীকেও মা স্বহস্তে খাইতে দিতেন, তাহার সহিত কথা বলিতেন। এমন-কি অবাঞ্ছিত লোলচর্ম্ম একটা কুকুরও যদি আহারের সময় উপস্থিত হইত, তাহার জন্যও একমুষ্টি প্রসাদের ব্যবস্থা মা করিতেন। এমন কুকুরকে কে আর দয়া করিবে!

অনেক সন্তানের অসঙ্গত আবদার মাকে রক্ষা করিতে হইয়াছে, অনেকের অবিবেচনার জন্য তাঁহাকে অনেক অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে। কেবল বস্ত্র বা পুষ্পমাল্য গ্রহণ নহে, কোন কোন ভক্তের আনীত মিষ্টান্নাদি তাঁহাদের সমক্ষেই মাকে অসময়ে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। এমন-কি ভোজনকালে বা বিশ্রামের সময়ও মানুষ আসিয়া

বিরক্ত করিয়াছে, তথাপি সর্ব্বংসহা মাতা সকল অস্বাচ্ছন্দ্য উপেক্ষা করিয়াছেন, সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছেন। মানুষ যে বাক্য বা আচরণে পীড়া পাইতে পারে, তাহা হইতে তিনি সতত বিরত থাকিতেন; অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও তিনি বলিতে পারিতেন না।

জনৈক ধনাঢ্য ভক্ত ঠাকুরের জন্য একখানি সিংহাসন দান করেন। সিংহাসনখানি বিশুদ্ধ-রৌপ্যনির্ম্মিত ছিল না। উৎকৃষ্টতর দানের সামর্থ্য-সত্ত্বেও দাতার এই কার্পণ্যে জনৈকা সেবিকা বলেন,—ধনীদের ভক্তি কম, তা'র চেয়ে গরীবের ভক্তি অনেক বেশী। এ সিংহাসন ফেরৎ দাও।

শ্রীশ্রীমা পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ হইতে আসিয়া সেবিকাকে আস্তে আস্তে বলিলেন,—তুমি বলছো কি? মানুষের প্রাণে ব্যথা লাগে এমন কথা কি বলতে আছে? ভক্ত যদি বাঁশের কঞ্চির তৈরী সিংহাসনও আমায় দেয়, আমি তা'ও নেবো। আমি এই সিংহাসন ফেরৎ দিতে পারবো না। জিনিষের দাম দিয়ে তা'র বিচার করতে নেই, মনের আন্তরিকতা দিয়েই জিনিষের বিচার করতে হয়।

এক মাদ্রাজী ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একখানি বহুমূল্য সাড়ী আনিয়াছেন। সাড়ীখানি দেখিয়াই একজন মন্তব্য করিলেন,—এমন সাড়ী কি মা কখনো পরতে পারেন? তোমাদের কি আক্কেল!

শ্রীশ্রীমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন,—না, না, অমন বলো না। মনে দুঃখু পাবে। আমি এ কাপড় রাত্তিরে পরবো, কেউ দেখতে পাবে না। আহা, ভক্তের প্রাণে কষ্ট দিতে নেই।

অবাঙ্গালী এক বৃদ্ধ ভক্ত শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একখানা জরিপাড়ের সাড়ী আনিয়াছিলেন। এইরূপ সাড়ী মা কখনও ব্যবহার করিতেন না, তথাপি পাছে ভক্তের প্রাণে আঘাত লাগে, এই মনে করিয়া মা সাড়ীখানি গ্রহণ করিলেন এবং ব্যবহার করিতেও স্বীকৃত হইলেন। পূজাগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া উক্ত সাড়ীখানা মা পরিধান করিলেন এবং পূজাবসানে তাহা পরিবর্ত্তন করিয়া বাহিরে আসিলেন। ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ হইল।

শ্রীমতী সরযূবালা সেন শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,—

"একদিন আমি একটি নির্ব্বুদ্ধির কাজ করেছিলাম। আমার ইচ্ছা হয়েছিল, মার শ্রীচরণ পূজা করবার। আমরা কিছু ফুল নিয়ে মার কাছে গেলুম। মা তখন গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছিলেন, তিনি আসতে তাঁকে জানালুম। তিনি তখনই হাসতে হাসতে পা দুটি জোড়া করে আসন নিয়ে বসলেন, আমি ইচ্ছামত তাঁর শ্রীচরণে ফুল দিলাম। তার পরই আমার বড়ই ইচ্ছা হল, তাঁর পাদুখানি বুকে নিতে। কিন্তু এমনি নির্ব্বুদ্ধি যে, তাঁকে না জানিয়েই পাদুটি বুকে তুলে নিয়েছি, আর তিনি একেবারে হেলে গেছেন। আমার খুব লজ্জা করতে লাগল; যোগেনমা, গোলাপমা সবাই হাসতে লাগলেন, মাও হাসতে হাসতে বললেন,—ছেলেমানুষ, কিন্তু কি ভক্তি দেখেছ! আমি কিন্তু খেয়ালবশেই করেছি, ভক্তির কি জানি, লজ্জাই পেলাম।"

জনৈক সেবকের অভিলাষ হইয়াছিল, শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দুইখানি বক্ষে ধারণ করেন। মা তাহাতে অস্বীকৃত হ'ন। একদিন সেবক প্রণাম করিবার সময় বক্ষে ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে মায়ের চরণ এমনভাবেই টানিলেন যে, উপস্থিত সকলে সন্তানের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন। মা ব্যথা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিলেন না। অবশ্য, সারদানন্দজী সেবকের এইরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে কলিকাতার বাহিরে পাঠাইয়া দেন।

ভক্তগণের আর একপ্রকার অন্যায় আবদারের উল্লেখ করিয়াছেন শ্রীকুমুদবন্ধু সেন,—

"একদিন শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে * * উঠিয়াছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম তাঁর কণ্ঠস্বর। সম্মুখে গিয়া দেখি, মা কোন স্ত্রী-ভক্তকে বলিতেছেন,—অন্য গুরুর কাছে দীক্ষা হয়েছে, লোকে আবার এখানে নিতে আসে, একি ছেলেখেলা! গুরুদত্ত মন্ত্রে তাদের বিশ্বাস নেই। মন্ত্র আর কি,—ঈশ্বরের নাম। আবার আমার কাছে এসে চায়। আমি দিতে চাই না, কিন্তু তারা যখন ছল্‌ছল্ চোখে হাতযোড় করে বলে,

'মা, ক্ষমা করুন। নামে—মন্ত্রে বিশ্বাস হচ্ছে না বলেই আপনার কাছে আসি। আপনি দয়া করলে যদি নামে বিশ্বাস হয়।' আমি বাপু, কারু চোখের জল সইতে পারি না। তাদের জন্য ঠাকুরের কাছে জানাই, প্রার্থনা করি যাতে তাদের মন্ত্রে—নামে বিশ্বাস হয়। ঠাকুরের ইঙ্গিতমত তাদের মন্ত্র রেখেই যাতে শক্তি সঞ্চার হয় সেইমত দীক্ষা দি। কি করি মা, লোকের কান্না আমি দেখতে পারি না।"

আরও একপ্রকার।

গুরুকে ইষ্টবিষ্ণু জ্ঞান করা শাস্ত্রেরই বিধান, সুতরাং নিজ নিজ গুরুকে যদি শিষ্যগণ সর্ব্বোচ্চ স্থান দেয়, তাহা দোষের নয়। কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের আচরণে পূর্ব্বাপর দেখা গিয়াছে যে, কেহ ঠাকুরকে অগ্রাহ্য বা লঘু করিলে অথবা ঠাকুরের উর্দ্ধে তাঁহার স্থান নির্দ্ধারণ করিলে, তিনি তাহাতে অত্যন্ত আপত্তি করিতেন এবং ব্যথিত হইতেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ একবার শ্রীশ্রীমা এবং অনেক নারীভক্তকে বেলুড়মঠে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভোগ হইয়া গেলে ব্রহ্মানন্দজী নির্দ্দেশ দিলেন, সর্ব্বাগ্রে মায়েরা প্রসাদ পাইবেন, তাহার পর সন্তানগণ।

গঙ্গার দিকে দ্বিতলের বারান্দায় মায়েদের বসিবার ব্যবস্থা হইল; তাঁহারা প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন, এমন সময় জনৈক সন্তান সেখানে গিয়া হাত বাড়াইয়া বলিলেন,—মা, আমায় একটু মহাপ্রসাদ দিন।

তা'র জন্যে এখানে এলে কেন? নীচেই তো ঠাকুরের পেসাদ রয়েছে, গম্ভীর হইয়া মা বলিলেন।

সেবক জানাইলেন,—ঠাকুরের প্রসাদের জন্য আমি আসিনি, আমি আসল মহাপ্রসাদ চাই।

তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মা দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—ঠাকুরের পেসাদের চেয়েও আমার পেসাদকে যে বড় বলে, আমি তা'কে পেসাদ দিই না। এই বলিয়া মা হাত তুলিয়া বসিয়া রহিলেন সন্তানটি চলিয়া না-যাওয়া পর্য্যন্ত।

আর একদিন মাতৃভবনে এক বৃদ্ধ আসিয়া যোড়হস্তে শ্রীশ্রীমাকে সম্বোধন করিলেন,—করুণাময়ী, তোমায় নমস্কার, এবং এই বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইতে উদ্যত হইলেন।

ঠাকুরের পটের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে মা বলিলেন,—আগে ওদিকে নমস্কার কর বাবা।

—ওদিকে আগে করবো কেন? আগে তোমায় করবো, তুমি আমার বড় নমস্কারের পাত্র।

—না বাবা, ওকথা বলতে নেই। প্রথম নমস্কার, বড় নমস্কার, সবই ঠাকুরের পায়ে; তার পর আমি।

এই যুক্তি মানিতে বৃদ্ধ স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন,—ঠাকুর তোমার, আমার কে? আমার নমস্কার আগে তোমার শ্রীচরণে।

তক্তাপোষের উপর চরণযুগল ঝুলাইয়া মা বসিয়া ছিলেন, তুলিয়া লইলেন উপরে এবং তাহা বস্ত্রাবৃত করিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন,

—তা' পারবোনি বাবা। আগে উদিকে কর।

তখন বৃদ্ধ অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন,—বাপরে বাপ, নমস্কার ব'লে নমস্কার! এই নমস্কার, এই নমস্কার, এই নমস্কার,—সাষ্টাঙ্গ হইয়া তিনবার ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করিলেন। অতঃপর মায়ের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—এইবার তোমার চরণস্পর্শ করতে দেবে তো?

বালিকার ন্যায় হাসিতে হাসিতে মা তাঁহার চরণযুগল প্রসারিত করিয়া দিলেন সন্তানের দিকে।

সচরাচর যাহারা অবজ্ঞাত বা পতিত, শ্রীশ্রীমা কিন্তু তাহাদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখেন নাই, তাহাদিগকেও করুণা করিয়াছেন, কল্যাণের পথে প্রেরণা দিয়াছেন।

একদিন তিনি মাতৃভবনে তক্তাপোষের উপর বসিয়া আছেন, পরিচিত অপরিচিত অনেক মহিলা—কেহ মায়ের কক্ষমধ্যে, কেহ বারান্দায়

উপবিষ্ট। জনৈকা নারী বারান্দা হইতে কুণ্ঠাজড়িতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—মা-ঠাকরুণ, যে পতিত, যে অধম তা'র কি গতি নেই?

মা বলিলেন,—কেন হবে না মা? সকলেই ঈশ্বরের কৃপাধীন, তিনি কাউকে ত্যাগ করেন না। 'অধম পতিত কাঙ্গাল সকলেরই আশ্রয় তিনি। কিয়ৎকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া পুনরায় মা বলিলেন,—

"উন পাপী তাপী প্রভু না কৈলা বিচার।
উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া নামভার॥"

পাপী তাপী সকলকেই ঈশ্বর তরাবেন, যদি অনুতপ্ত হ'য়ে তাঁর শরণ নেয়। কিন্তু একান্তভাবে শরণ নিতে হবে। তাই বলছি মা, শরণাগত হও, শরণাগত হও।

জনৈকা অভিনেত্রীর প্রশ্নের উত্তরে মা বলিলেন,—সকলেরই উপায় হবে মা, কিন্তু তোমাদের ঐ দূষিত সঙ্গ ছেড়ে দাও। খেটে খাও, ভিক্ষে ক'রে খাও, সেও ভাল; সৎপথে থেকে ঠাকুরকে ভজ।

আরক্তবদনে সেই অভিনেত্রী জানাইলেন,—সত্য কথা কি জানেন মা, নিজের রোজগারে এতদিন ঝি-দারোয়ান, গাড়ী-ঘোড়া রেখেছি, এখন নীচ কাজ করতে মর্য্যাদায় বাধবে।

—তা' প্রথম একটু বাধবে বটে, কিন্তু ঐ সঙ্গই তোমাদের দুর্গতি এনেছে। ঐ সঙ্গ ছেড়ে দাও। তারপর প্রাণমন দিয়ে ঠাকুরকে ধরো, তিনি পতিতপাবন।

—মা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।

শ্রীশ্রীমায়ের সংস্পর্শে আসিয়া,তাঁহার স্নেহ ও উপদেশলাভ করিয়া কোন কোন স্খলিতা নারীর জীবনেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, চিত্তে ঈশ্বর-ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে; এবং তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেও এমন ঘটিয়াছে যে, শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কোন কোন নারীর যাতায়াতে ঠাকুর আপত্তি জানাইয়াছেন। কিন্তু করুণাময়ী মাতা উত্তরে বলিতেন,—আমার কাছে এসে যে মা ব'লে দাঁড়ায়, তা'কে যে আমি ফেরাতে পারিনে।

মণি মল্লিকের পরিবারের নন্দিনী দেবী তাঁহাদের গঙ্গাতীরস্থ বরাহনগরের বাগানবাটীতে একবার শ্রীশ্রীমাকে আমন্ত্রণ করেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ, রামলালদাদা-প্রমুখ ত্যাগী ও গৃহী সন্তান এবং অনেক ভক্তিমতী মায়েরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রশস্ত একটি কক্ষে শ্রীশ্রীমাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া মায়েরা বসিলেন। পুরুষভক্তগণ সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে বসিয়া কীর্ত্তন করিলেন। অতঃপর লক্ষ্মীদিদি চূড়া বাঁধিয়া, পীতবাস পরিয়া মায়ের সম্মুখে নৃত্যসহ কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় জনৈকা কীর্ত্তনীয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার নাম চ—। সুদর্শনা, বয়সে প্রৌঢ়া, পরিধানে গৈরিকবাস। তিনি আমন্ত্রিত হইয়া আসেন নাই, সেইস্থানে শ্রীশ্রীমাতার আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিয়াই তিনি আসিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদিদির কীর্ত্তন শেষ হইলে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিতে বলা হইল। মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিয়া তিনি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সুর-তাল-ভাব উচ্চাঙ্গের। শ্রোতৃবর্গ রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছেন, আর গায়িকার নয়নযুগল হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে।

শ্রীশ্রীমা কিন্তু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, সমস্ত শরীরে তাঁহার অসহ্য জ্বালা। যোগেনমাকে বলিলেন,—যোগেন, আমি যে আর বসতে পারছি না এখানে।

যোগেনমা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন,—আচ্ছা, মা-ঠাকরুণ, এ কেমনতর কথা! এতক্ষণ তুমি মন দিয়ে সবার গান শুনলে, এখন ভাল গান হচ্ছে, সবার ভাল লাগছে, আর তুমি কি-না বলছো, বসতে পারছি না।

মা বলিলেন,—যে গান করছে তা'কে জিজ্ঞেস করো, তা'র যে কত জ্বালা সে-ই জানে। তা'র বুকটা চৌচির হ'য়ে ফেটে যাচ্ছে।

কীর্ত্তনসমাপ্তি পর্য্যন্ত মা বসিয়া রহিলেন, তাহার পর তিনি গঙ্গাস্নানে চলিলেন। গায়িকাও তাঁহার অনুগমন করেন! জীবনের কত সঞ্চিত দুঃখের কথা অকপটে নিবেদন করিয়া মায়ের চরণে লুটাইয়া লুটাইয়া তাঁহার সে কি মর্ম্মন্তুদ ক্রন্দন!

মা আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—গানের ব্যবসা ছেড়ে দাও মা, সমাজ থেকে নিজেকে লুকিয়ে ফেলো। দিনরাত ঠাকুরের নাম জপো, জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

কিছুদিন পরে নারী পুনরায় আসিয়া মায়ের কৃপা প্রার্থনা করিলেন। মায়ের কৃপাধন্য হইয়া তিনি পরমার্থের সন্ধানে তীর্থে চলিয়া গেলেন।

সালঙ্কারা এক নারী প্রায়ই আসিয়া মাতৃভবনের দরজায় প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন, ভিতরে আসিতেন না। শ্রীশ্রীমা উপর হইতে ইহা কয়েকদিন লক্ষ্য করেন। একদিন যখন সেই নারী আসিয়া প্রণাম করিতেছিলেন, মা তাঁহাকে প্রশ্ন করেন,—কে গা তুমি? ভেতরে ঢোক না, বাইরে থেকেই প্রণাম ক'রে চ'লে যাও, ভেতরে কেন আস না মা?

রাস্তা হইতেই কৃতাঞ্জলিপুটে তিনি উত্তর করিলেন,—আপনার পায়ের ধূলো নেবার যোগ্যতা কি সকলের থাকে মা? আপনার মন্দিরের ধূলো মাথায় তুলে নিয়েই কৃতার্থ হই।

মা বুঝিতে পারেন এই কথার ইঙ্গিত; তাঁহার দীনতা, তাঁহার সঙ্কোচ স্পর্শ করে মায়ের প্রাণ। যেন ব্যথাহত হইয়াই পুনরায় বলেন,—না, না, আমার নয়, এ ঠাকুরের মন্দির। তুমিও তাঁরই মেয়ে, আমিও তো ভালমন্দ সকলেরই মা, শরণাগত হ'য়ে এ মন্দিরে যে-ই আসবে, দরজা খোলা পাবে। তুমি ওপরে উঠে এসো।

এমন মমতাপূর্ণ প্রাণগলানো কথা পূর্ব্বে কোথাও তিনি শোনেন নাই, তাঁহার কর্ণে যেন অমৃতবর্ষণ হইল, তাপিত প্রাণ শীতল হইল। এমন সুযোগ যে জীবনে কখনও আসিবে, কে জানিত? কৃপার্থিনী ভরসা পাইয়া উঠিয়া গেলেন উপরে।

বহুজনবাঞ্ছিত চরণযুগল সম্মুখে প্রসারিত, নারীর মন এবং নয়ন মথিত করিয়া দরবিগলিতধারা ঝরিয়া পড়ে মহিমময়ী জগজ্জননীর চরণকমলে। আর সেই জগজ্জননীর করুণার মন্দাকিনীধারায় অভিষিক্ত হয় তাপদগ্ধা ভাগ্যবতী অভাগিনী।

জনৈক সেবক এবং মন্ত্রশিষ্য সুদীর্ঘকাল শ্রীশ্রীমায়ের সেবা করিয়াছিলেন। অকুণ্ঠ এবং অতুলনীয় তাঁহার সেই সেবা। মায়ের প্রসন্নতা-বিধানে কোনপ্রকার কষ্টকেই তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। মাতাও তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন ছিলেন, পরম নিঃসঙ্কোচে তাঁহার সেবা গ্রহণ করিতেন। দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া সন্তান দিয়াছেন তাঁহার শ্রদ্ধা এবং ভক্তি মায়ের শ্রীচরণে; পক্ষান্তরে মাতাও সন্তানকে উজাড় করিয়া দিয়াছেন তাঁহার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ। কিন্তু প্রাক্তন! স্বীয় কর্ম্মফলে সেই সন্তানকে আজ স্নেহময়ী মাতা ও গুরুর আশ্রয় ত্যাগ করিতে হইতেছে। বিদায়ের দিনে রিক্তহৃদয়ে রোদন করেন সন্তান, রোদন করেন সন্তানবৎসলা মাতা; অশ্রুমোচন করেন গুরু ও শিষ্য উভয়েই। তাঁহাদের এ মর্ম্মবেদনা বুঝাইবার নহে।

নয়নে অশ্রু এবং হৃদয়ে বেদনা লইয়া মাতা বিদায় দিলেন এতকালের সেই প্রিয় সন্তানকে তাঁহার চরম দুর্দ্দিনে। কিন্তু তিনি তো কেবল আদর্শবাদী গুরু নহেন, তিনি যে স্নেহময়ী মাতাও। আদর্শনিষ্ঠারও উপরে জাগিয়া রহিল তাঁহার অন্তরের অনির্ব্বাণ মাতৃত্ব, তাঁহার চিরন্তন ধর্ম্ম। আদর্শচ্যুত সন্তানকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—যাও বাবা, কিন্তু জেনো, আমি সর্ব্বদাই তোমাদের মা। আমার আশীর্ব্বাদ আজও রইলো তোমার ওপর। তোমার কর্ম্মভোগ শেষ হ'লে আবার পাবে আমাকে।

শ্রীশ্রীমায়ের আর এক ভাগ্যবান এবং কীর্ত্তিমান সন্তান অ-ব-।

মহাযুদ্ধের সময় তিনি পলটনে চাকুরী করিতেন, পাঞ্জাব হইতে মেসোপটেমিয়া পর্য্যন্ত অনেক স্থানে তিনি পলটনের সঙ্গে গিয়াছিলেন। বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ অনেক পদক এবং একখানি তরবারিও ইংরাজ-সরকার হইতে লাভ করিয়াছিলেন। চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হইলে সঞ্চিত অর্থাদিসহ তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

কোথায় কবে শুনিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের কথা, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়াছিল মনে, এইবার দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইল। মা তখন

পল্লীভবনে ; অ—গিয়া উপস্থিত হইলেন জয়রামবাটীতে। সৈনিকের বেশ, কণ্ঠে পদকের মালা, কটিদেশে বিলম্বিত তরবারি। সকলের মনে বিস্ময় এবং কৌতূহলের উদয় হয় ; লোকটির ইতিহাস জানিবার ঔৎসুক্যে তাহারাই পথ দেখাইয়া লইয়া আসে তাঁহাকে মাতৃমন্দিরে।

মাতৃসকাশে উপস্থিত হইয়া তিনি উষ্ণীষ, বীরত্বের নিদর্শনগুলি এবং কোষমুক্ত করিয়া তরবারিখানিও একে একে সাজাইয়া রাখিলেন মায়ের চরণতলে। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—মা, এসব পুরস্কার ইংরেজ সরকার আমায় দিয়েছেন, সব তোমায় দিলুম।

মা হাসেন তাঁহার আচরণে।

—তুমি কি আমায় ছেলে ক'রে নেবে মা ?

—পৃথিবীসুদ্ধ্ সবাই তো আমার ছেলে, তুমিও আমার ছেলে।

—আমি কিন্তু তা'দের মতন নই, আমি তোমার ওঁচা ছেলে। পৃথিবীর কোন্ দুষ্কর্ম্ম যে আমি করিনি, নিজেই তা' জানিনে। স্পষ্ট ভাষায় অকপটে সকলের সমক্ষেই বলিয়া চলিলেন তিনি তাঁহার অফুরন্ত দুষ্কৃতির কাহিনী। অবশেষে বলিলেন,—এখন বলো তুমি, ধূলো ঝেড়ে কি আমায় ছেলে ক'রে নেবে ?

নেবো, কিন্তু আমার দু'টি কঠিন সর্ত্ত আছে। পারবে কি তা' পালন করতে ? হাসিতে হাসিতে মা বলিলেন।

—কি তোমার এমন কঠিন সর্ত্ত, যা' আমি পারবো না !

—পরে বলবো। এখন গিয়ে তুমি বিশ্রাম কর।

উপস্থিত ভক্তগণ একমত হইয়া মিনতি জানাইলেন,—মা, এ লোকটাকে আপনি কিছুতেই দীক্ষা দেবেন না। ওর পাপ নিয়ে আপনার দেহ আরো খারাপ হ'য়ে পড়বে।

—আমার শরণ নিয়েছে, অসৎ ব'লে কি বিমুখ করবো ? ওর ভাল হবার একটা সময় এসেছে, মনটি সরল ; মাতৃকৃপা না পেলে ও যে আরো উচ্ছন্নে যাবে।

সেইদিন মায়ের চক্ষে দেখিয়াছিলাম করুণার স্নিগ্ধজ্যোতি, ওষ্ঠাধরে

সংকল্পের সুস্পষ্ট দৃঢ়তা, যাহা আজও স্মৃতিতে জাগরূক রহিয়াছে। তিনি এই বিষয়ে মন স্থির করিলেন। ভক্তগণ শঙ্কিত হইলেন।

সময়ান্তরে পলটনের সন্তানটি মাতাকে পুনরায় প্রশ্ন করেন,—কি তোমার সর্ত্ত, এইবার বলো।

গম্ভীর হইয়া মা বলিলেন,—আমি তোমায় দীক্ষা দেবো, কিন্তু আমার কাছ থেকে মন্ত্র নিলে, তু'টি সর্ত্ত তোমায় পালন করতে হবে। প্রথমটি—তুমি কখনো বিয়ে করবে না, আর দ্বিতীয়টি—কোন সতী নারীর সম্মান নষ্ট করবে না। এই শপথ করতে হবে।

এইরূপ কঠোর সর্ত্ত যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সন্তানটি তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—সত্যি কথা বলবো মা, বিয়ে করার সাধ আমার আছে। নইলে জীবন বিপন্ন ক'রে এত টাকাপয়সাই-বা কিসের জন্যে জমালুম।

—সে হবে না বাবা, এই-ই আমার সর্ত্ত। তুমি খাও দাও বেড়াও, আমার কিছুতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ তু'টি চলবে না।

অনেক বিবেচনার পর সন্তানটি শ্রীশ্রীমাতার সর্ত্তপালনে স্বীকৃতি দিলেন। মাতৃকৃপা তিনি পাইলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল।

আর এক বিচিত্র চরিত্র আমজাদ মিঞা।

জয়রামবাটীতে যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ আমজাদকে দেখিয়া থাকিবেন। তাহার উপজীবিকা—চাষের কর্ম্ম, ঘরামির কর্ম্ম এবং বহুবিধ কর্ম্ম, যখন যাহা পাওয়া যাইত। চুরিডাকাতিও বাদ যাইত না, সুতরাং দুষ্কৃতির জন্য মধ্যে মধ্যে তাহাকে কারাবাসও করিতে হয়। লোকে এই দুর্জ্জনটিকে ভয় করিত। শ্রীশ্রীমাও তাহার দুষ্কৃতির বিষয় জানিতেন, তথাপি সে ছিল মায়ের স্নেহাস্পদ সন্তান।

মায়ের প্রতি আমজাদের একটা আকর্ষণ ছিল, মাকে সে ভক্তি করিত। এইকারণে মায়ের পল্লীটিকে সে চুরিডাকাতি হইতে রক্ষা

করিত। অভাবে পড়িয়াই হউক, আর স্বভাবের দোষেই হউক, দুষ্কর্ম্ম করিলেও তাহার অন্তর মমতাশূন্য ছিল না। মধ্যে মধ্যে আসিয়া মাকে দর্শন করিয়া যাইত; নিজের সুখদুঃখের কথা মায়ের নিকট বলিত, দুষ্কর্ম্মের কথাও গোপন করিত না। আবার বাড়ীর ফলটি আনাজটি আনিয়া মায়ের সেবায় দিয়া যাইত। মায়ের প্রয়োজন হইলে, অন্যের দুঃসাধ্য কার্য্য তাহা যত চেষ্টা, যত কষ্ট করিয়াই হউক, সে ঠিকই হাসিল করিয়া দিত। কোন দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে যেমন করিয়াই হউক সে তাহা সংগ্রহ করিয়া দিত। মায়ের স্নেহে এবং গুণে মুগ্ধ হইয়া সে যেন তাঁহার ক্রীড়াপুত্তলীতে পরিণত হইয়াছিল।

আরও দশজন গৃহী এবং সাধুর ন্যায় আমজাদও মায়ের সন্তান। অনেককাল না আসিলে মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহার সংবাদ লইতেন; আসিলে তাহাকে আদরযত্ন করিতেন, মুসলমান এবং দুর্জ্জন বলিয়া দূরে রাখিতেন না। আত্মীয়গণ স্বভাবতঃই ইহা আপত্তিজনক মনে করিতেন, তথাপি মা তাহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার অধিকারও দিয়াছিলেন। মাতৃসন্দর্শনে আসিলে ভোজ্য, বস্ত্র এবং নানাবিধ দ্রব্য তাহার লাভ হইত। ততোধিক, মাতৃদর্শনে সে অন্তরে অনাবিল আনন্দ অনুভব করিত, মায়ের স্নেহে সে শিশুর মত সরল হইয়া যাইত। আমজাদ নিশ্চিত জানিত যে, এই মা ব্যতীত তাহার নিঃস্বার্থ হিতৈষী আর কেহই নাই, তাহার আপন বলিতে পৃথিবীতে একমাত্র মা-ই আছেন।

নিকুঞ্জবালা দেবী বলিয়াছেন,—

একদল সাপুড়িয়া একদিন জয়রামবাটীর গ্রাম্যপথে ডুগডুগী বাজাইয়া যাইতেছিল। তাহারা যখন শ্রীশ্রীমায়ের বাটীর নিকট আসিল, ডুগডুগীর শব্দ শুনিয়া সাপের খেলা দেখিবার জন্য মায়ের বালিকার ন্যায় কৌতূহল জন্মিল। কাহাকেও নিকটে দেখিতে না পাইয়া নিজেই সাপুড়িয়াদের ডাকিলেন এবং তাহাদের পারিশ্রমিক ধার্য্য না করিয়াই বলিলেন,—খুব ভাল ভাল খেলা দেখাও, তোমাদের খুশী ক'রে বখশিস্ দেবো।

ছোটবড় প্রতিবাসীরাও আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঁশী বাজাইয়া সাপুড়িয়ারা নানারকম খেলা দেখাইল। খেলাসমাপ্তি হইলে, মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দুইটি টাকা ও একখানি বস্ত্র দিলেন এবং মুড়িগুড় খাইতে দিলেন। বিদায়কালে দলপতি মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। মা-ও তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ইহাতে এক মামী অসন্তুষ্ট হইয়া বলেন,—সাপুড়েকে টাকা দিয়েছ, কাপড় দিয়েছ, খেতে দিয়েছ, এই তো বেশ। ওদের আবার ছোঁয়া কেন বাপু! সারাক্ষণ সাপ নিয়ে থাকে, সাপের বিষ হাতে লাগে, ওদের কখনো ছুঁতে আছে?

শ্রীশ্রীমা কাঁচুমাচু হইয়া বলিলেন,—কি করি বলো? লোকটা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে, আমি কি ক'রে বারণ করি? প্রণামই যদি করলে, আর আমি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করবোনি? তোমাদের এ কেমনতর কথা!

বিদেশীয় বা অন্যধর্ম্মীয় ভক্ত নরনারী সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা মায়ের নিকট যাতায়াত করিতেন বলিয়া আত্মীয়স্বজন কেহ কেহ আপত্তি এবং অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু মা বলিতেন,—ভক্তের জাত নেই। ওরা মা ব'লে আমার কাছে আসে, কত ভক্তি ওদের, ছাড়ি কি ক'রে বলো?

তৎকালীন ইংরাজ-সরকার ভারতের স্বাধীনতাকামীদের উপর কিরূপ নির্ম্মম নির্য্যাতন করিতেন এবং কিভাবে ইংরাজ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পৃথিবীর দুর্ব্বল ও নিরস্ত্র দেশকে শোষণ করিয়া থাকেন, তাহার করুণ ইতিহাস বিবৃত করিয়া বিপ্লবী সন্তানগণ কেহ কেহ শ্রীশ্রীমায়ের চিত্ত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে প্রয়াস পাইতেন, এবং কাতরভাবে প্রার্থনা করিতেন,—মা, তুমি একবারটি মুখ দিয়ে বলো, 'ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক।'

সন্তানদিগের মর্ম্মজ্বালা অন্তরে অনুভব করিয়াও মা বলিয়াছিলেন,—আমি মা হ'য়ে মানুষকে উচ্ছন্নে যেতে কি ক'রে বলবো, ইংরেজ কি আমার সন্তান নয়? আমি বলি, সকলেরই কল্যাণ হোক।

জনৈক ভক্তিমতী বুয়র রমণী মায়ের দর্শনে আসিতেন। তাঁহার প্রসঙ্গে একদিন মা বলেন,—ঠাকুর যেন দু'হাতে কতকগুলো সরষে এমনি ক'রে (হাত দিয়া দেখাইয়া) চারদিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। পৃথিবীর নানান দেশে গিয়ে পড়েছিলো সে-সব সরষে, তাই থেকে গাছ হ'য়ে সেই সেই দেশের জলবায়ুতে পুষ্ট হ'য়ে আবার এসে মিলেছে এখানে।

একদিন দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীমা মাদুরে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। ভগিনী দেবমাতা তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে কোন সময় অন্যমনস্কতা-বশতঃ একেবারে মায়ের গাত্রসংলগ্ন হইয়া তদ্গতভাবে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন। শ্রীশ্রীমাকে তিনি সর্ব্বদাই অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করিয়া চলিতেন; কিন্তু এইদিন দেখিলাম, মা যে ধর্ম্মগুরু, পূজনীয়া, আর তিনি যে বিদেশিনী ধর্ম্মার্থিনী,—এই কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছেন। সকল সম্ভ্রম, সকল ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া স্নেহাশ্রিতা কন্যার ন্যায় তিনি নিঃসঙ্কোচে মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, আর মাতাও তাঁহাকে একান্ত আপন করিয়া লইয়াছেন। আজ যেন তাঁহারা গুরু-শিষ্যা নহেন, স্নেহময়ী মাতা-পুত্রী।

জগৎপ্রসবিনী জগদম্বার অসীম করুণা সমগ্র জগতে বিকীর্ণ হইয়া আছে,—সকল সময় সকলের তাহা উপলব্ধ হয় না। সেই বিকীর্ণ করুণাধারাগুলি যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল মায়ের তপোভাস্বর সত্ত্বশুচি অন্তরে, জগদম্বার অসীম মহিমা যেন সীমায় মূর্ত্ত হইয়াছিল মায়ের জীবনে। ফলে, জগজ্জননীর অপার করুণা ও অনন্ত মহিমা জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপলব্ধিগম্য হইয়াছিল।

ধন্য শ্রীশ্রীমায়ের করুণা, আর ধন্য সেইসকল নরনারী যাঁহারা এই করুণাধারার কিঞ্চিৎ আস্বাদন করিবারও সৌভাগ্য পাইয়াছেন।

আমাদের মাতা কি দেবীরূপা মানবী, অথবা মানবীরূপে দেবী?

মানবীকে যে-সকল শ্রেষ্ঠ গুণ মহত্ত্বে উন্নীত করে, উন্নীত করে দেবীত্বে, সেই সমস্ত গুণের তিনি অধিকারিণী ছিলেন। বিশ্বজননীই মা-সারদার মানবীরূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন কি-না, তাহারই কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস এইপ্রসঙ্গে দিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সাধারণতঃ 'আমি' বা 'আমার' শব্দও প্রয়োগ করিতে পারিতেন না। তথাপি ভাবমুখে কদাচিৎ তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। নিজদেহ দেখাইয়া তিনি বলিয়াছেন, "দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর হৃদয়মধ্যে যিনি আছেন এক ব্যক্তি।" ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়াও তিনি বলিয়াছেন, শীঘ্রই "আর একবার আসতে হবে।" লীলা-সম্বরণের পূর্ব্বক্ষণেও যখন নরেন্দ্রনাথের মনের গোপন কোণে গুরুর স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, তখন দ্ব্যর্থহীন ভাষাতেই ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ।"

কিন্তু শ্রীশ্রীমা এই বিষয়ে অতিশয় সাবধান থাকিতেন। স্বীয় মহাভাব এবং বিভূতি তিনি যথাসাধ্য গোপন রাখিতেন। সংসারের সাধারণ নারীরূপে তিনি নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতেন, মাতৃরূপে অকাতরে অগণিত সন্তানের উপর স্নেহাশিস বিতরণ করিয়াছেন, আবার গুরুরূপেও ধর্ম্মার্থীদিগকে উপদেশ দান করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, ইহার আভাসমাত্র প্রকাশ করিতেও তিনি বিরত থাকিতেন।

অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ঠাকুরের ভাবসমাধি পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশ্রীমায়ের ভাবসমাধি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়াছে। অগাধ সমুদ্রের মণিমুক্তার ন্যায় তাহা গহন অন্তস্তলেই প্রচ্ছন্ন থাকিত, বাহিরে প্রকাশ হইতে দিতেন না; এমন বিরাট শক্তির আধার ছিলেন আমাদের মা।

কোন কোন ভক্ত বা ভক্তিমতী তাঁহার মধ্যে যে ঈশ্বরীর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার দুই-চারিটি ঘটনা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন অসতর্ক মুহূর্ত্তে তাঁহার স্বমুখে স্বীয় স্বরূপসম্বন্ধে যে উক্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, যে কণামাত্র ইঙ্গিত আমরা পাইয়াছি বা বুঝিয়াছি, তাহারই দুই-একটি এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি।

বলরাম-ভবনে একদিন 'দক্ষযজ্ঞ' পালা হইতেছিল। মাতাঠাকুরাণী, গৌরীমা, গোলাপমা, অসীমের মা-প্রমুখ মায়েরাও উপস্থিত ছিলেন। কথা ও গীতসহযোগে পরপর ঘটনার বর্ণনা চলিতেছে।—প্রজাপতি দক্ষের মনে হইয়াছিল দারুণ অভিমান, তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীর পতি দেবাদিদেব শিব,শ্বশুরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন না। জামাতাকে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দক্ষ এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবতা, ঋষি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন ; করিলেন না কেবল কন্যা ও জামাতা —সতী ও শিবকে।

দক্ষেরই চক্রান্তে এবং নারদ ঋষির দৌত্যে শিবহীন যজ্ঞের সংবাদ গিয়া পৌঁছিল কৈলাসে। শিব তাহাতে নির্ব্বিকার, কিন্তু সতীর প্রাণে লাগিল আঘাত,—পতির অপমান ; দ্বিতীয়তঃ নিজেও পিতৃগৃহের উৎসবে যাইতে পারিবেন না। মনের কৌতূহল এবং দুঃখ লইয়া গিরিশৃঙ্গে যাইয়া সতী চাহিয়া দেখেন, একে একে জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া নিজ নিজ পতির সহিত যাইতেছেন পিত্রালয়ে কত উল্লাসভরে! তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠা, অথচ তিনিই রহিলেন বঞ্চিতা ; অতি দুঃখে নিজের মনেই বলেন,—হায় রে! দিদিরা যে-যা'র চ'লে গেল, আমারই কেবল যাওয়া হলো না।

এদিকে বলরাম-ভবনে স্তব্ধ আসর ; ভাবগাম্ভীর্য্যে এবং অভিনয়-নৈপুণ্যে শ্রোতৃবর্গ অভিভূত, সতীর ব্যথায় সকলেরই প্রাণে বাজে ব্যথা, ছলছল করে চক্ষু। সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত কাঁপিয়া উঠে শ্রীশ্রীমায়ের দেহ। সখেদে তিনি বলিয়া উঠিলেন,— হায় রে! দিদিরা যে-যা'র চ'লে গেল, আমারই কেবল যাওয়া হলো না।

মুহূর্ত্তমধ্যে সঙ্গিনীগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাঁহার দিকে—শ্রীশ্রীমায়ের তন্ময় অবস্থা, মুখমণ্ডল বিষাদপূর্ণ। তাঁহার স্বীকারোক্তির সূত্র ধরিয়া গৌরীমা বলেন,—কি হলো এবার, ধরা দিয়ে ফেললে! উল্লাস প্রকাশ করেন সঙ্গিনীগণ।

মা সঙ্কুচিত হইয়া নীরবে মিনতি জানাইলেন,—তোমরা চুপ কর।

কালীমামা বলিয়াছেন,—

জননী শ্যামাসুন্দরী দুঃখ করিতেন,—মানুষ মেয়েজামাই নিয়ে কত আমোদ-আহ্লাদ করে, ভাল ভাল খেতে-পরতে দেয়, আমার ভাগ্যে তা' আর হলোনি। এমন পাগল জামাইয়ের হাতেই সারদাকে সঁপে দিয়েছি যে, ঘরসংসার সুখভোগ তা'র কোনদিন হলোনি। কা'কে নিয়ে হবে? সে পাগল তো দিনরাত নিজের ভাবেই মত্ত হ'য়ে আছে। আমার মেয়ের সুখশান্তির কথা ভাববার অবসর তা'র কৈ? এত দুঃখুও ছিল মেয়েটার কপালে!

জননীর খেদ এবং পতির নিন্দা শুনিতে শুনিতে একদিন কন্যা রুখিয়া উঠিয়া কপালে চক্ষু তুলিয়া বলেন,—দ্যাখো, আমার কাছে বার-বার তুমি পাগল পাগল করোনি, ব'লে দিচ্ছি। একবার পতিনিন্দায় দেহ ছেড়েছি, আবার কি তুমি তাই দেখতে চাও?

শান্তশীলা কন্যার উগ্রমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া শ্যামাসুন্দরী স্তম্ভিত হইলেন, শঙ্কিত হইলেন। অতঃপর আর কোনদিন তিনি কন্যার সমক্ষে জামাতার নিন্দা করেন নাই।

শিবরামদাদা বলিয়াছেন,—

একদা সূর্য্যাস্তকালে নির্জ্জন পল্লীপ্রান্তর দিয়া চলিয়াছেন শ্রীশ্রীমা এবং শিবরাম। পশ্চাৎ হইতে শিবরামের মনে হইল, খুড়িমা মানবী নহেন, স্বয়ং ভগবতী; ডাকিয়া বলেন,—দাঁড়াও গো, শোন একটা কথা।

পশ্চাতে চাহিয়া মা দেখেন, শিবরাম নিশ্চল দণ্ডায়মান; বলেন,—দাঁড়িয়ে কেন রে? চ'লে আয় শীগ্গির ক'রে।

—না, আগে বলো, তুমি কে?

—ওমা, এ আবার কেমনধারা কথা! কি হয়েছে তোর?

—না, তুমি কে, সত্যি ক'রে বলো আমায়। নইলে এক পা নড়ছিনে আমি।

—আমি কে, তুই জানিসনে বুঝি? আমি তো তোর খুড়িমা।

—উ-হুঃ, তুমি মানুষ নও।

—তবে কি আমি মা-কালী, চারটে হাত দেখেছিস আমার?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাই, তুমি নিজের মুখ দিয়ে বলো একবার।

—যা' দেখেছিস সত্যি, আমি কালী।

আর এক কথা।

শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাবের প্রাক্কালে জনক রামচন্দ্র দর্শন করিয়াছিলেন,—দেবী জগদ্ধাত্রী তাঁহার গৃহে কন্যারূপে আগমন করিবেন। শ্রীশ্রীমা বাল্যকালেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী তাঁহার ইষ্টদেবী। অবশ্য, অন্য মন্ত্রও তিনি জপ করিতেন। জননী শ্যামাসুন্দরী যেদিন স্বপ্নে দেবী জগদ্ধাত্রীর দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে তাঁহাদের গৃহে যথাবিধি এই দেবীর পূজার অনুষ্ঠান হইয়া আসিতেছে। শ্রীশ্রীমা অতি নিষ্ঠাভক্তির সহিত তাঁহার পূজা সম্পন্ন করিতেন; এমন-কি পূজা যাহাতে ভবিষ্যতেও কোনপ্রকারে ব্যাহত না হয় তজ্জন্য উপযুক্ত এবং স্থায়ী ব্যবস্থা তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

শ্রীশ্রীমা শৈশব হইতেই মাতৃত্বের প্রতিমূর্ত্তি, বিবাহিত হইয়াও তিনি অসঙ্গা, পবিত্রতার মূর্ত্ত বিগ্রহ। অধিকন্তু, ঠাকুরের শ্রীমুখে গৌরীমা যাহা শুনিয়াছেন, এবং শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে,দেবী জগদ্ধাত্রীই জগতে মাতৃভাব প্রচার করিতে এবং নারীর মধ্যে দেবীত্ব,বিশেষ করিয়া কৌমারী-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে জগতে সারদা-জননীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী দেবী জাতিধর্ম্মের, স্থানকালের অতীত লোকের অধিষ্ঠাত্রী,—কল্যাণময়ী জগজ্জননী।

নিত্যমিলন

শ্রীশ্রীমাতা সারদেশ্বরী এইবার মর্ত্ত্যলীলা সাঙ্গ করিয়া নিত্যধামে প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। একদিন ঠাকুরের পটখানি বক্ষে চাপিয়া বলেন,—জীবের জন্যে অনেক দুঃখ সয়েছি, এখন আমি তোমার কাছে যাবো। মানুষের পাপতাপের গ্লানি মা নিজদেহে গ্রহণ করিয়াছেন। ইদানীং তাঁহার নরদেহ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। লোকাকীর্ণ কলিকাতায় তাঁহার মন আর স্বস্তি পাইতেছিল না। প্রকৃতির নিভৃত নিকুঞ্জ, পল্লীর অনাবিল প্রশান্তি যেন তাঁহার শ্রান্ত দেহমনকে আকর্ষণ করিতেছিল।

শ্রীশ্রীমা ১৩২৩ সালের জন্মতিথির পর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া পল্লীভবনে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইল না। বাতের কষ্ট তো ছিলই, তদুপরি মধ্যে মধ্যে জ্বরেও আক্রান্ত হইতেন। তথাপি পরবর্ত্তী জগদ্ধাত্রীপূজা মায়ের নূতন বাটীতে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। তদুপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে অনেক ভক্ত মাতৃ-দর্শনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ অবনতির দিকে যাইতে থাকে। নিজের দেহ সম্বন্ধে তিনি উদাসীন ছিলেন, ইদানীং আরও উদাসীন হইয়া উঠিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া এই সময় গৌরীমা জয়রামবাটী আগমন করেন। স্থানীয় চিকিৎসায় মায়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি হইতেছে না এবং দেহসম্বন্ধে তাঁহার উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া গৌরীমা কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামী সারদানন্দকে সকল অবস্থা জ্ঞাত করাইলেন। চিকিৎসকগণসহ সারদানন্দজী জয়রামবাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার কাঞ্জিলালের চিকিৎসায় কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলে সারদানন্দজী তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। কিন্তু মা কলিকাতায় ফিরিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা তাঁহারা বিফলমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন।

এই বৎসরের শেষভাগে কোয়ালপাড়ায় গিয়া মা কিছুকাল বাস করেন। সেখানে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। ক্রমে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এই সংবাদ পাইয়া পুনরায় সারদানন্দজী জনৈক চিকিৎসককে সঙ্গে লইয়া কোয়ালপাড়ায় পৌঁছিলেন। তাঁহার এবং ভক্তগণের ব্যাকুলতা উপলব্ধি করিয়া ১৩২৫ সালের প্রথম ভাগে মা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

মাতৃভবনে একদিন শ্রীশ্রীমা পদযুগল প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছেন, কন্যাগণও চারিদিকে উপবিষ্ট; আশুবাবুর মা, সুরমা এবং তাঁদের একটি কন্যাও উপস্থিত। মা মুড়িমটরভাজা সহ জলযোগ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে কন্যাগণের হাতেও দুই-এক মুঠা দিতেছেন। এমন সময় মা বলিলেন,—দেখ মা, আমি জীর্ণ হয়েছি, গৌরমণিও জীর্ণ হয়েছে, আমরা সব বৃদ্ধ হয়েছি। বটগাছগুলো বুড়ো হ'য়েও মরে না, তা'দের ঝুরি নাবে; নেবে মাটির সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আবার রসপুষ্ট হয়, মূল গাছকে বাঁচিয়ে রাখে। তোমরা রইলে এই গাছের ঝুরি।

আমরা সকলে নীরব, হাতের মুড়িমটরভাজা হাতেই নিবদ্ধ। মায়ের মুখপানে অপলকদৃষ্টিতে সকলে চাহিয়া আছি।

কিছুক্ষণ পরে মা ভাবাবেশে আবার বলিতে লাগিলেন,—প্রচার কর মা, জনে জনে * * নাম বিলিয়ে দাও, মেয়েরা কোটিতে গুটিক কেউ যেন সব ছেড়ে নিঃসঙ্গ হ'য়ে ঠাকুরকে ধরে। মেয়েদের বুঝিয়ে দিও, তা'রা কেবল থোড়বড়িখাড়া, আর খাড়াবড়িথোড় করতে আসেনি, তা'রাও সন্ন্যিসী হ'তে পারে, ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে। এজন্যই ঠাকুর এবার স্ত্রীগুরু গ্রহণ করেছেন, মাতৃভাব প্রচার করেছেন।

এইসময় শ্রীশ্রীমা পুনরায় একদিন ঠাকুরের পটখানি বক্ষে ধারণ করিয়া বলেন,—ঠাকুর, আমি এখানে আর থাকবো না, তোমার কাছে চ'লে যাবো।

ইহার কিছুদিন পরই মা পুনরায় জয়রামবাটী যাত্রা করেন।

১৩২৬ সালে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পল্লী ভবনেই অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় কলিকাতা হইতে কোন কোন ভক্ত মাতৃদর্শনে তথায় আগমন করেন। পুনঃপুনঃ জ্বরে ভুগিয়া মা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থাতেও তিনি দীক্ষার্থীদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। স্থানীয় চিকিৎসাতে জ্বর এবং দুর্ব্বলতার বিশেষ কোন উপকার না হওয়ায় তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার চেষ্টা হইল, কিন্তু তিনি আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বামী সারদানন্দ মাতৃভবনে উপস্থিত না থাকিলে তথায় বাস করা শ্রীশ্রীমা সমীচীন বোধ করিতেন না। সারদানন্দজী এইসময় কলিকাতায় অনুপস্থিত ছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া মায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা অবগত হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং কয়েকজন সেবককে জয়রামবাটীতে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের নিকট মাতৃগতপ্রাণ সারদানন্দজীর মিনতি শ্রবণ করিয়া মা ১৩২৬ সালের ফাল্গুন মাসে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন।

এইবার মায়ের জয়রামবাটী-ত্যাগ একটি বিশেষ ঘটনা। যাত্রার প্রাক্কালে কয়েকটি বাধাবিঘ্নের উদয় হইল, কাহারও কাহারও মন অজ্ঞাতকারণে, অনাগত বিভীষিকায় শঙ্কিত হইল, আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথায় অনেকেরই নয়ন অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। যাত্রাকালে মা পল্লীর দেবদেবীর উদ্দেশে করজোড়ে প্রণাম জানাইয়া প্রিয় জন্মভূমি হইতে বিদায় লইলেন।

শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া কলিকাতায় আসিতেছেন জানিয়া অনেক ভক্ত সেদিন হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। মায়ের শীর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ দেহখানি দেখিয়া অনেকেই অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অবস্থাদর্শনে মনে এই আশঙ্কাই জাগিল, স্নেহময়ী মাতাকে আর অধিককাল বুঝি নরদেহে দর্শন করিতে পাইব না।

মায়ের চিকিৎসা আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ ডাক্তার কাঞ্জিলালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, তৎপর কবিরাজ-শিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসায় থাকিয়াও স্বাস্থ্যের বিশেষ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। তবে, কবিরাজী চিকিৎসায় পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন;

কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে জ্বালা, কোন পথ্যেই রুচি নাই। এইভাবে কিছুকাল চলিবার পর জ্বর আবার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া দর্শনার্থী ভক্তগণ দলে দলে আসিতেন। অতি প্রত্যূষ হইতেই অনেকে সমাগত হইতেন মাতৃ-ভবনে। ভক্তিমতীগণ সাধ্যমত নানাভাবে মায়ের সেবা করিতেন।

আশ্রম তখন দূরে নহে, শ্যামবাজারে; মনের উদ্বেগে প্রাতঃকালেই গৌরীমার সহিত মাতৃভবনে চলিয়া যাইতাম। অনেকদিনই ফিরিতে অধিক রাত্রি হইত। শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া কিছু সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ হইত, মায়ের মুখারবিন্দ দর্শন করাও ছিল এক প্রবল আকর্ষণ। দ্বিপ্রহরে একবার করিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে হইত, ঠাকুরের পূজাভোগ এবং অন্যবিধ প্রয়োজনে। আবার কোন কোন দিন রাত্রিতে মায়ের চরণতলেই পড়িয়া থাকিতাম। মনের অবস্থা তখন এমন যে, কিভাবে দিবারাত্র আসিতেছে, যাইতেছে, বুঝিতে পারিতাম না।

মায়ের স্বাস্থ্যের অবস্থা ক্রমে গুরুতর হইল। সন্তানগণের দর্শন এবং দীক্ষাদান সম্পর্কে অনেক বিধিনিষেধ হইল। দূর দূরান্ত হইতে কত সন্তান আসিতে লাগিলেন মাকে দর্শন করিতে। যেদিন মা অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকেন সকলের মনে আশা-আনন্দ জাগিয়া উঠে, আবার কোনদিন অবস্থা খারাপ হইলেই নিভিয়া যায় সকল আশা, সকল আনন্দ। এমনই আশা-নিরাশার মধ্য দিয়া চলিতে থাকে সন্তানগণের দিন।

এই অবস্থাতেও কৃপালাভের আশায় দীক্ষার্থীরা আসিয়া উপস্থিত হইতেন। একদিন এক মহিলা মনে অনেক আশা লইয়া আসিলেন; মায়ের নিকট দীক্ষা লাভ হইলে মুক্তি সুনিশ্চিত, ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস। সেবকগণ জানাইলেন, শ্রীশ্রীমা অসুস্থ, তিনি এখন আর কাহাকেও দীক্ষা দিবেন না। নৈরাশ্যে এবং দুঃখে মহিলা কাঁদিতে লাগিলেন। মা কিন্তু যে-ভাবেই হউক ইহা জানিতে পারিয়াছেন, গোলাপমাকে আস্তে আস্তে বলিলেন,—গোলাপ, আর তো বেশীদিন নেই, একটি বউ সিঁড়ির কাছে বসে কাঁদছে, তা'কে নিয়ে এসো-না তুমি।

গোলাপমা নীচে আসিয়া দেখেন,—মহিলা আড়ষ্টভাবে সিঁড়ির কাছে পড়িয়া আছেন। নিকটে আর কেহ নাই, এই সুযোগে গোলাপমা তাঁহাকে মায়ের নিকট উপস্থিত করিলেন। মা ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন,—মা, আচমনের প্রয়োজন নেই, তিনবার শুধু শুনে নাও। আর কাউকে যেন বলো না; দীক্ষাদান ছেলেরা বারণ ক'রে দিয়েছে।

মহিলার দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল এবং মায়ের নির্দ্দেশে এক কন্যা তাহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া বুঝাইয়া দিল। মায়ের করুণালাভে সেই ভাগ্যবতী মহিলা পরম কৃতার্থ হইলেন। নিজের অসুস্থতার কথা ভুলিয়া গিয়া মা কিভাবে নিজেকে জীবের কল্যাণে বিলাইয়া দিতেন, তাহা ভাবিয়া বিস্ময়ে মুগ্ধ হইতাম।

একদিন পারস্য-প্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী দীক্ষিত সন্তান মাতৃদর্শনের উদ্দেশ্যে মাতৃভবনে আসিয়া উপস্থিত। মায়ের অসুস্থতার কথা তিনি পূর্ব্বে জানিতেন না। যখন শুনিলেন, মায়ের দর্শনে নিষেধ আছে, তিনি হতাশায় বসিয়া পড়িলেন; বলিলেন,—ভাগ্য আমার প্রতিকূল, মায়ের দর্শন আমি আর পাবো না। এমন সময় একজন সেবিকা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দূর দেশ থেকে কোন ছেলে এসেছে কি? মা ডাকছেন তা'কে। মা সন্তানকে দর্শন দান করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। সন্তানও মাকে দর্শন এবং প্রণাম করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কিন্তু দেখিয়া অবাক হইতাম, এইরূপ অসুস্থতার মধ্যেও করুণাময়ী মাতার অন্তরের স্নেহপ্রীতি মন্দীভূত হয় নাই। এই অবস্থাতেও তিনি সন্তানদিগের সংবাদ লইতেন, চিকিৎসকগণের আদর-আপ্যায়ন যথারীতি হইল কি-না সেদিকে দৃষ্টি রাখিতেন।

শেষ-কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁহার শারীরিক অবস্থা যখন মন্দের দিকে, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী অদ্ভুতানন্দ, রামকৃষ্ণ বসু ও তৃতীয় সহোদর বরদাপ্রসাদ লোকান্তর গমন করেন; ইঁহাদের জন্য মায়ের মন অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিল।

মহাযাত্রার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে যখন দুর্ব্বলতায় তাঁহার কণ্ঠ

ক্ষীণতর হইয়াছে, তখনও একদিন দীক্ষাদানের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—সন্ন্যিসীর দীক্ষাদানে জাতবিচার নেই, উত্তম অধম, সাধু অসাধু, সকলকেই দীক্ষা দেওয়া যায়; যে ধর্ম্মপিপাসু হ'য়ে আসবে, তা'কেই ধর্ম্মলাভে সাহায্য করতে হয়, এতে জগতের কল্যাণ।

হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক, কবিরাজী, কোন চিকিৎসাতেই কিছু হইল না। মায়ের যে কি ব্যাধি, তাহা সঠিক নির্ণীত হইয়াছিল কি-না জানি না; আজ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারি নাই, কোন্ ব্যাধিতে মায়ের দেহত্যাগ হইল। শেষের দিকে জ্বরের আর বিরাম হইত না, কোনপ্রকার পথ্যই মা গ্রহণ করিতে চাহিতেন না, শিশুর মত বায়না করিতেন। দেহে অসহ্য জ্বালা; যাহার দেহ শীতল, মা অনেকসময় তাহার দেহের স্পর্শ চাহিতেন। মায়ের গায়ে হাত দিয়াই বুঝিতে পারিতাম, তাঁহার দেহে কী প্রদাহ, তাঁহার কত কষ্ট!

এইসময় একদিন মা বলিলেন,—ঠাকুর বলেছিলেন, 'জীবের জন্যে আমি শত দুঃখ সয়েছি। তুমিও তা'দের একটু দেখো।' তাই, যেখান থেকে যে এলো আমি আর কারুকে বারণ করলুমনি, সবাইকে নাম বিলিয়েছি। মানুষের পাপেতাপে এই দেহটা জ্বলে গেল। কাঠিতে (থার্মোমিটারে) কি জ্বর পাবে মা! আমার এ অন্তঃজ্বরা।

অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইত মায়ের এইরূপ কথা শুনিয়া।

তাঁহার লীলাসম্বরণের ইঙ্গিত দিন দিন সুস্পষ্ট হইতে লাগিল।

একদিন ছোটমামী ও রাধারাণীকে ডাকিয়া মা বলিলেন,—আমি চ'লে গেলে তোমরা দেশের বাড়ীতে ফিরে যেও। মায়ের এই কথা শুনিয়া রাধারাণী কাঁদিতে লাগিল, বুঝিল, পিসিমা আর ইহজগতে থাকিবেন না। শরৎ মহারাজ ও যোগেনমা রাধুকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—রাধু, কাঁদিসনি, ঠাকুরকে বল, মা থাকুন।

গৌরীমাকে একদিন মা বলিলেন,—আমার তো, যাবার সময় হ'য়ে এলো, * * দেহান্তে তুমি আমার অস্থি আশ্রমে নিয়ে রেখো। পাঁচখানা বাতাসা নিত্য ভোগ দিলেই হবে।

মাতৃহারা হইবার আশঙ্কায় গৌরীমা কাঁদিতে লাগিলেন এবং এইরূপ ইঙ্গিতের জন্য দুঃখ করিলে, শিশুর ন্যায় আবদার করিয়া মা বলিলেন,—না, না, না, আমি আর থাকবো না, আমি ঠাকুরের কাছে চলে যাবো।

সারদানন্দজী একদিন শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়কে দিয়া মায়ের নিকট অনুরোধ জানাইলেন। তিনি অনুরোধ করিলেন,—মা, আপনি যদি ইচ্ছে করেন আরো কিছুকাল থাকবেন, তবেই আপনার দেহ রক্ষে পাবে। আপনার শত শত সন্তানের ইচ্ছে, আপনি থাকুন।

মা কাতরভাবে বলিলেন,—না বাবা, আমার আর থাকা হবে না। আমি এইবার ঠা-কু-রে-র কাছে চ'লে যাবো।

এইকালের একটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

আসাম-গৌরীপুরের রাজকুমারদিগের গৃহশিক্ষক আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পরম ভক্ত। শ্রীশ্রীমাকে অতিশয় ভক্তি করিতেন। একবার তিনি লেখিকার নিকট স্বীকৃতি আদায় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অন্তিমকালে গৌরীমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে একদিন সংবাদ আসিল, আশুতোষ অসুস্থ, গৌরীমাকে সেইদিনই একবার দর্শন দিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভক্তের অন্তিমকালে গৌরীমা গিয়া উপস্থিত হইলেন। মুমূর্ষু বৃদ্ধ নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন,—মা এসেছো, বেশ হলো। আমার ডাক এসেছে, এবার আমি চল্লুম। মা-ঠাকরুণ যাবেন, আমি তাঁর ঝাড়ুদার, পথের ধূলোকাঁকর ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে রাখতে হবে। নইলে যে মায়ের পায়ে ব্যথা লাগবে। ভক্তিমহারাণী সারদা-জননী যাবেন, আমি আগে গিয়ে তাঁর জন্যে 'মছলন্দ' পেতে রাখবো। আমি চল্লুম।

সত্যই শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধির কয়েকদিবস পূর্ব্বেই, সজ্ঞানে ঠাকুরের নাম করিতে করিতে এই ভক্তসন্তানটি শ্রীশ্রীমায়ের গমনপথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেই যেন এই মরজগৎ হইতে বিদায় লইলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্য সারদানন্দজীর কী কাতরতা, তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য কতরকম তাঁহার প্রয়াস! কত লোককে তিনি মিনতি করিয়া বলিয়াছেন,—ওগো, তোমরা সবাই প্রার্থনা করো, মা-ঠাকরুণ যা'তে আরো কিছুকাল দেহে থাকেন। মায়ের রোগমুক্তির কামনায় তিনি শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি করাইলেন, পূজা করাইলেন। গৌরীমাও কালীঘাটে কালীপূজা এবং আশ্রমে চণ্ডীপাঠ ও নামযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। জনৈকা কন্যা ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া বাবা তারকনাথের নিকট ধরণা দিলেন। আদেশ হইল,—আমিই জগতের কল্যাণে দেহধারণ করিয়াছিলাম, কাজ ফুরাইয়াছে, এবার আপন দেহ আপনি আকর্ষণ করিব।

শ্রীশ্রীমাতার মনোভাবেরও কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইল না। আহারে অরুচি আরও বৃদ্ধি পাইল। যে-খাদ্য তাঁহার নিকট রুচিকর বলিয়া মনে হইত, চিকিৎসকগণ তাহার অনেক কিছুতেই আপত্তি করিতেন। লীলাসম্বরণের চারি-পাঁচ দিন পূর্ব্বে গৌরীমার নিকট মা আনারস খাইতে চাহিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণ তাহাতেও আপত্তি করিলেন। আহারে রুচি এবং স্বাস্থ্য কোনটারই উন্নতি দেখা গেল না। অবস্থা ক্রমশঃই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। একদিন জনৈকা ভক্তিমতীকে তিনি সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—তোমরা দুঃখু করো না, আমায় যেতে হবে।

জীবের প্রতি করুণা করিয়া যে-মনকে শ্রীশ্রীমা এতদিন মর্ত্ত্যের কল্যাণে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, মরজগতে সে-মন আর থাকিতে চাহিতেছে না, থাকিবে না। মাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য শত শত প্রাণের আকুতিভরা প্রার্থনা ব্যর্থ হইতে চলিল। চরম দুর্দ্দিনের কথা ভাবিয়া, মাতৃবিহীন জগতের কথা ভাবিয়া সন্তানগণের যেন চতুর্দ্দিক অন্ধকার মনে হইত। মা একবার অপ্রকট হইলে আর তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দর্শন করা যাইবে না, মায়ের শ্রীমুখের বাণী আর শ্রবণ তৃপ্ত করিবে না, তাঁহার শ্রীচরণ আর স্পর্শ করা যাইবে না,—এইরূপ চিন্তা সকল সন্তানকেই দুঃসহ ব্যথায় অধীর করিতে লাগিল। মন হইতে এই চিন্তা দূর করিবার

প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও চিন্তা দূর হয় না, ভাবিতে না চাহিলেও এই ভাবনা বারবার মনকে আকুল করে।

একদিন, দুইদিন করিয়া ধীরে ধীরে কালরাত্রি অগ্রসর হইতে লাগিল। যে দিনটি মাকে পাওয়া যায়, সেটিই যেন পরম লাভের; পরবর্ত্তী দিবসের জন্য শুধুই আশঙ্কা, কি ঘটিবে কে জানে! এমন চরমক্ষণেও কল্যাণময়ী মাতা একদিন অতি করুণার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা,—আমার ভালবাসা, আমার আশীর্ব্বাদ সকলের ওপর আছে।"

শ্রাবণ মাস। ব্যথাক্লিষ্ট ধরণীর সকল অশ্রু আহরণ করিয়া যেন আকাশতলে গিয়া জমিয়াছে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। যে-কোন মুহূর্ত্তে আরম্ভ হইবে বর্ষণ অবিরল ধারায়। মানুষ বর্ষার পরে শরৎকালে গায় মায়ের আগমনী, এইবার আগমনীর পূর্ব্বেই বিজয়া, বেহাগের করুণ সুরে কাঁদিবে পৃথিবী,—এই নিষ্ঠুর আশঙ্কাই সন্তানদিগের মনে দৃঢ় হইল।

দেখিতে দেখিতে ১৩২৭ সালের ৪ঠা শ্রাবণ, মঙ্গলবারের দণ্ড পল একটি একটি করিয়া কাটিতে লাগিল। সকল কার্য্যই নিষ্পন্ন হইতেছে, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ কোথাও নাই; না করিলে নয়, তাই যেন যন্ত্রের মত সকল কার্য্য চলিতেছে। মহানিশা ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল। গভীর নিস্তব্ধতা যেন পাষাণের মত বুকে চাপিয়া বসিয়া আছে। ক্রমে মহাপ্রয়াণের চরমতম নির্ম্মম ক্ষণ উপস্থিত হইল। রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকা। শ্রীশ্রীমাতা সারদেশ্বরী মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণ করিয়া তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত নিত্যধামে মিলিতা হইলেন।

এক দিব্য জ্যোতিতে মায়ের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত, মনে হইল, স্নেহময়ী মাতা তাঁহার সন্তানদিগের জন্য এখনও দেহেই প্রতীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু যে মা সন্তানদের সামান্য দুঃখ সহিতে পারিতেন না, যে মা কাহারও এতটুকু কষ্ট দেখিলে আকুল হইতেন, সেই করুণাময়ী মায়ের চরণতলে আজ কত শত সন্তান বুকফাটা আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, মা আর সাড়া দিলেন না।

মা নাই, মা নাই, আমাদের আজ আর আপন বলিতে কেহই নাই; আছে শুধু অশ্রু, আছে শুধু আর্ত্তনাদ। শ্রাবণধারায় পৃথিবীও যেন কাঁদিয়া বলে,—মা নাই, মা নাই।

কালরাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই মর্ম্মান্তিক সংবাদ দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ভুলিয়া সকলে ছুটিল মায়ের শেষ দর্শনের আশায়। নয়নে নয়নে অশ্রুধারা, কণ্ঠে কণ্ঠে মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ, সকলের বিভ্রান্ত দৃষ্টি। সে শোকদৃশ্য অসহনীয়, অবর্ণনীয়।

মায়ের দিব্যদেহ পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত হইল। কেহ-বা চরণদ্বয় অলক্তকরঞ্জিত করিয়া পায়ের ছাপ লইতেছে, কেহ-বা মুখারবিন্দ চন্দনে চর্চ্চিত করিতেছে। অতঃপর মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে মায়ের পূত দেহ লইয়া শোকযাত্রা বাহির হইল, বরাহনগর ঘাট হইয়া তাঁহার দেহ নৌকাযোগে বেলুড় মঠে লইয়া যাওয়া হইবে।

শরৎ মহারাজের নির্দ্দেশে সেই নৌকায় লেখিকাও মাতার চরণতলে বসিবার সৌভাগ্য লাভ করিল। নৌকা গিয়া বেলুড়ের ঘাটে ভিড়িল। গৌরীমা, গোলাপমা, যোগেনমা-প্রমুখ মায়েরা এবং শত শত সন্তান সকলেই আছেন, অথচ কেহ কাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন না, কাহারও মুখে কোন কথা নাই, একই ব্যথা সকলকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সমবেত জনতার ব্যাকুলদৃষ্টি মায়ের শ্রীমুখে নিবদ্ধ।

অভিষেকের আয়োজন হইতেছে। স্রক, চন্দন, পাদ্য, অর্ঘ্য, নববস্ত্র, সিন্দূর, আরও বহু দ্রব্য কোথা হইতে জড় হইয়াছে, কে জানে! সারদানন্দজী মাতৃহীনা লেখিকার হাতে একখণ্ড কাগজ দিয়া বলিলেন, এই কাগজে লেখা মন্ত্র পাঠ ক'রে মায়ের অভিষেক করতে হবে তোকে।

অতঃপর কন্যাগণ মায়ের দিব্যদেহ গঙ্গায় স্নান করাইয়া নববস্ত্র, কেশবিন্যাস, ও গন্ধানুলেপনাদি দ্বারা সজ্জিত করিলেন। বৈদিক মন্ত্রযোগে মায়ের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তাঁহার শ্রীমুখে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্নও নিবেদন করা হইল। ইহার পর সুসজ্জিত শ্রীঅঙ্গখানি চন্দন কাষ্ঠের

শয্যার উপর স্থাপন করা হইলে রামলালদাদা শিরাগ্নি-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনলদেব শতশিখা বিস্তার করিয়া সেই পূতদেহ ঘিরিয়া ফেলিলেন, সমবেত সন্তানগণ অশ্রুসিক্তনয়নে প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন।

পূর্ণাহুতির পর প্রকৃতিও যেন রুদ্ধশোকাবেগ আর সম্বরণ করিতে পারিল না, দরবিগলিতধারায় অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই বর্ষণে মঠমন্দির সকল স্থান প্লাবিত হইল, হোমানলও নির্ব্বাপিত হইল: নির্ব্বাপিত হইল না শুধু শত শত হৃদয়ের মর্ম্মদাহী শোকাগ্নি। যে-মায়ের দর্শন ও স্পর্শনে সন্তানগণ সকল সন্তাপ ভুলিয়া যাইত, যাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত পান করিয়া পরাশান্তির আস্বাদ অনুভব করিত, স্নেহকরুণার খনি সেই শ্রীশ্রীমাতা সারদেশ্বরী আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যা নহেন, আজ তিনি ধ্যানগম্যা।

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

(এক)

যে-সকল গ্রন্থের উক্তি এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম—মাষ্টার মহাশয়) ... (১)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি (অক্ষয়কুমার সেন) ... (২)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (স্বামী সারদানন্দ) ... (৩)

শ্রীশ্রীমায়ের কথা (উদ্বোধন কার্য্যালয়) ... (৪)

বিবেকানন্দ চরিত (সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার) ... (৫)

গৌরীমা (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম) ... (৬)

শ্রীমা (আশুতোষ মিত্র) ... (৭)

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী (উদ্বোধন কার্য্যালয়)।

(দুই)

নিম্নোক্ত ভক্ত ও ভক্তিমতীগণের লিখিত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে,—

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল, এম. এ., বি. এল., জিলা ও দায়রা জজ (অবসরপ্রাপ্ত)

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পোষ্টমাষ্টার (অবসরপ্রাপ্ত)

শ্রীমতী কিরণবালা দেবী, শিক্ষাব্রতী শশধর মজুমদারের পত্নী

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের প্রাচীন ভক্ত

শ্রীমতী কৃষ্ণময়ী দেবী, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদার জ্যেষ্ঠকন্যা

শ্রীগণপতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ভ্রাতুষ্পুত্র, প্রসন্নমামার পুত্র

শ্রীজিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, এম. এ., বালীগঞ্জ

শ্রীমতী থাকমণি দাসী, ঠাকুরের ভক্ত কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পালের পত্নী

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়, পাইকপাড়া-রাজ অফিসের তত্ত্বাবধায়ক, পুরী

শ্রীব্রজনাথ মিশ্র, ডাক্তার, কটক

শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী বসু, স্বামী প্রেমানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং
শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু, আই. সি. এস.-এর পত্নী

শ্রীমতী রাধারাণী হালদার, ঠাকুরের ভক্ত ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষের কন্যা

স্বামী শ্যামানন্দ, রেঙ্গুন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ
শ্রীসতীন্দ্রমোহন বসু, এম. এ., বি. এল., যাদবপুর
শ্রীমতী সরযূবালা সেন, শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের প্রাচীনভক্ত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনের পত্নী
শ্রীমতী সরলাবালা সরকার, প্রখ্যাত সাহিত্যসেবী
শ্রীমতী সরোজবাসিনী কোলে, জয়রামবাটীর জমিদারকন্যা এবং
বেলিয়াঘাটার ধনী ব্যবসায়ী ভূতনাথ কোলের পত্নী
শ্রীসারদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের মুখ্য
ক্রয়োপদেষ্টা এবং স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সহকারী সচিব (অবসরপ্রাপ্ত)
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের প্রাচীন ভক্ত।

(তিন)

এতদ্ব্যতীত অনেক প্রত্যক্ষদর্শী ভক্ত ও ভক্তিমতী মৌখিক বিবরণ দিয়াছেন।

(চার)

গ্রন্থমধ্যে প্রকাশিত চিত্রাবলীর জন্য শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় পাঁচখানি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন।

(পাঁচ)

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ নাগ
চিত্র-মুদ্রণে—রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট
বাঁধাই—নিউ বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকার, গ্রন্থপ্রকাশক, বিবরণদাতা এবং অন্যান্য সাহায্যকারী সকলকেই কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নাম-সূচী ও পৃষ্ঠা-সংখ্যা

অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—৩৮
অক্ষয়কুমার সেন—১৪২
অখণ্ডানন্দ স্বামী (গঙ্গাধর মহারাজ)—
১৮৪, ৩৩৪, ৩৯৩-৯৪
অঘোরমণি দেবী—গোপালের মা দ্রষ্টব্য
অদ্ভুতানন্দ স্বামী (লাটু মহারাজ)—৭৯,
৮২-৮৩, ৯৮, ১৩২, ১৫২, ১৫৫,
৩২৪-২৫, ৪২০
অনুকূলচন্দ্র সান্যাল—২৪৬, ২৫৯
অন্নপূর্ণার মা—২৩৯, ২৬৯
অবিনাশচন্দ্র—৩৭৫
অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১১১, ২২২,
২৪০
অভয়চরণ মুখোপাধ্যায় (ছোটমামা)—
৩২, ১৯৪-৯৫
অভেদানন্দ স্বামী (কালী মহারাজ)—
৭৯, ১৩৪, ১৪৮, ১৫২, ১৮৪,
১৯১, ২৭৯
অমূল্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—২৬১, ২৬৩
অমৃতানন্দ স্বামী—২৯৭
অসীমের মা—১০১, ১২০-২১, ২০৪,
৩৪৮, ৪১৩
আমজাদ মিঞা—৪০৮-৯
আশুতোষ চৌধুরী—২৭২
তাঁহার মাতা—২৭৩, ৪১৭
আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—৪২২
ইন্দু—৮৬
ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৮, ১০
ঈশ্বর বড়ু—২৩৫-৩৬
উপেন্দ্রনাথ সেন—২১৩
উমা—২৬৯-৭০
উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—৩২
ঊষা—৩০৫
ওলি বুল, মিসেস্ (ধীরামাতা)—৩১০,
৩১৭, ৩১৯
কাঞ্জিলাল, ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ—
২৬১-৬২, ২৭৩, ৩০৬, ৩২২, ৪১৮
কাত্যায়নী দেবী—১৮
কাদম্বিনী দেবী—৩২
কাত্তিকরাম মুখোপাধ্যায়—৮
কালা-বৌ—২৬৯, ৩২০
কালিদাসী দেবী—১৫২, ১৫৫, ১৬০,
২০৪
কালীকুমার মুখোপাধ্যায় (কালীমামা)—
৩২, ৪১৪
কালীপদ ঘোষ—২০১
কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—২৭৬
কালু বন্দ্যোপাধ্যায়—২২২
কাশীমণি দেবী—৩১০
কিরণবালা মজুমদার—৩৮৭
কুমুদবন্ধু সেন—৩৩৮, ৩৭৯, ৪০০
কৃষ্ণচন্দ্র বসু—২০২, ২৯২
কৃষ্ণভাবিনী দেবী—১০১, ১১০, ১২৬-২৮,
১৬৭, ১৭১, ১৭৭, ২২২, ২২৭,
২৩৩, ২৯৩, ৩০৫, ৩১০, ৩৪৫,
৩৪৮, ৩৯৭
কৃষ্ণময়ীদিদি—২০৪-৫, ২৬৪-৬৫
কৃষ্ণময়ী দেবী—৩০৩
কেদারনাথ দাস—২৬৬
কেনাদিদি (নীরদবাসিনী দেবী)—
২১৭-১৮, ২৭২
কেনারাম ভট্টাচার্য্য—২৩
কেশবচন্দ্র সেন—৭৮, ১৩৭
কেশবমোহিনী দেবী—২০১
কেশবানন্দ স্বামী (কেদারনাথ দত্ত)—
৩৩৫, ৩৪০-৪১

ক্রিশ্চিয়ানা, ভগিনী—৩১৭, ৩১৯
ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়—১৭-২০
খেলাত ঘোষের পত্নী—৩১০
গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়—২১৬
গঙ্গামায়ী—১৫৪
গণপতি মুখোপাধ্যায়—২৮৫
গণেন্দ্রনাথ—২৯২
গিরিবালা দেবী—১২৩-২৪, ২২২, ২৪০
গিরিশচন্দ্র ঘোষ—৭৯, দক্ষিণেশ্বরে—৮১-৮২, শ্যামপুকুরে—১৩৭-৩৮, ১৪০, কাশীপুরে—১৪৭, জয়রামবাটীতে—১৭৩-৭৪, স্বামিজী ও নাগমহাশয়ের তুলনা—১৭৬, দুর্গাপূজায় মা—২৫৩-৫৪, ২৫৭, ২৬১, বেলুড়ে মা—৩০১
গোপালের মা—৭৯, ১০১, ১০৪-৬, ১১০-১১, ১৩১, ১৯৯, ২৩৮-৩৯
গোপীনাথ পাল—৩৯২
গোবিন্দ শৃঙ্গারী—১৭০, ২২৪, ২২৬, ২৩৭
গোলাপমা—দক্ষিণেশ্বরে—৭৯, ১০১, ১০৬-৭, শ্যামপুকুরে ১৩৫, বৃন্দাবনে—১৫২, ১৫৯-৬০, কামারপুকুরে—১৬৪-৬৫, বেলুড়ে—১৬৯, জয়রামবাটীতে—১৭৩, স্বামিজীর পত্রে—১৮৯, ভক্তগৃহে—২০৩, ২৫৪, শ্রীক্ষেত্রে—২২২, ২২৬, ২২৯, ২৩৪, মাতৃভবনে—২৬৯, ২৮০-৮১, ৩২১, ৩২৬, ৩২৯-৩০, কাঁকুড়গাছিতে—২৭৯, মাহেশে—২৯২, কোঠারে—২৯৩, ২৯৫, অন্তরের পরিচয়—৩১৩-১৬, ৩৬৫, বলরামভবনে—৩২৪, ৪১৩, কাশীতে—৩৩০-৩১, মায়ের অসুখে—৪১৯-২০, ৪২৫
গোস্বামী—১৩২
গৌরীমা (গৌরমা)—দক্ষিণেশ্বরে—৮৫-৮৬, ৯৪, ৯৯, ১১১-১৩, ১২৩-২৪, ১২৭, ১৫১, বৃন্দাবনে—১৫৫-৬৩, বলরামভবনে—১৬৯, ৪১৩-১৪ কামারপুকুরে—১৬৯, ১৭৪-৭৫, স্বামিজী—১৮৫, ১৮৯, আশ্রম-প্রতিষ্ঠা—১৯০, ভক্তসহ মাতৃসকাশে—২১৩, ২১৫-১৬, ৩১১, ৩৪৪, ৩৬৬, যোগোদ্যানে—২১৯, শ্রীক্ষেত্রে—২২২, ২২৬, ২২৯, কালীঘাটে ও খড়দহে—২৩৯-৪১, বসন্তরোগে—২৭১-৭৪, পুরুষসাধুর বেশে—২৭৪, ২৮৪, মায়ের নিকট চণ্ডীপাঠ—২৮২, সঙ্গীতে—২০২, ৩৪৪, জয়রামবাটীতে—২৮৩, বড়মামীর দীক্ষা—২৮৫, শম্ভুনাথ রায়—২৮৬, জয়রামবাটীতে প্রচার—২৮৮-৮৯, মৃন্ময়ীদর্শন—২৯০-৯২, কটকে—২৯৪, মায়ের উক্তি—৩০০, ৩৫৩, রাধুর বিবাহে—৩০৩, মাতৃভবনে অস্ত্রোপচার—৩২২, সারদেশ্বরী আশ্রম—৩৪৩-৫৪, নফর কোলে—৩৮৮-৮৯, মায়ের অসুস্থতায়—৪১৯, ৪২১-২৩, ৪২৫
গৌরের মা—১০৯-১০
চণ্ডী দেবী—১০৬-৭, ৩১৫
চন্দ্রকান্ত ঘোষ—৩২৮
চন্দ্রমণি দেবী—চরিত্র—১৮, ৩৮-৩৯, পুত্রবাৎসল্য—২১, ২৫-২৬, ১৬৫, পুত্রবধূর প্রতি মমতা—৩০-৩১, ৫৩, দক্ষিণেশ্বরে—৩৭, ৪৪, অন্তিমে—৬৩
চপলা দেবী—২৭৯
চারুহাসিনী দেবী—২৩৭

চ্যাটার্জি, মিসেস্—৩৭৩-৭৪
জগৎমোহিনী (ঘরশোভা)—৩৭০
জগৎমোহিনী দেবী—২৫৭
জগদম্বা—৪৪
জয়মতী দেবী—৩৬৪-৬৫
জানকীনাথ বসু—১৭০
জিতেন্দ্রচন্দ্র দত্ত—৩৩৬
ডাকাত-বাবা—৬৬-৬৯
তুরীয়ানন্দ স্বামী (হরি মহারাজ)—
২০৪, ২৪১, ৩২৩-২৪
তোতাপুরী পরমহংস—৪০-৪৪
ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী (সারদা মহারাজ)
৯৮, ১৮১
ত্রৈলোক্যনাথ বসু—১৭০
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—৮
ত্রৈলোক্যসুন্দরী—৩৭০
থাকমণি দাসী—৩৯২
দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ—৩৫২
দীন মহারাজ—২৫৯
দুর্গা (দুর্গামা)—২৮৩-৮৪, ২৯৪
দুর্গাচরণ নাগ—১৭৬
দুর্লভকৃষ্ণ চৌধুরী—২১২
দেবমাতা, ভগিনী—৩১৭,৩১৯-২০, ৪১১
দেবেন্দ্রনাথ বসু—৩৩৯
দ্বারকানাথ মজুমদার—৩৩৪
ধীরানন্দ স্বামী—১৯৩, ২৯৩-৯৪, ২৯৬
ন'দিদি—১৯৭, ২৮০
নগেন্দ্রবালা—২১৮, ৩৪৮
নন্দিনী দেবী—৪০৪
! কোলে—৩৮৮-৮৯
নরেন্দ্রনাথ দত্ত—স্বামী বিবেকানন্দ দ্রষ্টব্য
নর্ম্মদা দেবী—৩০৭
নলিনচন্দ্র মিত্র—৩১১-১৩
নলিনীদিদি—২৪৯, ২৬৮, ২৮০
নিকুঞ্জবালা দেবী—দক্ষিণেশ্বরে—১০১, বৃন্দাবনে—১৫২, কামারপুকুরে—১৬৮-৬৯, জয়রামবাটীতে—১৭৩, ২৫৯, ৪০৯, কালীঘাটে—২৩৯, মাতৃভবনে—২৬৯, বেলুড়ে—৩২২, কাশীতে—৩৩০
নিতাই সূত্রধর—২৬৫
নিত্যানন্দ বসুর মাতা—২০৬, ২৯২
নিবেদিতা, ভগিনী—২৩৮-৩৯,৩১৭-১৯, ৩২৮
নিরঞ্জনানন্দ স্বামী (নিত্যনিরঞ্জন মহারাজ)
—১৪৩, ১৭৩
নির্ম্মলানন্দ স্বামী (তুলসী মহারাজ)—
২৩৯, ২৫৯, ৩০০
নীলমাধব মুখোপাধ্যায়—৮, ১০, ২২২
ন্যাড়া—৩৮৫-৮৬
পঞ্চানন ব্রহ্মচারী—২৮৫
পঞ্চাননী দেবী—২৭৬-৭৭
পদ্মবিনোদ—২০৯-১০
পীতাম্বর নাথ—২৮৫
পুলিনচন্দ্র মিত্র—৩০৬
পুষ্পমালা দেবী—২৩৮
পূর্ণানন্দ স্বামী—১০২
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—৭৪, ৭৮
প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩০২
প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায় (বড়মামা)
—৩২, ১৬৬, ১৬৮, ২৫২-৫৩, ২৬৮, ২৮৫, ৩০৩, ৩৪১

প্রসন্নময়ী—১৬৪, ১৬৬, ১৬৮
প্রসাদী দেবী – ৩১১
প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—২০০
প্রিয়তমা দেবী—১২২, ৩৩২-৩৩
প্রিয়নাথ ডাক্তার—২০৪, ২১১, ২৭৩, ৩১০
প্রেমানন্দ স্বামী (বাবুরাম মহারাজ)—৩০৪, ঠাকুরের ভালবাসা—১০০, কাশীপুরে—১৪৫, আঁটপুরে মাতাঠাকুরাণী – ১৭১, শম্ভুনাথকে প্রবোধদান—২১৭, শ্রীক্ষেত্রে—২২২, ২২৮ খড়দহে—২৪১, মায়ের প্রসঙ্গে—২৪৭, ৩৩৭, মাতৃভবনে—২৭১, দেহত্যাগ – ৪২০
বগলামণি দেবী—২০০
বঙ্কিমচন্দ্র সেনের পত্নী—১০১, ১২০
বরদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—৩২, ১৬৬, ১৮১, ২২২
বরেন ঘোষ—২৬২
বলরাম বসু—দক্ষিণেশ্বরে—৭৯, ৯৯, ২০৩, গৌরীমাসহ—১০৩, মাকে দণ্ডবৎ—১২৫-২৭, স্বগৃহে মা ১৫২ গৌরীমাকে পত্র—১৫৬, পরলোকগমন—১৭১-৭২
বলরাম বসুর শাশুড়ী—২৩১
বলরাম মিশ্র—২৩৭
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—৭৮, ১৩৭
বিনয়েন্দ্র প্রসাদ বাকচী – ২৬০
বিনোদবিহারী সোম—২০৯-১০
বিনোদিনী—১৩৭-৩৯
বিপিনকালী দেবী—২৪০
বিপিনকৃষ্ণ চৌধুরী—২৭২
বিপিনচন্দ্র রায় চৌধুরী—৩১০
বিপিন বিহারী—৩৫৭-৫৮
বিপিন শা—৩৯২
বিবেকানন্দ স্বামী (নরেন্দ্রনাথ)—দক্ষিণেশ্বরে—৭৯-৮১, ৯৩-৯৫, ৯৭-৯৮, ১০০, পানিহাটিতে—১৩৪, শ্যামপুকুরে—১৩৭, কাশীপুরে—১৪৩, ১৪৫, ঠাকুর কি ভগবান—১৪৭, ৪১২ শ্রীমায়ের জন্য ভাবনা—১৫১, ১৬৯, মায়ের আশীর্ব্বাদ—১৭২-৭৩, গিরিশচন্দ্রের উপমায়—১৭৬, সংঘ ও প্রচার—১৮২-৯২
বিমলা দেবী—৩৪৫
বিশ্বেশ্বরী দেবী—২৫৫
বিষ্ণুবিলাসিনী ও বিষ্ণুমানিনী দেবী—২৭৮-৭৯
বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার—২৯৩
বৃন্দাবন ঘোষের স্ত্রী—৩০১
বেণীর বোন—২১৫
বৈকুণ্ঠনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩০০
বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক—২৯৩-৯৫
বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় – ৩০২
ব্রজনাথ মিশ্র—২৯৩-৯৪
ব্রজবালা দেবী—১২১-২৩
ব্রহ্মানন্দ স্বামী (রাখাল মহারাজ)—দক্ষিণেশ্বরে—৭৯, ৯৮-১০০, কাশীপুরে—১৪৩, শ্রীক্ষেত্রে—১৭০, স্বামিজীকে পত্র—১৮৪, বরাহনগরে—১৮৫, স্বামিজীর পত্রে—১৮৯, মধুসূদন ও শম্ভুনাথ প্রসঙ্গে—২০৫,

২১৭, কালীঘাটে—২৩৯, খোড়ো-কেদারের জমিগ্রহণ—২৬৬, মাতৃ-ভবনে—২৭১, মাকে অভ্যর্থনা—৩০১, ৪০১, কাশীতে—৩৩০, মণি-মল্লিকের উদ্যানবাটীতে—৪০৪

ভগবতী দেবী—১২২

ভবমা—২৬৯, ৩৯৪

ভানুপিসী—২৭০-৭১, ৩৩০

ভাবিনী দেবী—১০১, ১১৩-১৪

ভুবনমোহিনী দেবী—১২৬-২৮, ১৬৭, ১৭৬,

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, মহারাজ—৩৫২

মথুরানাথ বিশ্বাস—২২, গদাধরের নিয়োগ—২৩, গদাধরে ভক্তি—৩৩-৩৪, গদাধরের চিকিৎসা—৩৬, চন্দ্রমণি-প্রসঙ্গে—৩৮-৩৯, গদাধরকে দেশে প্রেরণ—৪৪, ঠাকুরের উক্তি—৫৩, তীর্থে—৯১-৯২, ১৫৩

মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়—২০৫-৬

মধুসূদন ভট্টাচার্য্য—১২৪

মনোরমা দেবী—৩৬৫

মন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩০২-৩

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম-মাষ্টার মহাশয়)—দক্ষিণেশ্বরে—৭৯, ১৩২, শ্যাম-পুকুরে—১৩৭, কাশীপুরে—১৪৩, বলরামভবনে—১৬৯, আঁটপুরে—১৭০, স্বগৃহে মা—১৭১, ১৮১, ছোট-মামার শিক্ষা—১৯৪, শ্রীক্ষেত্রে—২২২, ২২৬, ২২৮, কালীঘাটে—২৩৯, অলঙ্কার উদ্ধারে—২৫২, জগদ্ধাত্রীর ভূমিক্রয়ে—২৫৭, অমূল্য-বাবুর প্রসঙ্গে—২৬৪, রাধুর বিবাহে—৩০৩, শ্রদ্ধাঞ্জলিদান—৩১০, মায়ের আহ্বানে—৩৯৪, কাশীতে—৩৩০

মহেন্দ্রনাথ পাল—৩৯২

মহেন্দ্রলাল সরকার—১৩৬-৩৭

মাকু—সুশীলা দ্রষ্টব্য

মাখনলাল চট্টোপাধ্যায়—৩০২

মাণিক—৮৬, ১২৬

মাধবচন্দ্র রায়—২০১

মাধবানন্দ স্বামী (নির্ম্মল মহারাজ)—১৮২, ২৬০-৬১

যোগবিনোদ স্বামী—২৬৪

যোগানন্দ স্বামী (যোগেন মহারাজ)—দীক্ষা—৯৮, তীর্থে—১৫২-৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৯, ১৬১, ১৭৭, কামারপুকুরে—১৬৪, স্বামিজীকে পত্র—১৮৫, দেহত্যাগ—১৯৩

যোগেনমা (যোগীন্দ্রমোহিনী দেবী) দক্ষিণেশ্বরে—১০৬-৭, ১১১-১২, বৃন্দাবনে—১৫৬, ১৫৯, বেলুড়ে—১৬৯, শ্রীক্ষেত্রে—১৭০, জয়রাম-বাটীতে—১৭৩, স্বামিজীর পত্রে—১৮৯, ভক্তগৃহে—২০৪, ৪০৪, মাতৃভবনে—২১৬-১৭, ২৬৮-৬৯, ২৮১, কালীঘাটে—২৪০, মাহেশে—২৯২, মায়ের মহাপ্রয়াণে—৪২১, ৪২৫

যোগেনমার গর্ভধারিণী—১৭৩, ১৯৭

যোগেশ্বরী দেবী (ভৈরবী ব্রাহ্মণী)—৩৬-৩৭, ৪০, ৪২, ৪৪-৪৬

রবি গুপ্ত—২৫৭

রমণী—৯০, ১৯৮

রসিক মেথর—৮৭-৮৯

রাকেশ মুখোপাধ্যায়—২৫৭

রাখাল—৩৬৩-৬৪

রাখাল ডাক্তার—১৩২

রাঘবানন্দ স্বামী—২৬০

রাজলক্ষ্মী বসু—২০২, ২৪০, ৩০৪

রাধারমণ বরাট—২২২

রাধারাণী (রাধু) জন্ম ও বাল্য—১৯৫, ২৪৪, ২৪৯, কলিকাতায়—১৯৬, ২০৪, ২৫৩, ২৫৫, ২৬৮, ৩৩৯, ৩৯৭, পুরীতে—২২২, অলঙ্কার প্রসঙ্গে—২৫১, সারদানন্দজীর স্নেহ—২৬৯, সঙ্গিনী উমা—২৭০, মাহেশে—২৯২, কোঠারে—২৯৩, বিবাহ—৩০২-৪, ৩৬০-৬১, মায়ের অন্তিমকালে—৪২১

রাধারাণী হালদার—২১৮

রামকুমার চট্টোপাধ্যায়—১৮, ২১-২৩, ৩৮

রামচন্দ্র দত্ত—১৯, ৮৩, ৯৯, ১২২, ১৩৪-৩৫, ১৪৭, ২৬৪, ২৭৮

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঠাকুর, গদাধর) - বংশ-পরিচয়—১৭-১৮, বাল্যকাল—১৯-২১, পূজারী—২৩-২৪, বিবাহ—২৫-৩১, বিবিধ সাধনা—৩৩-৩৭, ৪০-৪৩, কামারপুকুরে—৪৪-৪৭, পত্নীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন—৫০, পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধা—৫৪-৫৭, আত্মপরীক্ষা—৫৭-৫৮, পত্নীতে জগজ্জননী বোধ—৫৮, ষোড়শী-পূজা—৬০-৬১, জননীর দেহত্যাগ-৬৩, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়—৭০-৭১, লোক-শিক্ষা—৭২, কামিনীকাঞ্চন প্রসঙ্গে—৭৩-৭৭, ব্রাহ্মদিগের শ্রদ্ধা—৭৮ অন্তরঙ্গ সমাগমে—৭৯-৮৩, ১০১-৭, আনন্দোৎসবে—৮৪-৮৬, রসিক মেথর—৮৭-৮৮, বৈদ্যনাথে—৯১-৯২, রমণী—৮৯, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি—৯২-৯৩, মাতৃজাতিসেবা প্রসঙ্গে—৯৪, পত্নীর সহিত অন্তরঙ্গ-গণের পরিচয়—৯৬-১৩০, রোগের সূত্রপাত—১৩১, পানিহাটিতে—১৩৪, শ্যামপুকুরে—১৩৫-৪০, কাশীপুরে—১৪০-৪১, রোগশয্যায়—১৪৩-৪৭, মহাসমাধি—১৪৮-৪৯, শ্রীমাকে দর্শনদান—১৫০-৫১, ১৬৩, ১৮৭, গৌরীমাকে দর্শনদান—১৫৬, স্বামিজীকে দর্শনদান—১৮৬, স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত—৪১২

রামকৃষ্ণ বসু—১৭১, ২৪০, ২৯৩, ২৯৬, ৪২০

রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী (শশী মহারাজ)—১৭৩, ১৮৪-৮৫, ২৮২, ২৯৭-৯৮, ৩০০, ৩০৪

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় - পরিচয়—৮, ১০, দেবীর দর্শন—১১-১২, ৪১৫, কন্যার বিবাহে—১৬, ২৭-২৮, কন্যার প্রতি স্নেহ—৩০, ২৪২, দক্ষিণেশ্বর-যাত্রা—৪৯-৫১, দেহত্যাগ—৬২, ২৪৩

রামদয়াল চক্রবর্ত্তী—২০৩

রামনাদের রাজা—২৯৯

রামপ্রিয়া দেবী—২৫২

রামলাল চট্টোপাধ্যায়—দক্ষিণেশ্বরে—৫৬-৫৭ ৭৪, ১০৪, ১৩১, পরিচয়—১০১, কাশীপুরে—১৪১, ১৫০, কামারপুকুরে—১৭৩, ২৬৪, মায়ের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনে—১৬৮, ভক্তগৃহে—২০০, পুরীতে—২২৮,

কালীঘাটে—২৩৯, মাতৃভবনে—২৬৮, কাঁকুড়গাছিতে—২৭৮, মাদ্রাজে—২৯৮, মণি মল্লিকের উদ্যানবাটীতে—৪০৪, মায়ের মহা-প্রয়াণে—৪২৫

রামলালদাদার পত্নী—২৩০

রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—১৮, ২১, ২৬-২৭, ৪৪, ৬২, ১০১

রাসমণি, রাণী—পরিচয় ও স্বপ্ন—২২, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা—২৩, ঠাকুরের পরীক্ষায় জামাতাকে প্রেরণ—৩৩-৩৪, ঠাকুরের শাসন ও শিক্ষা—৩৫-৩৬, কুমারীপূজায়—৩৭২

লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী—৫৪, ৭৭

লক্ষ্মীদিদি (লক্ষ্মীমণি দেবী)—পরিচয়—১০১-২, দক্ষিণেশ্বরে—১২০-২১, নহবতে কীর্ত্তন—১৩০, শ্যামপুকুরে—১৩৫, কাশীপুরে—১৪১, ১৪৫, ১৫০, বৃন্দাবনে—১৫২, প্রয়াগে—১৬৩, শ্রীক্ষেত্রে—১৭০, ২২২, ২২৬, ভক্তগৃহে—২০০, ২০১-২, ৪০৪, খড়দহে—২৪১, কামারপুকুরে—২৬৪, মাতৃভবনে—২৬৮, কাঁকুড়-গাছিতে—২৭৯

ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়—২৫২, ৩১১, ৩৪২, ৩৯৪

লীলাবতী দেবী—২৮৫

শতদলবাসিনী—১১৫-১৬, ২৮৫

শম্ভুচরণ মল্লিক—১২৪

শম্ভুনাথ—২১৬

শম্ভুনাথ রায়—২৮৬

শশধর মজুমদার—৩৮১, ৩৮৭

শশিভূষণ ঘোষ—২১৮

শাকম্ভরী দেবী—৩১

শিবকালী মুখোপাধ্যায়—১২২-২৩

শিবকুমার ঠাকুর—৩১৫

শিবনাথ শাস্ত্রী—৭৮

শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—১০১, ১৬৪-৬৫, ১৭৩, ২০০, ২৩৯, ২৬৮-৬৯, ৩৬৬, ৪১৪

শিবানন্দ স্বামী (মহাপুরুষ মহারাজ)—১৭৩, ১৮৪, ১৮৮, ২০৪

শীতলামাতার ব্রাহ্মণ—২৭৫

শুভারাণী বরাট—২৫৭

শৈলবালা দেবী—২১২-১৩

শৌর্য্যেন্দ্রনাথ মজুমদার—২৮৫

শ্যামাদাস বাচস্পতি—৪১৮, ৪২২

শ্যামাকুমার ঠাকুর—৩১৫

শ্যামানন্দ স্বামী—৩১৩-১৪, ৩২২, ৩৮০

শ্যামাসুন্দরী দেবী—পরিচয়—১০, সন্তান-স্নেহ—১৩-১৬, কন্যার বিবাহে—২৭, পুত্রকন্যা—৩২, জামাতার জন্য ক্ষোভ—৪৮, ৯৭, ৪১৪, জগদ্ধাত্রী-দর্শন—৬৪, ৬৬, ৪১৫, কন্যার জন্য শোক—১৬৫, ১৬৮-৬৯, তীর্থে—১৭৭-৮১, ২২৭, মাতা-কন্যার সম্বন্ধ—২৪১-৪২, দেহত্যাগ—২৪৩, ৩০২

শ্রীম—মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত দ্রষ্টব্য
সতীন্দ্রমোহন বসু—৩৩৪-৩৫
সত্যকাম স্বামী—২২৭, ২২৯, ২৯৩, ২৯৫, ২৯৭
সদানন্দ স্বামী (গুপ্ত মহারাজ)—১৮৫
সরযূ (দক্ষিণেশ্বরের)—১১৬-১৮
সরযূ (মাতৃভবনের)—২৭৭-৭৮
সরযূবালা সেন—২১৩, ৪০০
সরলা দেবী—৩৬১
সরলাবালা সরকার—৩৬৮
সরোজবালা—৩৫৩
সরোজবাসিনী কোলে—১৯৫, ৩৮৮-৮৯
সর্ব্বমঙ্গলা দেবী—১৮
সর্ব্বানন্দ স্বামী (তেজনারায়ণ মহারাজ) ৩১৯
সারদাদেবী (শ্রীশ্রীমা, মাতাঠাকুরাণী, সারদেশ্বরী দেবী)—বংশ পরিচয়—৮-১০, জন্ম—১৩, শৈশব—১৪-১৬, বিবাহ—২৭-২৯, পতিগৃহে—৩০-৩১, পিতৃগৃহে—৩১-৩৩, 'কামারপুকুরে পতিসেবায়—৪৫-৪৭, দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা— ৪৮-৫০, নহবতে—৫১-৫৩, লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারী প্রসঙ্গ—৫৪-৫৫, পতির শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—৫৫-৫৭, অগ্নিপরীক্ষা—৫৭-৫৮, পতিতে কালীরূপ দর্শন—৫৯, ষোড়শীপূজা—৬০-৬১, সিংহবাহিনীর কৃপা—৬২-৬৩, জগদ্ধাত্রীপূজা—৬৪-৬৬, ডাকাতবাবা—৬৬-৬৯, রসিক মেথর ও রমণীর প্রসঙ্গ ৮৮-৯০, সন্তানগণেরসহিত পরিচয়—৯৭-১০১, সঙ্গিনীগণের সমাগম—১০১-০৭, ভক্তিমতীগণ—১০৮-৩০, শ্যামপুকুরে—১৩৫-৩৬, তারকেশ্বরে—১৪৪, ঠাকুরের মহাসমাধিতে—১৪৮-৫০, ঠাকুরের দর্শনদান—১৫০-৫১, ১৬৩, ১৮৭, কাশীবৃন্দাবনে—১৫২-৬৩, ১৭৭-৮১ কামারপুকুরে নূতনজীবন—১৬৪-১৬৮, বেলুড়ে—১৬৯, ১৭৬, শ্রীক্ষেত্রে—১৭০, ২২২-৩৭, গয়ায়—১৭১, ঘুষুড়ীতে—১৭২, ভক্তসঙ্গে—১৭৩-৭৫, কৈলোয়ারে—১৭৭, স্বামিজীকে আশীর্ব্বাদ—১৮৭, স্বামিজীর উক্তি—১৮৮-৮৯, সন্তানবৎসলা—১৯৩-২২১, আশ্রম ও মঠপ্রতিষ্ঠা—১৯০-৯২, দীক্ষাপ্রসঙ্গে—২১৩, ৩৮০, ৪০০, ৪২১, কালীঘাট ও খড়দহে—২৩৯-৪১, শ্যামাসুন্দরীর দেহত্যাগ—২৪২-৪৩, গিরিশ ঘোষের দুর্গাপূজায়—২৫৩, জগদ্ধাত্রীপূজার ব্যবস্থা—২৫৭, কামারপুকুরে ঠাকুরের উৎসবে—২৬৪, মাতৃভবনে—২৬৬-৮২, বসন্তরোগ—২৭১-৭৩, কাঁকুড়গাছিতে ২৭৮-৭৯, মৃন্ময়ীদর্শন—২৯১, মাহেশে—২৯২, কোঠার ও রামেশ্বরে—২৯৩-৩০১, দৈনন্দিন কর্ম্মধারা—৩০৫-৬, সঙ্গীতানুরাগ—৩০৬-৭, বিরাট ব্যয়নির্ব্বাহে—৩১০, আহার

ও বেশভূষায়—৩১০, পাশ্চাত্ত্য মহিলাদের সহিত—৩১৭-২০, অস্ত্রোপচারে ভীতি—৩২১-২৪, স্বপ্নে দর্শন ও দীক্ষাদান—৩২৫-৩০, পুনরায় কাশীতে—৩৩০-৩৪, মায়ের রূপ—৩৩৭-৪১, দেশের নূতন বাটী—৩৪২, মা ও সারদেশ্বরী আশ্রম—৩৪৩-৫৪, পথের নির্দ্দেশ—৩৫৫-৮২, সমাজবিধি—৩৭৬-৭৭, নারীর নৃত্য—৩৭৯, আদর্শনিষ্ঠা—৪০১-২, ৪০৬, মায়ের স্বরূপ—৩৮৩-৪১৫, লীলাসম্বরণ—৪১৬-২৬

সারদানন্দ স্বামী (শরৎ মহারাজ)—পাশ্চাত্ত্যে কর্ম্মভার—১৯১, কালীপদ ঘোষের গৃহে—২০১, পদ্মবিনোদ প্রসঙ্গে—২০৯, অর্থসংগ্রহে—২৫৭, মাতৃভবননির্ম্মাণে—২৬৭, রাধারাণীর প্রতি স্নেহ—২৬৯, মাতৃভবনের রক্ষক—২৭১, লেখিকার সন্ন্যাসের আয়োজনে—২৮২, মায়ের জন্য ব্যাকুলতা—২৮৩, ২৯০, ৪১৮, মাহেশে—২৯২, রাধারাণীর বিবাহে ৩০৩, সঙ্গীতানুষ্ঠানে—৩০৬, বিবিধ প্রসঙ্গে—২৪৩, ৩১৬, ৩২১-২২, ৩২৯, দেশে মায়ের গৃহনির্ম্মাণে—৩৪২, দরিদ্রের শিক্ষা ব্যবস্থায়—৩৯৩-৯৪, অশিষ্ট সেবককে নির্ব্বাসন—৪০০, মায়ের অসুস্থতায়—৪১৬-১৮, ৪২১-২৩, ৪২৫

সারদারঞ্জন দত্তশর্ম্মা—৩১৮, ৩২৮, ৩৯৫

সিদ্ধেশ্বরী দেবী—১২২, ১৬৭

সুধীরা বসু—৩৩০

সুবাসিনী দেবী—২৫৩, ২৮৫-৮৬

সুরবালা দেবী—১৯৪-৯৫, ২৫১-৫২, ২৬৮, ২৮০, ২৮৫, ২৯২, ৩০২, ৩১১, ৪২১

সুরমা দেবী—৪১৭

সুরেন্দ্রনাথ—২১১-১২

সুরেন্দ্রনাথ ভৌমিক—২৮৫

সুরেন্দ্রনাথ সেন—২১৩, ২৪৪

সুশীলা (মাকু)—২৪৯, ২৬৮-৬৯, ৩০২, ৩০৪, ৩৮৫

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—৩১৫

হরলাল মজুমদার—৩৩৫

হরিচরণ রায়—৩৭০

হরিদাস চৌধুরী—১৮২

হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়—২২২

হরিপ্রসাদ মজুমদার—১০

হরিপদ দত্ত—৩৩০

হরিবল্লভ বসু—১৭০, ২২২-২৩

হরির মা—২৭১, ২৭৯-৮০, ২৯২

হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—৩৩৪

হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়—২৬, ৩৬, ৪৪, ৫৬-৫৭, ৯১, ২৪৯